

ISSN 1813-0402

সাঁদেপা সাহিত্য

৩২তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২১



কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

A Research Journal
Faculty of Arts
University of Rajshahi

সাঁদেপা সাহিত্য

৩২তম সংখ্যা ■ ডিসেম্বর ২০২১



কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা পত্রিকা

৩২তম সংখ্যা □ ডিসেম্বর ২০২১



A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

A Research Journal
Faculty of Arts
Rajshahi University

Vol. 32
December 2021

Published by
Professor Dr. Md. Fazlul Haque
Dean, Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

Cover Design
Rashed Sukhon

Printed by
Uttoran Offset Printing Press
Kadirgonj, Rajshahi - 6100

Price : Tk. 400.00 \$ 6

Contact Address
Chief Editor, *A Research Journal* (Faculty of Arts)
Deans Complex
Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh

E-mail: dean.arts@ru.ac.bd
www.ru.ac.bd/arts

EDITORIAL BOARD

Chief Editor

Professor Dr. Md. Fazlul Haque

Dean, Faculty of Arts
Rajshahi University

Members

Professor Shamima Akter

Chairman
Department of Philosophy

Professor Dr. Mahmuda Khatun

Chairman
Department of History

Rubaida Akhter

Chairman
Department of English

Professor Dr. Sarker Sujit Kumar

Chairman
Department of Bangla

Professor Dr. Mohammad Fayek Uzzaman

Chairman
Dept. of Islamic History & Culture

Professor Dr. Mohammad Sabirul Islam Hawlader

Chairman
Department of Arabic

Professor Dr. Muhammad Mahbubur Rahman

Chairman
Department of Islamic Studies

Professor Dr. Dino Bandhu Pal

Chairman
Department of Music

Professor Dr. SM Faruque Hossine

Chairman
Department of Theatre

Professor Dr. Md. Osman Goni

Chairman
Department of Persian Language & Literature

Professor Dr. Juely Biswas

Chairman
Department of Sanskrit

Professor Dr. Md. Ataur Rahman

Chairman
Department of Urdu

Message from the Chief Editor

The 32th volume of *A Research Journal*, Faculty of Arts is being published with as many as 23 research articles contributed by the faculty members of History, Arabic, Islamic Studies, Theatre, Persian Language & Literature and Sanskrit Departments. The articles are of diverse characters and will come to the use of the students and researchers of various disciplines, specially of the Faculty of Arts.

The publication of the journal is the result of collective efforts of all the scholar members of the editorial board. They have ungrudgingly helped me in its publication. I am grateful to them for their cooperation. I thank the concerned officers of the Faculty for their assistance and also the employees of the Uttoran Offset Printing Press for their support.

Professor Dr. Md. Fazlul Haque

Chief Editor and Dean
Faculty of Arts
University of Rajshahi
Rajshahi-6205

সূচিপত্র

ড. মো. গোলাম সারওয়ার ও ড. মোছা. সাহিনা আক্তার ড. মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন	নিউজিল্যান্ডের মাওরি জনগোষ্ঠী সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা সাহাবীদের কবিতায় মানবতাবোধ	১ ১১
ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান	শায়খ 'আলী তানতাবি রচিত প্রবন্ধে ইসলামি উপাদান	২১
ড. মুহা: উবায়দুল্লাহ	সূরা ক্বাফ: পরিচিতি ও মর্যাদা	৪৫
ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম ও মুহাম্মদ হানীফ ড. জিয়াউর রহমান খান	আরবি কাব্যে রাসূল-প্রশস্তি: পরিশ্রেক্ষিত ইসলামি যুগ সাহাবীদের শোকগাথায় মহানবী (সা.) প্রসঙ্গ : একটি পর্যালোচনা	৫৭ ৭৫
ড. ছালেকুজ্জামান খান	যুররুন্মাহর কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি	৯১
ড. মো. সেতাউর রহমান আব্দুল মমিন	বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ উমাইয়া যুগে আরবী কবিতায় ইসলামী আকীদা ও ভাবধারা	৯৯ ১১১
মো. মিনারুল ইসলাম মো. ওবায়দুল্লাহ মুহাম্মদ আব্দুছ ছাত্তার	খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী: আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান শাসক শ্রেণীর সমালোচনায় রচিত মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরীর কবিতায় দর্শন জারীরের কবিতায় মরু সংস্কৃতি	১২৩ ১৩১ ১৪১
ড. মো. মনিরুজ্জামান	খলিল মুতরানের কাব্যে প্রেম ও রোমান্টিকতা: একটি পর্যালোচনা	১৪৯
ড. মো. কামারুজ্জামান	নাজীব কিলানীর সাহিত্যে বৈশ্বিক ভাবনা	১৬৩
ড. মো. আবু বকর	আল কুরআনে ব্যবহৃত وَ (ওয়াইল) শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ	১৮৩
ড. মুহা. বারকুল্লাহ বিন-দূর মো. ওবাইদুল্লাহ	ইসলামী সংস্কৃতি: পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্পদ সঞ্চয়: ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি	১৯৭ ২১৭
ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান	রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী: একটি বিশ্লেষণ	২৩১
ড. মো. মাসুদ আলম আব্দুল্লাহ	বিবাদ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা: প্রচলিত ও ইসলামী বিধান আল-কুরআনের অলৌকিক মর্যাদা: একটি পর্যালোচনা	২৫৭ ২৭৫
ড. এস. এম. ফারুক হোসাইন	বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চা: বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার	২৮৯
ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তাপস কুমার রায়	ইরানের কবি হাফিজের কাব্যে পির প্রসঙ্গ অনুকূলচন্দ্রের রচনাবলী: বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিকতা	৩০৫ ৩১৫

নিউজিল্যান্ডের মাওরি জনগোষ্ঠী সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. গোলাম সারওয়ার*

ড. মোছা সাহিনা আক্তার*

Abstract: The Maori are the indigenous Polynesian people of New Zealand. They were settlers from eastern Polynesia, and they arrived in New Zealand in several waves of canoe voyages some time between 1250 and 1300. Over several centuries in isolation, the Maori settlers developed a unique culture, with their own language, a rich mythology, and distinctive crafts and performing arts. The early Maori formed tribal groups based on eastern Polynesian social customs and organisation. Horticulture flourished using plants they introduced; later, a prominent warrior culture emerged. The arrival of Europeans to New Zealand, starting in the 17th century, brought enormous changes to the Māori way of life. Māori people gradually adopted many aspects of the Western society and culture.

ভূমিকা:

নিউজিল্যান্ডের অন্যতম আদিম জনগোষ্ঠী হলো মাওরি। ২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী নিউজিল্যান্ডে এদের সংখ্যা হলো ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ২০০। এছাড়া অস্ট্রেলিয়াতে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৪০৭ জন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৪ জন, যুক্তরাজ্য ৮ হাজার, কানাডাতে ১ হাজার ৩০৫ জন মাওরি অধিবাসী রয়েছে। এছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য অংশে আরও ৮ হাজার মাওরি জনগোষ্ঠী বসবাস করছে। তবে নিউজিল্যান্ডে মাওরি জনগোষ্ঠী পূর্ব পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এখানে এসেছে। ১২৫০খ্রী. থেকে ১৩০০খ্রী. সালের মধ্যে মাওরিরা ডিঙ্গি নৌকাতে করে নিউজিল্যান্ডে আগমন করে। নিউজিল্যান্ডে এই পলিনেশীয় জনগোষ্ঠী শত শত বছর বসবাস করে উন্নত সংস্কৃতি, নিজস্ব ভাষা, কলাবিদ্যা, হস্তশিল্পের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী, কুটির শিল্পের বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তবে শুরুর দিকে মাওরিরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত থেকে পূর্ব পলিনেশীয় গোত্র প্রথা ও সামাজিক সিস্টেম দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তবে পরবর্তীতে চাষাবাদ সংক্রান্ত ধারণা এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত ধারণাও মাওরিদের মধ্যে বিকশিত হয়। ইউরোপীয়রা ১৭শতকে নিউজিল্যান্ডে আগমন করে। ইউরোপীয়দের আগমন মাওরি জনজীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। মাওরি জনগোষ্ঠী ইউরোপীয় সমাজের নানা সংস্কৃতি বিভিন্নভাবে আত্মস্থ করেছে। ইউরোপীয় ও মাওরি জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছিল বন্ধুত্বপূর্ণমূলক। ১৮৪০ সালে ওয়াটাঙ্গি (Watangi) চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে দুই সম্প্রদায়ের সহাবস্থান স্থিতিশীলতা লাভ করেছে। ভূমি বিরোধ ও ক্রয় বিক্রয়কে কেন্দ্র করে ১৮৬০ এর দশকে কিছু কিছু বিরোধও প্রকাশিত হয়েছে। সামাজিক বিপর্যয়, দশকের পর দশক গোত্রগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্ভিক্ষ মাওরি জনগোষ্ঠীর উপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। তবে বিশ শতকের শুরুতেই মাওরি জনগোষ্ঠী এই বিপর্যয় হতে বের হওয়ার চেষ্টা করেছে। নিউজিল্যান্ডের সমাজ সংস্কৃতিতে প্রভাব বৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও ঐতিহ্যবাহী মাওরি সংস্কৃতির উত্থান এই সময় লক্ষ্য করা যায়। ১৯৬০ এর দশক থেকে মাওরি অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ হল মাওরি জনগোষ্ঠী। এটি নিউজিল্যান্ডের অন্যতম বৃহৎ নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। নিউজিল্যান্ডের বাহিরে অস্ট্রেলিয়াতে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাওরি বসবাস করছে। বর্তমানে মাওরিদের প্রায় এক

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

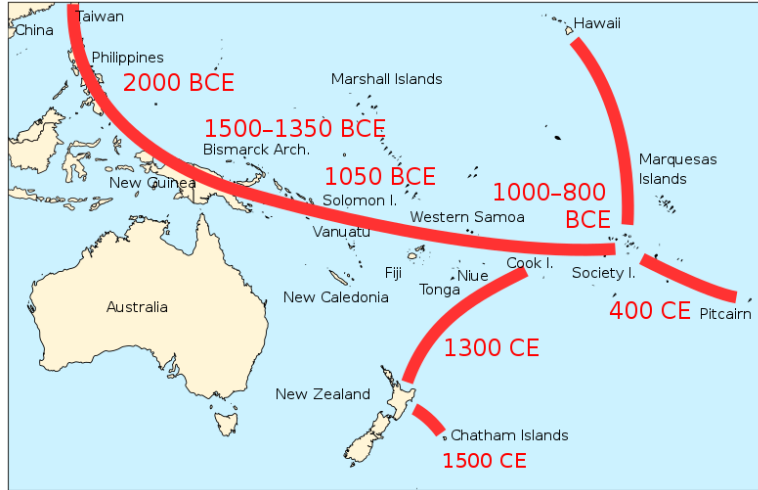
* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পঞ্চমাংশ তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। নিউজিল্যান্ডের বিভিন্নক্ষেে যেমন, মিডিয়া, রাজনীতি এবং খেলাধুলাতে মাওরিদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। তবে বেশিরভাগ মাওরিরাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাঁধা বিপত্তির সম্মুখীন হন। নিউজিল্যান্ডের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় মাওরিদের জীবনযাত্রার মান অপেক্ষাকৃত নিম্নগামী। তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধি চক্র, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং শিক্ষা সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে নিউজিল্যান্ডের সরকার মাওরি এবং নিউজিল্যান্ডবাসীর মধ্যে পার্থক্য কমিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন ধরনের আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তবে এই আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে চলে আসা দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক ঘৃণার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত চলমান আছে।^১

মাওরি সংজ্ঞা

মাওরি (Maori) ভাষায় মাওরি শব্দের অর্থ হলো সাধারণ বা প্রাকৃতিক। মৌখিকভাবে চলে আসা মাওরি মিথোলজি বা কাহিনী অনুযায়ী মাওরি বলতে বোঝায় মরণশীল অর্থাৎ মরণশীল মানুষ জাতি। ‘মাওরি’ শব্দটি প্রত্ন পলিনেশীয় ভাষা থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হয়। প্রত্ন পলিনেশীয় ভাষায় মা-কুলি (maa-quli) থেকে মাওরি শব্দ এসেছে বলে ধারণা করা হয়।^২ বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের কিছু সংবাদপত্র ও ওয়েবসাইড মাওরি ভাষা আত্মস্থ করেছে। নিউজিল্যান্ডের প্রথম দিককার অভিবাসীরা নিউজিল্যান্ডের আদিবাসীদের ‘Native’ নামে অভিহিত করত। তবে মাওরিরা নিজেদেরকে মাওরি হিসাবেই পরিচয় দিত। মাওরিরা নিজেদেরকে ভূমিপুত্র হিসাবে পরিচয় দিত। মাওরিদের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী নিউজিল্যান্ডের ‘Native’ শব্দের পরিবর্তে সরকারিভাবে ‘Maori’ শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। এরপর থেকে সরকারী Native সংক্রান্ত বিভাগের নাম মাওরি বিভাগ হিসাবে অভিহিত হয়। ১৯৭৪ সালের পূর্ব থেকেই ‘Legal’ বৈধ মাওরি জনগোষ্ঠীদের সনাক্তকরণের জন্য সরকার নানা ধরনের তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে। ১৯৭৪ সালে মাওরি সংক্রান্ত আইনে কিছুটা সংশোধন আনা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক সুবিধা মাওরি জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়া।

নিউজিল্যান্ডে মাওরিদের আগমন



মানচিত্র-১: নিউজিল্যান্ডে মাওরিদের আগমন

বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ১২৮০ সাল নাগাদ নিউজিল্যান্ডে মাওরিরা বসতি স্থাপন করে। এই ধরনের পরীক্ষাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ইদুরের হাড় পরীক্ষা। এটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, ১২৮০ সালের মধ্যেই অভিবাসীরা নিউজিল্যান্ডের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বনভূমি বসতি স্থাপনের জন্য কেটে উজাড় করেছে। মাওরিদের মৌখিক ইতিহাসের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তারা হাওয়াকি (Hawaki) নামক স্থান থেকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছে। বিগত কয়েক দশকে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (M.T DNA) পরীক্ষার মাধ্যমে মাওরিদের বাহিরে থেকে আসার তত্ত্বটি প্রমাণিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক তথ্যের নীরতি দেখা যায় যে, প্রথম যুগের এই অভিবাসীরা পূর্ব পলিনেশিয়া থেকে নিউজিল্যান্ডে এসেছে। ভাষাগত বিবর্তনের অনুসন্ধান ও মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (M.T DNA) পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এই জনগোষ্ঠী প্রায় ৫ হাজার ২শ বছর আগে তাইওয়ান থেকে পলিনেশিয় অঞ্চলে অভিবাসিত হয়েছিল।^৭ কাইজার (Kaysar) ২০০৮ সালে এক গবেষণায় দেখান যে, মাওরিদের মধ্যে ২১ শতাংশ হলো মেলোনেশিয়ান বংশদ্ভূত ও ৭৯ শতাংশ হলো পূর্ব এশীয় বংশধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।^৮ তাছাড়া ফ্রাইডল্যান্ডারের (Fried Laender) গবেষণাতেও দেখা গিয়াছে পলিনেশীয়রা জন্মসূত্রে মাইক্রোনেশিয়ান, তাইওয়ানিজ ও পূর্ব এশিয়দের সাথে মেলোনেশীয়দের থেকে বেশি নিকটতম।^৯ মাওরি বসতি স্থাপন থেকে দেখা যাচ্ছে নিউজিল্যান্ডে প্রথম যুগে তারা পূর্বসূরী পলিনেশীয়দের নানা ধরনের সংস্কৃতি নিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে। এই অঞ্চলে এসময়ে বিস্তীর্ণ বনভূমি এবং বৈচিত্র্যময় পাখির অস্তিত্ব ছিল। এসব পাখির মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া একটি প্রজাতির নাম হলো মোয়া (Moa)। এই পাখির ওজন প্রায় ২০ কিলোগ্রাম থেকে ২৫০ কিলোগ্রাম পর্যন্ত ছিল। এছাড়াও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া অন্যান্য পাখির মধ্যে এক ধরনের রাজহাঁস ও বিশেষ প্রজাতির ঈগল ছিল। নিউজিল্যান্ডের উপকূল অঞ্চল শীল মাছে পরিপূর্ণ থাকত। মাওরিদের প্রথম দিকের বসতিগুলি উপকূলীয় অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। ওয়াটাকি (Waitaki) নদীর মোহনায় এবং দক্ষিণ দ্বীপের উপকূল থেকে ৯০ হাজার মোয়া (Moa) পাখির দেহবশেষ পাওয়া গিয়েছে।^{১০} ধারণা করা হয় অল্প সময়ের মধ্যে এগুলোকে হয়তো হত্যা করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দেখা যায় প্রথম যুগে অটাগো (Otago) অঞ্চলে মাওরি সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল। প্রথম যুগে উপকূলীয় অঞ্চলে ১০ কি. মি. এর মধ্যে মাওরি বসতি গড়ে উঠেছিল। এগুলো অস্থায়ী আবাস হিসেবে শিকারের জন্য তৈরি করা হয়। একেকটা বসতিতে ৩০০ থেকে ৪০০ মানুষ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ টা বসত তৈরি করে বসবাস করত। সাগা (Shaga) নদীর মোহনাতে গড়ে উঠা এই ধরনের বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। তবে দক্ষিণ দ্বীপে গড়ে উঠা মাওরিদের প্রাচীন বসতি হিসাবে ওয়াইরংবার এর নাম উল্লেখ করা যায়। এখানে পূর্ব পলিনেশীয় গ্রামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বসতি গড়ে উঠে। তবে রেডিও কার্বন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে ১২৮৮-১৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই অঞ্চলটি অধিকৃত হয়েছিল। ভূমিকম্পের কারণে এই অঞ্চলের বড় অংশ এখন সাগরে তলিয়ে গেছে। ২০১০ সালে ওয়াইরংবারে প্রাপ্ত দেহাবশেষ পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, এখানে মানুষের জীবনকাল ছিল স্বল্পস্থায়ী। সব থেকে বেশি বয়সের দেহাবশেষটি হলো ৩৯ বছর বয়সের। এখানে বেশিরভাগ মানুষই ২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। বেশিরভাগ দেহেই খাদ্যের অভাব জনিত সমস্যা, রক্তস্রাব এবং আর্থ রাইটিকের প্রদূর্ভাব দেখা গিয়েছে। কিছু কিছু দেহাবশেষে যক্ষ্মা রোগেরও চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।^{১১}

প্রথম যুগে মাওরিদের অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জামাদি সেভাবে বিকশিত হয়নি। তবে প্রথম যুগের পরবর্তীতে প্রায় ৩২ প্রজাতির পাখি এই অঞ্চল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ধারণা করা হয় মানুষের অত্যাধিক শিকারজনিত কারণে এই বিলুপ্তি ঘটে থাকতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে জ্বালানির ব্যবহার ও গাছপালা কর্তন পরিবেশকে ক্রমান্বয়ে উষ্ণ করে তোলে। ধারণা করা হয় ১৪০০-১৪৫০খ্রী. সময়কালের মধ্যে আবহাওয়ার এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তবে প্রথম যুগে মাওরিদের প্রচুর পরিমাণে পাখি, মাছ এসবের প্রাপ্যতা নিশ্চিত ছিল। মোয়া পাখি ছিল তাদের মাংস সরবরাহের অন্যতম উপকরণ। প্রফেসর অ্যালান

কুপার (Allan Cooper) মনে করেন যে, ১০০ বছর ধরে এই সব পাখিকে যথেষ্টাচারভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে নিধন করা হয়। এতে এদের বিলুপ্তি ঘটে।^৮ হেলেন লিচ (Helen Leach) এক গবেষণার মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন মাওরিরা খাদ্যের জন্য প্রায় ৩৬ প্রকারের উদ্ভিদের ব্যবহার করত।^৯ এসব উদ্ভিদকে অনেক সময় আগুন দিয়ে ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা ধরে রান্না করার ব্যবস্থা ছিল। আরেকটা গবেষণায় দেখা গিয়েছে মাওরি নারীরা ২০ বছর বয়সে সন্তান ধারণে সক্ষম ছিলেন। মাওরিদের এই জন্মহার ছিল অনেক নিচে। তবে ৩১-৩২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করার কারণে এই জন্মহার কম হয়ে থাকতে পারে। ওয়াইরুবার অঞ্চলে প্রাপ্ত হাড়ের নিদর্শনগুলো পরীক্ষা বহুর দেখা গিয়েছে মানুষের জীবন যাপন খুব সহজসাধ্য ছিল না।^{১০} তবে এখান থেকে এইটা ধারণা করা যায় জনগণ সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করত এবং একটা সহিষ্ণু সমাজে বসবাস করত। কেননা কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গিয়েছে যেখান থেকে দেখা যাচ্ছে পরিবারের কেউ আহত হলে অন্যরা তার সেবাপ্রদান ব্যবস্থা করত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হকিটিকা (Hokitika) অঞ্চলে গাছপালার উপরে অনুসন্ধান চালিয়ে এইটা দেখা গিয়েছে যে, ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে শীতল আবহাওয়া ছিল। এই সময়কালেই দক্ষিণের দ্বীপগুলোতে অনেক ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটে। ওয়েলিংটন অঞ্চলে ১৪৬০ এর দশকে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।^{১১} এসব ভূমিকম্প উপকূলীয় অঞ্চলের বসতিগুলির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয়। এছাড়া গাছপালা ধ্বংস হয় এবং অনেক উদ্ভিদ মারা যায়। এসমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়েই প্রাচীন মাওরি সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। মাওরি সংস্কৃতির নতুন ধ্রুপদি যুগে বিকাশ লাভ করে। আর এই সময়কালে নিউজিল্যান্ডে ইউরোপীয়দের আগমন ঘটে। এই সময়ে মাওরিরা সবুজ পাথর দিয়ে নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন কারুকার্য খচিত ব্যবহার্য গহনা, সুন্দরভাবে তৈরি করা নৌকার ব্যবহার রপ্ত করে। তারা এই সময় নতুন গৃহ নির্মাণ পদ্ধতিও শিখে ফেলে। এছাড়া যুদ্ধ সংস্কৃতিরও উন্নতি ঘটে। যুদ্ধে পাহাড়ি দুর্গ নির্মাণ করে যা পা (Pa) নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া মানুষের মাংস ভক্ষণ করার সংস্কৃতিও (Cannibalism) চালু ছিল।^{১২} ১৫০০ সালের পর একদল মাওরি পূর্ব দিকে চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের দিকে চলে যায়। এখানকার নতুন আবহাওয়া এবং নতুন পরিবেশে মাওরিদের আরেকটি নতুন সংস্কৃতি বিকশিত হয়। এটি মরিওরি (Moriori) সংস্কৃতি নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতি নিউজিল্যান্ডের মূল মাওরি সংস্কৃতির থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। এই মরিওরি সংস্কৃতি শান্তিবাদের ধারণার উপরে গড়ে উঠেছিল।^{১৩} মাওরিদের মধ্যে সংঘটিত বৃহৎ যুদ্ধ গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হিংগাকাকা (Hingakaka) যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ১৭৮০ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে দক্ষিণ ওয়াহাকু অঞ্চলে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে প্রায় দুই পরস্পর বিরোধী পক্ষে প্রায় ৭০০০ যোদ্ধা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইউরোপীয় অভিবাসী ও মাওরি:

আধুনিক সময়কালের মধ্যেই ইউরোপীয় অভিবাসীরা নিউজিল্যান্ডে আগমন করেন। নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসবিদ মাইকেল কিং তার বিখ্যাত গ্রন্থ *The Penguin History of New Zealand* গ্রন্থে মাওরিদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি এখানে মাওরিদেরকে পৃথিবীর আদিম সংস্কৃতির শেষ উত্তরাধিকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। প্রথম দিকের ইউরোপীয়দের মধ্যে জেমস কুক, অ্যাবেল তাসম্যান প্রমুখের বিবরণীতে মাওরিদের বিষয়ে নানা তথ্য প্রদান করেছেন। তবে প্রথম দিকে ইউরোপীয় ও মাওরিদের সম্পর্ক ছিল বামেলাপূর্ণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। অনেক বর্ণনাতে বলা আছে মাওরিরা ইউরোপীয়দেরকে হত্যা করে তাদের মাংস ভক্ষণ করেছিল।^{১৪} অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে ইউরোপীয় ও আমেরিকান তিমি শিকারী, জাহাজ চালকরা তাদের জাহাজে মাওরিদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করত। নিউজিল্যান্ডের দক্ষিণ অঞ্চলের দ্বীপগুলিতে যতগুলি অভিযান পরিচালিত হয়েছে এবং

প্রত্যেকটি অভিযানে ব্যাপক সংখ্যক মাওরিদের কাজে লাগানো হয়েছে। ১৮২০ সালের মধ্যে ১০৫টি তিমি শিকারের অভিযান এবং ৬৫টি সমুদ্র অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

প্রাথমিক খ্রিষ্টান মিশনারীরা মাওরিদের মধ্যে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করেছিল। অনেক সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীরা সুযোগ মত পালিয়ে মাওরিদের মধ্যে আশ্রয় নিত। এভাবে মাওরিরা ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসে। ১৮০৯ সালের একটি ঘটনা যেখানে মাওরি প্রধানের ছেলেকে জাহাজের ক্যাপ্টেন চাবুক মরার কারণে মাওরিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ৬৫ জন ইউরোপীয়কে তারা হত্যা করে।^{১৫} ইউরোপীয়দের অনেকে দাস থেকে শুরু করে উচ্চাপদস্থ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পালিয়ে মাওরিদের সমাজে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে মাওরিদের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে। মাওরি সংস্কৃতি গ্রহণকারী এই ইউরোপীয়দেরকে পাকিহা (Pakeha) মাওরি হিসাবে অভিহিত করা হয়।^{১৬}

১৮৩৮ সালে মাওরিদের দুই পক্ষের মধ্যে একটি যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে ১৩১ জন ইউরোপীয় মাওরিদের একটা পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার পরে মাওরিরা নানা ধরনের নতুন চিন্তার দ্বারা আলোড়িত হয়। ১৮১৫ সালে টমাস কিডাল(Thomas Kendall) প্রথম লিখিতভাবে মাওরি ভাষাকে উপস্থাপন করেন। এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে কিডালের সহযোগিতায় প্রফেসর স্যামুয়েললি *A Grammar and Vocabulary of the New Zealand* গ্রন্থ সম্পাদন করেন।^{১৭} মাওরিদের অনেক উপখ্যান, গাঁথা, কবিতা এগুলো লিখিত আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩৫-১৮৪০ সালের মধ্যে উইলিয়াম কলেনসো তার প্রেস থেকে প্রায় ৭৪ হাজার কপি মাওরি ভাষার গ্রন্থ ছেপেছিলেন। ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে ১৮০৫-১৮৪০ সালের মধ্যে মাওরিদের নানা গোত্র বন্দুকের ব্যবহার শিখেছিল। এই বন্দুকের ব্যবহারের মাধ্যমে মাওরিদের ভেতর শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘাত বা বন্দুক যুদ্ধ। ফলশ্রুতিতে এই সময়কালে মাওরিদের জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। দশকের পর দশক ধরে চলা এ ধরনের সংঘাতে অনেক গোত্র ধ্বংস হয়ে যায়।

একই সময়ে মাওরিরা ইউরোপীয়দের বয়ে আনা নানা ধরনের রোগের কবলেও পড়ে। এই সব রোগের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা, গুটি বসন্ত, হাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব রোগের মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর সংখ্যক মাওরি মৃত্যুবরণ করে। এসব রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কেননা মাওরিরা এসব রোগের প্রতিষেধকের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নাই।^{১৮}

ব্রিটিশ কতৃপক্ষের সাথে মাওরিদের চুক্তি সম্পাদন:

ইউরোপীয় অভিবাসনের সাথে সাথে ১৮৩০ এর দশকের থেকেই নিউজিল্যান্ডের মিশনারীদের কার্যকলাপ বাড়তে থাকে। এছাড়া এই সময় পলাতক অপরাধী, নাবিক ও সরকার বিরোধী ব্যক্তিরা মাওরিদের ভিতর আশ্রয় নিয়ে নানা ধরনের চক্রান্তমূলক সরকার বিরোধী তৎপরতা চালানোর চেষ্টা করে। মাওরি গোত্র প্রধানদের অনেকে এই সব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করে। এছাড়া এই সময় ফ্রান্স পলিনেশিয়া অঞ্চলে কিছু তৎপরতা চালায় যা ব্রিটিশদেরকে শঙ্কিত করে তোলে। ব্রিটিশদের অনেকেই বিশ্বাস করত ক্যাথলিক মিশনারীরা ফ্রান্সের হয়ে এখানে ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত আছে। ১৮৪০ সালে বেশিরভাগ গোত্রীয় প্রধানরাই ক্যাথলিক মিশনারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হবসনকে ব্রিটিশ এবং নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্যে সমস্যা দূর করার জন্য পাঠায়। হবসন এসেই উত্তরের দ্বীপগুলোর প্রধানদের সাথে আলাপ সম্পন্ন করেন। এই সব আলোচনার মধ্যে দিয়েই শেষ পর্যন্ত ওয়াটিঙ্গির(Waitangi)চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে প্রায় ৫০০ জন গোত্রপ্রধান ইউরোপীয়দের সাথে স্বাক্ষর করেন। তবে ওয়াটিঙ্গির চুক্তিতে প্রধান বিষয়গুলি সেভাবে মিমামসিত হয়নি। চুক্তির ধারাগুলো মাওরি ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছিল।^{১৯}

ওয়েটাঙ্গি চুক্তির নানা বিতর্কিত বিষয় স্বত্বেও উপনিবেশীক যুগে ইউরোপীয় ও মাওরিদের সম্পর্ক খুব বেশি বিরোধপূর্ণ ছিল না। অনেক মাওরি এ সময় থেকে ব্যবসা বাণিজ্য, খাবার সরবরাহ, দেশে এবং দেশের বাহিরে বাণিজ্য এসবে জড়িত হতে থাকে। তবে ১৮৬০ এর দশকে ওয়েকাটো (Waikato) অঞ্চলে ভূমিকে কেন্দ্র করে মাওরিদের সাথে ইউরোপীয়দের সম্পর্কের উত্তেজনা তৈরি হয়। মাওরিরা তারানাকিতে (Taranaki) অভিবাসীদের উপরে এক পর্যায়ে আক্রমণ চালায়। অবশ্য মাওরিদের এই আক্রমণে সবাই অংশগ্রহণ করেনি। মাওরিদের অনেকে ইউরোপীয়দের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। ইউরোপীয়দের সহযোগী এই মাওরিদেরকে কুপাপা (kupapa) নামে অভিহিত করা হয়।

এই সংঘর্ষে কিছু ইউরোপীয় ও মাওরিদের মৃত্যু ঘটেছিল। সরকার এর শাস্তি স্বরূপ বিদ্রোহী মাওরিদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে ফেলেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকার বিদ্রোহে অংশ নেয়নি সেরকম মাওরি গোত্রেরও জমি বাজেয়াপ্ত করেছিল। তবে এই জমি গুলি দ্রুতই ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তারপরও আরও কিছু ছোটখাট সংঘর্ষ সংঘটিত হয়েছিল।^{২০}

১৮৬২ সালের Native Land Act এর মাধ্যমে ১৮৬৫ সালে Native Land Code স্থাপন করা হয়। এই কোডের মাধ্যমে মাওরিদের গোত্রীয় সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। এই ব্যক্তি মালিকানায় জমি নিয়ে আসার ফলে মাওরিরা সহজে জমিগুলো ইউরোপীয় অভিবাসীদের কাছে বিক্রি করে দিত। ১৮৪০-১৮৯০ সালের মধ্যে মাওরিরা তাদের জমির ৯৫ শতাংশই ইমিগ্রান্টের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সময় সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত মোট জমির ৪ শতাংশ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৩ লক্ষ একর জমি ওয়াইকাটো (waikato) নদীর অঞ্চলে কুপাপা মাওরিদেরকে দেওয়া হয়েছিল। জমি বিক্রির মাধ্যমে অনেক মাওরি যথেষ্ট সংখ্যক অর্থ লাভ করে। ওয়াইকাটো অঞ্চলের গোত্রপ্রধানরা প্রত্যেকেই ১০০০ পাউন্ড পেয়েছিল।^{২১}

মাওরিদের পুনর্জাগরণ:

উনিশ শতকের শেষের দিকে বেশিরভাগ মাওরি ধারণা করত যে, মাওরি সংস্কৃতি তারা টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে না। ধীরে ধীরে তারা ইউরোপীয় সভ্যতার গহ্বরের মধ্যে নিপতিত হবে। ১৮৪০ সালে নিউজিল্যান্ডে মাওরি জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজারের মত। এই সময় এখানে ইউরোপীয়দের জনসংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৫০ হাজার। অপরদিকে ১৮৭০ সালে সেখানে রিপোর্টে দেখা যায় এই সময় মাওরিদের সংখ্যা কমে দাড়িয়েছে ৩৭ হাজার ৫২০। ১৮৯৬ সালে সেখানে মাওরিদের সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার ১১৩। আর এই সময় ইউরোপীয়রা ছিল প্রায় সাত লক্ষ। এই বিষয়ে প্রফেসর আয়ান পুল (Ian Pool) উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৯০ দশকে প্রায় ৪০ শতাংশ মাওরি মহিলা মৃত সন্তান প্রসব করেছিলেন। এসব শিশুরা জন্মের ১ বছরের মধ্যে মারা যায়। তাছাড়া এই সময় নারী শিশু জন্মগ্রহণের হার ছিল বেশি।^{২২}

মাওরিদের এই পতনের ধারাবাহিকতা সবসময় একই রকম থাকেনি। ১৯৩৬ সালের মধ্যেই মাওরিদের জনসংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ৮২ হাজার ৩২৬। এই সময় মাওরি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ছিল সরকার কর্তৃক তাদেরকে কিছু কিছু পারিবারিক সুবিধা দেওয়ার নীতি। তবে এই সময় মাওরি ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক আন্তঃবিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। এতে অনেক মাওরির সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বিলুপ্তি ঘটে। নিউজিল্যান্ডের ১৮৬৭ সালের পার্লামেন্টে ৪টি মাওরি আসন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এই সময়ে প্রাপ্ত বয়স্ক সমস্ত মাওরির ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়। কিন্তু এই সময় সমস্ত ইউরোপীয়দের ভোটাধিকার ছিল না। মাওরিদেরও ১২ বছর পরে সমস্ত ইউরোপীয়দের সার্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। নব্য ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে নিউজিল্যান্ড ছিল প্রথম দেশ যেখানে প্রথম আদিবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়। এর ফলে মাওরিদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দেখা যায়।^{২৩}

উনিশ শতকের শেষের দিকে উল্লেখযোগ্য সকল মাওরি রাজনীতিবিদদের মধ্যে ছিলেন জেমস ক্যারোল(James Carrol), আপিরানা নাগাটা (Apirana Nagata),টে রান্জি হিরোয়া (Te Rangi Hiroa) প্রমুখ এরা ছিলেন প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। ক্যারোল কিছু সময়ের জন্য নিউজিল্যান্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই রাজনীতিবিদরা Young Maori Parti পার্টি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তারা রাজনীতির মাধ্যমে মূলত মাওরিদের উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ খুঁজেছিলেন। তারা বিগত কয়েক শতকে মাওরিদের পতনের জায়গা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছিলেন। তারা মনে করতেন ইউরোপীয় শিক্ষা দীক্ষা যেমন, আধুনিক চিকিৎসা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে মাওরিরা উন্নয়নের পথ খুঁজে পেতে পারে।^{২৪}নাগাটা মাওরিদের সংস্কৃতি বিশেষ করে কাপা হাকা (kapa haka) সংস্কৃতির উত্থান ঘটান। এছাড়া তিনি মাওরিদের ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।



চিত্র-২: মাওরি সংস্কৃতি কাপা হাকা নৃত্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মাওরিদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য মিশরে আনা হয়েছিল। এই বাহিনী যুদ্ধে হিসাবে সফলতা দেখাতে সক্ষম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে এই বাহিনীর নাম দেওয়া হয়েছিল মাওরি ব্যাটেলিয়ন। তবে মাওরিদের অনেক গোত্রই এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে বিরোধিতা করেছিল। ১৯১৮ সালে এই বাহিনীর অনেকে প্রত্যাবর্তন করেন। এদের প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে নতুন সমস্যা তৈরি হয়। কেননা অনেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে। এই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে অনেক মাওরি মৃত্যু ঘটে।^{২৫}

১৮৯৩ সাল পর্যন্ত ওয়াটাসির চুক্তি অনুযায়ী মাওরিরা কোনো ধরনের কর প্রদান করত না। ১৮৯৩ সালেই তাদের ভূমির উপর অল্প কিছু কর ধার্য করা হয়। তবে ১৯১৭ সালের পরে অন্যান্য নিউজিল্যান্ডারদের চেয়ে মাওরিদের অধিক কর দিতে হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও নিউজিল্যান্ডের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি মাওরিরাও অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময় মাওরি স্বৈচ্ছাসেবকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল ২৮তম মাওরি ব্যাটেলিয়ন। এই বাহিনীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্রিট, উত্তর আফ্রিকা ও ইতালিতে সাফল্যের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। প্রায় ১৬ হাজার মাওরি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৩৬০০ সরাসরি যুদ্ধে হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিল।^{২৬}

১৯৬০ সালের পর থেকে মাওরিদের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা এই সময় বিভিন্ন অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য অনেক ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলে। সরকার

মাওরিদের এই ক্রমবর্ধমান তৎপরতার কারণে ভূমি সমস্যাসহ অন্যান্য অধিকারের বিষয়ে নমনীয় মনোভাব দেখাতে বাধ্য হয়। ১৯৭৫ সালে ওয়াটাপি ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়। এই ট্রাইব্যুনাল এর উদ্দেশ্য ছিল মাওরিদের বিদ্যমান সমস্যাগুলি অনুসন্ধান করা। ১৯৭৬ সালের পর থেকে মাওরিরা স্বাধীনভাবে সাধারণ মানুষ হিসাবে অথবা একজন মাওরি হিসাবে ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারত। ১৯৯০ এর দশক থেকে ১৮৪০ সালে সম্পাদিত ওয়াটাপির চুক্তির বিষয়বস্তু নিয়ে আবারও পরীক্ষা নীরক্ষা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সরকার ২০০৬ সালে নিউজিল্যান্ডের সরকার মাওরিদেরকে ৯০০ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রদান করেন।^{২৭} মাওরিদের বর্তমান নেতৃত্ব তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আরও নানা বিষয়ে উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে। এছাড়া নিউজিল্যান্ডের সমাজে মাওরি সংস্কৃতির গ্রহণযোগ্যতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৩ সালের জনগণনা অনুযায়ী নিউজিল্যান্ডে ৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৬০৫ জন মাওরি জনগণ আছে। এটা নিউজিল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার ১৪.৯ শতাংশ। নিউজিল্যান্ডের বাহিরে অস্ট্রেলিয়াতে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার মাওরি জনগোষ্ঠী আছে। অস্ট্রেলিয়ার মাওরি সংগঠন অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে মাওরিদের জন্য একটি সিট সংরক্ষণের দাবি করেছে।

ঐতিহ্যগতভাবে মাওরি সংস্কৃতি পলিনেশীয় সংস্কৃতির অন্তর্গত। মাওরিদের গল্পগাঁথা এবং পুরাণ কাহিনীতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মাওরিদের প্রত্যাহিক জীবনযাত্রায় পলিনেশীয় সংস্কৃতির পবিত্রতা, অপবিত্রতা, সম্মান ত্যাগ প্রভৃতি ধারণার প্রভাব লক্ষ করা যায়।^{২৮} তবে ইউরোপীয়দের আগমনের পর থেকে মাওরিদের জীবনযাত্রায় ইউরোপীয় সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমানে মাওরিদের বেশীরভাগই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তাদের উল্লেখযোগ্য চার্চের মধ্যে প্রেসবাইটেরিয়ান, ক্যাথলিক, অ্যাংলিকান এবং মেথডিস্ট প্রধান। তবে সাম্প্রতিককালে মাওরিদের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ছোঁয়াও লক্ষ্য করা যায়। মাওরিদের অল্প কিছু অংশ বর্তমানে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।

১৮৯০ সাল থেকে মাওরি পার্লামেন্ট মেম্বাররা মাওরি ছাত্রদেরকে ইংরেজি শেখানোর ব্যাপারে গুরুত্বরূপ করতে থাকেন। তবে অনেক আগে থেকেই মিশনারীরা বিভিন্ন স্কুলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। মাওরিদের নিজস্ব ভাষা ‘টিরিও’ মাওরি নামে পরিচিত। এই ভাষাকে বর্তমানে নিউজিল্যান্ডে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ভাষা ভাষাতাত্ত্বিকভাবে পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীয় অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপীয়রা আসার আগে মাওরি ভাষার কোনো লিখিত রূপ ছিল না। এটি মৌখিক সূত্রে বংশ পরম্পরায় শত শত বছর ধরে চলে আসছিল।^{২৯} তবে মাওরিদের ভৌগোলিক জ্ঞানের ব্যাপারে দক্ষতা ছিল প্রশংসনীয়। তারা এই অঞ্চলের যেকোনো ভৌগোলিক অবস্থানের ম্যাপ তারা সহজেই চিহ্নিত করতে পারতেন। এই ম্যাপগুলি ইউরোপীয় ভূগোলবিদদের আঁকা ম্যাপের সমকক্ষই ছিল। ২০০৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে নিউজিল্যান্ডে মাওরি টেলিভিশনের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ‘টিরিও’ ভাষী মাওরিদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার। এই সংখ্যা ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৫২ জন।

নিউজিল্যান্ডের মাওরিরা নিউজিল্যান্ডের স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই রাজনীতিতে ভালোভাবেই সম্পৃক্ত হয়েছে। এরই ফলাফল আমরা ১৮৪০ সালে সম্পাদিত ওয়াটাপির চুক্তিতে। ১৮৬৮ সালে থেকে নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে মাওরিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ছিল ৭। এরই ধারাবাহিকতায় এখানে মাওরিদের নিজস্ব রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত মাওরি পার্টি ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১.৩২% ভোট প্রাপ্ত হয়ে দুটি সিটে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। এই দুইজন সদস্যকে মন্ত্রীসভার বাহিরে আলাদাভাবে মন্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া হয়।

উপসংহার

আমরা যদি ইউরোপ, আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর দিকে লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী সরকারগুলি এসব দেশের আদিবাসীদের ব্যাপারে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। কিন্তু নিউজিল্যান্ড এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এক পর্যায়ে ইউরোপীয় অধিবাসীরা নানা রকমের দমন পীড়ন চালালেও নিউজিল্যান্ডের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে মাওরিদের উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য যেকোনো অঞ্চলের আদিবাসীদের চেয়ে নিউজিল্যান্ডের প্রাচীন আদিবাসীরা মাওরিদের অবস্থা অনেকটা সন্তোষজনক।

তথ্যনির্দেশ

- ¹ https://en.wikipedia.org/wiki/M%C4%81ori_people, Retrieved 24.06.2020.
- ² Atkinson, A. S. (1892). "What is a Tangata Maori?" *Journal of the Polynesian Society*, 1 (3), 133–136.. Retrieved 24.06.2020.
- ³ 'Rethinking Polynesian Origins: Human Settlement of the Pacific,' Michal Denny and Lisa Matisoo Smith, [www.hokulea.com> wp- content> 2015/ 03](http://www.hokulea.com/wp-content/2015/03). Retrieved 24.06.2020
- ⁴ Kayser, Manfred; Lao, Oscar; Saar, Kathrin; Brauer, Silke; Wang, Xingyu; Nürnberg, Peter; Trent, Ronald J.; Stoneking, Mark (2008). "Genome-wide analysis indicates more Asian than Melanesian ancestry of Polynesians". *The American Journal of Human Genetics*. 82 (1): pp.194–198, ISSN. 002-9297.
- ⁵ Friedlaender, Jonathan S.; Friedlaender, Françoise R.; Reed, Floyd A.; Kidd, Kenneth K.; Kidd, Judith R.; Chambers, Geoffrey K.; Lea, Rodney A.; et al. (2008). "The genetic structure of Pacific Islanders". *PLOS Genetics*. 4 (1): e19. doi:10.1371/journal.pgen.0040019. PMC 2211537. PMID 18208337.
- ⁶ "The Ichnological record of New Zealand's Moas: A Preliminary Summary" Martin G. Lockley, Murray R. Gregory And Brian J. Gill; Lucas, Spielmann and Lockley, eds., 2007, *Cenozoic Vertebrate Tracks and Traces. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin* 42, pp 72-78.
- ⁷ Hallie R. Buckley, Nancy Tayles, Sian E. Halcrow, Kasey Robb & Roger Fyfe 'The People of Wairau Bar: a Re-examination', *Journal of Pacific Archaeology*, Vol. 1 · No. 1· 2010, Newzealand Archaeological Association, pp 1-20.
- ⁸ Cooper A, Lalueza-Fox C, Anderson S, Rambaut A, Austin J, Ward R (2001) 'Complete mitochondrial genome sequences of two extinct moas clarify ratite evolution'. *Nature* 409.pp.704–707 :<https://doi.org/10.1038/35055536>
- ⁹ 'Oceanic Arboriculture at the Margins? The Case of the Karka (*Corynocarpus Laevigatus*) in Aotearoa,' Helen Leach & Chris Stowe, *The Journal of the Polynesian Society*, Vol. 114, No. 1 (March, 2005), pp. 7-27, Published by: The Polynesian Society URL: <https://www.jstor.org/stable/20707255>
- ¹⁰ Hallie R. Buckley, Nancy Tayles, Sian E. Halcrow, Kasey Robb & Roger Fyfe 'The People of Wairau Bar: a Re-examination', *Journal of Pacific Archaeology*, Vol. 1 · No. 1· 2010, Newzealand Archaeological Association, pp.1-20
- ¹¹ Maclean, Chris (3 March 2009). "Creation stories and landscape – Wellington region". *Te Ara: The Encyclopedia of New Zealand*. <https://teara.govt.nz/wellington-region/page-2> Retrieved 10 July 2021.
- ¹² Neich Roger, 2001. *Carved Histories: Rotorua Ngati Tarawhai Woodcarving*. Auckland: Auckland University Press, pp 48–49.
- ¹³ Clark, Ross (1994). "Mori and Māori: The Linguistic Evidence". In Sutton, Douglas. *The Origins of the First New Zealanders*. Auckland: Auckland University Press. pp. 123–135.

¹⁴ Ingram, C. W. N. (1984). *New Zealand Shipwrecks 1975–1982*. Auckland: New Zealand Consolidated Press; pp 3–6, 9, 12.

¹⁵ "The Boyd incident". Ministry for Culture and Heritage. <https://nzhistory.govt.nz/culture/the-boyd-incident>, Retrieved 16 August, 2021.

¹⁶ Ian Smith, 'Maori, Pakeha and Kiwi Peoples, cultures and sequence in New Zealand archaeology', G. Clark, F. Leach and S. O'Connor (eds) 2008, *Islands of Inquiry: Colonisation, Seafaring and the Archaeology of Maritime Landscapes*. Terra Australis 29, ANUE Press, pp.367-380.

¹⁷ Norman Albert Anaru, *A Critical Analysis of the Impact of Colonisation on the Māori Language through an Examination of Political Theory*, A thesis submitted to Auckland University of Technology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Māori Development, November 2011, pp.24-25, 102.

¹⁸ Hiroa, Te Rangi (1910). *Medicine Amongst the Maoris, in Ancient and Modern Times*. Dunedin: Otago University, Ph D Thesis. pp. 82–83. Retrieved 28 August September 2021.

¹⁹ Alan Ward, 'Interpreting the Treaty of Waitangi: The Maori Resurgence and Race Relations in New Zealand', *The Contemporary Pacific*, Volume 3, Number 1, Spring 1991, University of Hawaii Press, 1991, pp.85-113.

²⁰ 'War in Waikato,' URL: <https://nzhistory.govt.nz/war/war-in-waikato>, (Ministry for Culture and Heritage), Retrieved, 30 August 2021.

²¹ Matthew Wynyard, 'Not One More Bloody Acre: Land Restitution and the Treaty of Waitangi Settlement Process in Aotearoa New Zealand' *Land*, 2019, 8 162; pp. 1-14, doi:10.3390/land8110162, Retrieved, 30 August, 2021.

²² Simon Chapple, 'New Zealand Numbers from Nearly Nowhere: 80,000 to 100,000 Māori circa 1769' *New Zealand Journal of History*, 51, 2 (2017), pp.104-119. : <https://www.researchgate.net/publication/322509237>, Retrieved, 30 August 2021.

²³ 'Maori and the vote' NZ History New Zealand History Online. <https://nzhistory.govt.nz/politics/maori-and-the-vote>, Retrieved, 13 September 2021.

²⁴ "Young Maori Party | Maori cultural association". *Encyclopædia Britannica*. Retrieved 1 October 2021.

²⁵ 'How Maori battled to fight together in the First World War' <https://www.iwm.org.uk/history/how-maori-battled-...> Retrieved, 1 October 2021.

²⁶ 'Maori and the Second World War- NZ History' <https://nzhistory.govt.nz/war/impact>, Retrieved, 1 October 2021.

²⁷ 'Minister for Treaty of Waitangi Negotiations' https://www.wikiwand.com/Minister_for_Treaty_of_Wa... Retrieved, 1 October 2021.

²⁸ Edward Shortland, *Maori Religion and Mythology*, (London: Longmans, Green & Co., 1882), pp. 5-7.

²⁹ 'History of the Maori Language – Te Wiki o Te Reo Maori', <https://nzhistory.govt.nz/culture/maori-language-week>, Retrieved, 1 October 2021.

সাহাবীদের কবিতায় মানবতাবোধ

ড. মুহাম্মদ নেছার উদ্দিন *

Abstract: The main motto of mankind's internal beauty and success is the moral value of humanity. To attain "Humanity" is the ultimate aim of mankind. Humanity is intricately connected with love of mankind. In a society a man at first learns the basic ideology of morality or moral values, which helps him to set an example of empathy, fellow- feelings, greatfulness and a higher sense of moral affection. Thus by becoming and enlightened man, he spreads humanity and creates a prosperous and peaceful nation. In every era the prophets have invited mankind towards humanity with a view to establishing a beautiful society, even the companions of the Prophet (Sm) have inspired the mankind with their poetic excellence by praising humanity. The various beautiful human traits of mankind are presented with poetic beauty in some companions who were poets at that time. Some of noteworthy poet companions are Hassan Ibn Sabit (R.), K'ab Ibn Malik (R.), Abdullah Ibn Rawaha (R.), Ali (R.), Labid Ibn Rabiha (R.) , Hutaiya (R.), K'ab Ibn Juhair (R.), Numan Ibn Bashir and Khansa (R.). They have presented the qualities associated with humanity in their poetry in a very natural way, with plain simplicity. In this article, we discussed the glorification of humanity and its depiction found in the poetics of the companions of Prophet (Sm.)

ভূমিকা

মানুষের জীবনকে যথার্থ সৌন্দর্যময় ও সাফল্যমণ্ডিত করে তার মানবিকতার নৈতিক মূল্যবোধ। সত্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শবাদিতা প্রভৃতি মহৎ গুণের সমাবেশেই মানবিক মূল্যবোধের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য এই অপূর্ব অমীয়া বাণী ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয় সমাজ ব্যবস্থা। যাতে করে সমাজের মানুষ আদর্শ শিক্ষায় মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন উন্নত ও উত্তম মানুষ হতে পারে। নম্রতা, ভদ্রতা, বিনয়ী, উদারতা, সহমর্মিতা, সৌজন্যবোধ, মমত্ববোধ, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, কর্তব্য পরায়ণতা, সাম্যবাদী, দর্শনবাদী ও কর্মজীবী আদর্শ মানবতাবাদী এবং আলোকিত মানুষ হয়ে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন করে শান্তির সমাজ গঠন করা সম্ভব। যুগে যুগে নবী রাসূলগণ মানবসমাজকে মানবতাবোধের দিকে আহ্বান করেছেন। বিশ্বনবী (সা.) এর সাহাবগণ সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে তাদের কাব্যিক প্রতিভার মাধ্যমে মানবসমাজকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আহ্বান করেছেন। তাঁরা তাদের কবিতায় মানবতাবোধের সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় অত্যন্ত সাবলিল ভঙ্গিমায়ে উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে সাহাবীদের কবিতায় মানবতাবোধের সে জয়গান ধ্বনিত হয়েছে তা উপস্থাপিত হলো।

সাহাবী ও সাহাবী কবি

صحابي শব্দটি আরবি ভাষায় صحبة শব্দের একটি রূপ। ইহা একবচন, বহুবচনে أصحاب আক্ষরিক অর্থ সহচর, সঙ্গী, সাথী ইত্যাদি।^১ আর পরিভাষায় বলা যায়, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁরাই হলেন সাহাবী। এ সম্পর্কে হাফেয ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন,

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

"الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام"^২

[সাহাবী হলেন তিনি, যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ঈমানদার হয়ে তাঁর সাক্ষাত পেয়েছেন এবং ইসলামের উপর ইন্তেকাল করেছেন।]

ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, মুসলিমগণের মধ্যে যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাহচর্য লাভ করেছেন অথবা দেখেছেন, তিনি তাঁর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, মুসলিম অবস্থায় যিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছেন, তিনিই সাহাবী বলে পরিচিত, চাই তিনি কম বয়সের হোক অথবা পূর্ণবয়স্ক হোক, চাই তাঁর সাহচর্য লাভের বিষয়টি কম সময়ের হোক অথবা বেশী সময়ের হোক।

ঐতিহাসিকদের ভাষ্য অনুযায়ী সাহাবীদের স্তরকে তিনটি শ্রেণিতে বিন্যাসের বিষয়টি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্রথম স্তর: বড় বড় সাহাবীদের স্তর। যেমন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন এবং প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীগণ। দ্বিতীয় স্তর: মধ্যম স্তরের সাহাবীগণ। তৃতীয় স্তর: ছোট স্তরের সাহাবীগণ, যারা বিলম্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, অথবা যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবদ্দশায় ছোট ছিলেন।^৩ উল্লেখ্য যে, সাহাবায়ে কিরামকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং তাদের মান-মর্যাদার মাঝেও তারতম্য রয়েছে। যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু তারা সকলেই যে ন্যায়পরায়ণ এবং নবী-রাসূলদের পরেই যে তারা পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তাদের সকলের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে উত্তম ও কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আল- কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ^৪

[‘আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন।]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ أُولَئِكَ أُعْطُوا دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى^৫

[তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের আগে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে, তারা সমান নয়। তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ তাদের চেয়ে, যারা পরবর্তী কালে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়ের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।]

সুতরাং সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রশ্নে সাহাবীগণের সকলেই সমান। ঐতিহাসিকদের তথ্যানুযায়ী সাহাবীগণের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এক লক্ষের অধিক হিসেবে। আর আবু যুর'আ আর-রাযী তাদের সংখ্যা নির্ণয় করেন এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার বলে। এত সংখ্যক সাহাবীগণের মধ্য থেকে একেকজন একেক বিষয়ে পারদর্শিতা ও পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাহাবী কবি হলেন, হাসান ইবন সাবিত (রা.), কা'ব ইবন মালিক (রা.), আলী ইবন আবী তালিব (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.), কা'ব ইবন যুহায়র (রা.) ও খানসা (রা.)। কোন কোন সাহাবী রাসূলের সাথে ইসলাম প্রচার কাজে আবার ধর্মযুদ্ধে অংশ নিয়ে কোন সাহাবী রণাঙ্গনে সমরাত্র ও সমান্তরালে কাব্যযুদ্ধ চালিয়েছেন। এসব কাজে আঞ্জাম দিতে গিয়ে সহনশীলতা, সহমর্মিতা ও মানবিকতার চরম নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে তাদের কাব্যকথামালায়। ফলে নিজেদেরকে মানবতার কাজে কবিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আরবি কবিতায় মানবতাবোধ

ইসলাম পূর্ব আরব বেদুইনদের অতিথিপরায়নতা সর্বজনস্বীকৃত। কারণ, অতিথি-শত্রুকেও তারা আদর-আপ্যায়ন করতে দ্বিধা করতো না। তাদের নিকট অতিথির ব্যাপক মর্যাদা ছিল। তারা তাদের সম্মান প্রদর্শন, মূল্যায়ন ও অধিকার সংরক্ষণ অপরিহার্য মনে করতো। জাহিলী আরবের প্রতিথযশা কবি তারাফা ইবনুল ‘আবদ বলেন,

ولست بحلال التلاع مخافة * ولكن متى يسترقد القوم أرفد^৮

[আমি অতিথি আগমনের ভয়ে নিম্নভূমিতে অবতরণ করি না; উপরন্তু গোত্র যখন সাহায্যপ্রার্থী হয় তখন আমি সাহায্যার্থে এগিয়ে যাই।]

পৃথিবীর সকল ধর্ম মানব সেবা ও জনহিতকর কাজে গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেবল গুরুত্ব প্রদানই নয়, বরং এসব কাজে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে মানবসেবা বা পরোপকার সর্বোত্তম গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। জাহিলী আরবে কবি সশাট ইমর^৯ উল কায়স তাঁর বিখ্যাত মু‘আল্লাকায় মানবসেবা সম্পর্কে বলেন,

وقربة أقوام جعلت عصامها * على كاهل مني ذلول مرحل

وواد كجوف العير قفر قطعته * به الذئب يعوي كالخليع المعيل^৯

[জাতির বহুজনের (পানির) মশক বার বার সফরে আমার অনুগত স্কন্ধ বহন করেছে (আমি জনসেবায় নিবেদিত)। গাধার পেটের ন্যায় জনশূন্য বহু উপত্যকা আমি অতিক্রম করেছি, যেখানে বৃহৎ পরিবারবিশিষ্ট হারানো জুয়াড়ির মত (ক্ষুধার্ত) বাঘ গর্জন করে।]

মহানবী (সা.) তদানীন্তন আরব সমাজ ছিল গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব-কলহ, মারামারি, ঝগড়া-বিবাদে জর্জরিত। সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো ছিল অত্যন্ত নাজুক। মনগড়া সমাজ ব্যবস্থায় তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। ফলে সমাজ সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ে। কেননা মক্কা ও মদীনায় কুরায়শরা মুসলমানদের প্রধান শত্রু ছিল। তারা উভয় ক্ষেত্রেই চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন-নিষ্পেষণে মুসলমানদের পিষ্ট করে ফেলে, এমনকি মুসলমানদের বাড়িঘর, জায়গা জমি, ধন সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। এ সকল উদ্ভূত পরিস্থিতির শিকার হয়ে মহানবী (সা.) সমাজ সংস্করণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সমাজে মানবতা স্থাপনে নানাবিধ কৌশল ও পরিকল্পনা হাতে নেন। আরব সমাজে ধীরে ধীরে মানবিকতার চর্চা হতে থাকে ফলে সমাজ জীবনে সর্বত্রই শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। জাহিলী যুগের কবিদের কবিতায় মানবিকতার যে নিদর্শন ফুঁটে উঠেছে তা সুদৃঢ় হয়ে ব্যাপকভাবে ইসলামি যুগের কবিদের কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। মানবিক গুণাবলীর বিভিন্ন দিক যেসব কবিদের কবিতায় শিল্পশোভন রূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন, খানসা (রা.), হাস্‌সান ইবন ছাবিত (রা.), ‘আমর ইবন কুলসূম (রা.), কা’ব ইবন মালিক (রা.), ‘আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.), ‘আলী ইবন আবী তালিব (রা.), লাবীদ ইবন রাবী‘আহ (রা.), হুতাইহা (রা.), কা’ব ইবন যুহায়র (রা.), নূ‘মান ইবন বাশীর (রা.)।

সাহাবীদের কবিতায় মানবতাবোধ

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মদীনায় হিবরতের পর সেখানে তিনি নব উদ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। তবে এ ক্ষেত্রে কাফির-মুশরিকদের দ্বারা প্রতিহিংসার শিকার হন। তারা অমুসলিম কবিদের দিয়ে ইসলাম ও

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে কবিতা রচনা করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের প্রতিহিংসার যথার্থ জবাব দানের জন্য কবিদের প্রতি তাদের কাব্য প্রতিভা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করার আহবান জানান। দ্রুত যাঁরা এই আহবানে সাড়া দিলেন তাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন কবি হাসসান ইবন ছাবিত (রা.)। তিনি মক্কার অমুসলিম কবিদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শক্তিশালী একটি কবিদের দল তৈরি করেন। এই দলের কয়েকজন হলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা (রা.), কা’ব ইবন মালিক (রা.), ‘আলী ইবন আবী তালিব (রা.), সওয়াদে ইবন আস-সামিত (রা.), সারমা ইবন আনাস (রা.), আবু সারমা ইবন কায়েস (রা.), খুবাযছ ইবন ‘আদী ইবন ‘আব্দুল্লাহ (রা.), ‘আমর ইবন আল-জামূহ (রা.), আল-হুবাব ইবন আল-মুনযির (রা.), নাবিগা আল-জা’দী, আন-নামির ইবন তাওলাব (রা.), খানসা (রা.) সহ আরো অনেকে। সেদিন তারা ইসলামের সেবায় চমৎকার ভূমিকা পালন করেন।

মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামি সাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়, তা ইসলামী দাওয়াতের সাথে সারা প্রথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের যে কোন ভাষার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের কবি-সাহিত্যিকরা তাদের প্রতিভাকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। এ ভাবে ইসলামী সাহিত্য আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে প্রাচীন আরবদের সমাজব্যবস্থার নেতিবাচক কার্যকলাপের বিপরীতে সাহাবায়ে কিরাম নৈতিক মূল্যবোধের পক্ষে কবিতা রচনা করেন। সামাজিক নানা অসঙ্গতি তাদের কবিতায় অত্যন্ত সাবলিলভাবে ফুটে উঠে। ধর্মীয় নানা বিষয় উপস্থাপনের পাশাপাশি তারা সমাজের অসহায় নারী-পুরুষ, শিশু, ইয়াতিম, হতদরিদ্র, বঞ্চিত এবং আশ্রয়প্রার্থীকে সহায়তাকরণ ইত্যাদি মানবিক মূল্যবোধ বিষয়ক বিষয়বস্তু আলোকপাত করেছেন তাদের কবিতায়। বিশিষ্ট সাহাবী কবি ‘আলী ইবন আবী তালিব মানব সমাজকে নিম্নোক্ত কাব্য চরণগুলির দ্বারা মানবিক মূল্যবোধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন,

إذا أكمل الرحمن للمرء عقله * فقد كملت أخلاقه ومأربه

يعيش الفتى في الناس بالعقل إنه * على العقل يجري علمه وتجاربه

يزيد الفتى في الناس جودة عقله * وإن كان محظورا عليه مكاسبه^৮

[দয়াময় আল্লাহ যদি মানুষের বুদ্ধি পূর্ণ করে দেন তাহলে তার নীতি-নৈতিকতা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করে। একজন যুবক মানুষের মাঝে বুদ্ধির দ্বারাই বেঁচে থাকে। আর বুদ্ধির উপরই তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। সুস্থ-সঠিক বুদ্ধি যুবককে মানুষের মাঝে সৌন্দর্যময় করে যদিও তার আয়-উপার্জন হয়ে যায়।]

নারীর মানবিক গুনাবলী

ইসলাম আসার পূর্বে আইয়্যামে জাহেলিয়াতে নারীদেরকে সামাজিক মর্যাদা দেয়া তো দূরের কথা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিলো না। কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের কথা শ্রবণ করার সাথে সাথেই সকলের মুখ কালো হয়ে যেত। তাকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতো এবং এই কন্যা সন্তানকে মাটিতে জীবন্ত প্রোথিত করাকেই নিজেদের জন্য সম্মান, মর্যাদা ও পুণ্যের কাজ বলে মনে করতো। জাহেলী যুগের সেই সময়কার ভয়াবহ এই অবস্থার কথা তুলে ধরে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ^৯

[অথচ যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুখবর দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।]

মহগ্রন্থ আল কোরআনে ‘নিসা’ অর্থাৎ ‘মহিলা’ শব্দটি ৫৭ বার এবং ‘ইমরাআহ’ অর্থাৎ ‘নারী’ শব্দটির ২৬ বার উল্লেখ হয়েছে। পবিত্র কোরআনে ‘নিসা’ তথা ‘মহিলা’ শিরোনামে নারীর অধিকার ও কর্তব্যসংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরাও রয়েছে। এ ছাড়া কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে নারীর অধিকার, মর্যাদা ও তাদের মূল্যায়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। ইসলাম নারীর ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। দিয়েছে নারীর জান-মালের নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সম্মান।

নারী তাঁর নারীত্বের মর্যাদা বজায় রেখেই সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন এবং রাখবেন। নারী ছাড়া অন্য কেউই মাতৃত্বের সেবা ও সহধর্মিণীর গঠনমূলক সহযোগিতার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম নয়। মায়েদের ত্যাগ ও ভালোবাসা ছাড়া মানবীয় প্রতিভার বিকাশ ও সমাজের স্থায়িত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। মায়েরাই সমাজের প্রধান ভিত্তি তথা পরিবারের প্রশান্তির উৎস। ইসলাম ফিতরাত বা স্বভাবজাত ধর্ম হওয়ায় নারীকে তার সৃষ্টিগত উপযুক্ততার ভিত্তিতে যা পাওয়া দরকার তার সব অধিকারই নিপুণভাবে প্রদান করেছে। সৃষ্টিগত এবং আকৃতিগতভাবে আল্লাহ তা‘আলা নারীকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। তাই তারা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য অনেক সময় নিকটাত্মীয় বা শুভানুধ্যায়ীদের দারস্থ হন তখন তারা আশ্রয়প্রার্থী নারীর ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বিপদ সংকুল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করেন। বিশিষ্ট সাহাবী কবি ‘আলী ইবন আবী তালিব (রা.) পৃথিবীর মাতৃকূলকে মানুষের মৌলিক ও বিশুদ্ধ আশ্রয়স্থল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন তার কবিতায়। যেমন তিনি বলেন,

وإنما أمهات الناس أوعية * مستودعات وللإحساب آباء

فإن يكن لهم من أصلهم شرف * يفاخرون به فالطين والماء^{১০}

[প্রকৃতপক্ষে মায়েরা মানবজাতির নিরাপদ আধার, আর পিতারা বংশের জন্য। তাদের উৎসমূলে গৌরব আভিজাত্যের যদি কিছু থেকেই থাকে তা হলো কাদা ও পানি।]

প্রকৃতপক্ষে মা হলেন, শাস্ত, চিরন্তন একটি আশ্রয়ের নাম। আর এ শব্দটি মনে করিয়ে দেয়, অকৃত্রিম স্নেহ, মমতা আর গভীর ভালোবাসার কথা। যিনি চিরন্তন ভালোবাসা দিয়ে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন সন্তানের ভবিষ্যৎ, নিরাপদ করেছেন তাদের আগামী। আরেক সাহাবী কবি কা‘ব ইবন যুহাইর (রা.) নারীদের নানান নেতিবাচক বিষয় উপস্থাপন করলেও তার স্বীয় বান্ধবীকে চমৎকার মহিয়সী নারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

أكرم بها خلة، لو كانت صدقت * موعودها أولو أن النصيح مقبول^{১১}

[সে কতই না চমৎকার বান্ধবী, যদি সে তার অঙ্গীকার পালনে সত্যবাদী হতো এবং আমার উপদেশ গ্রহণ করতো।]

আরেকজন প্রখ্যাত সাহাবী কবি হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর একবার ‘আয়শা (রা.) এর গৃহে আসেন। তিনি গদি বিছিয়ে হাসসানকে (রা.) বসতে দেন। এ সময় আয়শা (রা.) এর ভাই ‘আব্দুর রহমান উপস্থিত হন। তিনি বোনকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনি তাকে গদির উপর বসিয়েছেন? তিনি আপনার চরিত্র নিয়ে এসব কথা বলেনি? ‘আয়শা (রা.) বললেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পক্ষ থেকে কাফিরদের জবাব দিতেন। শত্রুদের জবাব দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অন্তরে প্রশান্তি দিতেন। এখন তিনি অন্ধ হয়েছেন। আমি আশা করি আল্লাহ তা‘আলা আখিরাতে তাকে শান্তি দিবেন না। প্রখ্যাত তার্বীঈ মাসরুক বলেন, একবার আমরা ‘আয়শা (রা.) এর নিকট গিয়ে দেখলাম হাসসান সেখানে বসে বসে ‘আয়শার (রা.) প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করে শুনাচ্ছেন। তার মধ্যে নিম্নোক্ত এই পংক্তিটিও ছিল:

حصان رزان ما تزين بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل^{১২}

[তিনি পূত:পবিত্র, শক্ত আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ভদ্রমহিলা, তাঁর আচরণে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। পরনিন্দা থেকে মুক্ত অবস্থায় তাঁর দিনের সূচনা হয়।]

আতিথেয়তা

আতিথেয়তা মানুষে মানুষে বন্ধন দৃঢ় করে। সম্পর্কের গুরুত্ব বাড়ায়। পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে। আতিথেয়তা সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম হাতিয়ার। এতে আছে আনন্দ ও পূণ্য। এটি কল্যাণ ও মহত্বের পরিচায়ক। হযরত ইবরাহিম (আ.) সর্বপ্রথম অতিথিসেবার প্রথা চালু করেছেন। ইসলামে অতিথিসেবার প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মূলত মেহমানদারির সঙ্গে ঈমানের বিশেষ সম্পর্ক আছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।^{১৩} আতিথেয়তা নবীদের আদর্শ। হযরত ইবরাহিম আ. সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ^{১৪}

[আর অবশ্যই আমার ফেরেশতার (পুত্রসন্তানের) সুসংবাদ নিয়ে ইবরাহিমের কাছে এলো। তারা বললেন, সালাম! সেও বললো সালাম! অতঃপর অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি একটি ভুনা করা বাছুর নিয়ে এলেন।]

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে ইবরাহিম (আ.) এর কাছে প্রেরিত ফেরেশতাদের দলে হযরত জিবরাঈল, মিকাইল ও ইসরাফীল (আ.) ছিলেন। তারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে ইবরাহিম (আ.) নিকট আগমন করেন। তিনি তাদের মানুষ মনে করে তাদের জন্য আতিথেয়তার আয়োজন করেন। ইবরাহিম (আ.) ই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অতিথি সেবার প্রচলন শুরু করেন।^{১৫}

রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন আতিথেয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেক সময় অতিথি আপ্যায়ন করতে গিয়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে অনাহারে থাকতে হয়েছে। নিজ ঘরে মেহমানদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে না পারলে তিনি মেহমানদের কোনো ধনী সাহাবির বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। নবী হওয়ার আগে থেকেই তিনি অতিথিসেবায় সচেতন ছিলেন। সর্বপ্রথম ওহি প্রাপ্ত হয়ে অনেকটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা.)। হজরত খাদিজা (রা.) তখন তাঁকে এই বলে সাহায্য দিয়েছিলেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো রক্ষা করেন আত্মীয়তার বন্ধন, বহন করেন অন্যের বোঝা, উপার্জনক্ষম করেন নিঃস্বকে, আহার দেন অতিথিকে, সাহায্য করেন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে।'^{১৬} আতিথেয়তা নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিতে মহৎ কাজ। অতিথিসেবা নবীদের সূন্যাত। শায়েরুর রাসূল হাসান ইবন সাবিত (রা.) অতিথিদের সেবায় নিজেকে অকুণ্ঠচিত্তে উৎসর্গ করে দেয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করে বলেন,

واني لمعط ما وجدت وقائل * لموقد ناري ليلة الريح أوقد

واني ليدعوني الندى فأجيبه * وأضرب بعض العارض المتوقد^{১৭}

[আমি যা কিছু অর্জন করেছি, তা অকুণ্ঠচিত্তে (মানুষের মাঝে) বিলিয়ে দেই। মৃদুমন্দ বাতাসের রজনীতে চুলায় অগ্নি প্রজ্জ্বলনকারীকে আমি জানান দেই; আমিও (প্রতিবেশীর প্রতি মমত্ব প্রদর্শনের লক্ষ্যে) চুলায়

আগুন প্রজ্জ্বলন করি। অর্থাৎ রান্না করে থাকি। তারা আমাকে তাদের ভোজনে আমন্ত্রণ করলে আমি তাতে সাড়া দেই। আর আমি কিছু কিছু হঠাৎ আরোপিত আমন্ত্রণেও পরিভ্রমণ করেছি।]

অন্য একাট শ্লোকে কবি হাসসান বিন সাবিত গাসসানীয় রাজন্যবর্গের দানশীলতা ও অতিথিপরায়ণতার একটি সুন্দর চিত্র এঁকেছেন অত্যন্ত চমৎকার ভাবে। যেমন তিনি বলেন,

يغشون حتى ما تهر كلابهم * لا يسألون عن السواد المقبل^{১৮}

[তাদের গৃহে সব সময় অতিথিদের এত ভিড় থাকে যে, তাদের কুকুরগুলিও তা দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এখন আর তারা অন্ধকার রাতে নতুন আগন্তুককে দেখে ঘেউ ঘেউ করে না।]

আরবী কাব্য জগতের বিখ্যাত তিন কবির তিনটি শ্লোক প্রশংসা বা মাদাহ কবিতা হিসেবে সর্বোত্তম। এ ব্যাপারে সকলে একমত। তবে এ তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ভালো কোনটি সে ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে। কবি হুতাইয়া সাহাবী কবি হাসসান ইবনে সাবিতের এ শ্লোকটিকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছেন। কিন্তু অন্যরা আবুত তিহান ও নাবিগার শ্লোক দুইটিকে সর্বোত্তম বলেছেন।^{১৯} উমাইয়াহ খলীফা ‘আব্দুল মালিক ছিলেন একজন বড় জ্ঞানী ও সাহিত্য রসিক মানুষ। তাঁর সিদ্ধান্ত হলো ‘আরবরা যত প্রশংসাগীতি রচনা করেছে সবচেয়ে সর্বোত্তম হলো হাসসানের শ্লোকটি।^{২০} হাসসান ইবনে সাবিতের কবিতার এ শ্লোকগুলি মানব সমাজকে মানবিক মূল্যবোধ ও মানবতাবোধের দিকে আহ্বান করে।

প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাত্মে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আল-কুরআনের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথমত, আত্মীয় প্রতিবেশী, দ্বিতীয়, অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং তৃতীয়, অস্থায়ী প্রতিবেশী- স্বল্প সময়ের জন্য যার সাথে উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার সুযোগ হয়েছে, ইসলামের সমাজ-বিধান অনুযায়ী এরা প্রত্যেকেই বন্ধুত্ব সহানুভূতি এবং ভাল ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, প্রতিবেশী অধিকার রক্ষার জন্য আমাকে এতদূর তাকীদ দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার দেয়া যেতে পারে বলে আমার ধারণা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ما يوصيني بالجار (আ.) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতো এমনকি আমার মনে হতো যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।^{২১} প্রতিবেশী আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয় হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া জরুরী। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْأَقْرَبِينَ الطَّيِّبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُدِّ
بِالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا^{২২}

[আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শীরক করোনা। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী-দাঙ্গিককে পছন্দ করেন না।

এ প্রসঙ্গে হাসসান ইবন সাবিত (রা.) বলেন,

قومي بنو النجار إن أقبلت * شهباء ترمي أهلها بالقتام
لا نخذل الجار ولا نسلم المولى * ولا نخصم يوم الخصام^{১০}

[আমার সম্প্রদায় বনু নাজ্জার। শুহবা বা আলেক্সো থেকে কেউ আগমন করলে ওউহার অধিবাসীকে ধূসর অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে অপদস্থ করি না এবং তাদের কাউকেও ওলীর নিকট সমার্পন করি না। এমনকি আমরা চরম ঝগড়ার দিনও অভিমান করিনা।]

উপসংহার

মূলত: সকল যুগেই কবিতা শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলামী দা'ওয়াতের কাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদের কাব্যপ্রতিভাকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করেছেন। তিনি তার সাথীদের কবিতার মাধ্যমে দীনের প্রচারকে উৎসাহিত করেছেন। কল্পনা নির্ভর, বাস্তবতা বিবর্জিত অসত্য কবিতাকে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করেছেন। সাহাবী কবিগণ তাদের কবিতার দ্বারা তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে মানবিক মূল্যবোধের সাবলিল ভাষায় আহ্বান জানিয়েছেন। তারা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং প্রতিবেশীদের অধিকারের বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ফলে তাদের কবিতা সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত কল্যাণময় ও যুগোপযোগী বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। অনন্তকাল ধরে সাহাবায়ে কেরামের এই কাব্যিক পংক্তিগুলো একটি মানবিক জীবনের দিকে পথ নির্দেশ করবে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ইবরাহীম আনিস ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (ঢাকা: আল-মাকতাবাতুল ইসলামীয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৫২৬।
- ^২ ড. নূর উদ্দিন 'আতর, *মানহাজুন নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস* (কায়রো: দারুল ফিকর, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭২খ্রি.), পৃ. ১১৬।
- ^৩ ড. নূর উদ্দিন 'আতর, *মানহাজুন নাকদ ফী 'উলুমিল হাদীস*, পৃ. ১২০।
- ^৪ সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০০।
- ^৫ সূরাহ আল হাদীদ, আয়াত: ১০।
- ^৬ মাহদী মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন, *দিওয়ানু তারাফা ইবন 'আবদ* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ২০০২খ্রি.), পৃ. ২৪।
- ^৭ মুত্তফা আব্দুশ শাফী, *দিওয়ানু ইমরাউল কায়স* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪খ্রি.), পৃ. ২৭।
- ^৮ আব্দুল আযীয আল-কারাম, *দিওয়ানু 'আলী* (কায়রো: লুজনা তুত তা'লীফ ওয়াত তারজমা, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ৩৪।
- ^৯ সূরাহ নাহল, আয়াত: ৫৮।
- ^{১০} আব্দুল আযীয আল-কারাম, *দিওয়ানু 'আলী*, পৃ. ২৯।
- ^{১১} ড. 'আলী ফাউর, *দিওয়ানু কা'ব ইবন যুহাইর* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ৩৪।
- ^{১২} হাসসান ইবন সাবিত, *আদ-দীওয়ান* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ১১২।
- ^{১৩} মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সাহীহুল বুখারী* (বৈরুত: দারুল ইবন কাছীর, ২০২০খ্রি.), পৃ. ৫৮৮; হাদীস নং-৬০১৮।
- ^{১৪} আল হুদ, আয়াত: ৬৯।
- ^{১৫} মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল কুরতুবী, *তাফসীরে কুরতুবী* (কায়রো: মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ১১২।
- ^{১৬} মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *সাহীহুল বুখারী*, পৃ. ৮; হাদীস নং-৩।
- ^{১৭} হাসসান ইবন সাবিত, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ১৩২-১৩৩।

^{১৮} হাসসান ইবন সাবিত, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ১৮১।

^{১৯} ইবনু কুতায়বা, *আশ-শিরু ওয়াশ শু'আরা* (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১), পৃ. ১৩৯।

^{২০} আহমাদ ইবন হাজার 'আসকালানী, *আল-ইসতী'আব ফী তাময়ীয আস-সাহাবা* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ১৩০।

^{২১} মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল আল-বুখারী, *সহীছুল বুখারী*, হাদীস নং-৪৯৬৪।

^{২২} সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৩৬।

^{২৩} হাসসান ইবন সাবিত, *আদ-দীওয়ান*, পৃ. ১৮৩।

শায়খ ‘আলী তানতাবি রচিত প্রবন্ধে ইসলামি উপাদান

ড. মুহাম্মদ মতিউর রহমান*

Abstract: Among the greatest scholars who wrote from Islamic perspectives in the modern Arab literature, and whose work earned him the most prestigious status is Sheikh Ali Al Tantawi (1909-1999AD). The modern Arab literature got perfection and reached the unique height in the master hand of Ali-Al- Tantawi. The versatile Syrian writer achieved unparalleled name and fame as an essayist, justice, fiqh scholar as well as Islamic scholar. This prolific author greatly influenced not only the Arab World but also the Indian Sub-continent by his substantial writing. Though he started his literary practice with essays, he has left a permanent impression in other forms of literature like short story, biography, feature and travel story. He aspired to illumine various issues regarding Islam with utmost lucidity and emerged as a pole star in the Arab literary constellation. His logical and thought-provoking expression made it easy for him to propagate his own religion as well as his individual ideology. The essence of his writing reflects transitoriness of human life, history and heritage, moral values and the Islamic civilization. His most popular and well-circulated books affirmed for him an unprecedented position in the contemporary literary period. The unique characteristics of his writing— exquisite expression, citation from Al Quran and the Prophetic tradition, choice of simple words replete with a lot of meanings and substantial as well as philanthropic theme - earned him the recognition as a great scholar. This article endeavours to illustrate the Islamic elements traceable in the great essays of Sheikh Ali-Al Tantawi.

সিরিয়ান ইসলামিক স্কলার ‘আলী তানতাবি (১৯০৯-১৯৯৯ খ্রি.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে কথাসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, প্রথিতযশা অধ্যাপক, প্রখ্যাত বিচারক ও সমাজ সংস্কারক। তবে বিখ্যাত প্রবন্ধকার ও জনপ্রিয় কলাম লেখক পরিচয়টি-ই ‘আলী তানতাবিকে আধুনিক আরবি সাহিত্যিকদের মাঝে অনন্য মর্যাদা ও সুখ্যাতি এনে দিয়েছে। বিষয়বস্তুর সুনিপুণ বিশ্লেষণ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সহজ-সরল শব্দচয়ন, সাবলীল উপস্থাপন, ভাষা ও ভাবের লালিত্য এবং ইসলামি ভাবধারায় রচিত তার প্রবন্ধগুলো আরবি সাহিত্যের ধ্রুপদী স্তরে উপনীত হয়েছে। ইসলামের মৌলিক বিষয়বাবলি, মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার, পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন, যুগোপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, জাতির ভবিষ্যত কাগুরী তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীদের উন্নত চরিত্র গঠন ও নৈতিক দৃঢ়তা অর্জন, ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনের মত অতিগুরুত্বপূর্ণ ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো-ই ছিল তাঁর প্রবন্ধের মূল উপাদান। প্রতিটি প্রবন্ধেই তিনি নিরাসক্তভাবে আলোচ্য বিষয়ের উপর বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা, কুরআন-হাদিসের আলোকে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও যুক্তিশৃঙ্খলার মাধ্যমে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলো আরববিশ্বের বিশেষত মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও জেদ্দাভিত্তিক প্রথম সারির পত্রিকাগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করত। একটি উন্নত দেশ ও সভ্য জাতি গঠনে তাঁর এসকল প্রবন্ধগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোকবর্তিকা হয়ে পথ দেখাতে পারে। একজন চিন্তাশীল ও অনুসন্ধানী পাঠক তাঁর রচিত প্রবন্ধ থেকে খুঁজে পাবে আলোকিত জীবন পথের পাথর। ‘আলী তানতাবি লিখনির মাধ্যমে ইসলামের সেবায় অনবদ্য ভূমিকার ফলে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে কিং ফয়সাল পুরস্কার

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(جائزة الملك فيصل) লাভ করেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ‘আলী তানতাবি রচিত প্রবন্ধে ইসলামি উপাদান নিয়ে আলোকপাতের প্রয়াস পাবো।

‘আলী তানতাবির পরিচয়

বিংশ শতাব্দীর আলোচিত সাহিত্যিক ও বিচারক ‘আলী তানতাবি ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুন মোতাবেক ১৩২৭ হিজরির ২৩ই জুমাদাল উলায় সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।^১ তাঁর প্রকৃত নাম ‘আলী। উপনাম আবুল হায়সাম। উপাধি ফকিহুল উদাবা ও আদিলুল ফুকাহা। বংশের দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে ‘আলী তানতাবি^২ নামে ডাকা হত। আর এ নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চায় এই পরিবারের সুখ্যাতি ছিল সর্বজনবিদিত। পিতা মুস্তাফা তানতাবিকে তৎকালে একজন বিজ্ঞ ও প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার এবং ফিকাহশাস্ত্রবিদ হিসেবে গণ্য করা হতো।^৩ দাদা আহমদ বিন ‘আলী বিন মুস্তাফা। যিনি উসমানি খলিফার পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর ইমাম ও ধর্মীয় শিক্ষক ছিলেন। মাতৃকুলের দিক থেকেও তিনি অত্যন্ত উচ্চবংশীয় ছিলেন। মাতৃবংশেও অনেক প্রখ্যাত আলেম, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক ও ইসলামিক স্কলার ছিল। ‘আলী তানতাবির মামা মুহিব উদ্দীন আল-খতিবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শৈশব থেকেই ‘আলী তানতাবি ছিলেন অত্যন্ত নম্র, ভদ্র ও শান্ত প্রকৃতির। পাঁচ ভাই-বোনের মাঝে তিনি ছিলেন সকলের বড়।^৪ বংশীয়ভাবেই তাঁর মাঝে কোমলতা ও সরলতা প্রাধান্য লাভ করে। ভাই-বোনের মাঝে বড় হওয়ায় তাঁর মাঝে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণের বিষয়টিও পরিলক্ষিত হয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি ঘরে-বাইরে বিভিন্ন কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা করতেন। জন্মের পর থেকে যেহেতু তিনি জ্ঞানচর্চার পরিবেশে লালিত-পালিত হোন তাই এর একটি প্রত্যক্ষ প্রভাব শৈশবকাল থেকেই তাঁর মাঝে প্রতিভা হয়। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক পাঠাগারে সংরক্ষিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন এবং নিজের জ্ঞানের পরিধিকে সমৃদ্ধ করেন।

পিতা মুস্তাফা তানতাবি পরিচালিত ‘মাদরাসাতু তিজারিয়াহ’তে ভর্তির মাধ্যমে ‘আলী তানতাবির আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষার অনেক বিষয়ই তিনি মাদরাসায় ভর্তির আগেই রপ্ত করতে সক্ষম হোন। আর এর পুরো কৃতিত্ব ছিল মূলত ‘আলী তানতাবির পিতা-মাতার।^৫ ‘আলী তানতাবি ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানেই অধ্যয়ন করেন। শায়খ খালিদ^৬ নামক এক শিক্ষকের নিবিড় তত্ত্ববধানে তিনি আনন্দের সাথেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তি করেন।^৭ এরপর মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের জন্য তিনি ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ‘মাদরাসাতুস সুলতানিয়া আস-সানিয়া’তে ভর্তি হন।^৮ আধুনিক বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতাপূর্ণ উন্নত ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানে আরবির পাশাপাশি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা শিক্ষা দান করা হতো। ‘আলী তানতাবি আরবির সাথে ফরাসি ও ইংরেজি ভাষাজ্ঞান লাভ করেন। তবে তিনি মাতৃভাষা আরবির প্রতিই বেশি আকর্ষণবোধ করেন। এর কারণ ছিল তাঁর অন্যতম প্রিয় শিক্ষক শায়খ সাঈদ মুরাদ। যার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ‘আলী তানতাবির কিশোর মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তিনি এ শিক্ষকের কাছ থেকে আরবি সাহিত্যের নানাদিক সম্পর্কে জানতে পারেন।^৯ এদিকে স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হোন। এরপর তিনি ‘আল-মাদরাসাতু জকমকিয়াহ’ (المدرسة الجقمقية) ও ‘মাকতারু আমর’ (مكتب عمر) থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ও অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন।^{১০} এসময় তিনি কুরআন, হাদিস, ফিকহ, তাফসির ও ইসলামি শরীয়াতের নানাদিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পাশাপাশি ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে বুৎপত্তি লাভ করেন। এখানে তিনি ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কৃতিত্বের সাথে অধ্যয়ন করেন।^{১১}

সে সময়ে মিশর জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার স্বর্গভূমি ছিল। 'আলী তানতাবি মিশরের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন ও গবেষণা করার সুযোগ লাভের স্বপ্ন লালন করতেন। স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর স্বীয় মামা মুহিব উদ্দীন আল-খতিবের কল্যাণে তাঁর হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পেয়ে যান। মামা তাঁকে মিশরে নিয়ে আসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। ১৯২৮ সালের ২৮ই সেপ্টেম্বর 'আলী তানতাবি উচ্চশিক্ষার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উর্বর নগরী মিশরে আগমন করেন।^{১২} নিজের মেধা ও মামার সহযোগিতায় তিনি 'দারুল উলুম মাদরাসায়' ভর্তি হন। পরিতাপের বিষয় তিনি অনেক স্বপ্ন নিয়ে মিশর আগমন করলেও এখানে নিজের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হননি। নতুন পরিবেশ, বিরাজমান পরিস্থিতি ও সেখানকার সংস্কৃতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। ফলে কিছুদিন অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া ফিরে আসেন এবং সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের একটি নামকরা প্রতিষ্ঠানে আইন বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। এখানে দীর্ঘ চার বছর অধ্যয়নের পর তিনি ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসাস ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করেন।^{১৩} একাডেমিক লেখাপড়ার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লেখা বই, পুস্তিকা, পত্রিকা, প্রবন্ধ, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী প্রচুর পরিমাণে পাঠ করতেন, যা তাঁর জ্ঞানের জগতকে আরো বেশি সমৃদ্ধ করে।

'আলী তানতাবির শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। এ জন্য পেশা হিসেবে তিনি শিক্ষকতার প্রতিই বেশি আগ্রহবোধ করেন। শিক্ষাজীবন সমাপ্তির পর ১৩৪৫ হিজরিতে 'আল-মাদরাসাতুল আহলিয়া' তে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং আনন্দের সাথে পাঠদান করতে থাকেন। এসময় তিনি সাহিত্যচর্চাও অব্যাহত রাখেন।^{১৪} এরপর তিনি ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন।^{১৫} পড়ানোর পাশাপাশি তিনি শিক্ষার্থীদেরকে জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ প্রদান করতেন।^{১৬} শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনের সাথে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সমাজ ও দেশে বিরাজমান নানা অসঙ্গতি নিয়ে নিয়মিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে থাকেন। এজন্য তিনি অবশ্য রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হোন। আর তার জীবনে নেমে আসে নানা দুর্ভোগ। একসময় বাধ্য হয়ে তিনি সিরিয়া থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন জনপদ ইরাকের বাগদাদ নগরীতে গমন করেন। এখানে প্রথমে তিনি একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পেশাদারিত্ব ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য দ্রুত তার সুনাম-সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের আমন্ত্রণ পান। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি অধ্যাপক হিসেবে লেবাননের রাজধানী বৈরুতের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান আইন কলেজে পাঠদান করেন।^{১৭} এক বছর অধ্যাপনার পর তিনি আবার ইরাকে ফিরে আসেন এবং দারুল উলুম মাদরাসায় পাঠদান করেন। এসময় চারদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল বেজে উঠলে তিনি ইরাক থেকে নিজের মাতৃভূমি সিরিয়ার দামেশকে ফিরে আসেন। 'আলী তানতাবির ক্ষুরধার লেখনি ও সফলতার সাথে অধ্যাপনার বিষয়টি তাঁর শিক্ষক মহোদয়ের দৃষ্টিগোচর হলে তাঁকে 'মাকতাবু আম্মুরে' সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালনের আমন্ত্রণ জানান। তিনি তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁর লেখনির ধারা অব্যাহত রাখেন।^{১৮}

আইন বিষয়ে অধ্যাপনা করে একসময় তিনি আইন পেশার প্রতি আগ্রহবোধ করেন।^{১৯} ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে অধ্যাপনা ছেড়ে তিনি আইন পেশায় নিয়োজিত হোন। প্রথমে দামেশকের 'নাবক' নামক অঞ্চলে তিনি প্রায় এগারো মাস এবং 'দুমা'^{২০} নামক অঞ্চলে প্রায় এক বছরের মত বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।^{২১} বিচারকার্যে দূরদর্শিতা, পেশাদারিত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকার ফলে তিনি ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে দামেশকের বিচারক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোন এবং দক্ষতার সাথে দীর্ঘ দশ বছর এ দায়িত্ব পালন করেন। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসময় তিনি উর্ধ্বতন মহলের সুদৃষ্টি, সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা

লাভ করেন।^{২২} এরপর স্বীয় কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের জন্য তিনি ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ান সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা ও পরবর্তীতে মিশরীয় সুপ্রিম কোর্টের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হোন।^{২৩}

জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও ক্ষুরধার লেখনির ফলে ‘আলী তানতাবির সুখ্যাতি সিরিয়ার গণ্ডি পেরিয়ে মিশর, সৌদিআরবসহ আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এ সকল দেশের বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁকে তাদের সাথে কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। শুরুতে তিনি স্বজাতির মাঝে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারে কাজ করলেও পরবর্তীতে ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত ‘কুল্লিয়াতুল মাআহিদ’ শীর্ষক প্রতিষ্ঠানে শরী‘আ অনুঘদের অধীনে আরবি ভাষা বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন।^{২৪} ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মক্কায় গমন করেন।^{২৫} বাইতুল্লাহর নিকট ‘আজযাদ’ নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। দীর্ঘ এগারো বছর এখানে বসবাসের পর তিনি ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে মিনার নিকট ‘আযীযিয়া’য় চলে আসেন। এখানে সাত বছর বসবাসের পর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জেদ্দায় গমন করেন এবং জীবনের শেষ সময়গুলো তিনি পঠন-পাঠনের মাঝে ব্যস্ত থেকে এখানেই অতিবাহিত করেন।^{২৬} দীর্ঘ সময় তিনি সৌদিআরবে অবস্থান করে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সেখানকার জনসাধারণ, জ্ঞানীগুণী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের হৃদয়ে সম্মান ও শ্রদ্ধার এক বিশাল জায়গা দখল করে নেন। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ১৮ই জুন তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তিনি জেদ্দার মালিক ফাহাদ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (ICU) চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।^{২৭}

‘আলী তানতাবি রচিত গ্রন্থাবলী

‘আলী তানতাবি কৈশর থেকে আমৃত্যু সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। সমাজ সংস্কার, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন, চারিত্রিক উন্নতি, নারীদের অধিকার ও শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মীয় জ্ঞানার্জন ও ইতিহাস নিয়ে একাধারে লিখেছেন। শিশু সাহিত্যেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। নিম্নে তাঁর রচিত ব্যাপক সমাদৃত ও জনপ্রিয় গ্রন্থগুলো উল্লেখ করা হল- ১. রাসাইলুল ইসলাহ (رسائل الإصلاح), ২. বাশ্শার বিন বুরদ (بشار بن برد), ৩. রাসাইলু সাইফিল ইসলাম (رسائل سيف الإسلام), ৪. আল-হাইসামিয়াত (الهيئيات), ৫. ‘উমর ইবনুল খাত্তাব (عمر بن الخطاب), ৬. ফিত তাহলিলিল আদাবী (في التحليل الأدبي), ৭. কিতাবুল মাহফুজাত (كتاب من تاريخ الإسلام), ৮. ফি বিলাদিল ‘আরব (في بلاد العرب), ৯. মিন তারিখিল ইসলামি (من تاريخ الإسلام), ১০. মাকালাতুন ফি কালিমাত (مقالات في كلمات), ১১. ফি সাবিলিল ইসলাহ (في سبيل الإصلاح), ১২. দিমাশ্ক (دمشق), ১৩. বাগদাদ (بغداد), ১৪. মা‘আলাস (مع الناس), ১৫. ফিকর ও মাবাহিস (فكر من نفعات), ১৬. ছুওয়ারুন মিনাশ শারকু ফি ইন্দোনেশিয়া (صور من الشرق في إندونيسيا), ১৭. আল-জামিউল উমাবী (الجامع الأموي), ১৮. ফুছুলু ইসলামিয়া (فصول إسلامية), ১৯. হুতাফুল মাজুদ (هتاف صيد من نفعات), ২০. সিলসিলাতু হিকায়াতুম মিনাত তারিখ (سلسلة حكايات من التاريخ), ২১. ছয়দুল খাতির (من نفعات), ২২. সিলসিলাতু আলামিত তারিখ (سلسلة أعلام التاريخ), ২৩. মিন নাফহাতিল হারাম (من حديث النفس), ২৪. কাছাছুম মিনাল হায়াত (قصص من الحياة), ২৫. মিন হাদিসিন নাফস (من حديث النفس), ২৬. ছুওয়ার ও খাওয়াতির (صور وخواطر), ২৭. কাছাছুম মিনাত তারিখ (قصص من التاريخ), ২৮. আখবার ‘উমর (أخبار عمر), ২৯. যিকরায়াতু ‘আলী তানতাবি (ذكريات على الطنطاوي), ৩০. রিজালুম মিনাত তারিখ (رجال من التاريخ), ৩১. আবু বকর সিদ্দীক (أبو بكر الصديق), ৩২. ফাতওয়াত তানতাবী (فتاوى الطنطاوي), ৩৩. তারিফুন আম বিদীনিলা ইসলাম (تعريف عام بدين الإسلام), ৩৪. সাইয়্যিদু রিজালিত তারিখ মুহাম্মদ (سيد رجال التاريخ محمد), ৩৫. নূর ও হিদায়া (نور وهداية), ৩৬. আহমদ বিন

ইরফান (أحمد بن عرفان), ৩৭. আব্দুর রহমান বিন আউফ (عبد الرحمن بن عوف), ৩৮. কিচ্ছাতুনা মাআল ইয়াহুদ (من شوارد الشواهد), ৪০. ফুজুলুন ইজতিমাইয়াহ (فصول إجتماعية), ৪১. আল বাওয়াকির (البواكير), ৪২. মিন গজলিল ফুকাহা (من غزل القاضي شريك), ৪৩. 'আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (عبد الله بن المبارك), ৪৪. আল-কাজী শুরাইক (القاضي شريك), ৪৫. আল-ইমাম আন-নববি (الإمام النووي)।^{২৮}

‘আলী তানতাবি রচিত প্রবন্ধে ইসলামি উপাদান

আধুনিক আরবি সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল প্রবন্ধ। প্রবন্ধ এর আরবি প্রতিশব্দ মাকালাহ (مقالة)। ‘আল-কওলু’ মূলউৎস থেকে উৎকলিত শব্দটির অর্থ বর্ণনা, বচন, কথন, বাণী, অভিমত ইত্যাদি। কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখক ও সাহিত্যিকের বস্তুনিষ্ঠ অর্থবহ আলোচনা, বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ, স্বীয় মতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি, নানাবিধ তথ্যের সমন্বয়ে মননশীল ও চিত্তাকর্ষক রচনা-ই হল (মাকালাহ) বা প্রবন্ধ। যাতে যাপিত জীবনের নানাদিক, যেমন- রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, ধর্মীয় রীতিনীতি, ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ও জীবনঘনিষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয়াবলি আলোচিত হয়। মাকালাহ বা প্রবন্ধের পরিচয় প্রসঙ্গে ড. আহমদ আমীন বলেন :

هي إنشاء نثري قصير كامل يتناول موضوعا واحدا غالبا كتبت بطريقة لا تخضع لنظام معين، بل تكتب حسب هوى الكاتب^{২৯}

‘একটি সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ রচনা-ই হল প্রবন্ধ। যেখানে একটি বিষয়ই বিশেষভাবে আলোচিত হয়। যা রচনার ক্ষেত্রে লেখক কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অনুসরণ না করে একান্ত নিজস্ব চিন্তাধারা, আত্মঅভিব্যক্তি ও মননশীলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।’

আধুনিক আরবি সাহিত্যের একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ‘ফুজুল মাকাল’ শীর্ষক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রণেতা ড. সালিহ আবু ইসবা ও ড. মুহাম্মদ ‘উবায়দুল্লাহ প্রবন্ধের একটি চমকপ্রদ পরিচয় প্রদান করেছেন :

إن المقالة هي نوع من الأنواع الأدبية النثرية تدور حول فكرة واحدة، وتناقش موضوعا محددا، أو تعبر عن وجهة نظر ما وتهدف إلى اقناع القراء بفكرة معينة أو إثارة عاطفة عندهم. ويمتاز طولها بالاقصاء ولغتها بالسلاسة والوضوح وأسلوبها بالجاذبية والتشويق.^{৩০}

‘গদ্য সাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা হল প্রবন্ধ। যাতে কোন একটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে পর্যালোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে পাঠকের নিকট একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্য পৌঁছে দেয়া হয়। এর পরিধি প্রবন্ধকারের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রবন্ধ রচনার ভাষা হয় নান্দনিক, শব্দচয়ন হয় সহজ-সরল, প্রকাশভঙ্গি হয় সাবলীল এবং এর উপস্থাপন ভঙ্গিতে এক ধরনের আবেগ ও উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়।’

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ নাজম প্রবন্ধকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেন :

إن المقالة الأدبية قطعة نثرية محدودة في الطول والموضوع، تكتب بطريقة عفوية سريعة خالية من الكلفة والرهق، وشرطها الأول أن تكون تعبيراً صادقا عن شخصية الكاتب.^{৩১}

‘প্রবন্ধ এমন এক গদ্য সাহিত্য, যা দৈর্ঘ্য ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে সীমাবদ্ধ। যা সহজ-সরল ভাষায় সাবলীলভাবে লেখা হয় এবং তা অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যদোষ ও অনাবশ্যক বিস্তৃতি থেকে মুক্ত থাকে। তবে এক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হল, তাতে লেখকের মনের বাস্তব অভিব্যক্তি যথাযথভাবে প্রতিভাত হওয়া।’

আরবি সাহিত্যের এ সর্বাধুনিক শাখা প্রবন্ধে ‘আলী তানতাবির বিচরণ ছিল ঈর্ষণীয়। তার রচনার অধিকাংশই প্রবন্ধ। যা বিভিন্ন সমাদৃত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তীতে গ্রন্থবদ্ধ রূপ লাভ করেছে। এসকল প্রবন্ধে তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি আলোচনার পাশাপাশি, ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি, তরুণ ও যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের করণীয়, ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত— এসকল অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

মূলত প্রবন্ধ রচনার মধ্যদিয়েই ‘আলী তানতাবি আরবি সাহিত্যের সুবিস্তৃত জগতে প্রবেশ করেন। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র আঠারো বছর বয়সে ‘আল-মুক্তাবাস’ পত্রিকায় তার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে তিনি একাধারে আরব বিশ্বের সব জনপ্রিয় পত্রিকায় লিখে যান সমসাময়িক ও ইসলামি নানাবিষয় নিয়ে। তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলো আল-আইয়াম, ফাতহুল আরব, আল-হজ, আল-ফাতাহ, আর-রিসালা, আল-মদীনা, আয-যুহরা, আল-মুসলিমু ও আন-নসরসহ পাঠক নন্দিত ও বহুল প্রচারিত সকল পত্রিকা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। এসব প্রবন্ধের অধিকাংশই ছিল সর্বসাধারণের মাঝে ইসলামি জ্ঞান, মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে রচিত। তাঁর জন্ম ও বেড়ে উঠা যেহেতু একটি দীন পরিবেশে হয়েছিল এজন্য তাঁর লেখনির মাঝে ইসলামের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বহুমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বিশেষত আকিদা-বিশ্বাসসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো তাঁর প্রবন্ধ রচনার মূল উপাদান ছিল। নিম্নে তাঁর রচিত প্রবন্ধে ইসলামি উপাদান উপস্থাপন করা হল।

ইসলাম ও তাওহিদ

ইসলাম^{৯২} একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। আনুগত্যের সাথে এক আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং শিরক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার নামই ইসলাম।^{৯৩} এর মূল শিক্ষা হল, আল্লাহ তা‘আলা একমাত্র স্রষ্টা ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং মুহাম্মদ (স.) তাঁর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবি ও রাসূল। ‘ইসলামী বিশ্বকোষে’ ইসলামের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

إِظْهَارُ الْخُضُوعِ وَالْإِتِمَامِ مَا آتَى جَمْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.^{৯৪}

‘আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁর নিকট থেকে রাসূল (স.) যে সকল বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, তা দৃঢ়তার সাথে মান্য করার নাম-ই হল ইসলাম।’

ইমাম রাযি (রহ.) ইসলামের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন :

الْإِسْلَامُ مَعْنَاهُ إِخْلَاصُ الدِّينِ وَالْعَقِيدَةِ وَالْمُسْلِمُ الْمَخْلُصُ لِلَّهِ عِبَادَتُهُ.^{৯৫}

‘ইসলাম মানে ‘আকিদা ও দ্বীনকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। স্বীয় ইবাদতকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্টকারীই হল একনিষ্ঠ মুসলিম।’

হাদিসে ইসলামের পরিচয় প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِئًا يَوْمًا لِلنَّاسِ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ... قَالَ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ؟ الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ.^{৯৬}

‘আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) একদিন লোকদের সামনে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন লোক আসলেন... তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলাম কি? তিনি বললেন, ইসলাম এই যে, তুমি

আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে না। সালাত কায়েম করবে, নির্ধারিত ফরয যাকাত আদায় করবে এবং রমযানে সিয়াম পালন করবে।’

জিবরাইল (আ.) একবার রাসূল (স.) এর কাছে ছদ্মবেশে আগমন করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন রাসূল (স.) তাকে ইসলামের মূল বিষয়গুলো শিক্ষা দেন। বর্ণিত আছে :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.^{৩৭}

‘উমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদিন রাসূল (স.) এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করেন। তাঁর পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো এবং দূরদেশ থেকে সফর করে আসার কোনো চিহ্ন তাঁর মাঝে ছিল না। অথচ আমাদের মাঝে কেউ তাকে চিনতে পারছিল না। তিনি রাসূল (স.) এর সামনে দুই হাঁটু বিছিয়ে বসলেন এবং নিজের দুই হাঁটু তাঁর দুই হাঁটুর সাথে মিলিয়ে দিলেন। নিজের দুই হাত তাঁর (রাসূলের) দুই উরুর উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মদ! ইসলাম কি? উত্তরে রাসূল (স.) বললেন, ইসলাম হল, তুমি মুখে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। মুহাম্মদ (স.) তাঁর প্রেরিত রাসূল। সালাত আদায় করবে। যাকাত প্রদান করবে। রমযান মাসে সিয়াম পালন করবে। সামর্থ্য থাকলে বাইতুল্লায় হজ করবে।’

তা’রীফ আম বিদীনিল ইসলাম’ (تعريف عام بدين الإسلام) ‘আলী তানতাবি রচিত একটি প্রবন্ধ সংকলন। যাতে একটি ভূমিকা ও সমাপনী বক্তব্যসহ মোট বারোটি প্রবন্ধ রয়েছে। এসকল প্রবন্ধে ইসলামের পরিচয়, ইসলামি আকিদার মূলনীতি, ইমানের মৌলিক বিষয়াবলী, যেমন- আল্লাহর প্রতি ইমান, তাওহিদুল উলুহিয়াহ, ইমানের বাহ্যিক দিকসমূহ, আখিরাতের প্রতি ইমান, তাকদিরের প্রতি ইমান, ফেরেশতা ও জিন জাতির প্রতি ইমান, নবি-রাসূল এবং আসমানি কিতাবের প্রতি ইমানের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তিনি গতানুগতিক লেখার বাইরে গিয়ে বিষয়গুলোকে এত মোহনীয় ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছেন যে, যার শুধুমাত্র ভাষা জ্ঞান রয়েছে তিনিও বিষয়গুলো খুব সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন। বিশেষত কুরআন-হাদিসের দালিলিক আলোচনার পাশাপাশি শব্দচয়ন ও বর্ণনা কৌশল এতোটাই মনমুগ্ধকর যে, পাঠক মাত্রই তাতে আনন্দ ও আত্মার খোরাক খুঁজে পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে আলোচ্য গ্রন্থে ইসলামের পরিচয়ের বিষয়টি উল্লেখ করা যেতে পারে।

একদা ‘আলী তানতাবি তাঁর কতিপয় শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি তোমাদের সামনে একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায় এবং বলে যে, তার হাতে খুব অল্প সময় আছে, তবে তোমরা তার নিকট ইসলামকে কিভাবে উপস্থাপন করবে? শিক্ষার্থীরা তার প্রশ্ন শুনে হতবাক হয়ে যায়। উত্তরে তারা বলে, খুব অল্পসময়ে একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষকে কিভাবে ইসলাম বুঝানো সম্ভব! এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো এতোটাই বিস্তৃত যে, খুব অল্প সময়ে তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝানো সম্ভব নয়। এটা বুঝতে হলে একজন ব্যক্তিকে তাওহিদ, তাজবীদ, তাফসির, হাদিস, ফিকহ ও উসুলুল ফিকহসহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান ও বুৎপত্তি লাভ করতে হবে। যা করতে কমপক্ষে তাকে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের এ উত্তর শুনে, ‘আলী তানতাবি বলেন: ‘সুবহানাল্লাহ! তোমাদের কী জানা নেই? একবার এক বেদুঈন রাসুল (স.) এর নিকট আসল। তার নিকট খুব অল্প সময় ছিল অর্থাৎ দ্রুত ফিরে যাওয়ার তাড়া ছিল। রাসুল (স.) তার নিকট অল্প সময়ে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরেন। আর সে বেদুঈন সেখান থেকে নিজ গোত্রের নিকট একজন পথপ্রদর্শক ও ইসলামের প্রশিক্ষক হয়ে ফিরে যান। কতই না উত্তম ছিল ইসলামের সেই পরিচয়টি, যা রাসুল (স.) একজন বেদুঈনের সামনে দিয়েছিলেন। আচ্ছা, তিনি কী একজন যোগ্য ও উপযুক্ত ইসলামের দা‘য়ী ও প্রচারক ছিলেন না? রাসুল (স.) তো মাত্র তিনটি বাক্যে ইসলামের পরিচয়কে তার নিকট তুলে ধরেছিলেন। যেখানে তিনি ইমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করেছেন। তাহলে আমরা কী অল্প সময়ে ইসলামের সেই পরিচয় উপস্থাপন করতে পারি না?’^{৩৮} এরপর তিনি আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে ইসলামের পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করেন এবং এ প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনা পেশ করেন। যাতে তিনি ইসলামকে সহজ-সরলভাবে উপস্থাপনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

অনেকেই ইসলাম ও এর বিধি-বিধানগুলোকে সাধারণ মানুষের সামনে অত্যন্ত কঠিনভাবে উপস্থাপন করেন। ফলে তারা কিছুটা শঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়ে এবং ইসলামি জীবনযাপন কষ্টসাধ্য ও দূরূহ ভেবে আস্তে আস্তে তা থেকে দূরে সরে যায়। সুতরাং যারা ইসলাম প্রচারক ও দা‘য়ী হিসেবে সাধারণ মানুষের সামনে কথা বলেন তাদের জন্য ইসলাম ও ইসলামের পালনীয় বিষয়াবলিকে কুরআন হাদিসের আলোকে সহজ-সরল ও সাধারণ ভাষায় তাদের সামনে উপস্থাপন করা-ই অধিক কল্যাণকর। এর ফলে সাধারণ মানুষ ইসলামি জীবনব্যবস্থার আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনার ব্যাপারে আগ্রহবোধ করবে এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিজের জান, মাল ও শ্রম উৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা খুঁজে পাবে।

ইসলামের মূলনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন- ‘বর্তমান পৃথিবীতে অসংখ্য দল ও মতবাদ দেখা যায়। এসকল দল ও মতবাদ কতিপয় সুনির্দিষ্ট মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের আবার সংবিধানও রয়েছে, যা কতিপয় মূলনীতির আলোকে রচিত। এখন কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত দলে প্রবেশ করতে চায় কিংবা উক্ত মতবাদ গ্রহণ করতে চায় সেক্ষেত্রে তাকে নির্দিষ্ট দল বা মতের মূলনীতি ও সংবিধানের উপর অকাট্য বিশ্বাসস্থাপন করতে হয়। এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইসলাম হল পৃথিবীতে প্রচলিত দল ও মতবাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক কল্যাণনির্ভর ও সর্বোত্তম। ইসলাম শুধুমাত্র একটি মতবাদই নয় বরং পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং কেউ যদি ইসলামে প্রবেশ করতে চায়, তার জন্য আবশ্যকীয় হল ইসলামের মূলনীতিগুলো দৃঢ়তার সাথে মেনে নেওয়া এবং তা দৃঢ়তার সাথে সত্যায়ন করা।’^{৩৯}

ইসলামি আকিদার প্রথম ও প্রধান মূলনীতি তাওহিদ। এটি মুসলিম হওয়ার প্রথম শর্ত। তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করে। কোন ব্যক্তি যদি তাওহিদ তথা মহান আল্লাহ তা‘আলাকে একক ক্ষমতাধর, বিশ্বচরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও লালন-পালনকারী, মানুষের সকল উপাসনা-আরাধনা পাওয়ার একক উপযুক্ত সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান না করে তবে সে মুসলিম হিসেবে গণ্য হবে না। ‘আলী তানতাবি ইমান ও তাওহিদকে চারটি বিষয়ের সমন্বিতরূপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বিষয় চারটি হল :

১. আল্লাহ সদা বিদ্যমান। তাঁর শুরু ও শেষ নেই। যখন কিছুই ছিল না তখনও তিনি ছিলেন এবং চিরকাল অনুরূপ বিদ্যমান থাকবেন। যদিও মানবচক্ষু আল্লাহকে কিংবা তাঁর অস্তিত্ব বিদ্যমানের বিষয়টি দেখতে পায় না। আর আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষই তাঁর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ^{৪০} وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

‘তোমাদের নিজেদের (দেহের) মাঝে (আল্লাহর পরিচয় লাভের অসংখ্য নিদর্শন) আছে, তোমরা কি তা দেখতে পাও না?’

মানুষ যদি এই মহাবিশ্ব ও এর মাঝে বিদ্যমান প্রাণী ও বস্তু, বিশেষত নিজেকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করে, তাহলে তার চিন্তার দুয়ার আলোর সন্ধান খুঁজে পাবে এবং সে খুব সহজেই আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে। মহাবিশ্বের সুনিপুণ সৃষ্টিকূল ছাড়াও মানব মনের সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারাও একজন ব্যক্তি চাইলে আল্লাহর অস্তিত্বের বিষয়টি অনুভব করতে পারে, যদি সে বহু রহস্যের আধার তার দেহ, এর গঠন প্রণালী ও কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা ও গবেষণা করে। এক্ষেত্রে আল্লাহর অস্তিত্ব বিদ্যমানের ব্যাপারে তার অন্য কোন দলিল ও প্রমাণের প্রয়োজন হবে না।^{৪১}

২. আল্লাহ হলেন বিশ্বজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি বিশ্বজগৎকে যথাযথভাবে সৃষ্টি ও সুবিন্যস্ত করেছেন। এর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন শুধুমাত্র তিনিই। এ ক্ষেত্রে তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সবকিছু তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়। বিশ্বজগত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সাথে অন্যকাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা ইমান ও তাওহিদ পরিপন্থী। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মানার পাশাপাশি বিশ্বজগত পরিচালনায় তাঁর সাথে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে তাহলে সে মুমিন বা বিশ্বাসী বলে গণ্য হবে না। কেননা ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বে আরবের লোকেরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করত এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য দেবদেবিকেও তাঁর সত্তা ও গুণাবলির সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করত। এজন্য তাদের এমন কর্মকাণ্ডকে তাওহিদ পরিপন্থী হিসেবে আখ্যায়িত করা হত। তাই প্রকৃত মুমিন হওয়ার জন্য অবশ্যই একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাকেই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালনকারী হিসাবে দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতে হবে এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা থেকে বিরত থাকতে হবে।^{৪২}
৩. আল্লাহ তা‘আলা বিশ্বজগতের একক অধিপতি ও মালিক। এর মালিকানা ও অধিপত্যে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পরিপূর্ণ ক্ষমতাবান। চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের পরিভ্রমণ, দিবারাত্রির আবর্তনসহ সবকিছু তাঁর একক নির্দেশেই হয়ে থাকে। প্রাণীকূলের জীবন-মৃত্যু, সুস্থতা-অসুস্থতা, ধন-সম্পদ, দরীদ্রতা, মহামারি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টিসহ পৃথিবীতে ঘটমান প্রতি বিষয়ই শুধুমাত্র তাঁর একক সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছাতেই হয়ে থাকে। এসকল বিষয়ে অন্য কারো বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। সৃষ্টিকূলের মাঝে কারোই তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের বাইরের যাওয়ার সাধ্য বা সক্ষমতা নেই। এমনকি সমগ্র মানবজাতি ও জিনজাতি মিলেও যদি আল্লাহ তা‘আলার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে চায় তবুও তারা সক্ষম হবে না। বরং ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সকলক্ষেত্রেই বিশ্বজগতের প্রতিটি প্রাণীকে মহান আল্লাহর একক অধিপত্য ও ক্ষমতার ভেতরেই থাকতে হবে এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে।^{৪৩}
৪. আল্লাহ তা‘আলা হলেন একমাত্র উপাস্য। সকল ইবাদত-বন্দেগি ও উপাসনা-আরাধনা পাওয়ার একক উপযুক্ত সত্তা। তিনি ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করা যাবে না। কুরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতে তিনি এ বিষয়ে মানবজাতিকে সতর্ক করেছেন। যারা এমন ঘৃণ্যকর্ম সম্পাদন করবে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, সে কথাও জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا^{৪৪}

‘আল্লাহর সাথে অন্যকোন উপাস্য স্থির কর না। তাহলে নিন্দিত ও (আল্লাহর রহমত হতে) বিতাড়িত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।’

আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কাউকে উপাস্য মনে করা; মানুষের ভাল-মন্দ ও কল্যাণ-অকল্যাণের ক্ষমতা রাখে এমন বিশ্বাস নিয়ে তাদের উপাসনা-আরাধনা করা মানবজাতির মর্যাদা ও সম্মানহানিকর কর্মও বটে। কেননা মানুষ হল সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাদের মাথা কেবল আল্লাহর সামনেই নত হবে, প্রার্থনার হাত শুধুমাত্র তাঁর

নিকটেই পেশ করা হবে।^{৪৫} সুতরাং কোনো ব্যক্তি উপরে বর্ণিত তিনটি বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখার পর ইবাদতের ক্ষেত্রে যদি আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করে তবে সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। মুমিন হতে হলে অবশ্যই তাকে শুধু আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে। কোনো ভাবেই তার সাথে অন্য কারো ইবাদাত করা যাবে না।^{৪৬}

ঈমান ও তাওহীদের মূলবিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে 'আলী তানতাবি আরও বলেন :

وهذه الأسس تتلخص في أن يعتقد أن هذا العالم المادي ليس كل شيء، وأن هذه الحياة الدنيا ليست هي الحياة كلها. فالإنسان كان موجودا قبل أن يولد وسيظل موجودا بعد أن يموت، وأنه لم يوجد نفسه، بل وجد قبل أن يعرف نفسه، ولم توجد هذه الجمادات من حوله، لأنه عاقل ولا عقل لها، بل أوجده وأوجد هذه العوالم كلها من العدم إله واحد، هو وحده الذي يحيي ويميت، وهو الذي خلق كل شيء، وإن شاء أفنائه، وذهب به، وهذا الإله لا يشبه شيئا مما في العوالم، قديم لا أول له، باق لا آخر له.^{৪৭}

'ইসলামের মূলনীতিগুলোর মাঝে একটি হল, একজন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে হবে যে, এই ধ্বংসশীল পৃথিবী-ই সবকিছুর মূল নয়। এই পার্থিব জীবন-ই শেষ জীবন নয়। মানুষ জন্মগ্রহণের পূর্বেও বিদ্যমান ছিল এবং মৃত্যুবরণের পরও বিদ্যমান থাকবে। (অর্থাৎ বিশ্ব জগতের বাইরে আরেকটি জগত রয়েছে। জন্মের পূর্বেই যে জগতে মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল এবং তাদের মৃত্যুর পরও সে জগতে তাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে।) মানুষ নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করেনি। বরং মানুষকে এবং তার আশেপাশে বিদ্যমান সবকিছুসহ এই বিশ্বজগতকে একজন ইলাহ সৃষ্টি করেছেন ও অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই (আল্লাহ তা'আলা) একমাত্র সত্তা, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন বা অস্তিত্বে এনেছেন। তিনি যদি চান তবে তা বিনাশ করতে পারেন এবং অস্তিত্বহীন করতে পারেন। আর এই সেই ইলাহ যা সৃষ্টিজগতের কোন কিছুর সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোন শুরু নেই। তিনি চিরস্থায়ী, তাঁর কোন শেষ নেই।'

আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। তিনি পরম পরাক্রমশীল। অপারগতা ও সসীমতা থেকে তাঁর সত্তা পূতপবিত্র। ভূমণ্ডল ও নভমণ্ডলের কোন কিছুই তাঁর জন্য অসম্ভব নয়। দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোন কিছুই তার জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান। তিনি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ। তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিই কল্যাণকর ও সুপরিমিত। আল্লাহর যত সৃষ্টি রয়েছে, তার মাঝে শুধুমাত্র মানুষেরই বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে। তাদের জন্য তিনি কিছু কল্যাণকর বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যারা তা পালন করবে তারা পার্থিব জীবন শেষে চিরস্থায়ী জীবনে সাফল্য ও জান্নাত লাভ করবে। আর যারা তা উপেক্ষা করবে তারা শাস্তিদায়ক ও লাঞ্ছকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।^{৪৮}

পরকালীন জীবন প্রসঙ্গ

পরকাল বলতে মৃত্যু পরবর্তী জীবনকে বুঝায়। ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিশ্বাস হল পরকাল বা মৃত্যু পরবর্তী জীবন। শরঈ দৃষ্টিকোণে কবর, হাশর, মিয়ান, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নামের সমন্বয়ই হল পরকালীন জীবন। পার্থিব জীবনের কর্মকাণ্ড ও আমলনামার ভিত্তিতেই পরকালীন জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ণয় হবে। ইসলামে ইহকালীন সাফল্যের চেয়ে পরকালীন সাফল্যের গুরুত্ব বেশি। কুরআনুল কারিমে পরকালীন মুক্তি লাভ ও চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশকে প্রকৃত সফলতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ رُخِّجَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ^{৪৯}

‘যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করল এবং জান্নাতে প্রবেশ করল, সেই প্রকৃত সফলতা লাভ করল। পার্থিব জীবন তো ধোঁকা ও প্রবঞ্চণার বস্তু বৈ কিছু নয়।’

মৃত্যু এক অবধারিত সত্য ও অবশ্যম্ভাবী বিষয়। পৃথিবীর সকল ধর্ম, জাতি, গোত্র, গোষ্ঠী এই অমোঘ সত্য বিষয়টি বিশ্বাস করে। আন্তিক-নাস্তিক কেউ আজ পর্যন্ত এই ধ্রুব সত্য বিষয়টি অস্বীকার বা অবিশ্বাস করতে পারেনি। প্রতিটি প্রাণীকেই কোন না কোনদিন মৃত্যুর স্বাদ আশ্বাদন করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَيُّمَّا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةٍ^{৫০}

‘তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের পাকড়াও করবেই, যদিও তোমরা কোন সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।’

প্রতিটি মানবসত্তাকেই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, চেতনে-অচেতনে মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন ক্ষণিকের জন্য হলেও ভাবিত ও তাড়িত করে। তারপরও দুনিয়ার শান-শওকত, চাকচিক্য ও জৌলুস দেখে অনেকেই মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের কথা ভুলে যায়। পার্থিব সফলতার পিছনে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সমাজিক মর্যাদার লোভ যেন পরকালীন জীবন সম্পর্কে আত্মবিস্মিত ও অনাবিষ্ট করে তোলে। সমাজে এমন মানুষের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়, যারা ভাবে যা অতীত হয়ে গেছে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। আর সামনে যে ভবিষ্যত আছে তা সর্বদা ভবিষ্যত রূপেই থাকবে, কখনো বর্তমান ও বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে সামনে আসবে না। ফলে ঐ ভবিষ্যতের জন্য পাথের সংগ্রহ ও কোনরূপ প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনবোধ করে না। আবার এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যারা মনে করে যে, মৃত্যু অবধারিত ও অবশ্যম্ভাবী সত্য এবং তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ নেই, জীবনটাও যেহেতু স্বল্প সময়ের এবং তা চিরস্থায়ী নয়। তাই যতদিন বাঁচা যায় তাতে চিন্তা-বিনোদন, মনোরঞ্জন ও খেল-তামাশায় মত্ত থেকে জীবনকে উপভোগ করাই শ্রেয়।

মৃত্যু প্রসঙ্গে এমন বিচিত্র চিন্তাধারা ও কুসংস্কার সমাজে বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে। প্রাচীন ধর্মগুলোতেও মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে নানাকথা বলা হয়েছে। ইসলামি বিশ্বাস মতে, মৃত্যু মানেই শেষ বা পরিসমাপ্তি নয়। বরং মৃত্যুর মধ্যদিয়ে একজন ব্যক্তি অনন্তকালের পথে যাত্রা শুরু করে। পার্থিব জীবন তো নিসক নিদ্রার ঘোরে দেখা স্বপ্নের মত। নিদ্রা ভঙ্গের মধ্যদিয়ে যেমন স্বপ্নজগতের পরিসমাপ্তি ঘটে, অনুরূপ মৃত্যুর মাধ্যমে ইহকালীন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যু হলেই কেবল একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে, এর মাধ্যমে কত দীর্ঘ ও চিরস্থায়ী জীবনের সূচনা হয়! শ্রুষ্ঠা প্রদত্ত বিধিবিধান পালন ও উত্তমকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি এ চিরস্থায়ী জীবনে সুখের জান্নাত লাভ করবে। আর অবিশ্বাসী ও দুষ্কৃতিকারীরা অপমানিত ও লজ্জিত অবস্থায় চিরস্থায়ী কষ্টের নরক রাজ্য জাহান্নামে নিষ্ফিণ্ড হবে।^{৫১}

পরকালীন জীবনই প্রকৃত জীবন। পরকালীন সুখই আসল সুখ। আর পরকালীন কষ্ট ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতিই হল প্রকৃত দুর্ভাগ্য। যে ব্যক্তির বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা কম; জ্ঞান-বুদ্ধি স্বল্প, সে হয়ত পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। তবে যে ব্যক্তির যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি রয়েছে, সে সহজেই মানবজীবনের বৈচিত্র্যময় স্তরগুলো অনুধাবন করতে পারে, যা যুগের পরিক্রমার সাথে সম্পৃক্ত। এমন একসময় ছিল যখন তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। সে একটি সুদীর্ঘসময় রহের জগতে অবস্থান করেছে। সেখান থেকে প্রথমে পিতার গর্ভে, তারপর মাতৃগর্ভে একটি নির্ধারিত সময় অবস্থানের পর এই পৃথিবীর আলো-বাতাসে তার আগমন ঘটেছে। কোন ব্যক্তি যদি মাতৃগর্ভের অন্ধকার গহ্বরে অবস্থানরত দিনগুলো নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে তার ভাবনার দুয়ার প্রসারিত হবে এবং পরকালীন জীবনের ব্যাপারে একটি ধারণা লাভ করবে।

কেননা মাতৃগর্ভে আলো-বাতাস, অক্সিজেন ও খাদ্যের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ এগুলো ব্যতিত দুনিয়াতে বাঁচার কথা ভাবাই যায় না। তাহলে সেখানে কী করে বেঁচে ছিল সে? মূলত আল্লাহ তা‘আলা এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় মাতৃগর্ভে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং অন্ধকার গহ্বর থেকে আলো-বালমল বিস্তৃত জগতে নিয়ে এসেছেন। এই জগত হল দুনিয়ার জগত। প্রথমে অস্তিত্বহীন, এরপর মাংসপিণ্ড এবং মৃত্যুবস্থা থেকে বের হয়ে এলেও আমরা কিন্তু এটাকে কখনো মৃত্যু বলি না, বরং বলি এটা হল জন্ম। অনুরূপ মানুষ মৃত্যুবরণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে নতুন এক জগতে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে মৃত্যুটা হল নতুন জগতে প্রবেশের এক বিশেষ প্রক্রিয়া। সেই জগত-ই পরকালীন জীবন। যে জীবন চিরস্থায়ী, একবার শুরু হলে কখনোই তা শেষ হবে না। এই পরকালীন জীবনের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করাও মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত।^{৫২} আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ^{৫৩}

‘আর তারা আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।’

রাসূল (স.) ইরশাদ করেছেন :

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^{৫৪}

‘ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।’

ইসলামিক স্ফলারগণ কুরআন-হাদিস বিশ্লেষণ করে পরকালীন জীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে থাকেন। কবর তথা আলমে বরযখ, কিয়ামত, হাশর, মিয়ান, পুলসিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম। মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত কবর জগতে অবস্থানকালকে আলমে বরযখ বলা হয়। ইসরাফিল (আ.) এর শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে সৃষ্টিজগত ধ্বংস-ই হল কিয়ামত। মানবজাতিকে বিচারের জন্য কবর থেকে উঠিয়ে একত্রে সমবেত করার নামই হাশর। কুরআনুল কারিমের বহুস্থানে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের সাথে পরকালীন জীবনের প্রতি ঈমান আনার উল্লেখ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য নির্দেশ করে।

কিয়ামত পরকালীন জীবনের একটি বিশেষ পর্যায়। এই দিনটি সুনির্দিষ্ট ও সুনির্ধারিত। তবে এর জ্ঞান শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটই রয়েছে। এমনকি কিয়ামত সংঘটনের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাও এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না। এটি আকস্মিকভাবে সংঘটিত হবে। কুরআনুল কারিমে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفْعِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً^{৫৫}

‘তারা তোমার কাছে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও এ জ্ঞান তো রয়েছে আমার প্রভুর কাছে। এর সময় আসার আগে তিনি তা প্রকাশ করবেন না। তবে আকাশমণ্ডল ও জমিনের জন্য সেদিন তা হবে একটি ভয়াবহ ঘটনা। এটি তোমাদের কাছে আসবে একান্তই আকস্মিকভাবে।’

কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনটি সুনির্দিষ্টভাবে জানা না গেলেও তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে। এসকল নিদর্শনগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য হল দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব এবং ইয়াজুজ মাজুজের আগমন। ইসরাফিল (আ.) এর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটন শুরু হবে। সেদিন পৃথিবী প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হবে। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে। সারা বিশ্বের সবকিছুই ধূলিকণার ন্যায়

উড়তে থাকবে। এভাবে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তা‘আলা এ বিশ্বজগতকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সকলকে পুনোরুত্থিত করে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে স্বাক্ষর প্রমাণের ভিত্তিতে তাদের বিচার ও ফায়সালা করবেন। ঐদন যারা কৃতকার্য হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যারা অকৃতকার্য হবে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আর যাদের পাপ-পুণ্য সমান হবে, তাদের অবাসস্থল হবে আরারফ।^{৫৬}

তাকদির ও নিয়তি প্রসঙ্গ

তাকদির ‘কাদরুন’ (قَدْرٌ) মূলধাতু থেকে উৎকলিত। অর্থ পরিমাপ করা, পরিমাণ করা, নির্ধারণ করা, সীমানির্ণয় করা, নিয়তি, ভাগ্য ইত্যাদি।^{৫৭} এই বিশ্বচরাচরে সংঘটিত প্রতিটি বিষয়ই প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা লওহে মাহফুজে সুনির্ধারিত করে রাখার নামই তাকদির। ‘কাওয়ায়িদুল ফিকহি’ গ্রন্থ প্রণেতা তাকদিরের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন :

هو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد من حسن و قبح و نفع و ضرر و ما يحويه من زمان و مكان وما يترتب عليه من ثواب و عقاب^{৫৮}

‘সমুদয় সৃষ্টির ভাল-মন্দ, উপকার-ক্ষতি ইত্যাদি সবকিছুর স্থান-কাল এবং এসবের শুভ-অশুভ পরিণাম ও পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত, এই বিশ্বাসের নামই তাকদির।’

তাকদিরে বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। তাকদির এমন এক নীতি ও পদ্ধতি, যার উপর আল্লাহ তা‘আলা এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। যে নীতির উপর ভিত্তি করেই তা টিকে রয়েছে এবং যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি সবকিছু পরিমিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুর সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। সৃষ্টজীবের কেউ হাজার চেষ্টা করলেও সেই সীমা কখনো অতিক্রম করতে পারবে না। আর কোনো কিছু সৃষ্টির আগেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সীমা নির্ধারণ করে থাকেন। এই সীমার ভেতরে রয়েছে- সে কবে পৃথিবীতে আগমন করবে; কবে পরলোক গমন করবে; কী খাবে; কী পড়বে; কতদিন হায়াত পাবে; কীভাবে প্রতিপালিত হবে; কতদিন বেঁচে থাকবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সৃষ্টজীব যা কিছু করবে তার কোনো কিছুই এই সীমার বাইরে নেই। সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهَا شَيْءٌ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَاتٍ الْأَرْضِ وَلَا أَرْضٍ وَلَا رَاطِبٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ^{৫৯}

‘সকল অদৃশ্য বিষয়ের চাবি তাঁর (আল্লাহর) কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া তা কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে এসকল বিষয়ে তিনি অবগত রয়েছেন। (গাছ থেকে) যে পাতাটি পড়ে তাও তাঁর জানা আছে। আবার ভূমির অন্ধকারে যে শস্যদানাটি কিংবা যে ভেজা ও শুষ্ক বস্তুটি আছে তাও একটি স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।’

রাসূল (সা.) বলেন- ‘আল্লাহ যা প্রদান করেছেন, তা রোধ ও বারণ করার কেউ নেই। আর যা তিনি বারণ ও রোধ করবেন, তা প্রদান করার ক্ষমতা ও সাধ্য কারো নেই। এক্ষেত্রে কোন ক্ষমতাবান ও প্রভাবপ্রতিপত্তিশীল ব্যক্তি কোন কাজে আসবে না।’^{৬০}

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদিও সকল সৃষ্টজীবের তাকদির নির্ধারণ করে রেখেছেন। তথাপিও তাদেরকে তিনি সেই তাকদিরের একেবারে অনুগামী করে দেননি। বরং তাদের মাঝে ইচ্ছের স্বাধীনতা দিয়েছেন।

তাই মানুষ ইচ্ছে করলে ভালো কাজ যেমন করতে পারে; তেমনি ইচ্ছে করলে মন্দ কাজও করতে পারে। তার ভাগ্যে ভালো কাজ লেখা আছে না মন্দ কাজ তা কিন্তু মানুষের জ্ঞানের বাইরে। তা কেবল আল্লাহ জানেন। তাই মানুষকে সব সময় ভালো কাজের জন্য চেষ্টা করতে হবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। ইচ্ছের স্বাধীনতা থাকার কারণেই মানুষ যদি মন্দকাজ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন। আর যদি ভালো কাজ করে তাহলে তাকে পুরস্কৃত করবেন।^{৬১} হাদিসে বর্ণিত আছে :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كِتَابَانِ، فَقَالَ : أَنْتَذِرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ فَقُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ. ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِعَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيُّ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيُّ عَمَلٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ فَتَبَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَعَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ قَرِيبٌ فِي الْجَنَّةِ وَقَرِيبٌ فِي السَّعِيرِ.^{৬২}

‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (স.) একদিন তাঁর দুই হাতে দু’টি কিতাব নিয়ে বের হয়ে আসলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কি বলতে পারো এই দু’টো কি? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জানি না, আপনি আমাদেরকে বিষয় দুটি জানিয়ে দিন। তখন রাসূল (স.) তাঁর ডান হাতের কিতাবের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি কিতাব। এতে সকল জান্নাতবাসীদের নাম, তাদের বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নামের শেষে সর্বমোট সংখ্যাও যোগ করা আছে। আর এতে কোনরূপ কম বেশি করা হবে না। তারপর রাসূল (স.) তাঁর বাম হাতে থাকা কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটিও আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কিতাব। এই কিতাবে সকল জাহান্নামীদের নাম ও তাদের বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই কিতাবের সর্বশেষ ব্যক্তির নামের শেষেও সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা আছে। এতেও কম বেশি করার কোনো সুযোগ নেই। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! বিষয়টি যদি এরূপ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েই থাকে, তবে আমল করার কি প্রয়োজন? রাসূল (স.) বললেন, তোমরা সঠিক পথে থেকে ঠিক ভাবে আমল করতে থাকো এবং নৈকট্য লাভের চেষ্টা অব্যাহত রাখো। কারণ জান্নাতবাসীদের অন্তিম আমল জান্নাতের অধিবাসীদের আমলের অনুরূপই হবে, পূর্বে সে যে আমলেই লিপ্ত থাকুক না কেন? এমনিভাবে জাহান্নামবাসীদের অন্তিম আমল জাহান্নামের অধিবাসীদের আমলের মতই হবে। পূর্বে সে যে আমলেই লিপ্ত থাকুক না কেন? এরপর রাসূল (স.) কিতাব দুটি রেখে দুই হাতে ইশারা করে বললেন, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দাদের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলেছেন। অতএব এক দল জান্নাতে যাবে, অন্য দল জাহান্নামে যাবে।’

নারী অধিকার প্রসঙ্গ

ইসলাম আগমনের পূর্বে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয় ও করুণ। সমাজে তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ঐশী জ্ঞানের অভাব ও সামাজিক কুসংস্কার নারীদেরকে ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করেছিল। তাদেরকে পিতা ও স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা হত না। কন্যা সন্তান জন্মদানকে তৎকালীন সমাজের লোকেরা লজ্জাকর ও অসম্মানজনক বিষয় মনে করত। অপমান ও লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে তারা কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করার মত নিষ্ঠুর ও অমানবিক পথ বেছে নিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ . بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

‘আর যখন জীবন্ত প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে- কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?’ সূরা তাকবির, আয়াত: ৮-৯।

ইসলাম আগমনের পর নারীদের সামাজিক ও মানবিক সকল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সৎকর্ম সম্পাদনকারী পুরুষ কিংবা নারী যেই হোক না কেন তাকে উত্তম প্রতিদানের কথা ব্যক্ত করে আল্লাহ তা‘আলা ঘোষণা করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্য হতে যে কেউ সৎকাজ ও নেক আমল করবে, আমি তাকে নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।’ সূরা নাহাল, আয়াত: ৯৭।

‘আলী তানতাবি রচিত ‘আল ইসলাম ও মারআহ’ নারী অধিকার বিষয়ক একটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে তিনি ইসলামে নারী অধিকারের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন, এবং কল্যাণকর সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি নারী অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শুরুতেই রাসূল (স.) এর বিদায় হজ্জের ভাষণের একটি অংশকে উদ্ধৃত করেন। রাসূল (স.) বলেন- ‘তোমরা নারীদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গলকামী হও, তারা তো তোমাদের কাছে দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্তের ন্যায়। তারা প্রকাশ্য কোনো অশ্লীল কাজ না করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো অধিকার তোমাদের নেই। তবে প্রকাশ্য কোনো অশ্লীল কাজ যদি তারা করেই ফেলে তাহলে তাদের বিছানা আলাদা করে দাও। এরপরও যদি তারা সংশোধন না হয়, তাহলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার করো, এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তাহলে তাদের আর কষ্ট দিও না। জেনে রেখো, তোমাদের যেমন নারীদের উপর অধিকার আছে তেমনি নারীদেরও তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে। নারীদের উপর তোমাদের অধিকার হল, তোমরা যাকে অপছন্দ করো তাকে তোমার বিছানায় বসতে দিবে না এবং তাদেরকে তোমার গৃহে প্রবেশের অনুমতি দিবে না। আর তোমাদের উপর নারীদের অধিকার হল- তোমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, ভালোভাবে তাদের পোশাক-আশাক ও খাবারের ব্যবস্থা করবে।’^{৬৭} এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ‘আলী তানতাবি বলেন :

أن الزواج شركة، تقوم على تبادل الحقوق، وكما أن كل شركة لا بد لها من رئيس، فالرياسة في هذه الشركة للرجل، وله الحق في إدارة سياسة البيت، ولا يجوز لها أن تخالفه فيها، وعليه في مقابلة ذلك، أن يقوم بنفقاتها، ونفقات البيت، وليس مكلفة أن تنفق على نفسها، ولو كانت تملك عشرة آلاف وكان هو عاملاً أو موظفاً صغيراً.^{৬৮}

‘বিয়ে হল অনেকটা অংশীদারীর ভিত্তিতে পরিচালিত জীবনের গৌরবময় অধ্যায়। যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কিছু ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। যা একজনের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে থাকে। আর দাম্পত্যজীবনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা পুরুষকে নেতৃত্ব প্রদানের অধিকার দিয়েছেন। তাই গৃহে স্ত্রীর জন্য পুরুষের নেতৃত্ব স্বীকার করার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আর স্বামীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার বিনিময়েই মূলত স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভারের দায়িত্ব স্বামীকে দেওয়া হয়েছে। স্ত্রী নিজের খরচ নিজে বহন করতে বাধ্য নয় যদিও সে কোটিপতি হয়, আর স্বামী একজন সাধারণ কর্মচারী কিংবা সামান্য বেতনের চাকুরিজীবী হয়।’

আধুনিক যুগে এসেও অনেক কর্তৃত্ববাদী পুরুষ স্ত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করে। তাদের সাথে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করে। রাসূল (স.) এই ঘৃণ্যকর্ম থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন অনেক পুরুষও রয়েছে, যারা সামান্য ভুল-ত্রুটি পেলেই স্ত্রীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে একাজটিও

সঠিক নয়। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি স্ত্রীর মাঝে সামান্য দোষ পেলেই যেন বিবাহবিচ্ছেদ না ঘটায়। কারণ কোনো ব্যক্তিই সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ নয়। কোন কোন দিক থেকে অপূর্ণতা রয়েছেই। একদিকে স্ত্রীর যেমন সামান্য কিছু দোষ রয়েছে, অন্যদিকে তার তো তেমন গুণও রয়েছে। তাই স্ত্রী রাগান্বিত হলে কিংবা কোনো অসদাচরণ করলে কখনোই তার সাথে দুর্ব্যবহার করা উচিত নয়। বরং তার দোষগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে।^{৬৫}

গাইরে মাহরাম রমণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও তাদের অধিকার লঙ্ঘনের নামান্তর। এ বিষয়টি বুঝাতে গিয়ে তিনি ‘আলী (রা.) কে উদ্দেশ্য করে বলা রাসূল (স.) এই নিম্নোক্ত হাদিসটি উপস্থাপন করেন। রাসূল (স.) বলেন- ‘হে ‘আলী! কোনো গাইরে মাহরাম রমণীর উপর একবার দৃষ্টি পড়ে গেলে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি দিও না। কারণ প্রথমবার অসতর্কতায় দৃষ্টি পড়াকে ক্ষমা করা হলেও দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।’^{৬৬} এরপর ‘আলী তানতাবি আরও বেশকিছু হাদিস উল্লেখ করেন। যাতে নারীর অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

আমানত প্রসঙ্গ

‘আমানত’ আরবি শব্দ। অর্থ গচ্ছিত রাখা, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা, নিরাপদ রাখা। ইসলামি পরিভাষায় কোন ব্যক্তির নিকট অর্থ-সম্পদ, তথ্য কিংবা অন্যকিছু গচ্ছিত রাখার নামই আমানত। যার নিকট আমানত রাখা হয় এবং তিনি গচ্ছিত রাখা জিনিস যথাযথভাবে তার যোগ্য ও প্রকৃত প্রাপকের নিকট ফিরিয়ে দেন, তাকে বলা হয় আমানতদার। আমানত রক্ষা করে তা মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়া ঈমানের পরিচায়ক। আমানতের বিপরীত শব্দ খিয়ানত। রাসূল (স.) খিয়ানত করাকে মুনাফিকের নিদর্শন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।^{৬৭} ইসলাম আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.^{৬৮}

‘আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানতসমূহ তার প্রাপকদের কাছে ফিরিয়ে দাও।’

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.^{৬৯}

‘তোমরা অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কর না এবং মানুষের ধন-সম্পদের কিয়দংশ জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকের নিকট পেশ কর না।’

রাসূল (স.) আমানত রক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন :

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ اسْتَمْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.^{৭০}

‘তোমার কাছে কেউ আমানত রাখলে সে আমানত তাকে ফিরিয়ে দাও। আর কেউ যদি তোমার রাখা আমানতের খেয়ানত করে তবুও তার রাখা আমানতের খেয়ানত করো না।’

মানব চরিত্রের একটি ইতিবাচক ও মহৎ গুণ হল আমানতদারিতা। এর দ্বারা উন্নত ও মানবকল্যাণ নির্ভর সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সহজ হয়। ‘আলী তানতাবি আমানতদারিতাকে মানব চারিত্রিক মূল গুণ ও উন্নত চরিত্রের মূলভিত্তি হিসেবে অবহিত করেছেন। তিনি গচ্ছিত সম্পদকে তার মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়াকে আমানতদারিতার একটি পদ্ধতি বলে উল্লেখ করেছেন। আমানত রক্ষার আরও অনেক দিক ও পদ্ধতি রয়েছে। যা রক্ষা করা একজন মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। যেমন- রাষ্ট্র, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট আমানত। এক্ষেত্রে তিনি যদি তার

ব্যত্যয় ঘটান তবে তা থিয়ানত বলে বিবেচিত হবে। বিচারকের নিকট বাদী-বিবাদীর মামলা-মোকাদ্দমার রায় বা ফায়সালা হল আমানত। তিনি যদি অন্যায়ভাবে পক্ষপাতিত্ব করে রায় প্রদান করেন তাহলে তা হবে আমানতের থিয়ানত। শ্রমিকের নিকট মালিকের কার্যসম্পাদন করা আমানত। কাজের ক্ষেত্রে সে যদি সামান্য পরিমাণ অবহেলা করে কিংবা যেভাবে করা দরকার সেভাবে না করে তাহলে তা হবে থিয়ানত। এমনিভাবে মানুষেরা আমার ও আপনার প্রতি ভালো মানুষ হওয়ার যে বিশ্বাস পোষণ করে সে বিশ্বাসটাও আমানত। আমরা যদি এই বিশ্বাসকে অর্থোপার্জনের মাধ্যম বানানো শুরু করি তাহলে তা হবে আমানতের থিয়ানত। আরো সহজ করে বলতে গেলে, মানুষের হাতে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুই আমানত। চোখ আমানত, চোখ দিয়ে হারাম কিছু দেখাটাও থিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। হাত, পা, জিহ্বা এমনকি মানুষের পুরো জীবনটাই আল্লাহর দেয়া আমানত। এর দ্বারা যদি অন্যায় কিছু করে; জীবনের সামান্য মুহূর্তও যদি এমন কাজে ব্যয় করে যেকাজে তিনি সন্তুষ্ট নন, তাহলে সেটাও একপ্রকারের খেয়ানত। বর্তমান সমাজের অনেক মুসলিম ব্যক্তিই আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে সচেতন নন। পার্থিব উন্নতি ও সম্পত্তি লাভের মোহ তাদের অন্ধ করে দিয়েছে। কারো সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে তারা উদাসীন। কথা বলার ক্ষেত্রে আমানতদারিতার লেশমাত্র নেই। আর এটা শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, উঁচু-নিচু সকল স্তরের মানুষেরই একই অবস্থা। যা সুন্দর সমাজ গঠন ও নিরাপদ পৃথিবী বিনির্মাণের ক্ষেত্রে মস্তবড় অন্তরায়। তাই ‘আলী তানতাবি তার ‘ফি সাবিলিল ইসলাম’ শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক-সাহিত্যিক, কবি-সাংবাদিক থেকে নিয়ে দেশের সর্বস্তরের মানুষকে আমানত রক্ষার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান।^{৭১}

মূলত প্রতিটি ব্যক্তির পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কতিপয় দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আর এসকল দায়িত্ব ও কর্তব্যই হল আমানত। ইমাম কুরতুবি (রহ.) এর মতে, ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমানতদারিতার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। রাষ্ট্র ও দেশ পরিচালনা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার পরিচালনা, হাসপাতালে সেবাদান, ব্যবসা-বাণিজ্য, অধীনস্তদের সাথে কথা-বার্তা ও তাদের পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রেও আমানত রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন দায়িত্বশীল প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার এ সকল ক্ষেত্রে আমানত রক্ষার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) বলেন- ‘তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কতটা যত্নবান ও আন্তরিক সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।’^{৭২}

আমানত রক্ষার মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তির ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন হয়। এর মাধ্যমে তিনি লোকদের মাঝে সম্মান ও মর্যাদার পায়ে পরিণত হন। আমানত রক্ষা করা তাকওয়া বা খোদাভীতি লাভেও সহায়ক হয়। অন্যের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জিত হয় এবং এর মাধ্যমে চিরস্থায়ী জান্নাতের পথ সুগম হয়। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^{৭৩}

‘(আর যারা আমানত রক্ষা করে) তারা জান্নাতুল ফেরদাউস নামক উদ্যানের অধিকারী হবে এবং সেখানে তারা চিরস্থায়ী ভাবে অবস্থান করবে।’

রিয়ক প্রসঙ্গ

‘রিয়ক’ আরবি শব্দ। অর্থ জীবিকা, খাদ্য, সম্পদ-সম্পত্তি।^{৭৪} সাধারণ অর্থে প্রাণীকূল আহার্যরূপে যা গ্রহণের মাধ্যমে শারীরিক শক্তি সঞ্চয়, জীবন রক্ষা ও পার্থিব প্রয়োজন মিটায় তা-ই রিয়ক। কুরআনে রিয়ক শব্দটি ব্যাপকঅর্থে ব্যবহার হয়েছে। রিয়ক বলতে সাধারণত খাদ্যসামগ্রীকে বুঝানো হলেও তা শুধুমাত্র খাদ্য-

পানীয় ও পোশাক-আশাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং জীবনধারণের প্রতিটি বিষয়ই রিয়কের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্বেই প্রত্যেকের রিয়ক সুনির্ধারিত করে দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল প্রাণী তাদের জন্য নির্ধারিত জীবিকা গ্রহণের মাধ্যমে জীবন-যাপন করে। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ^{৭৫}

‘আর ভূপৃষ্ঠে এমন কোন প্রাণী নেই, যাদের রিয়কের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে নেই। (অর্থাৎ পৃথিবীর সকল প্রাণীর রিয়ক প্রদানের দায়িত্ব আল্লাহর যিম্মায়)। আর তিনি প্রত্যেকের দীর্ঘ অবস্থানের স্থান এবং অল্প অবস্থানের স্থানকে জানেন। এসবই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।’ আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ^{৭৬}

‘যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির উপায় বের করে দেন এবং তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে রিয়ক দান করেন।’

মানুষ পৃথিবী আগমনের পূর্বেই আল্লাহর তা'আলা বান্দার রিয়ক নির্ধারণ করে রেখেছেন। এমন কি কোন ব্যক্তি যখন মায়ের গর্ভে অবস্থান করে তখন তিনি ঐ ব্যক্তির আয়ুষ্কাল কেমন হবে, তার রিয়কের কি পরিমাণ হবে, তা নির্ধারিত করে দেন। এ প্রসঙ্গে আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে। রাসূল (স.) বলেন :

وَكَلَّمَ اللَّهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ نُطْفَئُ أَيُّ رَبِّ عُلْفَةُ أَيُّ رَبِّ مُضْغَةٍ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ أَيُّ رَبِّ أَذْكَرٌ أَمْ أَنْثَى أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ^{৭৭}

‘আল্লাহ মাতৃগর্ভে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, হে প্রতিপালক! এটি বীর্য। হে প্রতিপালক! এটি রক্তপিণ্ড। হে প্রতিপালক! এটি গোশতপিণ্ড। আল্লাহ যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান, তখন ফেরেশতা বলেন, হে প্রতিপালক এটি নর হবে নাকি নারী? এটি দুর্ভাগা হবে, নাকি ভাগ্যবান? আর তার রিয়ক কি পরিমাণ হবে? তার জীবনকাল কত হবে? তখন আল্লাহর নির্দেশ মত তার মায়ের পেটে থাকাকালে ঐ রকমই লিখে দেয়া হয়।’

বান্দার রিয়ক আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বনির্ধারিত। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে ‘আলী তানতাবী বলেন, বান্দার রিয়ক পূর্বনির্ধারিত ও সুপরিমিত। তবে তা অনুসন্ধান লাভের মাধ্যমেই তা হস্তগত হয়। সাধারণত বিনা অনুসন্ধানে রিয়ক ব্যক্তির হস্তগত হয় না। আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগত সৃষ্টির বহুকাল আগেই সকল প্রাণীর রিয়ক নির্ধারণ ও লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবে সবার রিয়ক আল্লাহ একই স্থানে রাখেননি। একেক জনের রিয়ক একেক স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন পেশায় রয়েছে। কারো রিয়ক বিমান চালনায়; কারো কৃষিকাজে, কারো লাইব্রেরীতে; কারো গাড়ির ড্রাইভারিতে; কারো রান্নাঘরে; কারো শিক্ষকতায় কিংবা অন্য কোনো পেশায়। রিয়ক নির্ধারণ করার পর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বলেননি, তোমরা বসে থাকো, রিয়ক এমনি এমনি তোমাদের কাছে চলে আসবে। বরং বলেছেন তোমরা রিয়ক অনুসন্ধান কর।^{৭৮}

কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{৭৯}

‘আর সালাত আদায়ের পর তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিয়ক) তালাশ কর। আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।’

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা 'উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রিয়ক অনুসন্ধানের ব্যাপারে বলেন : 'তোমরা কেউ-ই রিয়ক অনুসন্ধান না করে অলস বসে থাকো না। আর একথা বলো না যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে রিয়ক দাও। আল্লাহ আকাশ থেকে কখনো স্বর্ণ-রোপার বৃষ্টি বর্ষণ করেন না, বরং একজনের মাধ্যমে অন্যজনকে রিয়কের ব্যবস্থা করে থাকেন।'^{৮০} সুতরাং রিয়ক অনুসন্ধান না করে অলস-অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকা যাবে না। বরং নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, পরিশ্রম ও দক্ষতা দিয়ে রিয়ক অন্বেষণ করতে হবে। আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস রাখতে হবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা ভাবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, রিয়ক যেহেতু পূর্ব নির্ধারিত, তাই আমাকে কিছুই করতে হবে না। এটি তকদিরের অপব্যখ্যা। ইসলামি আদর্শ পরিপন্থী কাজ। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এবং রিয়কের অনুসন্ধান করে তবে আল্লাহ অবশ্যই উত্তম রিয়ক ও জীবিকার পথ সহজ করে দিবেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল (স.) বলেন- 'যদি তোমরা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ভরসা রাখ, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পাখিকে রিয়ক প্রদানের ন্যায় রিয়ক দান করবেন। পাখি সকালবেলা খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।'^{৮১} এ হাদিসের দ্বারাও বুঝা যায় যে, রিয়ক অনুসন্ধানের জন্য পাখিকুল বাসা থেকে ভোরবেলায় বের হয়। আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা জমিনের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক বিচরণ করতে থাকে এবং খাদ্যের জন্য অনুসন্ধান চালায়। দিনশেষে আল্লাহ প্রদত্ত আহর্য্য গ্রহণের মাধ্যমে পরিতৃপ্ত হয়ে নীড়ে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে মানুষকেও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে রিয়কের অনুসন্ধান করতে হবে। অনেক বেশি পরিশ্রমী ও উদ্যমী হতে হবে। অবৈধ পথ পরিহার করে সৎ-হালাল ও বৈধ পথে নিজের শ্রম ও মেধা ব্যয় করতে হবে। ব্যবসায়ী হলে পণ্যে ভেজাল দেয়া যাবে না। কাউকে ধোঁকা দিয়ে ওজনে কম দেয়া যাবে না। খারাপ পণ্যের সাথে ভাল পণ্য মিশ্রণ করে বিক্রি করা যাবে না। বরং সততা অবলম্বন করে কিভাবে ব্যবসাকে সম্প্রসারণ করা যায় সে ব্যাপারে ব্যাপক পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে। চাকুরির ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি না করে নিজের কর্মদক্ষতা ও কার্যনিপুণতা প্রদর্শনের মাধ্যমে পদোন্নতির চেষ্টা করে যেতে হবে। আর আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখতে হবে। তারপরও যদি কখনো রিয়ক ও জীবিকার পথ সংকোচিত হয়ে যায় তবে দিশেহারা ও ধৈর্যহারা হওয়া যাবে না। বরং শান্ত ও স্থির থেকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এতে আশা করা যায়, অচিরেই আল্লাহর রহমতে জীবন-জীবিকা ও রিয়কের পথ প্রশস্ত ও বরকতময় হবে।'^{৮২}

উপসংহার

'আলী তানতাবি আধুনিক আরবি সাহিত্যের এক অনন্য অসাধারণ প্রতিভাধর ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। তিনি সিরিয়া, মিশর, সৌদি আরব, ইরাক ও কুয়েতসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের নামকরা ও প্রথম সারির জার্নালগুলোতে নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রায় সকল প্রবন্ধই গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। তার কিছু বিখ্যাত ও আলোচিত প্রবন্ধ সংকলন হল- মাকালাতুন ফি কালিমাত, ফি সাবিলিল ইসলাম, নূর ও হিদায়া, ফিকার ওয় মাবাহিস, মাআনাছ ইত্যাদি। এসকল প্রবন্ধে ইসলামি মূল্যবোধ ও মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। ইসলামি বিষয়গুলোকে তিনি সাধারণ মানুষের ভাষায় উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সুন্দর উপমা ও হৃদয়গ্রাহী উদাহরণের মাধ্যমে তিনি ইসলাম পরিচিতি, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও একত্ববাদ, তাকদিরে বিশ্বাস, পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাসসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী এবং জটিল-কঠিন মাসালাগুলো সহজ-সরল ও বোধগম্য ভাষায় গল্পছলে উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি সমাজিক জীবনপ্রবাহ, ইতিহাস, বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের জীবনীসহ বহুবিধে সাহিত্যচর্চা করে পরবর্তী প্রজন্মকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। বিশেষত শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুবকদের জন্য রেখে গেছেন এক বিশাল রচনা সম্ভার, যা আলোকবর্তিকা রূপে তাদেরকে সফলতা ও কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে চলছে। তার রচিত বহুনিষ্ঠ ও ব্যাপক সমাদৃত তেত্রিশটি গ্রন্থ, দশটি পুস্তিকা ও অসংখ্য প্রবন্ধ তাকে সমসাময়িকদের মাঝে এক অনন্য মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের

আসনে সমাসীন করেছে। তিনি বিংশ শতাব্দী একজন শীর্ষস্থানীয় আরবি সাহিত্যিক ও ইসলাম প্রচারক হিসেবে বিবেচিত হন। তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৯০ সালে ‘বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার’ লাভ করেন।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ‘আলী তানতাবি, যিকরায়াত, খ. ১ (জেন্দা : দারুল মানারা, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৩১।
- ^২ তানতাবি: তানতাবি বংশীয় উপাধি। শব্দটি প্রথমে ‘শানওয়ানি’ বা ‘শানাবি’ অথবা ‘মানশাবি’ ছিল। শব্দটির মৌলিকত্বের ব্যাপারে স্বয়ং ‘আলী তানতাবি-ই কিছুটা দ্বিধাশ্রিত। সময়ের ব্যবধানে শব্দটি বিভিন্ন রূপে পরিবর্তন হয়ে সর্বশেষ ‘তানতাবি’ রূপ গ্রহণ করে। আর এই শব্দটিই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে। মুহাম্মদ বিন মুস্তফা ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তানতাবি নামে পরিচিতি পান। তিনি ছিলেন মিশরের অধিবাসী। তিনি মিশরের রাজধানী কায়রোর নিকটবর্তী তানতা নামক জনপদে বসবাস করতেন। পারিবারিক সমস্যা ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য তিনি উসমানী শাসনামলে ১২৫৫ হিজরিতে সিরিয়ার দামিশকে আগমন করেন এবং এখানেই বসবাস শুরু করেন। দ্র. যিকরায়াত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪; মুজাহিদ মামুন দায়রানিয়া, ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা (দামিশক : দারুল কলাম, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৯।
- ^৩ শায়খ মুস্তফা তানতাবি: মুস্তফা তানতাবি একজন বিখ্যাত ফিকহশাস্ত্রবিদ, শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তাকে সমসাময়িকদের মাঝে একজন অন্যতম প্রধান মুফতি হিসেবে অভিহিত করা হতো। ইসলামি শরীয়াহ সংক্রান্ত অনেক আধুনিক জটিল সমস্যা ও মাসআলার ব্যাপারে অবগত হওয়ার জন্য লোকেরা তার দারস্ত হত। তিনি কুরআন-হাদিসের আলোকে এসকল আধুনিক সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান, দিকনির্দেশনা ও প্রাসঙ্গিক পরামর্শ দিতেন। দ্র. https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الطنطاوي
- ^৪ যিকরায়াত, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।
- ^৫ ‘আলী তানতাবির পিতা একজন জনপ্রিয় ইসলামিক স্কলার ছিলেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা করতেন। অনেক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে ইসলামের নানাদিক সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের দিকনির্দেশনা ও উপদেশ প্রদান করতেন। এসকল স্থানে প্রিয় পুত্র ‘আলীকেও সাথে নিয়ে যেতেন। এরফলে ‘আলী তানতাবি পরিণত বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই ইসলামের ইতিহাস, বিধি-বিধান ও মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। দ্র. যিকরায়াত, খ. ২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১২।
- ^৬ শায়খ খালিদ: তিনি আল-মাদরাসাতুত তিজারিয়াহর একজন প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক ছিলেন। যিনি অভিনব কায়দায় আনন্দের সাথে শিশু-কিশোরদের পাঠদান করতেন। তবে শান্তি দানের ক্ষেত্রে তিনি ভীষণ কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকেই তিনি পড়া আদায় করতেন এবং পঠিত বিষয়টি চব্বিশবার পর্যন্ত লিখিয়ে নিতেন, যেন পঠিত বিষয়টি শিক্ষার্থীদের ভালভাবে আত্মস্থ হয়ে যায়। যদি কোন শিক্ষার্থী তা না করতো তবে তিনি তাকে শ্রেণিকক্ষে বন্দি করে শাস্তি প্রদান করতেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রতিষ্ঠান প্রধান কিংবা অন্যকোন শিক্ষকের ছেলেকেও ছাড় দিতেন না।
- ^৭ যিকরায়াত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।
- ^৮ ১৯১৪ খ্রি. থেকে ১৯১৮ খ্রি. পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশ্য সিরিয়াতে এর খুব একটা প্রভাব পড়েনি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হলেও সিরিয়ার অবস্থা অনেকটা স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তুর্কিরা সিরিয়া আক্রমণ করে। এতে সিরিয়ার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে। শিল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে মুস্তফা তানতাবি পরিচালিত আল-মাদরাসাতুত তিজারিয়াহও বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রিয়পুত্রের শিক্ষাকার্যক্রম যেন ব্যাহত না হয় এ দিকটি বিবেচনা করে তিনি ‘আলী তানতাবিকে আল-মাদরাসাতুস সুলতানিয়া আস-সানিয়াতে ভর্তি করে দেন।
- ^৯ যিকরায়াত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।
- ^{১০} যিকরায়াত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।
- ^{১১} ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
- ^{১২} যিকরায়াত, খ. ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৫।
- ^{১৩} ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

- ১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
- ১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।
- ১৬ যিকরায়াত, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।
- ১৭ ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০; যিকরায়াত, খ. ৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭।
- ১৮ ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
- ১৯ ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ‘আলী তানতাবি লেবাননে একবছর আইন বিষয়ে পাঠদান করেন। এসময় আইন পেশার প্রতি তাঁর ভালোলাগা তৈরি হয়। কেননা এ পেশায় অনেক অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ মিলে। সততার সাথে দায়িত্ব পালন করলে সাধারণ মানুষকে ন্যায়বিচার পাইয়ে দেয়া যায়। তাছাড়া সে সময়ে এই পেশাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদাকর মনে করা হতো। তাই তিনি নিজেকে কখনো শিক্ষাকার্যক্রম থেকে দূরে রাখেননি। দ্র. ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।
- ২০ দুমা: দুমা সিরিয়ার দামেশকে অবস্থিত একটি জেলা শহর ও লিবাননের সীমান্তবর্তী অঞ্চল। শীতকালে এখানকার অধিবাসীদের জীবনধারণ কষ্টকর হয়ে ওঠে। ফলে এ অঞ্চলের অনেক লোক এ সময়ে জীবন ও জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্যান্য শহরে গমন করে। এ অঞ্চলে দায়িত্ব পালনকালে ‘আলী তানতাবি ‘আইন প্রণয়ন কমিটির’ সদস্য নির্বাচিত হোন এবং আইন বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্বাচিত একটি প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি মিসর গমন করেন। সেখানে তিনি ‘উত্তরাধিকার ও অসিয়ত আইন’ প্রসঙ্গে একবছর বিস্তারিত অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষে তিনি আবার সিরিয়াতে ফিরে আসেন এবং অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। দ্র. ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।
- ২১ ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৪।
- ২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।
- ২৩ https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الطنطاوي
- ২৪ ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
- ২৫ তাঁর ‘কুল্লিয়াতুল মাআহিদে’ যোগদানের পর এখানে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। কতিপয় ব্যক্তির সাথে মতবিরোধের ফলে তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম হননি। তাঁর চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতার সাথে মিল না হওয়ায় এই স্বাধীনচেতা ব্যক্তি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নিজের মাতৃভূমি সিরিয়ায় ফিরে আসেন এবং আর কখনে সৌদিআরবে গমন না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সিরিয়ায় ফিরে আসার কিছুদিন পরই বাথ পার্টির অভ্যুত্থান (১৮ ই মার্চ ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দ) শুরু হয়। তিনি সিরিয়ায় অবস্থান করা অনিরাপদ মনে করেন। এসময় তিনি মক্কার এক ইনিস্টিটিউট থেকে গবেষণা ও অধ্যাপনার আমন্ত্রণ পান। পরিশেষে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের অভিমানের জায়গা থেকে সরে আসেন এবং আবার মক্কায় গমন করে নিজেকে জ্ঞান প্রচারের কাজে নিয়োজিত রাখেন। দ্র. ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬।
- ২৬ ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; https://ar.wikipedia.org/wiki/علي_الطنطاوي
- ২৭ ‘আলী তানতাবি: আদিবুল ফুকাহা ওয়া ফকিহুল উদাবা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।
- ২৮ আহমদ বিন মুসফির বিন মুজিব আল আতিবী, কিরাআতুন ফি আশআরিশ শায়খ ‘আলী তানতাবী (মাজাল্লাতুল মিনহাল, সংখ্যা- ৬১, রজব ১৪২০ হিজরি), পৃ. ৯৮-৯৯।
- ২৯ ড. আহমাদ আমিন, আন-নাকদুল আদাবি, খ. ১ (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৩৮৭ হি./১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১১৫।
- ৩০ ড. সালেহ আবু ইসবা, ড. মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ, ফানুল মাকাল (আম্মান : উসুলুন নাযরিয়্যাতিত তাতবিকাত, ২০০২খ্রি.), পৃ. ১২; আহমাদ খালিদ আব্দুল মুনইম হুসায়নী, কিল ওয়া কাল ফি ফান্নিল মাকাল (জামিআতু আইনিস শামস (মিশর: ২০১৬খ্রি.), পৃ. ৮।
- ৩১ ড. মুহাম্মদ ইউসুফ নাজম, ফানুল মাকাল (বৈরুত: দারুস সাকাফা, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৯৫।
- ৩২ ইসলাম (إسلام) শব্দটি সিলমুন (سَلَّمَ) মূলধাতু থেকে উৎকলিত বাবে ইফ‘আল (اَفْعَلْ) এর মাসদার। অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, বশ্যতা স্বীকার করা। দ্র. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু‘জামুল ওয়াফী, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৮০।

-
- ৩৩ সম্মাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, *তায়ফিসরুল উশারিল আখির* (প্রকাশনী ও প্রকাশকাল উল্লেখ নেই), পৃ. ৬৮।)
- ৩৪ সম্মাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ. ৫ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮খ্রি.), পৃ. ২৯৬।
- ৩৫ প্রাপ্ত।
- ৩৬ *সহিহ বুখারি*, খ. ১, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ৫০।
- ৩৭ *সহিহ মুসলিম*, খ. ১, পৃ. ৮৪।
- ৩৮ ‘আলী তানতাবি, তারীফ ‘আম বিদীলিন ইসলাম (জেদ্দা : দারুল মানারাহ, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ২৫।
- ৩৯ তারীফ ‘আম বিদীলিন ইসলাম, প্রাপ্ত, পৃ. ২৬-২৭।
- ৪০ সূরা যারিয়াত, আয়াত: ৫১।
- ৪১ তারীফ ‘আম বিদীলিন ইসলাম, প্রাপ্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।
- ৪২ প্রাপ্ত, পৃ. ৬১।
- ৪৩ প্রাপ্ত, পৃ. ৬২।
- ৪৪ সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত: ৩৯।
- ৪৫ তারীফ ‘আম বিদীলিন ইসলাম, পৃ. ৫৪।
- ৪৬ প্রাপ্ত, পৃ. ৬২।
- ৪৭ প্রাপ্ত, পৃ. ২৬-২৭।
- ৪৮ তদেব।
- ৪৯ সূরা আল ইমরান, আয়াত: ১৮৫।
- ৫০ সূরা নিসা, আয়াত: ৭৮।
- ৫১ তারীফ ‘আম বিদীলিন ইসলাম, প্রাপ্ত, পৃ. ১০১-১০২।
- ৫২ প্রাপ্ত, পৃ. ১০২-১০৩।
- ৫৩ সূরা বাকার, আয়াত: ৪।
- ৫৪ *সহিহ মুসলিম*, প্রাপ্ত, খ. ১, পৃ. ২৮, হাদীস নং- ১০২।
- ৫৫ সূরা আরাফ, আয়াত: ১৮৭।
- ৫৬ তারীফ ‘আম বিদীলিন ইসলাম, প্রাপ্ত, পৃ. ১০৪-১২৬।
- ৫৭ আল-মু‘জামুল ওয়াফী, প্রাপ্ত, পৃ. ২৫৪।
- ৫৮ মুহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন, *কাওয়াইদুল ফিকহ* (মিশর: দারুল বাসিরাহ, তাবি.), পৃ. ২২৭।
- ৫৯ সূরা আনয়াম, আয়াত: ৫৯।
- ৬০ *সহিহ বুখারি*, হাদীস নং- ৬১৫৪।
- ৬১ তারীফ ‘আম বিদীলিন ইসলাম, প্রাপ্ত, পৃ. ১২৭-১৩৮।
- ৬২ ইসমাঈল হাক্কী বিন মুস্তফা আল ইসতামুলী, *তায়ফিসরুল রুহিল বয়ান*, খ. ৭ (বৈরুত: দারুল নাশর, তাবি.), পৃ. ২৮৯।
- ৬৩ মুহাম্মদ বিন ঈসা আবু ‘ঈসা আত তিরমিযি, *সুনান তিরমিযি*, খ. ৩ (বৈরুত: দারুল ইহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবি, তাবি.), পৃ. ৪৬৭, হাদীস নং-১১৬৩।
- ৬৪ *মাকালাতুন ফি কালিমাত*, প্রাপ্ত, পৃ. ৪৪।
- ৬৫ তদেব।
- ৬৬ আবু দাউদ সোলাইমান বিন আশআস আস সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, খ. ২ (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, তাবি.), পৃ. ২১২, হাদীস নং- ২১৫১।
- ৬৭ *সহিহ বুখারি*, খ. ১, প্রাপ্ত, পৃ. ২১, হাদীস নং- ৩৩।

-
- ৬৮ সূরা নিসা, আয়াত: ৫৮।
- ৬৯ সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৮৮।
- ৭০ সুনান তিরিমিযি, খ. ৫, পৃ. ১৯২, হাদীস নং- ১৩১১।
- ৭১ ‘আলী তানতাবী, *ফি সাবিলিল ইসলাম* (জৈদা : দারুল মানারা, ১৪১৬ হি.), পৃ. ৮৩-৮৭।
- ৭২ সুনান তিরিমিযি, প্রাপ্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৪।
- ৭৩ সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১৮৮।
- ৭৪ আল-মুজামুল ওয়াফী, প্রাপ্ত, পৃ. ৪৪৩।
- ৭৫ সূরা হুদ, আয়াত: ৬।
- ৭৬ সূরা তালাক, আয়াত: ৩।
- ৭৭ সহিহ বুখারি, হাদিস নং- ৬১৪৩।
- ৭৮ নূর ও হিদায়া, প্রাপ্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।
- ৭৯ সূরা জুম‘আ, আয়াত: ১০।
- ৮০ মুহাম্মদ রশিদ বিন ‘আলী রিজা, *তাফসিরুল মানার*, খ. ৪ (মিশর : আল হায়আতুল মিসরিয়্যা, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ১৭৪।
- ৮১ আবু হাতিম মুহাম্মদ আত-তামিমী, *সহিহ ইবন হিব্বান*, খ. ২ (বৈরুত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৫০৯, হাদীস নং- ৭৩০।
- ৮২ নূর ও হিদায়া, প্রাপ্ত, পৃ. ১৩২।

সূরা ক্বাফ : পরিচিতি ও মর্যাদা

ড. মুহা: উবায়দুল্লাহ*

Abstract: Al Quran, the last revelation of Allah has been revealed upon the last prophet Hazrat Muhammad (PBUH). Al Quran contains total 114 surahs. Surah Qaf is one of the important Maccan surahs in it. This surah is named after the alphabet 'Qaf' (ق) which is mentioned at the beginning of the surah. This surah has a deep and close relationship with its preceding and following surahs. Like other surahs of the Quran, Allah has described in this surah the discussed topics beautifully and easily with lucidity using diction, simile, metaphors and other rhetorical devices. At the same time, He has discussed the various topics like the beginning of creation, life in ther hereafter, standing before Allah for accountability, heaven-hell, reward, punishment, encouragement, the indication of fear, etc. in this surah. The importance of Surah Qaf has been discussed in this article.

ভূমিকা

সর্বশেষ মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহ তায়ালা পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে সর্বশেষ নবী এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর। এই গ্রন্থটিতে মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা ক্বাফ অন্যতম একটি মাক্কী সূরা। এই সূরাটির নাম আরবী 'ক্বাফ' অক্ষর দ্বারা করা হয়েছে, যা এই সূরার শুরুতেই উল্লিখিত হয়েছে। এই সূরাটির সাথে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদেও অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা ক্বাফের আলোচিত বিষয়গুলোকে অলংকারপূর্ণভাবে, ভাষা, শব্দ-বাক্য এবং উপমা ও অলংকারের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। একই সাথে তিনি সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার, শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়ের উপরও আলোকপাত করেছেন। এই প্রবন্ধে সূরা ক্বাফ-এর পরিচিতি ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিচিতি

নামকরণ

সূরা 'ক্বাফ' মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ৫০তম সূরা। ২৬তম পারায় এ সূরার অবস্থান। আল-কুরআনে অধিকাংশ সূরার নামকরণের ক্ষেত্রে সেই সূরার মাঝে উল্লিখিত কোন অক্ষর বা শব্দকে কেন্দ্র করেই নামকরণ করা হয়েছে। যেমন সূরা আল-বাকারায় উল্লিখিত আল-বাকারাহ শব্দ দিয়ে আবার সূরা আন-নাস এ উল্লিখিত আন-নাস শব্দ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে। তেমনিভাবে সূরা ক্বাফের নামকরণও তার প্রথমে উল্লিখিত ق অক্ষর দ্বারা করা হয়েছে। আর ق হচ্ছে المقطعات এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যেগুলোর অর্থ মানুষকে জানায়নি। তবে মুহাক্কিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, নাবী কারীম (সা.) এটার অর্থ জানতেন। অন্যথায় সম্বোধন অর্থহীন হয়ে পড়বে। তবে সাধারণ ঈমানদারগণের এটার অর্থ জানার কোন প্রয়োজন নেই, বরং তাদের জন্য এতটুকু বিশ্বাস স্থাপনই যথেষ্ট যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।^২ এ সূরার নামকরণের ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মতামত উল্লেখ করা হল। যেমন সূরা ক্বাফের নামকরণ সম্পর্কে আবুল আলা মওদুদী (রহ.) বলেন, 'সূরার প্রথম বর্ণটিই এর নাম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

سميت في عصر الصحابة سورة ق (ينطق بحروف قاف، بقاف و ألف، وفاء).

¹⁰ سورة ق مكية و اياتها خمس و اربعون-

سورة ق مكية الا "ولقد خلقنا السموات" الاية فمدينة، خمس و اربعون اية-¹¹

‘সূরা ক্বাফ, মক্কায় অবতীর্ণ তবে وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ।’

শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী সূরা ক্বাফের পরিচয় প্রদান করে বলেন-

و هي خمس و اربعون اية مكية كلها في قول الحسن و عطاء و عكرمة و جابر، قال ابن عباس و قتادة: الا اية، و هي قوله تعالى ولقد خلقنا السموات و الارض و ما بينهما في ستة ايام و ما مسنا من لغوب¹²

‘হাসান, ‘আতা, ইকরামা ও জাবীরের মতে, উহার ৪৫টি আয়াতের সবগুলোই মক্কী, ইব্ন ‘আব্বাস (রা.) বলেন, তার একটি আয়াত لغوب من لغوب و ما مسنا من لغوب و ما بينهما في ستة ايام و ما مسنا من لغوب ব্যতীত সবগুলোই মক্কী।’

সূরা ক্বাফের আয়াত, বাক্য ও হরফ সম্পর্কে মুহাম্মদ আল-খাযিন (র) বলেন-

مكية و هي خمس و اربعون اية و ثلاثمائة و سبع و خمسون كلمة و الف و اربعمائة و اربعة و تسعون حرفا¹³

‘সূরা ক্বাফ মক্কী, উহাতে ৪৫টি আয়াত, ৩৫৭টি বাক্য ও ১৪৯৪টি হরফ রয়েছে।’

এ সূরা অবতীর্ণ সম্পর্কে মুত্তফা আল-মারাগী মন্তব্য করে বলেন- 38 فمدنية- ‘ইহা মক্কী, তবে তার ৩৮ নম্বর আয়াত মাদানী।’ এ সূরার আয়াত, রকু সংখ্যা ও অবতীর্ণের স্থান সম্পর্কে কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র) বলেন-

هي مكية و هي خمس و اربعون اية و ثلاث ركوعات¹⁴

‘ইহা মক্কী, তার ৪৫টি আয়াত ও ৩টি রকু আছে।’ মুহাম্মদ আলী আল-সাবুনী সূরা ক্বাফ সম্পর্কে বলেন-

و هي مكية و هذه السورة هي اول الحزب المفصل على الصحيح¹⁵

‘যে সব সূরাকে মুফাস্সাল বলা হয়, সেগুলোর মধ্যে সূরায়ে ক্বাফই প্রথম।’

তবে সার্বিক দিক থেকে পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সূরা ক্বাফের বিষয়বস্তু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের তুলনায় মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সঙ্গে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সূরাটি রাসূলুল্লাহ (সা.)এর মক্কী জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ সূরা বলে মনে হয়। সূরাটি গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে অতি সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, সমগ্র সূরার বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য হচ্ছে পরকাল।¹⁶ এ সূরাতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আখিরাত সংঘটনের বিভিন্ন দলীল পেশ করেন। উদাহরণ স্বরূপ সূরা ক্বাফের আয়াতগুলোর পৃথক পৃথক শানে নুয়ুল উল্লেখ করা হল।

এর শানে নুয়ুল

রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কার লোকদের নিকট তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় পুনরুত্থানের বিষয়টিও পেশ করেন। তখন তারা তাওহীদ ও রিসালাতের ন্যায় পুনরুত্থানকেও অস্বীকার করতে লাগল, আর তারা বলতে লাগল, আমরা যখন মরে যাব এবং আমাদের মৃতদেহ গলে পঁচে মৃত্তিকায় পরিণত হবে, এর পরেও কি আমরা পুনরুত্থিত হব? এটা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? তাদের এই ভ্রান্ত ধারণাকে নিরসন করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা এ সূরাটি নাযিল করেন।¹⁷ তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-¹⁸ قد علمنا ما تنقص ‘মৃত্তিকা তাদের কতটুকু ক্ষয় করে তাতো আমি জানি।’ অর্থাৎ তাদের মৃত দেহের অনু-পরমাণু মাটির কোথায় যায় এবং কী অবস্থায় কোথায় থাকে তা আমার অজানা থাকে না। আমার নিকট যে রক্ষিত

পুস্তক রয়েছে তাতে সবকিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইবন আববাস (রা.) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে: তাদের গোশত, চামড়া, হাড়, চুল ইত্যাদি যা কিছু মৃত্তিকায় খেয়ে ফেলে তা আমার জানা আছে।^{২০}

ولقد خلقنا السماوات و الارض الخ আয়াতের শানে নুযুল:

আলোচ্য আয়াতটি ইয়াহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছিল। কাতাদাহ (রহ.) বলেন: অভিশপ্ত ইয়াহুদীরা বলত যে, আল্লাহ তা'আলা ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন এবং সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ঐ সপ্তম দিনটি ছিল শনিবার। এ জন্য ঐ দিনকে তার ছুটির দিন বলে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদের এই ধারণাটি খন্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, তিনি ক্লাস্তই হননি, কাজেই বিশ্রাম কিসের? কারণ কোন ক্লাস্তি, অবসন্নতা কিংবা ঘুম তাকে স্পর্শ করে না।^{২১}

এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে এসে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে বললেন, মহান আল্লাহ রবি ও সোমবার জমিন সৃষ্টি করেছেন। মঙ্গলবার পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করেছেন। বুধবারে গাছপালা, পানি ও বৃক্ষলতা সৃষ্টি করেছেন। বৃহস্পতিবার আসমান সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবার তারকারাজি, চন্দ্র-সূর্য ও ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। শুক্রবারে তিনটি ঘণ্টা অবশিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে প্রথম ঘণ্টায় আমল, দ্বিতীয় ঘণ্টায় কল্যাণকর বিষয়াদি, বিপদ আপদ ও তৃতীয় ঘণ্টায় আদম (আ.)কে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আদম (আ.)কে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছেন এবং ইবলিসকে আদেশ করেছেন আদম (আ.)কে সিজদা করতে। অবশেষে আদম (আ.)কে জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে নিয়ে আসলেন। ইয়াহুদীরা জিজ্ঞাসা করল যে, তারপর কি হল? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তারপর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন হলেন। তারা (ইয়াহুদীরা) বলল, তোমার কথা তো অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। তারা বলল, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং তাদের বক্তব্যকে খন্ডন করা হয়।^{২২}

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد آয়াতের শানে নুযুল:

হযরত ইবন আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইয়াহুদীদের একটি দল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছে- হে রাসূল! আমাদেরকে যদি আখিরাত সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতেন তাহলে ভালো হতো। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে তুমি উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে। এতে সে অবশ্যই উপকৃত হবে এবং সঠিক পথে চলে আসবে।^{২৩}

পূর্বাপর সূরার সাথে সম্পর্ক

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে অধিকাংশ সূরা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সূরার সাথে বেশ কিছু দিক থেকে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। সূরা ক্বাফও এর ব্যতিক্রম নয়; কেননা সূরা ক্বাফ তার পূর্ববর্তী সূরা 'হুজুরাত' এবং পরবর্তী সূরা 'আয-যারিয়াত'-এর সাথে বেশ কিছু বিষয়ের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমে সূরা ক্বাফের সাথে তার পূর্ববর্তী সূরা, সূরা আল-হুজুরাতের সাদৃশ্য আলোচনা করা হল। মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা ক্বাফে মুমিন ও মুত্তাকিদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন, ^{২৪} وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, 'আর জান্নাতকে মুত্তাকিদের নিকটস্থ করা হবে কোনো দূরত্ব থাকবে না।'

সূরা ক্বাফের পূর্ববর্তী সূরা আল-হুজুরাতেও মুমিন মুত্তাকিদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ-²⁵

‘তারাই মু’মিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ।’

পাশাপাশি দু’টি সূরার মাঝে মুমিন এবং মুত্তাকীদের সম্পর্কে আলোচনা থাকায় উভয় সূরার মাঝে বিষয়গত সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী সূরা আল-হুযরাতে শেষ দিকে এমন কিছু মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যারা বারবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট বলত আমরা ঈমান গ্রহণ করেছি অর্থাৎ আমরা মু’মিন। অথচ তারা প্রকৃত ঈমানদার এবং মু’মিন ছিল না। তারা পশ্চাতে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত এবং আরবের মুশরিকরা কিয়ামত দিবসকে এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াতকে অস্বীকার করত। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوَدُّوا أَنْ تَمُوتُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ-²⁶

‘আরব মরুভাসীরা বলে: আমরা ঈমান আনলাম। তুমি বল: তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল: আমরা আত্মসমর্পণ করেছি; কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর তাহলে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও কম করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’

সূরা হুযরাতে সতের নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا مَعَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ بِكُمْ إِنْ هَدَاكُمْ لَلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ-²⁷

‘তারা মনে করে আত্মসমর্পণ করে তোমাকে ধন্য করেছে। বল: তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করো না বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।’

অনুরূপভাবে সূরা ক্বাফ এর মধ্যেও আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যারা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়াত ও মৃত্যুর পরবর্তী পুনরুত্থানকে অস্বীকার করত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ- إِذَا مَتَّأ وَكُنَّا تَرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ-
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ-²⁸

‘কিঞ্চিৎ কাফিরেরা তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময় বোধ করে এবং বলে: এটাতো এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মৃত্তিকায় পরিণত হলে আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব! এ প্রত্যাঘর্ষণ সুদূর পরাহত! আমি তো জানি, মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে রক্ষিত ফলক।’

এ সম্পর্কে আহমদ মোস্তফা আল-মারাগী বলেন:

انه أشار في آخر السورة السابقة إلى أن إيمان أولئك الأعراب لم يكن إيمان حقا و ذلك يقتضى إنكار النبوة و إنكار البعث و افتتح هذه السورة بما يتعلق بذلك.^{২৬}

‘নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ তা‘আলা) পূর্ববর্তী সূরার শেষাংশে সে সকল আরবদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যারা প্রকৃতপক্ষে ঈমানের অধিকারী নয়। আর এটা এ জন্য যে, তারা পুনরুত্থান ও নবুয়াতকে অস্বীকার করে। আর এই সূরা (সূরা আল-কাফ) শুরু হয়েছে সেই বিষয়ের দ্বারা যা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট।’

আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাতে মু‘মিনদেরকে রাসূল (সা.)-এর সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তার রীতি শিক্ষা দিয়ে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.^{২৭}

‘হে মু‘মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উচু করনা এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চঃস্বরে কথা বল তার সাথে সেইরূপ উচ্চঃস্বরে কথা বলনা, কারণ এতে তোমাদের কাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে।’

আর পাপাচারী ব্যক্তি কোন সংবাদ প্রদান করলে তার সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.^{২৮}

‘হে মু‘মিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ণ করে, তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত না কর এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও।’

মহান আল্লাহ দু‘টি সূরাতেই মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করেছেন, যাতে তারা সৎপথে ফিরে আসতে পারে। এ দিক থেকে দু‘টি সূরার মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

সূরা কাফ কাফেরদেরকে অধৃত ধারণা থেকে বের হয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য সতর্কবাণী হিসেবে নাযিল করেন। আর আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী সূরা আল-হুজুরাত মু‘মিনদেরকে সতর্ক করার জন্য নাযিল করেছেন। সুতরাং সতর্কীকরণের দিক থেকে উভয় সূরার মাঝে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সূরা কাফের যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনিভাবে পরবর্তী সূরার সাথেও বিভিন্ন দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে। সূরা কাফের পরবর্তী সূরা আয-যারিয়াত। মহান আল্লাহ সূরা কাফ যেমন কসম দ্বারা শুরু করেছেন, তেমনি সূরা আয-যারিয়াতও কসম দ্বারা আরম্ভ করেছেন। সূরা কাফ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের শপথ দ্বারা আরম্ভ করে বলেন, ^{২৯} *ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ* ‘কুরআন সম্মানিত কুরআনের শপথ।’

পক্ষান্তরে সূরা আয-যারিয়াত ঝঞ্ঝাবায়ুর শপথ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা সূরা আয-যারিয়াতের শুরুতে বলেন, ^{৩০} *وَالْزُرِّيَّتِ ذُرْوًا* ‘শপথ ধূলি ঝঞ্ঝার।’

সূরা কাফে কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন কিয়ামতের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন: ^{৩১} *يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ* ‘যে দিন মানুষ অবশ্যই শ্রবণ করবে মহানাদ, সেই দিনই পুনরুত্থান দিন।’

অনুরূপভাবে সূরা আয-যারিয়াতেও কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আয-যারিয়াতে কিয়ামতের বর্ণনায় মহান আল্লাহ বলেন: ^{৫৭}‘يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ’ তারা জিজ্ঞেস করে: কর্মফল দিন (কিয়ামত) কবে হবে।’

নামকরণের ক্ষেত্রেও উভয় সূরার মাঝে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন সূরা ক্বাফ তার প্রথম হরফ ق দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে। তেমনি সূরা আয-যারিয়াতেও প্রথম শব্দ আয-যারিয়াত দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ সূরা ক্বাফে জান্নাতী এবং অপরাধীদের শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। এ সূরায় জান্নাতীদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন: ^{৫৮}‘وَأَزَلَفْتُ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ’ আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের নিকটস্থ করা হবে, কোন দূরত্ব থাকবে না।’ পক্ষান্তরে অপরাধীদের সম্পর্কে তিনি বলেন:

كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرِّسِّ وَثَمُودٌ-^{৫৯}

‘তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস ও সামুদ সম্প্রদায়।’

সূরা ক্বাফের পরবর্তী সূরা আয-যারিয়াতেও জান্নাতী এবং অপরাধীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ সূরায় মহান আল্লাহ জান্নাতীদের সম্পর্কে বলেন: ^{৬০}‘إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ’ - ‘সে দিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবন বিশিষ্ট জান্নাতে।’ পক্ষান্তরে অপরাধীদের সম্পর্কে সূরা আয-যারিয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

فَعْتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَاخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ-^{৬১}

‘কিন্তু তারা তাদের রবের আদেশ অমান্য করল, ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হল এবং তারা তা দেখতে ছিল।’

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় সূরা ক্বাফ এর সাথে তার পূর্ববর্তী সূরা হুজুরাত এবং পরবর্তী সূরা আয-যারিয়াত এর বিভিন্ন দিক থেকে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে।

সূরা ‘ক্বাফ’-এর মর্যাদা

সূরা ক্বাফ মহাখুসুস আল-কুরআনের সূরাসমূহের মধ্যে একটি মর্যাদাপূর্ণ সূরা। এর ভাষা, শব্দবিন্যাস, বাক্যের অন্তর্মিল সবকিছুই তুলনাহীন। সূরাটি মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবীদের কাছে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ছিল। তাই হাদীসে সূরাটির বিভিন্নভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। এর তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য করেই রাসূল (সা.) বেশির ভাগ জুমু‘আর খুতবা ও দুই ঈদের সালাতে এ সূরা পাঠ করতেন, যাতে করে মানুষ এ সূরার গুরুত্ব বুঝতে পারে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

وقال الامام احمد عن عبد الله بن عبد الله ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال: بقاف و اقتربت (اخرجه مسلم و اصحاب السنن)

‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) আবু ওয়াকিদ লাইসীকে (রা.) জিজ্ঞেস করেন: ‘ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) কি পড়তেন?’ উত্তরে তিনি বলেন, ঈদের সালাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা ক্বাফ এবং সূরা ইকতারাবাত (কামার) পাঠ করতেন। এ হাদীসটি ইমাম আহমদ (রা:) ও মুসলিম (রা:) বর্ণনা করেছেন।^{৪০}

এ সম্পর্কে হাদীসে আরও এসেছে-

و عن ام هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تنورنا و تنور النبي صلى الله عليه و سلم واحدا سنيتين او سنة وبعض سنة، وما اخذت (ق والقران المجيد) الا على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم، وكان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس. (اخرجه مسلم و ابو داود و احمد)

‘উম্মে হিশাম বিন্তি হারিসাহ (রা:) বলেন: দুই বছর অথবা এক বছর ও কয়েক মাস পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এবং আমাদের একটিই চুল্লী ছিল। আমি সূরা ক্বাফ ওয়াল-কুরআনিল মাজীদ, এই সূরাটি রাসূল (সা.) এর মুখে শুনে শুনে মুখস্ত করেছিলাম। কেননা, প্রত্যেক জুমু‘আর দিন যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ভাষণ দেওয়ার জন্য জনগণের সামনে মিম্বারের উপর দাঁড়াতেন তখন তিনি এই সূরাটি পাঠ করতেন। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রা.), আবু দাউদ (রা:) ও আহমদ (রা:) বর্ণনা করেছেন।’^{৪১}

রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরা ক্বাফ-এর মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে ফজরের সালাতে এ সূরা পাঠ করার জন্য বেছে নিতেন। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে-

فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك (أن النبي صلى الله عليه و سلم قرأ فى صلاة الصبح سورة ق والقران المجيد).

‘ইমাম মুসলিম কুতবা মালেক থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সা.) ফজরের সালাতে সূরায়ে ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ পড়তেন।’^{৪২}

ইমাম আবু দাউদ (রহ.)ও এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হারিস ইবন নুমানের (রহ.) মেয়ে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি শুক্রবার খুতবা দেয়ার সময় যে সূরা ক্বাফ তিলাওয়াত করতেন তা শুনে আমি সূরাটি মুখস্ত করেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর এবং আমাদের রান্না করার একই চুল্লী ছিল।^{৪৩}

বড় বড় সমাবেশ, যেমন ঈদ, জুমু‘আহ ও ফজর সালাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এই সূরাটি পাঠ করতেন। কেননা এর মধ্যে সৃষ্টির সূচনা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা‘আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।^{৪৪}

কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের ফজীলত অনেক। কুরআন তিলাওয়াত মহান আল্লাহর সাথে একটি লাভজনক ব্যবসা। পৃথিবীতে ব্যবসার ক্ষেত্রে লাভ এবং ক্ষতি দুটিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কুরআন তেলাওয়াত লাভ ছাড়া কোন প্রকার ক্ষতির অংশ নেই এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে এসেছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ- لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ-^{৪৫}

‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমাদের দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার, যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালব।’

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনেক সওয়াব অর্জন করা যায় এবং অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন-

هو من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة و الحسنة بعشر امثالها لا اقول الم حرف و لكن الف حرف و لام حرف و ميم حرف.^{৪৬}

‘যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকি প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকি দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ।’

কুরআনের মর্যাদা এত বেশি কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সর্বোত্তম বলে রাসূল (সা.) আখ্যায়িত করেছেন। উসমান (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন।

خيركم من تعلم القرآن و علمه-⁸⁹

‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।’

কুরআন তার তেলাওয়াতকারীর পক্ষে কেয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য এক বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, আবু উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন:

اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه-⁸⁹

‘তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কারণ কুরআন কেয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।’

সূরা ক্বাফে বর্ণিত প্রাচীন জাতিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা‘আলা মহাশুভ আল-কুরআনে বিভিন্ন ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অনেক জাতি আল্লাহর আযাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর নাফরমানী করেছিল। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ সূরা ক্বাফে এরশাদ করেন-

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَ ثَمُودُ- وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ لُوطُ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدُ-⁸⁹

অর্থ: তাদের পূর্বেও সত্যপ্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস ও সামুদ সম্প্রদায়, আদ, ফিরআউন ও লুত সম্প্রদায় এবং আইকাহর অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়, তারা সবাই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে।

এখানে আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী কয়েকটি জাতির কথা তুলে ধরেছেন যারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, ফলে তাদের ওপর শাস্তি নেমে এসেছিল। যেমন নূহের (আ.) কাওম, যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। নূহ (আ.)-এর জাতির কাছে তাঁকে, সামুদ জাতির কাছে সালেহ (আ.)কে, আ‘দ জাতির কাছে হুদ (আ.)কে, লুত (আ.)-এর জাতির কাছে লুত (আ.)কে, আসহাবে আইকাহ বা জঙ্গলের অধিবাসীদের কাছে শু‘আইব (আ.)কে এবং তুব্বা সম্প্রদায়ের কাছে নাবী প্রেরণ করেছেন। তারা তাদের কাছে আগত নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আইকাহ বলা হয় জঙ্গলকে এটা বলার কারণ হল, এ অবাধ্য জাতি প্রচণ্ড গরমে অতিষ্ঠ হয়ে নিজেদের বসতি ছেড়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সেখানেই ধ্বংস করে দেন।

এটাও বলা হয় যে, উক্ত জঙ্গলে ‘আইকাহ’ বলে একটা গাছকে তারা পূজা করত। রাস জাতি বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে বেশ কয়েকটি মত পাওয়া যায়। তবে ইমাম ইবনু জারীর প্রাধান্য দিয়ে বলেন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য ‘আসহাবুল উখদুদ’। আল্লামা জালালুদ্দীন মহল্লী (র.) উল্লেখ করেন যে, ‘রাস’ ছিল একটি কুপের নাম। তারা উক্ত কুপের আশে-পাশে বসবাস করত। তারা ছিল প্রতিমাপূজারী। কথিত আছে যে,

তাদের নাবী ছিলেন হানযালা ইবনে সাফওয়ান (আ.)। কুরআনে দু'জায়গায় তুব্বার উল্লেখ রয়েছে- এখানে এবং সূরা দুখানে। মূলত তুব্বা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়, বরং এটা ইয়ামানের হিমইয়ারী সম্রাটের উপাধি বিশেষ। যেমন পারস্যের বাদশাকে কিসরা, রোমের বাদশাকে কায়সার, মিশরের বাদশাদেরকে ফির'আউন এবং হাবশা অর্থাৎ ইথিওপিয়ার রাজাদেরকে নাজ্জাসী বলা হত।^{৫০}

শিক্ষা

সূরা ক্বাফ সৃষ্টি জগতের প্রতি মহান আল্লাহর অসীম করুণার বহিঃপ্রকাশ। এ সূরায় কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নাবী রাসূলদেরকে মানবজাতি থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। তারা মাটির মানুষ নূরের তৈরী নয়। পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস রাখা ঈমানের অন্যতম একটি রুকন। তাদের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে মু'মিন হওয়া যাবে না। মানুষকে কবরস্থ করা হোক, বা নাই হোক তার পুনরুত্থান হবেই। সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা তবে এতটুকু বিশ্বাস করলেই মু'মিন হওয়া যাবে না যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে। আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বের ওপর প্রমাণ বহন করে। প্রত্যেক আত্মাকে হিসাব নিকাশের জন্য পুনরুত্থিত হতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। পুনরুত্থান চিরন্তন সত্য এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতঃ তাঁর বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার জীবন পরিচালনার মাধ্যমে পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ করাই সূরা ক্বাফ এর মৌলিক শিক্ষা।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় সূরা ক্বাফ পবিত্র কুরআনের অন্যতম মাধুর্যমন্ডিত একটি সূরা। মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের অন্যান্য সূরার ন্যায় সূরা ক্বাফের আলোচিত বিষয়গুলোকে অলংকারপূর্ণ ভাব, ভাষা, শব্দ, বাক্য এবং উপমা অলংকারের মাধ্যমে অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সূরার সাথে এর অপূর্ব মেলবন্ধন রচিত হয়েছে। এ সূরায় আল্লাহর নিয়ামত, সৃষ্টির সূচনা, মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন, আল্লাহ তা'আলার সামনে দাঁড়ানো, হিসাব-নিকাশ, আখিরাত-কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম, পুরস্কার-শাস্তি, উৎসাহ প্রদান এবং ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদির বর্ণনা অলংকারপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। এর মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় বড় বড় সমাবেশে, যেমন ঈদ, জুমুআয় ও ফজরের সালাতে পাঠ করতেন। তাই আমাদের জীবনে এ সূরার গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ

^১ حروف المقطعات বলা হয় এমন কতগুলো বিচ্ছিন্ন হরফকে যেগুলোর কোনো নির্দিষ্ট অর্থ নেই। আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর অর্থ মানুষকে জানায়নি। আর কোনো মানুষেরও উচিত নয় حروف المقطعات বাক্যের ব্যাখ্যা বিশেষ করে অবশেষ করা। আল-কুরআনের আয়াতসমূহকে প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা: ১. محكم ও ২. متشابه। মূলত المتشابه حروف المقطعات ১. যার আভিধানিক অর্থ জানা আছে, কিন্তু পারিভাষিক অর্থ অন্তর্ভুক্ত। আবার متشابه কেও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. যার আভিধানিক অর্থ জানা নেই। ২. যার আভিধানিক ও পারিভাষিক কোনো অর্থই জানা নেই। ৩. বর্ণটি শেযোক্ত শ্রেণীভুক্ত। (আল্লামা জালালুদ্দিন আল-মহল্লী (র.) ও আল্লামা জালালুদ্দিন আস-সুয়ুতী (র.), তাফসীরে জালালাইন, ৬ষ্ঠ খন্ড, অনু: মাওলানা আব্দুল গাফফার শাহপুরী, মওলানা আমীরুল ইসলাম ফরদাবাদী, মাওলানা হাবীবুর রহমান হবিগঞ্জী (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ১৮০।) এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم يقولون أمتنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولوا الألباب-

- ‘তিনিই তোমার প্রতি গ্রহ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে- ওগুলো গ্রহের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারা ই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশেষ ষণের উদ্দেশ্যে অস্পষ্টের অনুসরণ করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত ওর অর্থ কেউ অবগত নয়, আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে: আমরা ওতে বিশ্বাস করি; সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না। আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ৭।
- ২ তাফসীরে জালালাইন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮০।
- ৩ সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, তাফহীমুল কুরআন, ১৫ খন্ড (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১১শ প্রকাশ, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রী.), পৃ. ১৭৫।
- ৪ মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, শব্দে শব্দে আল-কুরআন, দ্বাদশ খন্ড (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, ১৪৩৪ হি./২০১৩ খ্রী.), পৃ. ১৩৮।
- ৫ মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, তাওযীহুল কুরআন, অনু: মাওলানা আবুল বাশার ও সাইফুল ইসলাম, তৃতীয় খন্ড (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১১ খ্রী.), পৃ. ৩৯৪।
- ৬ ইবন ‘আশুর, আত তাহরীর ওয়াত তানবীর, ২৬ খন্ড (তিউনিসিয়া: দারুল সুহুন, তা.বি.), পৃ. ২৭৩।
- ৭ জালালুদ্দীন আস-সুহুতী, আল-ইতকান ফী উলুমিল কুরআন (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি./২০০৬ খ্রী.), পৃ. ৪৯।
- ৮ তাফসীরে জালালাইন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫।
- ৯ শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী আস-সাক্বার (র.), অনু. আব্দুস সালাম মিতুল, আল-কুরআন সূরাসমূহের নাযিলের ইতিহাস (ঢাকা: গেণ্ডা বাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক ১ম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১৬ খ্রী.), পৃ. ৩৪২-৪৩।
- ১০ সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন, ৬ষ্ঠ খন্ড (বৈরুত: দারুল শুরক, ৩৬তম সং, ১৪২৮ হি./২০০৭ খ্রী.), পৃ. ৩৩৫।
- ১১ তাফসীরে জালালাইন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৭।
- ১২ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আল-কুরতুবী, আল-জামি’ লি আহকামিল কুরআন, ১৭ খন্ড (মিশর: দারুল কুতুব আল-মিসরিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ১।
- ১৩ মুহাম্মদ ইবনে আল-খাযিন, তাফসীরুল খাযিন, ৪র্থ খন্ড (পাকিস্তান: আল-মাকতাবাতুল আলাউদ্দীন ‘আলী রাশীদিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ১৮৬।
- ১৪ আহমদ ইবনে মুত্তফা আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, ২৬ খন্ড (মিশর: শারিকাতুল মাকতাবাহ ওয়া মাতবাহ ‘আহ মুত্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৯৫৩ খ্রী.), পৃ. ১৫০।
- ১৫ কাযী ছানাতুল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, ৯ খন্ড (পাকিস্তান: মাকতাবাতুল রশদিয়া, ১৪১২ হি.), পৃ. ৬০।
- ১৬ ইমামুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহ.), তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম, ৭ম খন্ড (লেবানন: বৈরুত: দারুল কুরআনুল কারীম, ৭ম সং, ১৪০২ হি./১৯৮১ খ্রী.), পৃ. ৩৯২।
- ১৭ আল-কুরআন সূরাসমূহের নাযিলের ইতিহাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৩।
- ১৮ পূর্বোক্ত: ইমাদুদ্দীন ইবন কাসীর (রহ.), অনুবাদ: ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান (সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুনর্লিখিত), তাফসীর ইবন কাসীর, সপ্তদশ খন্ড (ঢাকা: খন্ডসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, সর্বশেষ সংস্করণ, ১৪৪০ হি./ ২০১৯ খ্রী.), পৃ. ৬৩।
- ১৯ আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত: ৪।
- ২০ তাফসীর ইবন কাসীর, সপ্তদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
- ২১ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২।
- ২২ তাফসীরে জালালাইন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫।
- ২৩ তাফসীর ইবন কাসীর, সপ্তদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।
- ২৪ আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত: ৩১।
- ২৫ আল-কুরআন, সূরা খন্ডজুরাত, আয়াত: ১৫।

-
- ২৬ পূর্বোক্ত, আয়াত: ১৪।
- ২৭ পূর্বোক্ত, আয়াত: ১৭।
- ২৮ আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত: ২-৪।
- ২৯ তাফসীরুল মারাগী, ২৬ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০।
- ৩০ আল-কুরআন, সূরা খন্ডজুরাত, আয়াত: ২।
- ৩১ পূর্বোক্ত, আয়াত: ৬।
- ৩২ আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত: ১।
- ৩৩ আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১।
- ৩৪ আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত: ৪২।
- ৩৫ আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১২।
- ৩৬ আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত: ৩১।
- ৩৭ পূর্বোক্ত, আয়াত: ১২।
- ৩৮ আল-কুরআন, সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৫।
- ৩৯ পূর্বোক্ত, আয়াত: ৪৪।
- ৪০ তাফসীর ইব্ন কাসীর, সপ্তদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০।
- ৪১ পূর্বোক্ত।
- ৪২ পূর্বোক্ত।
- ৪৩ পূর্বোক্ত।
- ৪৪ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।
- ৪৫ আল-কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত: ২৯-৩০।
- ৪৬ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল 'আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-২৯১০।
- ৪৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়াহ, ২০০৬ খ্রী.), হাদীস নং-৫০২৭।
- ৪৮ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, তা.বি.), হাদীস নং-১৯১০।
- ৪৯ আল-কুরআন, সূরা কাফ, আয়াত: ১২-১৪।
- ৫০ তাফসীর ইব্ন কাসীর, সপ্তদশ খন্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮।

আরবি কাব্যে রাসূল-প্রশংসা: পরিপ্রেক্ষিত ইসলামি যুগ

প্রফেসর ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম*

মুহাম্মদ হানীফ*

Abstract: Arabic is one of the ancient languages in the world. From ancient times the necessary speech, lectures, advice and storytelling have been done in this language, but the first practice of poetry started in the Jahiliyyah period (the age of ignorance 450-622AD). Through poetry, the accumulated love of the human mind, heroism, courage, clan nobility, incitement to war, mourning, praise and slander took place. Poets became the most respected and dignified people in the society. At the beginning of the advent of Islam, the practice of poetry became somewhat limited as many Muslim poets felt discouraged. Meanwhile, the polytheists continued to confuse Muslims and truth-seekers by composing obscene and hateful poems against the Prophet (PBUH) and Islam. This conspiracy of the polytheists tormented the Prophet (PBUH). For this reason, the Prophet (PBUH) appealed to his companions to compose poems with the purpose of helping Allah and His prophet. Believers and believing poets came forward in response to the call of the Prophet (PBUH). They wrote poems based on Tawheed, Monotheism, Honesty, Generosity, Courage, Righteousness and the History and tradition of Islam. From the Islamic era (622-661 AD) to the modern era (1897-present), many poets have written various poems on various aspects of the enlightened life of the Prophet. His biography and admirable aspects are presented in the melody of their poems as a shining example of the Prophet's love. They present their hymns and glorious songs in the skillful construction of artistic words. As a result, a separate genre of poetry called 'Al-Madihur Rasul' (Prophetic praise) was generated in Arabic poetry. In this case, the contributions of Hassan Bin Thabit, Kab Bin Zuhair and Abdulla Bin Raowaha are unforgettable and undeniable. In the following article, we will try to shed light and analyze the context of praise of the Prophet in Arabic poetry in the Islamic era.]

[Keywords: Arabic poetry, Prophetic praise, Islamic era]

ভূমিকা

মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর সর্বোত্তম মানব। উন্নত আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধের ঐশ্বর্যময় উপমা। দেশ ও কালের গণ্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর সকল ভাষাই স্পর্শ করেছে তাঁর মহিমা ও গরিমা। অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক তাঁর শানে রচনা করেছেন স্তুতিগাথা, যাতে তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, মমত্ববোধ, অগাধ শ্রদ্ধাবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যা যুগযুগ ধরে মানব হৃদয়কে করেছে বিমোহিত ও উদ্বেলিত। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা আরবিতেই সর্বপ্রথম ‘মাদিহুর রাসূল’ বা রাসূল-প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক ও সাহিত্য সমালোচকদের ভাষ্যমতে, রাসূল (সা.) এর নবুয়াত লাভের পূর্বে তাঁর প্রশংসায় রচিত খণ্ড কবিতা পাওয়া গেলেও মূলত নবুয়াত লাভের পরই সাহাবি কবিগণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ও মানোত্তীর্ণ রাসূল-প্রশংসার উদ্ভব ঘটে। এক্ষেত্রে হাসসান ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা ও কা'ব ইবন যুহাইর কবিদ্বয় অসামান্য অবদান রাখেন। পরিসংখ্যান বলে, পৃথিবীতে যে ব্যক্তির প্রশংসা ও স্তুতিজ্ঞাপন করে সর্বাধিক কবিতা রচনা করা হয়েছে তিনি হলেন রাসূল (সা.)। কারণ তিনি ছিলেন মানবতার যুগসন্ধিক্ষণে

* অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

* পিএইচ.ডি. গবেষক, আরবি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

এক আলোকবর্তিকা, পথপ্রদর্শক ও বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ। পৃথিবীতে তাঁর আগমন, শৈশবকাল, তারুণ্যদীপ্ত সময়, পারিবারিক জীবন, নুবওয়াতী জীবন, সমরনীতি, শারীরিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক মাধুর্যের নানাদিক উপজীব্য করে রচিত হয়েছে হাজারো কবিতা। কবিগণ তাদের শৈল্পিক শব্দের নিপুণ গাঁথুনিতে তাঁর জীবনালেখ্যকে সুমহান ও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে আরবি কবিতার স্বভাবসিদ্ধ ধারায় ‘রাসূল-প্রশস্তি’ নামক এক পৃথক কাব্যধারা সৃষ্টি হয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইসলামি যুগে আরবি কাব্যে রাসূল-প্রশস্তি প্রসঙ্গে আলোকপাত ও বিশ্লেষণের প্রয়াস পাবো।

আরবি কাব্য পরিচিতি

কবিতার আরবি প্রতিশব্দ ‘আশ-শিরু’ (الشعر)। শব্দটি বাবে ينصر- نصر অথবা বাবে يكرم- كرم থেকে ইসমে মাসদার। শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হল ‘আশ-আরুন’ (أشعار)।^১ আশ-শিরু (الشعر) শব্দটি দুটি মৌলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. العلم والفتنة (জ্ঞান ও উপলব্ধি), দুই. الاحساس والشعور (অনুভব ও উপলব্ধি), দুই. العلم والفتنة (জ্ঞান ও বিচক্ষণতা)।^২ এছাড়াও শব্দটি আরও অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- কবিতা, পদ্য, কল্পনা করা, ছন্দবদ্য বাক্য ইত্যাদি। আর কবিতা রচনাকারীকে শা‘ইর (شاعر) বলা হয়। বহুবচনে শু‘আরা (شعراء)।^৩ আশ-শিরু (الشعر) শব্দটি উতপত্তিগতভাবেই আরবি কিনা এ ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিকগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন সাহিত্যসমালোচক ও ভাষাতাত্ত্বিকের অভিমত হল, আশ-শিরু (الشعر) শব্দটি হিব্রু ভাষার שיר শব্দমূল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক ড. আহমাদ আমীন বলেন-

يرى بعض المشتشرقين ان كلمة الشعر مأخوذة من اللغة العبرية والعبرانية فكان أصله فيها شير بمعنى الترتيل و التسبيح القدسي^৪

‘কতিপয় প্রাচ্যবিদের অভিমত হল, الشعر শব্দটি হিব্রু ভাষার শব্দ شیر মূলধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। শব্দটির অর্থ আবৃত্তি করা, সুন্দররূপে তিলাওয়াত করা ও পবিত্রতা বর্ণনা করা।’

অভিধানবেত্তাদের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হল, আশ শিরু (الشعر) শব্দটি উতপত্তিগতভাবেই আরবি। কুরআনুল কারিমে আশ-শিরু (الشعر) শব্দটি কবিতা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ

‘আমি (আল্লাহ) তাঁকে (মুহাম্মদ সা.) কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং এটা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়। এটাতো উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন ছাড়া আর কিছুই নয়।’

ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্য সমালোচকগণ কবিতাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও ঐতিহাসিক জুরজি যায়দান কবিতার পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন-

فهو لغة النفس او هو صور ظاهرة لحقائق غير ظاهرة^৫

‘কবিতা হল হৃদয়ের ভাষা অথবা ভাব-কল্পনার বাস্তব চিত্র।’

কবিতার পরিচয় প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত বলেন-

الشعر هو الكلام الموزون المقفى المعبر عن الأخيلة البديعة والصور المؤثرة البليغة^৯

‘এমন ছন্দবদ্ধ ও অন্তর্মিলযুক্ত বাক্যকে কবিতা বলা হয়, যা বিরল ভাবনা, কল্পনার নতুনত্ব এবং অর্থপূর্ণ দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে।’

কুদামা ইবন্ জাফরের দৃষ্টিতে কবিতা হল,

الشعر قول موزون مقفى يدل على معنى^{১০}.

‘অন্তর্মিল ও ছন্দোবদ্ধ এমন কথামালাকে কবিতা বলা হয়, যা পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।’

শায়খ নাসিফ আল-ইয়াযিজীর ভাষ্যমতে,

الشعر كلام يقصد به الوزن والتقفية^{১১}.

‘কবিতা হল অর্থবহ বাক্য, যার দ্বারা ছন্দমাত্রা (وزن) ও অন্তর্মিল (قفية) উদ্দেশ্য।’

‘জ্ঞান ও অনুভূতি যে অন্তর্মিল ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যের রূপ দান করে তাকে কবিতা বলে।’

রাসূল (সা.)ও কবিতার একটি চমকপদ পরিচয় দিয়েছেন, যাতে কবিতার পরিচয়ের পাশাপাশি কবিতা রচনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়টিও অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন-

انما الشعر كلام مولف فما وافق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه^{১২}

‘সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কথামালার সমষ্টিই হল কবিতা। আর যে কবিতা সত্যার্চিত হয় তা সুন্দর, পক্ষান্তরে যে কবিতা সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তাতে কোন কল্যাণ নেই।’

কবিতার পরিচয় প্রসঙ্গে Oxford Advanced Learners Dictionary উল্লেখ আছে যে, Piece of writing in verse form, specially one expressing deep feeling or noble thought in beautiful language composed with the desire to communicate on experience.^{১৩}

কবিতার এসকল পরিচয় বিশ্লেষণ করে বলা যায়, মানব হৃদয়ে সৃষ্ট অনুভূতির অর্থপূর্ণ ছন্দময় বহিঃপ্রকাশ-ই হল কবিতা।

রাসূল (সা.) এর পরিচয়

মক্কার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশ কুরাইশ।^{১৪} মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশ বংশে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় জন্মগ্রহণ করেন।^{১৫} নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত তাঁর সর্বাধিক সঠিক বংশধারা হল- ‘মুহাম্মদ ইবন্ আব্দুল্লাহ ইবন্ আব্দুল মুত্তালিব ইবন্ হাশিম ইবন্ আবদে মানাফ ইবন্ কুসাই ইবন্ কিলাব ইবন্ মুররা ইবন্ কা’ব ইবন্ লুআই ইবন্ গালিব ইবন্ ফিহর ইবন্ মালিক ইবন্ নাযর ইবন্ কিনানা ইবন্ খুযায়মা ইবন্ মুদরিকা ইবন্ ইলিয়াস ইবন্ মুযার ইবন্ নিযার ইবন্ মা’আদ ইবন্ আদনান।’^{১৬}

মুহাম্মদ (সা.) শৈশব থেকেই উন্নত চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ছিলেন। সততা, বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার জন্য তিনি ‘আল-আমিন’ তে ভূষিত হন।^{১৭} সমাজ থেকে জুলুম ও অন্যায় দূর করার জন্য ‘হিলফুল ফুযুল’ নামক সংগঠন তৈরি করেন।^{১৮} পরিণত বয়সে খাদিজা বিনত খুযাইলিদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।^{১৯} তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে তাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়।^{২০} কুরআনের ঐশী আলো সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যান। একপর্যায়ে প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি

মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।^{১৯} সাম্য, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিক ও ধর্মীয় অধিকার সুরক্ষা এবং মানব কল্যাণনির্ভর নীতিমালার আলোকে তিনি মদিনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। অবশেষে নবুওয়্যাত ও রিসালাতের গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে পালন শেষে তিনি একাদশ হিজরির বারোই রবিউল আওয়াল, রোজ সোমবার মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন।^{২০}

রাসূল-প্রশস্তির পরিচয়

‘রাসূল-প্রশস্তি’ এর আরবি পরিভাষা হল ‘আল-মাদিহুর রাসূল’ (المديح الرسول)। আল-মাদিহ (المديح) শব্দটি একবচন। বহুবচনে আল-মাদাইহ (المديح وأماديح)। শব্দটির মূলধাতু (ح د م)। অর্থ- প্রশংসা, প্রশস্তি, স্তুতি, গুণগান, তারিফ, স্তব।^{২১} সুতরাং আল-মাদিহুর রাসূল অর্থ মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা ও স্তুতিগাথা। ড. বদর আব্দুল হামিদ রাসূল-প্রশস্তির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন-

المديح الرسول في الاصطلاح هي الأشعار التي تنظم على مدح النبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه بتعداد صفاته الخلقية والخلقية وإظهار الشوق لرؤيته وزيارة قبره والأماكن المقدسة التي ترتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذكر معجزاته المادية والمعنوية ونظم سيرته شعرا وإشادة بغزواته وصفاته المثلى والصلاة عليه تقديرا وتعظيما.^{২২}

‘পরিভাষায় রাসূল-প্রশস্তি বলা হয় এমন কাব্যগাথাকে, যাতে রাসূল (সা.) এর প্রশংসা করা হয়। তাঁর চারিত্রিক ও শারীরিক সৌন্দর্যের গুণকুর্তীর্ণ বর্ণনা করা হয়। তাঁকে দেখার আশ্রয় প্রকাশ করা হয়। তাঁর পবিত্র রওয়া মুবারক এবং জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ যিয়ারতের আশ্রয় প্রকাশ করা হয়। পাশাপাশি তাতে তাঁর আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়। কাব্যিক সুরবাহকার তাঁর জীবনের নানাদিক আলোচিত হয়। তাঁর সমরজীবনের কথাও তাতে স্থান পায় এবং তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্যের বর্ণনার সাথে সাথে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দরদ পেশ করা হয়।’

ড. যাকি মুবারক রাসূল-প্রশস্তির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেন-

قال الدكتور زكي مبارك في تعريف المديح الرسول: هي فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف، فهي لون من التعبير عن العواطف الدينية، وباب من الأدب الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص.^{২৩}

আরবি কাব্য সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল ‘আশ-শিরুল মাদিহ’ (প্রশংসাগাথা)। জাহেলি যুগের অনেক কবিই সম্মানিত ও মর্যাদাবান ব্যক্তিবর্গের কৃতিত্বপূর্ণ কাজের প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগে এসে এর ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পায়।

আরবি কবিতায় রাসূল-প্রশস্তির উদ্ভব

ঐতিহাসিকগণ বলেন, কখন থেকে রাসূল (সা.) এর প্রশস্তিগাথার শুভসূচনা হয়েছে এর সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ধারণা করা হয়, রাসূল (সা.) এর নবুয়াত লাভের পূর্বেই রাসূল-প্রশস্তির উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন সিরাত রচয়িতাগণ রাসূল (সা.) এর নবুয়াতপূর্ব জীবন নিয়ে স্ব স্ব গ্রন্থে অনেক কবিতা উল্লেখ করেছেন। তবে এর অধিকাংশই ছিল খণ্ড কবিতা। ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আবু তালিব নিজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রশংসা করতে গিয়ে রাসূল (সা.) এরও উচ্ছসিত প্রশংসা করেন। তিনি বলেন-

إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر * فعبد مناف سرها وصميمها

وإن حصلت أشراف عبد منافها * ففي هاشم أشرافها وقديمها

وإن فخرت يوما فإن محمدا* هو المصطفى من سرها وكريمها^{২৪}

‘কুরাইশ বংশের লোকেরা যদি কখনো গৌরব করার জন্য সমবেত হয়, তবে আবদে মানাফ-ই সেই মহান ব্যক্তি, যাকে নিয়ে কুরাইশরা গর্ব করতে পারে। আবার আবদে মানাফের সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিদের খুঁজে পেতে চাইলে তাদেরকে হাশিম গোত্রেরই খুঁজতে হবে। তারা যদি আরও গৌরব করতে চায়, তাহলে মুহাম্মদকে নিয়েই তা করতে হবে। কেনান মুহাম্মদ-ই হলেন তাদের মধ্যে মহান ব্যক্তিদের বাছাই করা ব্যক্তি।’

পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবের একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ওরাকা বিন নওফেল। তিনি রাসূল (সা.) এর নবুয়াত লাভের পূর্বে তাঁর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা শুনে তাঁকে নিয়ে কবিতা আবৃত্তি করেছেন। তিনি বলেন-

فتاك الذي وجهت يا خير حرة* بغور وبالنجدين حيث الصحاصح
إلى سوق بصرى في الركاب التي غدت* وهن من الأحمال قعص دوالج
فيخبرنا عن كل خير يعلمه* ولله حق أبواب لهن مفاتيح
بأن ابن عبد الله أحمد مرسل* إلى كل من ضمت عليه الأباطح
وظني به أن سوف يبعث صادقا* كما أرسل العبدان هود وصالح
وموسى وإبراهيم حتى يرى له* بهاء ومنشور من الذكر واضح
ويتبعه حيا لؤي وغالب* شباههم والأشيبون الججاج
فإن أبق حتى يدرك الناس دهره* فإني به مستبشر الود فارح
والأ فإني يا خديجة فاعلمي* عن أرضك في الأرض العريضة سائح^{২৫}

‘হে নজদ ও গাওর এর শ্রেষ্ঠ রমণী! ভারী মাল বোঝাই উটের আরোহী বণিক কাফেলার সাথে বসরার বাজারে তুমি যে যুবককে প্রেরণ করেছিলে, এখন তিনি তোমার কাছে ফিরে এসেছেন। এখন তিনি আমাদেরকে সজ্ঞানে সংবাদ দিচ্ছে সার্বিক কল্যাণের। সত্য প্রকাশের অনেক দ্বার রয়েছে, এ দ্বার খোলার চাবিও রয়েছে। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, এই প্রত্যন্ত মরু অঞ্চলের সকলের প্রতি আব্দুল্লাহর পুত্র আহমদ প্রেরিত হচ্ছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি হুদ, সালিহ, মুসা ও ইবরাহিমের ন্যায় সত্যবাদীরূপে আবির্ভূত হবেন। অচিরেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। দিকে দিকে দৃষ্টি গোচর হতে শুরু করবে তাঁর ঔজ্জ্বল্য। তাঁর অনুসরণ করবে লুআই ও গালিব গোত্র- আবাল, বৃদ্ধ সকলে। তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে তাঁকে পেয়ে আমি বড়ই আনন্দিত হব। অন্যথায় জেনে রাখ হে খাদিজা! তোমার দেশ ত্যাগ করে আমি চলে যাব অন্য কোন প্রশস্ত ভূখণ্ডে।’

রাসূল (সা.) এর সম্মানিতা মাতা আমিনা প্রিয়পুত্র মুহাম্মদ (সা.) কে জন্মদানের পূর্বে প্রায়ই নানারকম আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখতেন। কখনো তিনি দেখতেন, কেউ তাকে সম্বোধন করে বলছে- ‘তুমি একজন জগত বিখ্যাত সন্তান ভূমিষ্ঠ করতে যাচ্ছে। যাকে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথিবী বাসীর নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে।’ এমন অদ্ভুত স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন। এবং হৃদয়ের মাধুরি মিশিয়ে সেই অনাগত সন্তানের প্রশংসা করে কবিতা আবৃত্তি করতেন। মা আমিনার ভাষায়-

بارك فيك الله من غلام* يا ابن الذي في حومة الحمام

نجا يعون الملك العلام* فودي غداة الضرب بالسهام

بِمَائِهِ مِنْ إِبْلِ سَوَامٍ* إِنَّ صِحَّ مَا أَبْصَرْتُ فِي الْمَنَامِ
فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ * تَبَعْتُ فِي الْحَلِّ وَفِي الْحَرَامِ
تَبَعْتُ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ * دِينَ أَبِيكَ الْبَرِّ إِبْرَاهِيمَ
فَاللَّهُ يَهْدِيكَ إِلَى الْأَصْنَامِ * أَنْ لَا تُؤَالِهَافِ مَعَ الْأَقْوَامِ^{২৬}

‘হে সম্ভ্রান্ত বিশাল বংশের সন্তান তুমি, তোমার প্রতি প্রভু বরকত বর্ষণ করুন। মহাজ্ঞানী ও বিশ্বচরাচরের অধিপতির কৃপায় তুমি সফলতা লাভে ধন্য হও। আমি যা স্বপ্নে দেখেছি, তা যদি বাস্তবায়িত হয় তবে অক্ষত শত উট উৎসর্গ করে দিব আমি। প্রেরিত হচ্ছে তুমি জগত বাসীর কাছে। প্রেরণ করা হচ্ছে তোমাকে হিল ও হারামের সবার কাছে। তোমাকে প্রেরণ করা হচ্ছে একত্ববাদ ও তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য। যা তোমার পুণ্যবান পিতা ইবরাহিম (আ.) এর দীন ছিল। সুতরাং আল্লাহ তোমাকে প্রতিমাপূজা থেকে নিষেধ করছেন যেন তুমিও গোত্রের লোকদের সাথে তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ না কর।’

রাসূল (সা.) এর নবুয়াত লাভের পূর্বে এমন খণ্ডকবিতার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ইসলামি যুগে এসেই রাসূল-প্রশস্তির উদ্ভব ঘটে। সাহিত্য সমালোচকদের মতে, জাহেলি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আশা ইবন্ কায়েস-ই সর্বপ্রথম রাসূল (সা.) এর গুণগান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ কাসিদা (قصيدة) রচনা করেন। যা আল-আশার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি রূপে বিবেচিত হয়। তিনি এ কবিতায় রাসূল (সা.) এর প্রশংসা করার পাশাপাশি তাঁর নিকট গমন ও সাক্ষাত লাভের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করেন। তাঁর রচিত সেই কবিতার দুটি আবেগময় পংক্তি হল-

أَجِدْتُ بَرَجِلَهَا النِّجَاءَ وَرَاجَعْتُ * يَدَاهَا خَنَافًا لَنَا غَيْرَ أُخْرَدَا
فَالْيَتُّ لَا أَزِي لَهَا مِنْ كِلَالَةٍ* وَلَا مِنْ حَفَى حَتَّى تَزُورَ مُحَمَّدًا^{২৭}

‘আমি শপথ করে বলছি যে, ক্লান্ত হয়ে পড়লেও এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কারণে তার পাগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও আমি তাকে বিশ্রাম করতে দিব না। যতক্ষণ না সে মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট গিয়ে পৌঁছে। হাশিমের বংশধর মুহাম্মদ (সা.) এর দরজায় গিয়ে পৌঁছতে পালে সে বিশ্রাম করতে পারবে এবং তাঁর অফুরান অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে।’

ঐতিহাসিক ও সাহিত্য সমালোচকগণ আরবি কবিতার বিকাশকালকে ছয়টি যুগে ভাগ করে থাকেন।^{২৮}

জাহেলি যুগ ব্যতীত সকল যুগেই এমন অসংখ্য কবির সন্ধান পাওয়া যায়, যারা রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবানদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মূলত রাসূল (সা.) এর প্রশংসা ও গুণ বর্ণনায় এসকল কবির নান্দনিক কাব্যগাথা ও অনবদ্য প্রচেষ্টার ফলেই আরবি কাব্য সাহিত্যে ‘রাসূল-প্রশস্তি’র বিকাশ সাধন হয়। এবং ধীরে ধীরে তা স্বতন্ত্র কাব্যধারায় রূপ লাভ করে।

ইসলামি যুগে রাসূল-প্রশস্তি

ইসলামি যুগ বলতে বুঝায় রাসূল (সা.) এর নবুয়াত লাভের পর থেকে নিয়ে খোলাফায়ে রাশিদুনের শেষ সময়কালকে। আলী (রা.) এর হত্যার মধ্য দিয়ে ইসলামি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটে।^{২৯} কবিতা ছিল আরবদের প্রাণের স্পন্দন। কবিতার মাধ্যমেই তারা হৃদয়ের অভিব্যক্তি ও আবেগ প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রীতিবোধ করত। ইসলাম আগমনের পর আরবি কাব্যচর্চার স্বাভাবিক গতিধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়। ইসলাম সেসময়ের প্রচলিত কাব্যচর্চাকে নিরুৎসাহিত করে, যা অশ্লীল ও ক্লেদাক্তভাবে অভিব্যক্তি থেকে উৎসারিত;

যা মানুষকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিকে ধাবিত করে। আর যেসমস্ত কবিতার মাধ্যমে সুস্থ মননশীলতা ও রুচিশীল চেতনা বিকশিত হয় সেসকল বিষয়ে কাব্য রচনাকে ইসলাম উৎসাহিত করে। ইসলামি যুগ পর্যন্ত আরবি কবিতা মূলত দু'টি ধারায় বিকশিত হতে থাকে। একটি সম্পূর্ণ জাহেলি ভাবধারায়, অপরটি বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে জাহেলি এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে ইসলামি।

রাসূল (সা.) এর বহু সাহাবি ইসলাম আগমনের পূর্বে প্রথম সারির কবিদের কাতারে গণ্য ছিলেন। আরবি কাব্যজগতের দিগন্ত বিস্তৃত উদ্যানে তাদের ছিল দৃশ্যপদচারণা। কিন্তু যখন নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়-

الشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ - أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ - وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ - إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ غَدٍ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ^{৩০}

‘বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদেরকে অনুসরণ করে। তুমি (মুহাম্মাদ) কি দেখ না যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়? তারা যা বলে তা করে না। তবে তাদের কথা ব্যতিক্রম যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে। তারা বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে। আর অত্যাচারিত হলে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর অত্যাচারিরা শীঘ্রই জানতে পারবে যে, তাদের পরিণতি কি হতে পারে।’

আল্লাহর এমন ঘোষণায় মুমিন ও তাওহিদপন্থী কবিগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। নিজেদের কর্মের জন্য তারা অনুশোচনার অনলে দগ্ধ হতে থাকেন। একপর্যায়ে তারা বিষয়টি নিয়ে অবনত মস্তকে রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হন। তাদের মাঝে অনেকেই তখন ক্রন্দরত ছিলেন। বিশেষত হাসসান বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা এবং কা'ব ইবন্ মালিক। তারা নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে বেশ শক্তিত ও ভয়ান্ত ছিলেন। রাসূল (সা.) তাদেরকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে, এই আয়াতগুলো তাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং তাতে অবিশ্বাসী, মুশরিক ও মুনাফিক কবিদের ভয়াভহ পরিণতির কথা হয়েছে। যারা অশ্লীল কবিতা রচনা করে মানুষদেরকে খারাপ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সমাজে অশ্লীলতার প্রসার ঘটায়। আর শেষের দিকে বিশ্বাসী মুমিন কবিদের কথা বলা হয়েছে। যারা তাদের কবিতার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর প্রশংসা ও গুণগান করে। কাব্যের ভাষায় যারা মানুষদেরকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বান করে। সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রসার ঘটায়।

এরপর মুমিন ও বিশ্বাসী কবিগণ নব উদ্যোগে কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী কাব্যচর্চায় অধিকতর মনোনিবেশ করেন। তারা তাওহিদ, রিসালাত, আসমানি কিতাব ও অন্যান্য বিষয়ে কবিতা রচনার পাশাপাশি রাসূল (সা.) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও স্তুতিজ্ঞাপন শুরু করেন। এক্ষেত্রে হাসসান বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, কা'ব বিন মালিক, আশা ইবন্ কায়েস, লাবিদ বিন রাবি'আ, আমান বিন মিরদাস, খানসা ও নাবিঘা আল-জাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে ইসলামি যুগে যেসকল প্রসিদ্ধ ও বিখ্যাত কবি রাসূল (সা.) এর স্তুতিগাথা রচনায় অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন এবং আরবি কাব্যে ‘রাসূল-প্রশস্তি’র এক সুবিস্তৃত জগৎ বিনির্মাণ করেছেন। তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় রচিত কবিতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হল।

ওরাকা বিন নওফেল

রাসূল (সা.) এর নবুয়াত লাভের শুরুর দিকে এমন দু'জন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, যারা ইসলাম গ্রহণ না করেও রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তাদের একজন ওরাকা বিন নওফেল। অপরজন আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব। ওরাকা একজন ধর্মযাজক ছিলেন। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি রাসূল (সা.) এর প্রিয়তম স্ত্রী খাদিজা বিনত্ খুয়াইলিদের চাচাতো ভাই। তিনি রাসূল (সা.) নবুয়াত লাভের অল্প কিছুদিন পরই মৃত্যুবরণ করেন।^{৩১}

সিরাত বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে ওরাকা বিন নওফেল রচিত কিছু কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, যাতে তিনি রাসূল (সা.) এর নানাগুণাবলির কথা বর্ণনার পাশাপাশি তাঁর নবুয়াত লাভের স্বীকৃতি প্রদান ও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। যেমন- প্রথম ওহি লাভের পর খাদিজা (রা.) ওরাকার কাছে গমন করেন এবং হেরাণ্ডহায় সংগঠিত ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। সব শুনে ওরাকা রাসূল (সা.) এর নবুয়াত ও রিসালাতের স্বীকৃতি ও সুসংবাদ প্রদান করতঃ বলেন-

وإن يك حقاً يا خديجة فاعلمي * حديثك إياها فأحمد مرسل
وجبريل يأتيه وميكال فاعلمي * من الله وحى يشرح الصدر منزل
وخبرني بأمر قد سمعت به * فيما مضى من قديم الدهر والعصر
بأن أحمد يأتيه فيخبره * جبريل انك مبعوث إلى البشر^{৩২}

‘হে খাদিজা! ‘আমার নিকট বর্ণনা করা তোমার কথাগুলো যদি সত্য হয়, তবে তুমি জেনে নাও যে, আহমদ নিশ্চয়ই রাসূল রূপে প্রেরিত। তাঁর নিকট জিবরাইল ও মিকাইল আসবেন। তাঁদের সাথে থাকবে আল্লাহর নাযিলকৃত ওহি। ওহি ওহি তাঁর বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিবে। আমি একটি বিষয় সম্পর্কে শুনে আসছি, যে ব্যাপারে আমাকে সুদূর অতীত থেকে এবং সুপ্রাচীনকাল থেকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর তা হল এই যে, আহমদের নিকট ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) আগমন করবেন এবং তাঁকে জানিয়ে দিবেন যে, আপনি মানবজাতির প্রতি (হেদায়াতের জন্য) প্রেরিত আল্লাহর রাসূল।’

তিনি আরও আবৃত্তি করেন-

وأرسله إلينا كي نأثله * عن أمـهـره ما يرى في النوم والسهـر
فقال حين أنانا منطقاً عجباً * يقف منه أعالي الجلد والشعر
إني رأيت أمين الله واجبي * في صورة أكملت من أعظم الصور
ثم استمر فكاد الخوف يذعـرنـي * مما يسلم من حولي من الشجر
فقلت ظني وما أدري أصدقني * ان سوف يبعث يتلو منزل السور^{৩৩}

‘তুমি তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তাকে উপলক্ষ করে ঘটে যাওয়া বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করব এবং নিদ্রিত বা সজাগ অবস্থায় তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন তা আমি জেনে নিব। তিনি যখন আমার নিকট আসলেন, তখন তিনি বিস্ময়কর ঘটনা বললেন, যা শুনে চর্মের উপরিভাগ ও লোমগুলো কেঁপে উঠল। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর আমানতদার ফেরেশতা জিবরাইলকে দেখেছি, তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন এক জ্যোতির্ময় আকৃতি নিয়ে, যা দৃশ্যত ছিল সর্ববৃহৎ। তারপর তিনি নিয়মিত আসতে থাকেন। আশেপাশে থাকা বৃক্ষরাজির সালাম আমাকে ভীতিগ্রস্ত করে তুলে। আমি বললাম, তিনি আমাকে সত্যবাদী বলবে কিনা তা আমি জানি না। বস্তুত, আমি ধারণা করছি যে, অবিলম্বে তিনি রাসূল রূপে প্রেরিত হবেন। এবং আল্লাহর নাযিলকৃত সূরাসমূহ পাঠ করবেন।’

ওরাকা বিন নওফেল পূর্ববর্তী কিতাব ও সমসাময়িক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পেরেছিলেন, একজন নবির আগমন অত্যাশ্চর্য। কিন্তু তাঁর আগমন বিলম্ব হওয়ায় তিনি আক্ষেপের সুরে আবৃত্তি করতেন-

بِأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُودُ فِينَا * وَيَخْصِمُ مَنْ يَكُونُ لَهُ حَاجِبًا
وَيَنْظُرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءَ نُورٍ * يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيَّةُ أَنْ تَمُوجَا
فِيَا لَيْتَنِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُم * شَهِدْتُ فَكُنْتُ أَوْلَهُمْ وَلَوْجَا^{৩৪}

‘মুহাম্মদ অচিরেই আমাদের সরদার ও নেতা হবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীকে তিনি পরাজিত করবেন। দেশের সর্বত্র আলো ছড়াবেন। যে আলো দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিজগৎকে তিনি আলোক উজাসিত করে তুলবেন। হায় আফসোস! যখন এসব ঘটনা ঘটবে তখন যদি আমি উপস্থিত থাকতাম, তাহলে তোমাদের মধ্যে সবার আগে আমি তাঁর দলভুক্ত হতাম।’

আবু তালিব ইবনু আব্দুল মুত্তালিব

আবু তালিব (৫৪৯-৬১৯ খ্রি.) ছিলেন কুরাইশী নেতা ও রাসূল (সা.) এর চাচা। দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ইন্তেকালের পর তিনি রাসূল (সা.) এর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এবং আমৃত্যু তাঁকে সহযোগিতা করে যান। তিনি রাসূল (সা.) এর প্রশংসা ও তাঁকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি রাসূল (সা.) এর মুখায়বের সৌন্দর্য ও বরকতের কথা উল্লেখ করে বলেন-

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * ثمال اليتامى عصمة للأرامل
يلوذ به الهالك من آل هاشم * فهم عنده في نعمة وفواضل^{৩৫}

‘তিনি শুভ্র মুখমণ্ডল বিশিষ্ট পূণ্যময় মানুষ। তাঁর ওসিলায় মেঘ থেকে বৃষ্টি কামনা করা হয়। সে অসহায় এতিমদের সহায় এবং বিধবা নারীদের আশ্রয়স্থল। তিনি এমন এক মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় ব্যক্তি যার দ্বারা হাশিম পরিবার বিপর্যয়ের সময় মুক্তি কামনা করে থাকে।’

রাসূল (সা.) মূর্তিপূজা পরিহার করে একত্ববাদে বিশ্বাসের প্রতি আহবান জানালে মক্কার মুশরিকরা বিরোধিতা শুরু করে এবং প্রচারকার্যে বাধা দেয়। এক পর্যায়ে তারা রাসূল (সা.) কে হত্যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চাচা আবু তালিব বিষয়টি জানতে পেরে মুশরিকদের ভর্ৎসনা করেন এবং রাসূল (সা.) কে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ান। তাঁর ভাষায়-

كذبتم وبيت الله نبي محمد * ولما نقاتل دونه ونناضل

ونسلمه حتى نصرع حوله * ونذهل عن أبنائنا والحلائل^{৩৬}

‘বাইতুল্লাহর কসম! তোমাদের ধারণা নিশ্চিতভাবে মিথ্যা। আমরা কখনো মুহাম্মদকে ফেলে দিব না, তোমাদের হাতেও তুলে দিব না। বরং তাঁর পাশে থেকে তোমাদের প্রতি তীর ও বর্শা নিক্ষেপ করব। তাকে রক্ষা করব এবং নিরাপদ রাখব। প্রয়োজনে তাঁর চারপাশে অবস্থান করে আমরা নিজেরা শত্রুর আঘাতে জর্জরিত হব এবং আমাদের স্ত্রী-পুত্রের কথা ভুলে যাব।’

আশা ইবনু কায়েস

জাহেলি যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আশা ইবনু কায়েস (৫৭০-৬২৯ খ্রি.)। কোন কোন সাহিত্য সমালোচক তাকে মুয়াল্লাকা রচয়িতাদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। মূলত তিনি-ই সর্বপ্রথম রাসূল (সা.) এর গুণগান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ কাসিদা (قصيدة) রচনা করেন। যা আল-আশার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকীর্তি রূপে

বিবেচিত হয়। এবং সেসময়ে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়। ইবন্ সালাম তাকে জাহেলি যুগের প্রথম সারির কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এবং তাকে জাহেলি যুগের আরবি কাব্যের দুই দিকপাল ইমরুল কায়েস ও যুহাইর ইবন্ আবি সুলমার সমপর্যায়ের বলে মত ব্যক্ত করেছেন।^{৩৭}

আশা ইবন্ কায়েস ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তেইশ পংক্তি বিশিষ্ট একটি কবিতা রচনা করে রাসূল (সা.) এর সাক্ষাত লাভের আশায় মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী হলে কুরাইশ বংশের কতিপয় মুশরিক ব্যক্তি তার সাথে মিলিত হয়ে মক্কায় আগমনের কারণ সম্পর্কে জানতে চায়। আশা ইসলাম গ্রহণে তার আগ্রহের কথা বললে মুশরিকরা তাকে ইসলাম গ্রহণ না করার শর্তে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আশা তাদের দেওয়া সম্পদ নিয়ে ইসলাম গ্রহণ না করেই নিজ জনপদে ফিরে আসে। পরবর্তী বছর সে আবার ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ নিয়ে মক্কায় আগমন করে কিন্তু রাসূল (সা.) এর সাথে সাক্ষাত লাভের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে।^{৩৮}

আশা ইবন্ কায়েস রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় রচিত তাঁর বিখ্যাত কবিতায় গুরুত্রে নিজের শৈশব, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব কালকে কিভাবে শুধুমাত্র সম্পদ অর্জনের পিছনে ব্যয় করেছেন এবং কার্যত কোন সফলতা লাভে সমর্থ হননি, তা আক্ষেপের সুরে বর্ণনা করেন। এরপর যখন তিনি ইসলামের আহবান পান তখন সবকিছু পরিহার করে রাসূল (সা.) এর নিকট গমন ও তাঁর সাক্ষাত লাভের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষায় দুপুরের প্রচণ্ড খরতাপে তার বাহনকে কিভাবে পরিচালনা করেছিলেন তা উপস্থাপন করেন। তাঁর ভাষায়-

شباب وشيـب وافـتقار وثـروة * فـلـله هـذا الدهـر كـيف تـردد
وما زلت أـبـغـي المـال مـذ أنـا يـافـع * وـلـيـدا وكـهـلا حـين شـيـت وأـمـردا
وأبـتـذل العـيـس المـراقـيل تـغـتـلي * مـسـافـة مـا بـيـن النـجـير فـصـرـخـدا
ألا أئـهـذا السـائـلي أئـن يـمـمـت * فـإن لـهـا فـي أهـل يـثـرب مـوعـدا
فإن تـسـألـي عـنـي فـيـا رـب سـائـل * حـفـي عـن الأـعـشـى بـه حـيـث أـصـعدا
فأما إذا مـا أـذـلـجـت فـتـرى لـهـا * رـقـيـبـيـن: جـدـيا لا يـغـيـب وـفـرـقـدا
وفـيـهـا إذا مـا هـجـرت عـجـز فـيـة * إذا خـلت جـزـاء الطـهـيرة أـصـيدا
أجـدت بـرجـلـهـا النـجـاء وراـجـعت * يـداهـا خـنـافـا لـيـنـا غـيـر أـخـردا
فألـيـت لا أـزـي لـهـا مـن كـلـالة * ولـا مـن حـفـى حـتى تـزور مـحـمـدا^{৩৯}

‘আমি অবিরাম ধন-সম্পদ অর্জনে ব্যস্ত ছিলাম। শৈশব, যৌবন এবং প্রৌঢ়ত্ব সকল বয়সে আমি তাই করেছি। এখন আমি আমার থাকী রঙের দ্রুতগামী ঘোড়া ছুটিয়েছি নাজিব ও মারখাদ অঞ্চলের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করার জন্য। হে লোকসকল! যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, আমার গন্তব্য কোথায়? তুমি শুনে নাও আমার অশ্ব ইয়াছরিব পৌছার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তুমি যদি তবু আমার ব্যাপারে প্রশ্ন কর, তবে এমন বহু প্রশ্নকর্তা আছে, যারা খুব ভালভাবে জানে যে, আশা কোথায় অধিষ্ঠিত। লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য আমি আমার অশ্বের পেছনের পা দুটিকে উঁচু ভূমির দিকে দ্রুত চালিয়েছি এবং সামনের পা দুটিকে আমার দিকে আলতোভাবে ঝুঁকিয়ে দিয়েছি। আমি তাকে অলসতা করার সুযোগ দেইনি। মধ্যাহ্নের বেপরোয়া গতিতে সে যখন দুপুরের প্রচণ্ড খরতাপে ছুটে, তখন তাকে মনে হয়েছে যেন এক মস্ত বড় অহংকারী অশ্ব।

আমি শপথ করে বলছি যে, ক্লান্ত হয়ে পড়লেও এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রমের কারণে তার পাগুলো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেও আমি তাকে বিশ্রাম করতে দিব না। যতক্ষণ না সে মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট গিয়ে পৌঁছে।’

এরপর তিনি রাসূল (সা.) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিশ্বময় তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (সা.) এর দানশীলতার বিষয়টি তার কাব্যের ভাষায় উপস্থাপন করেন। আশা ইবন্ কায়েস (৫৭০-৬২৯ খ্রি.) এর ভাষায়-

مَتَى مَا تُنِيخِي عِنْدَ بَابِ ابْنِ هَاشِمٍ * تُرِيحِي وَتَلْقِي مِنْ فَوَاضِلِهِ نَدَى
نَبِيٍّ يَرَى مَا لَا يَرُونَ وَذِكْرُهُ * أَغَارَ لَعْمُرِي فِي الْبِلَادِ وَأُنْجَدَا
لَهُ صَدَقَاتٌ مَا تَغِيبُ وَنَائِلٌ * وَلَيْسَ عَطَاءُ الْيَوْمِ مَانِعُهُ غَدَا
أَجْدَاكَ لَمْ تَسْمَعْ وَصَاةَ مُحَمَّدٍ * نَبِيِّ الْإِلَهِ حَيْثُ أَوْصَى وَأَشْهَدَا^{৪০}

‘হাশিমের বংশধর মুহাম্মদ (সা.) এর দরজায় পৌঁছলেই সে বিশ্রাম করতে পারবে এবং তাঁর অফুরান অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে। তিনি তো এমন নবি, তোমরা যা দেখতে পাও না, তিনি তা দেখতে পান। আমার জীবনে শপথ! তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। এবং সবকিছুর উপর বিজয় মণ্ডিত হয়েছে। তিনি অনবরত দান সদকা করেন। এমন নয় যে, একদিন দিলে আরেকদিন বন্ধ রাখেন। তার একদিনের দানদক্ষিণা পরের দিনের দান-দক্ষিণার জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। তোমার অদৃষ্টির কসম! তুমি কি মুহাম্মদ (সা.) এর উপদেশ শুননি? তিনি তো আল্লাহর নবি। বস্তুত তিনি উপদেশ দিয়েছেন এবং সত্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন।’

লাবিদ বিন রাবি’আ

জাহেলি যুগের সত্যসন্ধানী কবি ছিলেন লাবিদ (৫১৫-৬৬১ খ্রি.)। তার পূর্ণনাম আবু আকিল লাবিদ বিন রাবি’আ বিন মালিক আল-আমিরী। তিনি আরবের হাওয়াযিন গোত্রে জন্ম ৫১৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি একজন সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাকে জাহেলি যুগের খ্যাতিমান কবিদের মাঝে গণ্য করা হয়। বিশেষত তিনি মু’আল্লাকা রচয়িতাদের মাঝে অন্যতম। তিনি জাহেলি ও ইসলামি উভয় যুগ পেয়েছেন। এজন্য তাকে ‘মুখাদরাম’ কবি বলা হয়। তার কবিতার বিষয় ছিল তৎকালীন আন্তঃগোত্রীয় বিরোধ। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কব্যচর্চা পরিহার করেন। তিনি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।^{৪১} লাবিদ বিন রাবি’আ ইসলামের আহ্বান পেয়ে স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে নিয়ে রাসূল (সা.) এর নিকট আগমন করেন। রাসূল (সা.) কে ‘খাইরুল বারিয়াহ’ (সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ) সম্বোধন করেন এবং ইসলাম গ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেন-

أَتَيْنَاكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَا * لِنَرْحَمَنَّكَ وَمِمَّا لَقِينَا مِنَ الْأَزْلِ
أَتَيْنَاكَ وَالْعَذْرَاءُ يَدُمِي لِبَائِهَا * وَقَدْ ذَهَبَتْ أُمُّ الصَّبِيِّ عَنِ الْوَلَدِ^{৪২}

‘হে সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি! আমরা বিপদে নিমজ্জিত হয়ে তা থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় বুক বেঁধে আপনার নিকট উপস্থিত হয়েছি। অনাবৃষ্টির ফলে সবকিছু শুষ্ক মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এমনকি অনাহারের ফলে যুবতীদের স্তন শুকিয়ে গেছে এবং আদুরে সন্তানকে তার মাতা ভুলে গেছে।’

নাবিঘা আল-জাদি

নাবিঘা আল-জাদি (৫৬৮-৬৮৪খ্রি.) জাহেলি যুগের আরেক প্রথিতযশা কবি। তাকে দীর্ঘজীবী কবি বলা হয়।^{৪০} তিনিও রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। তার নিকট ইসলামের আহবান পৌঁছলে তিনি সে আহ্বানে সাড়া দেন এবং রাসূল (সা.) এর নিকট ছুটে আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহণকালে রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। যাতে তিনি রাসূল (সা.) এর ভূয়সী প্রশংসা করেন।^{৪৪} তিনি বলেন-

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى * ويتلو كتاباً كالمجرة نيرا

بلغنا السماء مجدنا وجدودنا * وإنا لنترجو فوق ذلك مظہرا^{৪৫}

‘আমি আল্লাহর রাসূলের নিকট আগমন করেছি, যিনি হেদায়াতে নিয়ে এসেছেন। তিনি একটি কিতাব থেকে তিলাওয়াত করেন, যে কিতাব ছায়া পথের ন্যায় উজ্জ্বল। আর আমাদের সম্মান ও মর্যাদা আসমান অবধি পৌঁছে গেছে। আমরা প্রত্যাশা করি তা জান্নাত অবধি পৌঁছবে।’

হাসসান ইবন্ সাবিত

রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় যেসকল কবি কবিতা রচনা করেছেন তাদের মাঝে সবচেয়ে আলোচিত ও বিখ্যাত কবি হলেন হাসসান ইবন্ সাবিত (৫৬৪-৬৬২ খ্রি.)। তার প্রকৃত নাম হাসসান। উপনাম আবু ওয়ালিদ, আবু হুসাম ও আবু আব্দুর রহমান।^{৪৬} উপাধি ‘শাইরুল রাসূল (রাসূলের সভাকবি), শাইরুল মাদার (নগর কবি)’ তিনি খায়রাজ এর শাখাগোত্র আন-নাজ্জারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সাবিত ইবন্ মনযুর। যিনি একজন প্রভাবশালী গোত্রপতি ছিলেন। মাতা আল-ফুরায়‘আ ছিলেন খাজরাজ গোত্রের সম্মানিতা রমণী। কবি হাসসান ইবন্ সাবিত শৈশব থেকেই শহুরে পরিবেশে লালিতপালিত হন। ফলে তার কবিতায় নগর জীবনের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তিনি গোত্রীয় কবি হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সিরিয়ার গাসসানি ও হিরার মুনযির রাজদরবারের কবি হিসেবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।^{৪৭}

রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরতের পর কবি হাসসান স্বগোত্রীয় লোকদের সাথে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি কাব্যপ্রতিভার দ্বারা ইসলামের সেবা করেন। বিশেষত যেসকল অবিশ্বাসী ও মুশরিক কবি নবি ও ইসলামের কুৎসা রটনা করে কবিতা রচনা করত, তিনি তাদেরকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন। যা তাদের হৃদয়ে তীরের মত বিদ্ধ হত এবং অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দিত। এ কাজে উৎসাহ দিয়ে রাসূল (সা.) হাসসানকে বলতেন- ‘হে হাসসান! তুমি কবিতার মাধ্যমে তাদের নিন্দবাদ কর। জিবরাইল (আ.) তোমার সাথেই রয়েছেন।’^{৪৮} রাসূল (সা.) এর দৈহিক সৌন্দর্য ও চারিত্রিক মাধুর্যের সুনিপুণ চিত্র উপস্থাপন করে হাসসান ইবন্ সাবিত (রা.) বলেন-

وأحسن منك لم ترقط عيني * وأجمل منك لم تليد النساء

خلقت مبراً من كل عيب * كأنك قد خلقْتَ كما تشاء^{৪৯}

‘আমার দু’চোখ আপনার চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে কখনো দেখিনি। কোনো রমণী আপনার চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে প্রসব করেনি। আপনাকে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনি যেভাবে চেয়েছেন ঠিক সেভাবেই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।’

মুশরিক ও অবিশ্বাসী কবিরা ইসলাম ও রাসূল (সা.) এর বিরুদ্ধে নিন্দা, কুৎসা ও ব্যঙ্গোক্তি করে কবিতা রচনা করে। রাসূল (সা.) তাদেরকে সমুচিত জবাব ও উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে সাহাবীদেরকে কবিতার মাধ্যমে জবাব দেওয়ার আহ্বান জানান- *ما يمنع القوم الذين نصرُوا رسولَ الله بسلَاحِهِمْ، أن ينصروه بالسنتِهِمْ*

‘যারা অস্ত্র-শস্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করছে কথা (কবিতা) দ্বারা সাহায্য করতে তাদের কে বাধা প্রদান করেছে?’ রাসূল (সা.) এর এই ঘোষণার পর অনেক তাওহিদপন্থী কবি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন। তারা রাসূল (সা.) এর পিতৃপুরুষ, বংশীয় অভিজাত্য ও শৌর্য বীর্যের বর্ণনা দিয়ে এমন কবিতা রচনা করেন যার ফলে তাদের মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। হাসসান ইবন্ সাবিত আবু সুফিয়ানকে তিরস্কার করে বলেন-

أَلَا أَبْلُغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنِّي * فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ نَجَبٌ هَوَاءٌ

هَجَوْتُ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ * وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءُ

أَتَهْجُوهُ وَلَسْتُ لَهُ بِكَفٍ * فَشَرُّكُمْ لِخَيْرِكُمَا الْفِدَاءُ

هَجَوْتُ مُبَارَكًا بَرًّا حَنِيفًا * أَمِينَ اللَّهِ شَيْئَمَنْهُ الْوَفَاءُ

فَمَنْ يَهْجُو رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ^{৫০}

কা'ব ইবন্ যুহাইর

কা'ব ইবন্ যুহাইর (৬৪৭ খ্রি.) রাসূল (সা.) এর একজন সম্মানিত সাহাবি ও মুখাদরাম কবি। তার প্রকৃত নাম কা'ব।^{৫১} উপনাম আবু উকবা ও আবু মুদাররাব।^{৫২} পিতার নাম যুহাইর ইবন্ আবি সুলমা, যিনিও আরবের একজন প্রখ্যাত কবি ছিলেন। তার বংশধারা হল, কা'ব ইবন্ যুহাইর ইবন্ আবি সুলমা ইবন্ রাবি'আ ইবন্ রিবাহ ইবন্ কুরত ইবন্ আল-হারিস। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কা'ব মুসলিম সতীসাপ্তরী রমণীদের কুৎসা বর্ণনা করে কবিতা রচনা করতেন। রাসূল (সা.) নারী জাতির এমন অপমানের বিষয়টি জানতে পেরে তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। পরিশেষে কা'ব নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং ‘বানাত সুয়াদ’ শীর্ষক কবিতা রচনা করে রাসূল (সা.) এর নিকট উপস্থিত হন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এই কবিতায় তিনি রাসূল (সা.) এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাসূল (সা.) তার এ কাসিদা আত্মহ সহকারে শ্রবণ করেন এবং পূর্ণ কবিতা শ্রবণে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন। কা'ব বলেন-

أُنَبِّئُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْعَدَنِي * وَالْعَفْوَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَأْمُولُ

وَقَدْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُعْتَذِرًا * وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقْبُولُ

مَهْلًا هَذَاكَ الَّذِي أَعْطَاكَ نَافِلَةً * الْقُرْآنَ فِيهَا مَوَاعِظٌ وَتَفْصِيلُ

لَا تَأْخُذْنِي بِأَقْوَالِ الْوُشَاةِ وَلَمْ * أَذْنِبْ وَقَدْ كُثِرَتْ فِي الْأَقْوَالِ^{৫৩}

‘আমাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কাছে তো ক্ষমা প্রত্যাশা করা যায়। অতএব আমি ক্ষমাপ্রার্থী রূপে আল্লাহর রাসূলের কাছে আগমন করেছি। আর এই ক্ষমা প্রার্থনা তাঁর নিকট গৃহীত হয়ে থাকে। আমাকে একটু সময় দিন। সেই মহান সত্তা আপনাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, যিনি অতিরিক্ত অনুগ্রহ রূপে আপনাকে কুরআন দান করেছেন। যে

কুরআনে রয়েছে উপদেশ মালা ও বিশদ ব্যাখ্যা। নিন্দুকের কথা আমাকে পাকড়াও করবেন না। কারণ আমি কোন অপরাধ করিনি। যদিও আমার সম্পর্কে অনেক বেশি কথাবর্তা হয়ে গেছে।’

রাসূল (সা.) এর স্তুতিজ্ঞাপন করতে গিয়ে কা’ব বিন মালিক তাঁকে আলোকবর্তিকা ও আল্লাহর তরবারি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এরপর তিনি সাহাবিদের মদিনায় হিজরত, সাহাবায়ে কেরামের শারীরিক সৌন্দর্য ও যুদ্ধে ক্ষেত্রে তাদের শৌর্য-বীর্যের নান্দনিক বর্ণনা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন-

إِنَّ الرُّسُولَ لَنُورٍ يُسْتَضَاءُ بِهِ * مُهَنْدٌ مِنْ سِي—وَفِ اللَّهِ مَسْئُولُ
فِي فِتْنَةٍ مِّنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ * بِيَطْنٍ مَّكَهَ لَمَّا أَسْلَمُوا زُؤُلُوا
زَالُوا فَمَا زَالَ أَنْكَاسٌ وَلَا كُشْفٌ * عِنْدَ الْإِلْقَاءِ وَلَا مِيلٌ مَّعَاذِلُ
شُمُّ الْعَرَانِينَ أَبْطَالٌ لُّبُوسُهُمْ * مِنْ نَّسَجٍ ذَاوُدَ فِي الْهَيْجَا مَرَابِيلُ
بِيَضٌ سَوَابِغٌ قَدْ شُكِّتْ لَهَا حَلَقٌ * كَأَنَّهَا حَلَقُ الْفَفْعَاءِ مَجْدُولُ
يَمْشُونَ مَشْيَ الْجَمَالِ الزُّهْرُ يَعْصِمُهُمْ * ضَرْبٌ إِذَا عَرَّذَ السُّودَ التَّنَابِيلُ
لَا يَفْ—رَحُونَ إِذَا نَالَتْ رِمَاحُهُمْ * قَوْمًا وَلَيْسُوا مَجَازِيْعًا إِذَا نِيلُوا
لَا يَفْعُ الطَّعْنُ إِلَّا فِي نُحُورِهِمْ * وَمَا لَهُمْ عَنْ جِيَاضِ الْمَوْتِ تَهْلِيلُ^{৫৪}

‘নিশ্চয়ই নবিজি এমন জ্যোতি, যার দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি আল্লাহর তলোয়ার সমূহের অন্যতম ভারতীয় তরবারী যা সতত নিকোষিত। কুরাইশ বংশীয় যুবকরা যখন মক্কার উপত্যকায় ইসলাম গ্রহণ করছিল তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেন-‘তোমরা সবাই মক্কা থেকে মদিনার দিকে সরে যাও’। ফলে তারা মদিনার দিকে সরে পড়ল। তবে যারা দুর্বল এবং সম্মুখসমরে বর্মহীন, অস্ত্রহীন এবং অশ্বোপরি ঢলে পড়ে, তারা সরলো না। তারা (সাহাবাগণ) উন্নত-নাসা, বীর কেশরী, রণপ্রান্তরে তাদের পরিধয় পোশাক হচ্ছে দাউদ (আ) এর তৈরি বর্মসমূহ। শ্বেতোজ্জ্বল ও ঢিলা সর্বাংগ আবৃতকারী বর্মগুলো একটির মধ্যে অপরটি প্রবিষ্ট, এদের সুদৃঢ় রঞ্জু রয়েছে। মনে হয় সেগুলো কাফআ ঘাসের ন্যায় শক্ত অঙ্গুরীয় বিশেষ। তারা মোটেই আনন্দিত হয় না যখন তাদের তীরগুলো কোন সম্প্রদায়ের উপর আঘাত হানে। আর তারা বিচলিত ও অস্থির হয় না যখন তারা আক্রান্ত হয়। তারা উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের উষ্ট্রীর ন্যায় পথ চলে, অস্ত্রের আঘাত তাদেরকে রক্ষা করে যখন খর্বকায় কৃষ্ণবর্ণের দুশমনরা পলায়ন করে। বর্ষার আঘাত তাদের বক্ষ ছাড়া অন্যকোথাও পতিত হয় না। আর মৃত্যুর সরোবর থেকে তাদেরকে পালিয়ে যাওয়ারও কোন উপায় থাকে না।’

আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা

সাহাবি কবিদের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা.)। তাকে শায়িরু রাসূল বা রাসূল (সা.) এর সভাকবি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।^{৫৫} তিনি আরবি সাহিত্যের যুগ্মকালীন কবি হিসেবেও স্বীকৃত।^{৫৬} ইসলামের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। এসকল যুদ্ধে তিনি একদিকে অস্ত্র হাতে নির্ভীক ও সাহসী যুদ্ধার পরিচয় দেন, অপর দিকে মুশরিক কবিদের ব্যঙ্গ কবিতার যথাযথ উত্তর প্রদান করে তার কাব্যপ্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। তিনিও কাব্যের ভাষায় রাসূল (সা.) এর প্রশংসা করেছেন। যাতে রাসূল (সা.) এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও অগাধ প্রীতির কথা ফুটে

উঠেছে। তিনি নাতে রাসূল বা রাসূল (সা.) এর স্তুতিগাথা রচনাকে পরকালের সম্মল মনে করতেন। রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় তিনি বলেন-

إِنِّي تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُ * وَاللَّهِ يَسْعَى أَنْ مَا خَانِي الْبَصَرُ
أَنْتَ النَّبِيُّ وَمَنْ يُحَرِّمَ شَفَاعَتَهُ * يَوْمَ الْحِسَابِ فَقَدْ أَزْرَى بِهِ الْقَدَرُ
فَتَبَّتْ اللَّهُ مَا أَتَاكَ مِنْ حَسَنٍ * تَثْلِيثٌ مُوسَى وَنَصُّ أَرْكَالِذِي نُصِرُوا^{৫৭}

ইসলামের একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ ছিল মু'তার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিন সেনাপতির একজন ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা। মুসলিম বাহিনী যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করে তখন রাসূল (সা.) কিছু দূর এগিয়ে এসে মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে বিদায় জানান। বিদায় জানানোর প্রাক্কালে আব্দুল্লাহ ইবন্ রাওয়াহা রাসূল (সা.) এর প্রশংসা ও তাঁর নিরাপত্তা প্রার্থনা করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি বলেন-

خَلَفَ السَّلَامُ عَلَى إِمْرِي وَدَعَتْهُ * فِي النَّخْلِ خَيْرٌ مُشَيِّعٍ وَخَلِيلٍ^{৫৮}

‘(হে আল্লাহ! আপনি) ঐ মহান ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ বন্ধু ও সর্বোত্তম বিদায় সম্ভাষণকারীকে খেজুরের বীথিতে নিরাপদ ও পরিতৃপ্তির মাঝে রাখুন, যাকে আমি বিদায় জানালাম।’

রাসূল (সা.) এর এক বড় সাফল্য ছিল হুদাইবিয়া সন্ধি। ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে দশ বছরের জন্য এ সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তানুসারে রাসূল (সা.) সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে উমরা আদায়ের জন্য রওয়ানা হন। মুসলমানদের উমরা পালনের সময় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মক্কার বাইরে চলে যায়।^{৫৯} মাঝ পথে মুসলমানগণ মুশরিকদের পক্ষ থেকে আক্রমণের শঙ্কা অনুভব করেন। তখন মুসলমানদের উদ্ধুদ্ধ করার জন্য আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা কবিতা আবৃত্তি করেন। তিনি বলেন-

خَلُوبِي الْكَفَارَ عَنْ سَبِيلِهِ * الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَأْوِيلِهِ

ضَرْبًا يَزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ * وَيَذْهَلُ الْخَلِيلُ عَنْ خَلِيلِهِ^{৬০}

‘হে কাফেরগণ! তোমরা তার পথ ছেড়ে দাও। আজ আল্লাহর নির্দেশে তোমাদেরকে এমন মার দেবো যে, তোমাদের মাথা থেকে খুলি আলাদা হয়ে যাবে এবং এক বন্ধু তার বন্ধু সম্পর্কে বেখবর হয়ে যাবে।’

এ সকল খ্যাতিমান কবি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও আরো অনেকে রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় কবিতা রচনা করেছেন। যেসকল কবিতায় রাসূল (সা.) এর প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এমন অনেক সাহাবিও ছিলেন যারা সচরাচর কবিতাচর্চা করতেন না। কিন্তু এমন কিছু বিশেষ বিশেষ সময় তারা রাসূল (সা.) এর সাথে অতিবাহিত করেছেন যে, পরিস্থিতিই তাদের হৃদয়ে রাসূল (সা.) এর শানে কবিতা রচনা ও আবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এদেরই একজন আব্দুল্লাহ ইবন্ যাবারি আস-সাহমি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল (সা.) এর কুৎসা রটানোর কারণে যার জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং রাসূল (সা.) এর ক্ষমা লাভে ধন্য হন। আস-সাহমির ভাষায়-

مِمَّا أَتَانِي أَنَّ أَحْمَدَ لَامَنِي * فِيهِ قَبِيْلٌ كَأَنِّي مَحْمُومٌ

إِنِّي لَمُعْتَذِرٌ إِلَيْكَ مِنَ الَّذِي * أَسَدَيْتُ إِذْ أَنَا فِي الضَّلَالِ أَهْمِيمٌ

فَالْيَوْمَ آمَنَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ * قَلْبِي وَمُخْطَطِي هَذِهِ مَحْرُومٌ

وَلَقَدْ شَهِدْتُ بِأَنَّ دِينَكَ صَادِقٌ * حَقٌّ وَأَنَّكَ فِي الْعِبَادِ جَسِيمٌ^{৬১}

‘আমার নিকট সংবাদ এল, নবি আহমদ (সা.) আমাকে খিষ্কার (মৃত্যুদণ্ড) দিয়েছেন। ফলে আমি রাত কাটালাম এমনভাবে যেন আমি ভীষণ জ্বরাক্রান্ত রোগী। এখন আমি আমার পথভ্রষ্ট জীবনের কৃত অপরাধের জন্য আপনার নিকট লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আজ আমার হৃদয় মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ইমান এনেছে। এ ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা হচ্ছে চিরবঞ্চিত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনার আনীত জীবনবিধান সত্য। আর মানবকুলের মাঝে আপনার ব্যক্তিত্ব অতিবিশাল।’

রাসূল (সা.) এর প্রিয়তমা স্ত্রীও আবেগাপ্ত হয়ে মাঝেমাঝে তাঁর প্রশংসায় কবিতা আবৃত্তি করতেন। বিশেষত যখন ঘর্মাক্ত হওয়ায় তাঁর বরকতময় চেহারার ঔজ্জ্বল আরও বেড়ে যেত। এই অবস্থায় আয়েশা (রা.) তাঁর চেহারার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন আর কবিতা আবৃত্তি করতেন-

وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أُسْرَةٍ وَجْهَهُ * بَرَقَتْ كَبْرَقِ الْعَارِضِ الْمَهْلِلِ^{৬২}

‘তাঁর চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম যেন তাতে দ্যুতিময় মেঘ অবিরাম চমকাচ্ছে।’

উপসংহার

রাসূল (সা.) মহান আল্লাহর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যিনি রহমতের বার্তা নিয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। এই জরাজীর্ণ পৃথিবীকে তিনি ওহির বিধানের আলোকে এক নতুন অবয়বে সাজিয়েছেন। পথহারা জাতিকে দিয়েছিলেন আলোকিত পথের সন্ধান। মনুষ্যত্বহীন বর্বর মানুষগুলোকে তিনি শিখিয়েছেন পাম্পরিক ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, আন্তরিকতা ও সাম্যের মত অসংখ্য ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। এ অনবদ্য ভূমিকার ফলে তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের সুউচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছেন। তাঁর এই কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবনের নানাদিক অবলম্বন করে যুগে যুগে কবিগণ রচনা করেছেন অসংখ্য রাসূল-প্রশংসা। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাতেই তাঁকে নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। তাঁর গুণগান ও বরকতময় নান্দনিক জীবনের ঘটনাপ্রবাহ বর্ণনা করা হয়েছে। যা মানব হৃদয়কে করেছে উদ্বেলিত ও আলোড়িত।

যদিও ইসলামি যুগে আরবি কাব্যে ‘রাসূল-প্রশংসা’র উদ্ভব ঘটে। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবি ইসলাম প্রচার-প্রসার, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ইবাদত-বন্দেগিতে লিপ্ত থাকায় তারা কবিতার জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় সুযোগ বের করতে পারেননি। তথাপিও বিশেষ কিছু সময়ে, আবেগময় কোন পরিস্থিতিতে তারা তাদের আত্মার আহ্বানকে অগ্রাহ্য করতে পারেননি। ফলে রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় তারা কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু আরবি কাব্যে একটি নতুন ধারা বিকশিত হওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তা পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য যথার্থ ছিল না। পরবর্তীতে আব্বাসী যুগে এসে আরবি কাব্যের এ ধারাটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরবি কাব্যে রাসূল-প্রশংসা বিকাশে শরফুদ্দিন আল-বুসরি (৬০৮-৬৯৬ খ্রি.), আবুল আব্বাস আহমদ বিন আব্দুর রহমান, আবু হামাবি মুসা আয-যায়ানি, আল-কুমাইয়াত বিন যায়িদ (৬৮০-৭৪৩ খ্রি.), আস-সায়্যিদ আল-হামিরি, আশ-শরিফ আর-রিদা (৯৭০-১০১৫ খ্রি.), মিহইয়ার আদ-দিলমি, আবুল আতাহিয়া (৭৪৮-৮২৬ খ্রি.), মুহাম্মদ বিন আল-মুস্তামবির (৮২১ খ্রি.), ইবনু নুবাতা আল-মিসরি (৬৮৬-৭৬৮ খ্রি.), আলী আদ-দারবিশ (১৮৮২-১৯৫২ খ্রি.), আলী আবু আন-নাসর (১৮১১-১৮৮১ খ্রি.), আস-সা‘আতি (১৮২৫-১৮৮১ খ্রি.), আবুল কাসিম বিন ইউসুফ, আহমদ শাওকি (১৮৬৮-১৯৩২ খ্রি.), মাহমুদ সামি আল-বারুদি (১৮৩৯-১৯০৪ খ্রি.), আহমদ মুহাররম (১৮৭৭-১৯৪৫ খ্রি.) সহ আরও অনেক কবি অসামান্য অবদান রাখেন।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ লুইস মা'লুফ, *আল-মুনজিদ ফিল লুগাতি ওয়াল আ'লাম* (বৈরুত: দারুল মাশরিক, ১৯৯৭ খ্রি.); পৃ. ৩৯০-৩৯১।
- ^২ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরাব*, চতুর্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল-সাদির, তাবি.), পৃ. ৪০৯।
- ^৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরবি বাংলা ব্যবহারিক অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৪৩৩।
- ^৪ ড. আহমাদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম* (কায়রো: আল-মাকতাবাতুন নাহযাহ আল-মিসরিয়্যাহ, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ৫৬।
- ^৫ সূরা আল-ইয়াসিন, আয়াত: ৬৯।
- ^৬ জুরজি যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল মাকতাবাতিল হায়াহ, ১৯৯২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৫৩।
- ^৭ আহমাদ হাসান আয-যাইয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবি* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ৫ম সং, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ২৫।
- ^৮ কুদামা ইবন জাফর, *নাকদুশ শি'র* (বাগদাদ: প্রকাশনীর নামবিহীন, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ৩০৭।
- ^৯ শায়খ নাসীফ আল-ইয়াযিজী, *মাজমুউল আদাব ফী ফুনিল 'আরাব* (বৈরুত: ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৬।
- ^{১০} ড. আব্দুল আমিন আতিক, *তারিখুন নাকদিল আদাবি*, পৃ. ৪৯।
- ^{১১} *Oxford Advanced learners Dictionary* (Oxford: Oxford University press, Sixth edition, 2000), p. 92.
- ^{১২} আবু বকর আহমদ ইবন হুসাইন আল-বায়হাকি, *দালাইলুন নুবুওয়াহ ওয়া মারিফাতি আহওয়ালি ছাহিবিশ শরিআহ*, প্রথম খণ্ড, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।
- ^{১৩} ইমাম মুহাম্মদ আবু যুহরাহ, *আল-মারজিউ ফি সিরাতিন নববিয়্যাহ: খাতামুন নাবিয়্যিন*, খ. ১ (কায়রো: দারুল ফিকরিল আরাবি, ১৪৩৩ হি.), পৃ. ৯৮।
- ^{১৪} আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন মাহমুদ বিন আহমদ বিন হাজার আস-কালানী, *ফাতহুল বারি শরহুল সহিহিল বুখারি*, খণ্ড ৩ (কায়রো: মাকতাবাতুল কুল্লিয়াত আল-আযহারিয়্যাহ, ১৩৯৮ হি.), পৃ. ১৫।
- ^{১৫} আবুল ফযল আল-ইরাকি, *আলফিয়াতুস সিরাতিন নববিয়্যাহ*, প্রথম খণ্ড (প্রকাশনীর নাম বিহীন, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩।
- ^{১৬} মুহাম্মদ বিন ওমর আল-হাদারমি, *হাকাইকুল আনওয়ার ওয়া মাতালিল আসরার ফি সিরাতিন নাবিয়্যাল মুখতার*, প্রথম খণ্ড (বৈরুত: দারুল হাদী, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১১৬।
- ^{১৭} হাকিম আবুল বারাকাত আব্দুর রউফ দানাপুরী, *আসাহুস সিয়্যার*, অনুবাদ: আ. ছ. ম. মাহমুদুল হাছান ও আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৮৩।
- ^{১৮} *আল-মারজাউ ফি সিরাতিন নববিয়্যাহ: খাতামুন নাবিয়্যিন*, প্রাপ্ত, পৃ. ২৬৯।
- ^{১৯} ইমাম আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দিন আয যাহাবি, *সিয়্যারু আলামিন নুবালা* (জর্ডান: বায়তুল আফকারিদ দাওলিয়া, তাবি.), পৃ. ৮৮; ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি, *সিরাতুন নববিয়্যা* (বৈরুত: দারুল মারিফা, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ২৭৭-২৭৮।
- ^{২০} *সহিহ মুসলিম*, প্রাপ্ত, হাদীস নং- ২৪৪৪; *ফাতহুল বারী*, প্রাপ্ত, খ. ১৬, পৃ. ২৭৮-২৮৫, হাদীস নং- ৪৪৪৯, ৪৪৬৩।
- ^{২১} *আল-মুজামুল ওয়াফী*, প্রাপ্ত, পৃ. ৭৪৮।
- ^{২২} ড. বদর আব্দুল হামিদ হামিসাহ, *আজমালুল আশ'আর ফি মাদহিন নাবিয়্যাল মুখতার*, প্রাপ্ত, পৃ. ১।
- ^{২৩} ড. যাকি মুবারক, *আল-মাদায়িছন নববিয়্যাহ* (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ-১৯৩৫ খ্রি.), পৃ. ১৭।
- ^{২৪} ইবন হিশাম, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ* (বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামিয়া, তাবি.), খ. ১, পৃ. ২৬৯; ড. যাকি মুবারক, *আল-মাদায়িছন নববিয়্যাহ ফিল আদাবিল আরাবি* (বৈরুত: মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ, ১৯৩৫ খ্রি.), পৃ. ১৭।
- ^{২৫} সম্পাদনা পরিষদ, *আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৪৮৬।
- ^{২৬} আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির, *আস-সিরাতুন নববিয়্যাহ* (বৈরুত: দারুল মাআরিফা, ১৯৭৬ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬১।
- ^{২৭} *আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া*, প্রাপ্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।
- ^{২৮} যুগ ছয়টি হল- ১. জাহিলী যুগ (৪৫০-৬২২খ্রি.), ২. ইসলামি যুগ (৬২২-৬৬১খ্রি.), ৩. উমাইয়া যুগ (৬৬১-৭৫০খ্রি.), ৪. আব্বাসীয় যুগ (৭৫০-১২৫৮খ্রি.), ৫. তুর্কি যুগ (১২৫৮-১৭৯৮খ্রি.) এবং ৬. আধুনিক যুগ (১৭৯৮খ্রি.-বর্তমান)।
- ^{২৯} সাবির আব্দুদ দায়িম, *আল-আদাবুল ইসলামি বাইনান নযরিয়্যা ওয়াত তাভিক*, পৃ. ২৪১; শাওকি দায়ীফ, *আল-আসরুল ইসলামি*, পৃ. ৪৭।

- ৩০ সূরা আশ-শু'আরা, আয়াত: ২২৪-২২৭।
- ৩১ ওরাকা সম্পর্কে মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন- 'ওরাকা ইবন নওফলকে নিন্দা করবে না, কারণ আমি দেখেছি যে তার জান্নাতে এক বা দুটি বাগান থাকবে।' অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন- 'আমি তাকে সাদা পোশাক পরিহিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখেছি। তিনি যদি জাহান্নামের বাসিন্দাদের মধ্যে থাকতেন, তিনি এমন পোশাক পরিধান করে থাকতেন না।' (দ্র. সহিহ আল-জা'মে আস-সিগার, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৫৩৪, হাদিস নং- ৭১৯৭; তিরমিযি, খণ্ড, ৪, পৃ. ৮, হাদিস নং- ২২৮৮)।
- ৩২ আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯।
- ৩৩ আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।
- ৩৪ সিরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৫০।
- ৩৫ আব্দুল হক মোহাম্মেদে দেহলভী (রহ.), মাদারেজ্জন্ নবুওয়্যাত, অনুবাদ: মাওলানা মুমিনুল হক, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, প্রথম খণ্ড (ঢাকা: হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেরিয়া, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১-২।
- ৩৬ আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব, দিওয়ান (বৈরুত: দারুল ওয়া মাকতাবাতু হিলাল, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৮৩।
- ৩৭ আল-মাদাইহুন নববিয়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
- ৩৮ তদেব।
- ৩৯ আল-বিদায় ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।
- ৪০ আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫।
- ৪১ আবু আব্দুল্লাহ আয-যাওয়ানি, শরহ মু'আল্লাকাতিস সাব'আ (বৈরুত: দারুল ইলমিয়াহ, তাবি.), পৃ. ৮৫।
- ৪২ সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামি বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৮৬।
- ৪৩ আয-যাহাবি, সিয়রুল আলামিন নুবালা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৭।
- ৪৪ ইবন সালাম, তাবাকাতু ফুহুলুশ শু'আরা, পৃ. ১২৩।
- ৪৫ আল-ইসতি'আবু ফি মা'রিফাতিল আসহাব, পৃ. ১৭৬।
- ৪৬ আবু মুহাম্মদ মুসলিম ইবন কুতায়বা, আশ-শিরু ওয়াশ শুয়ারা, প্রথম খণ্ড (মিশর: দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৩০৫।
- ৪৭ ড. সালিহ আশ-শানতি, ফিল আদাবিল আরাবি আল-কাদিম (সৌদি আরব: দারুল আন্দালুস, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৭৬।
- ৪৮ আয-যাবুরি, শিরুল মুখাদরিমিন ওয়া আসরুল ইসলাম ফিহি (বৈরুত: মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৬৪।
- ৪৯ হাসান বিন সাবিত, দিওয়ান, প্রাগুক্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২।
- ৫০ আল-জাওলিকি, শরহ আদাবিল কাতিব, প্রথম খণ্ড (লেবানন: মাওকিউল ওরাক, তাবি), পৃ. ৫৫।
- ৫১ The Encyclopaedia of Islam, Vol-4 (London: Luzac & Com. W.D), p. 316; ড. মুহাম্মদ মুজিবুর রহমান, সাহাবী কবি কা'ব ও তার অমর কাব্য (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৭১।
- ৫২ আহমদ হাসান আয-যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরবি (প্রকাশনীর নাম ও তারিখ বিহীন), পৃ. ১৪৭।
- ৫৩ সাহাবী কবি কা'ব ও তার অমর কাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।
- ৫৪ সাহাবী কবি কা'ব ও তার অমর কাব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।
- ৫৫ খায়রুদ্দিন যিরকিলি, আল-আলাম, চতুর্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২১৭।
- ৫৬ আহমদ আল-হাশেমি, জাওয়াহিরুল আদাব (মিশর: আল-মাকতাবাতু তিজারাতুল কুবরা, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ১৩৫।
- ৫৭ আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা, দিওয়ান, পৃ. ১৫৯।
- ৫৮ সিরাতে ইবনে হিশাম, প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১০।
- ৫৯ সিরাতুল মুত্তফা (সা.), প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩-৩৮৬।
- ৬০ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৫৫০।
- ৬১ প্রাগুক্ত, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৯।
- ৬২ প্রাগুক্ত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০।

সাহাবীদের শোকগাথায় মহানবী (সা.) প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা

ড. জিয়াউর রহমান খান*

Abstract: Mourning is one of the main themes of Arabic poetry. From the origin of Arabic poetry to the present day, it has continued to shine in all eras. In mourning songs, various qualities of heroism, glory and fame of the deceased are expressed. In the Islamic era, there are many mourning stories centered on the death of the Prophet Muhammad (sm.) Those were composed by his favorite disciples. They have expressed the various aspects of the life of the Prophet (sm.), the qualities, the death of the Prophet (sm.) and their sufferings, sorrows, pains, emotions etc. in poetry. Those mourning stories have become a witness to their times and are still alive today. At the same time, it has awakened the elegiac poetry in literature. Those priceless mourning stories are scattered in history and biographical texts. This article offers a distinct study and religious discussion by analyzing the mourning verses written on and for the Prophet Muhammad (sm.)

ভূমিকা

কবিতা আরবী সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। যাকে আরবী ভাষায় شعر^১ বলা হয়। আর شعر বা কবিতার একটি বিশেষ শাখা হলো আরবী শোকগাথা। যাকে نداء^২ বলা হয়। এই نداء বা শোকগাথা তার সূচনা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে তার আভা ছড়িয়ে চলেছে। মৃত ব্যক্তিকে উপজীব্য করে রচিত এই সকল কাব্যমালায় মৃত ব্যক্তির শৌর্যবীর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ নানা গুণাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়। সাহিত্য সমালোচকদের অনেকে মনে করেন এ জাতীয় কবিতায় কৃত্রিমতার চেয়ে বাস্তবতাই বেশি প্রাধান্য পায়। মূলত শোকগাথায় দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ থাকতে হয়।^৩ যেন এর মাধ্যমে শ্রোতা ও পাঠকদের মনে ব্যথা জাগ্রত হয়।^৪ এই نداء বা শোকগাথা যুগে যুগে যেমন আরবী সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে, তেমনি এটা কবি সাহিত্যিকদের কবিতা রচনায় প্রলুব্ধ করেছে।

সাহাবীদের রচিত কাব্যমালা পর্যালোচনা করলে যার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। সাহাবীদের রচিত কবিতার একটা বিরাট অংশ জুড়েই রয়েছে এই শোকগাথা। যেখানে তারা মহানবী (সা.) এর তিরোধানে ব্যথিত হয়ে ব্যথা ভরা কথাগুলো কাব্যিক আকারে ছড়িয়ে দিয়েছেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রা.), আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস (রা.), আবু বকর (রা.), উমর (রা.), আলী (রা.), যুবারকন (রা.), হাসসান (রা.) সহ অসংখ্য সাহাবীর শোকগাথাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

আরবী শোকগাথা এবং আরবী কবিতা একই সময় রচিত হয়েছে। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে ৫ম শতাব্দীতে আরবী কবিতার উদ্ভব।^৫ মুহালহাল বিন রাবি'আ তার ভাই কুলায়ব এর মৃত্যুতে শোক বিহ্বল হয়ে একটি কবিতা রচনা করেছিল। যেহেতু সে আরবী ভাষী ছিল এবং ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকাবৃত হয়ে শোকের কবিতা রচনা করেছিল। সেহেতু মুহালহালের রচিত সেই কবিতাই প্রথম আরবী কবিতা এবং প্রথম রচিত আরবী শোকগাথা।^৬

আরবী শোকগাথা তার উৎপত্তি কাল তথা জাহেলীযুগ থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে থাকে। তবে জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগে শোকগাথার চর্চা হলেও উভয় যুগের শোকগাথায় দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জাহেলী যুগের শোকগাথায় শোক প্রকাশে অনেক ক্ষেত্রেই শোককারীর সীমালঙ্ঘন

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিলক্ষিত হয়। মিথ্যা প্রশংসা ও বর্ণনার অতিরঞ্জে শোকগাথা রচিত হতে দেখা যায়। তৎকালীন সময়ে শোক প্রকাশে শোককারীর মৃত ব্যক্তির জন্য মাথা মুড়ন করা, আজীবন বিলাপ করা, নারীর ঘোমটা বিদীর্ণ করা, পশমী শোকবস্ত্র পরিধান করার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।^১ পাশাপাশি প্রাচীনকালে কবির শোকগাথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কৃতিত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে তাদের প্রসিদ্ধ রাজা-বাদশাহ্, অতীত জাতি, গগনচুম্বী পাহাড়, বিষাক্ত সাপ, বন্যপ্রাণী ইত্যাদির সাথে সাদৃশ্য দেখানো পছন্দ করতেন।^২ বাস্তবিক পক্ষে তা সত্য হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে ইসলামী যুগে শোকগাথায় কবির সাবলীল বর্ণনা ও সত্যপ্রিয় রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় কবির তাদের শোকগাথায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নীতি, আদর্শ ও অবস্থান চিত্রিত করার প্রয়াস পান।^৩ যার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র, সরূপ, স্বভাব ও প্রকৃতি সকলের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬১০ খ্রিস্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন।^৪ শুরু হয় ইসলামী যুগ। ইসলামী যুগেও শোকগাথা রচিত হতে দেখা যায়। বিশেষত যখন নবী (সা.) ইন্তিকাল করেন, তখন সাহাবীগণ প্রাণাধিক প্রিয় রসূলের শোকে শোকগাথা রচনা করেন। কারণ তাঁরা রসূলের জীবদ্দশায় যেমন তাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর মৃত্যুর পরও তেমনি তাঁকে ভালবাসতেন। রসূলের জীবদ্দশায় তাঁরা রসূলকে এতটা ভালবাসতেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের নানাবিধ অত্যাচারের মুখেও তাঁরা রসূল (সা.) সম্পর্কে কোন মন্দ কথা বলতে রাজি হননি। যেমন খাব্বাব বিন আরাত, যিনি আঙনের ছাঁকার মুখেও রসূল (সা.) সম্পর্কে মন্দ বলতে রাজি হননি।^৫ অনুরূপভাবে সুমাইয়া, ইয়াসার (রা.) দম্পতি কাফেরদের অত্যাচারে জীবন উৎসর্গ করেছেন; কিন্তু রসূলকে খারাপ বা মন্দ বলতে রাজি হননি।^৬ প্রিয় সেই নবীর ইন্তিকালে সাহাবীগণ দুঃখ ভারাক্রান্ত হবেন এটাই তো স্বাভাবিক। মহানবী (সা.) ইন্তিকাল করেন একাদশ হিজরীতে। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি ১৩/১৪ দিন অসুস্থ ছিলেন। এ সময় তিনি হযরত আয়েশার (রা.) ঘরে অবস্থান করেন। নবীর অন্য স্ত্রীগণ এতে সম্মতি দেন।^৭ মৃত্যুর পূর্বে নবী (সা.) পানির পাত্র থেকে পানি নিয়ে মুখ মুছতে থাকেন আর ‘لا إله إلا الله’ বলতে থাকেন। এ সময় রসূল বলেন, মৃত্যু বড়ই কষ্টদায়ক।^৮ রসূল (সা.) যে মাসে ইন্তিকাল করেন সে মাসটি ছিল রবিউল আওয়াল আর দিনটি ছিল সোমবার।^৯ তাঁর মৃত্যুর পর সাহাবীগণ হতবিস্ত্র হয়ে পড়েন। তাঁদের দুঃখ ভরা মন ভেঙে অসংখ্য শোকগাথা রচিত হতে দেখা যায়।

হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)

তিনি ছিলেন অন্যতম কুরাইশ নেতা ও রসূল (সা.) এর চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাই। কিন্তু তিনি ইসলামের শত্রুদের একজন ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।^{১০} সারা জীবন ইসলামের বিরোধিতা করলেও ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত। তিনি হুনায়েনের যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন।^{১১} রসূল (সা.) ইন্তিকাল করলে তিনি দুঃখ ও কষ্টে ভেঙ্গে পড়েন। আর রসূলের শোকে শোকগাথা রচনা করেন। সেই শোকগাথায় তিনি তাঁর নিজের ও মুসলিম সমাজের নিদারুণ দুঃখ ও কষ্টের চিত্র অংকন করেন। রসূলের বিদায় নেয়ার দুঃসংবাদ কিভাবে জাতিকে বিষণ্ণতায় ছেয়ে ফেলে তা তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে। যেমন তিনি বলেন-^{১২}

أرقت فبات ليلي لا يزول * وليل أخي المصيبة فيه طول
فأسعدني البكاء وذاك فيما * أصيب المسلمون به قليل

আমি বিন্দি রজনী কাটাচ্ছি, রাত যেন শেষ হচ্ছে না। রাতের বেলার দুঃখকষ্ট যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতম হচ্ছে। রসূল (সা.) এর ওফাতে একটু কাঁদতে পারাও আমার সৌভাগ্যের কারণ। তাঁর বিরহ ব্যথায় কাতর মুসলিমদের দুঃখকষ্টের তুলনায় আমার এ ক্রন্দন খুবই সামান্য।

জাতির জীবনে এতবড় দুর্যোগ যেন আগে কখনো আসেনি। জাতি কাকে নিয়ে বাঁচবে, যাকে অবলম্বন করে জাতি সব রকম বিপদ মোকাবেলা করেছে তিনিই যদি না থাকেন, তবে মানুষ তার মনোবল কিভাবে ধরে রাখবে। যেন সব কিছু স্তব্ধ হয়ে গেছে। নবী ছাড়া জাতি বাঁচবে কিভাবে। সেই দুঃসহ কষ্টের বর্ণনা দিয়ে আবু সুফিয়ান তাঁর শোকগাথায় বলেন-^{১৯}

لقد عظمت مصيبتنا وجلت * عشية قيل قد قبض الرسول
فظل الناس منقطعين فيها * كأن الناس ليس لهم حويل
كأنَّ الناس إذ فقدوه عمي * أضر بلب حازمهم غليل

যে সন্ধ্যায় রসূল (সা.) এর ওফাতের খবর বলা হলো, তখন আমাদের উপর নেমে আসা মুসিবত আর বিরহ যন্ত্রণার মাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠল। মুসলিমগণ এই বিপদে কাতর হয়ে গেলো, এই মুসিবতের কাছে অন্যসব মুসিবত স্নান হয়ে গেলো। তাঁকে হারিয়ে সবাই দিশেহারা হয়ে গেলো, চোখ থেকেও তাঁরা যেন অন্ধ হয়ে গেলো।

নবী বিয়োগে দুঃখ, বেদনা এমনভাবে জাতিকে আচ্ছন্ন করেছে যা থেকে পরিদ্রাণের যেন কোন উপায় নাই। এই দুঃখ আর বেদনা শুধু মানুষকেই নয় বরং তা যেন পুরো পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করেছে। কেননা রসূল (সা.) কে হারানো শুধু রসূলকে হারানো নয় বরং রসূলকে হারানোর অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ওহী^{২০}ও হারানো। যে ওহী নিয়ে পবিত্র ফেরেশতা জিবরাঈল^{২১} প্রয়োজন অনুপাতে সকাল বিকাল পৃথিবীতে আসতেন। রসূলকে হারানোর সেই শোককে ব্যক্ত করে আবু সুফিয়ান বলেন-^{২২}

وحق لتلك مرزئة علينا * وحق بأن تطير لها العقول
واضحت أرضنا مما عراها * تكاد بنا جوانبها تميل
فقدنا الوحي والتنزيل فينا * يروح به ويغدو جبرئيل-

তাঁর শূন্যতা ইস্পাতসম দৃঢ়সংকল্পকে নড়বড়ে করে দিলো। তাঁর বিরহ যেন তাঁদের চিন্তা শক্তিকেই শেষ করে দিয়েছে। জমিনের বুকে আজ যে ব্যথা বিপদ আপতিত হয়েছে সে ব্যথায় কাতর হয়ে পৃথিবীর প্রান্তগুলো আমাদের নিয়ে কাৎ হয়ে যাচ্ছিল। আমরা হারিয়েছি ওহী, কুরআনের অবতরণ, সকাল-সন্ধ্যা যা নিয়ে আসতো জিবরাঈল।

রসূল (সা.) ছিলেন সাহাবীদের নিকট আলোর দিশা। অন্ধকার থেকে তিনিই মানুষদের আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন। সাহাবীরা যখনই যে সমস্যায় পড়তেন তখনই তা তাঁরা রসূলের নিকট উপস্থাপন করতেন। রসূল (সা.) তা আল্লাহর ওহীর মাধ্যমে সমাধান করতেন।^{২৩} আবার কখনো কোন বিষয়ে রসূল যখন যা বলতেন, ঠিক হুবহু সেটাই সংঘঠিত হত। যা সবার দৃষ্টিগোচর হত। যেমন মক্কার কুখ্যাত উমাইয়্যার মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ার ভবিষ্যতবাণী করেন নবী (সা.), যা বদর যুদ্ধে প্রমাণিত হয়।^{২৪} কিন্তু সেই রসূলের তিরোধানের এর সবকিছু থেকেই সাহাবীরা বঞ্চিত হলেন। তাই নবী হারানো কষ্ট ব্যক্ত করে আবু সুফিয়ান বলেন-^{২৫}

أصبنا بالنبي وقد رزانا * مصيبتنا فمحملها ثقیل

نبي كان يجلو الشك عنا * بما يوحى إليه وما يقول
ويهدينا ولا نخشى ضللا * علينا والرسول هو الدليل
يخبرنا بظهر الغيب عما * يكون فلا يخون ولا يحول

রসূল (সা.) এর ওফাতের ব্যাখ্যায় আমরা ব্যাখ্যাতুর কাতর, শক্তির দ্বিগুণ ভারি বোঝা চাপানোর মতো এ ব্যাখ্যা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। সহ্য করার ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। আমাদের মাঝে যে সংশয় সন্দেহের সৃষ্টি হতো তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী ও ওহীর মাধ্যমে তা নিমিষেই দূর হয়ে যেতো। তিনি আমাদের সুপথ দেখাতেন, পথ হারানোর ভয় আমাদের ছিলনা। তিনিই হলেন সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ, হকের বাগুবাহী। (আল্লাহ চাইলে) তিনি আমাদের নির্ভুলভাবে অদৃশ্যের খবর দিয়ে দিতেন।

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রা.)

আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রা.) ছিলেন বনী সালমার একজন সহযোগী। তাঁর উপনাম আবু ইয়াহইয়া।^{২৬} রসূল (সা.) এর নির্দেশে তিনি কুখ্যাত খালিদ বিন সুফিয়ানের বিরুদ্ধে অভিযান চালান এবং তাকে হত্যা করেন। রসূল (সা.) এতে খুশি হয়ে তাঁকে একটা লাঠি প্রদান করেন।^{২৭} লাঠিটি তিনি সাথে রাখতেন। এমনকি তাঁর নির্দেশে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর রসূলের এই নিদর্শন প্রদর্শনের জন্য তাঁর সাথে তা দাফন করা হয়।^{২৮} রসূল (সা.) এর এই প্রিয় সাহাবী রসূলের ইস্তিকালে অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং ব্যথিত চিন্তে তিনি শোকগাথা রচনা করেন। যে শোকগাথার শুরুতেই তাঁর করুণ আত্ননাদ কাব্য প্রেমিকদের আবেগ তাড়িত করে। নবী বিহনে তাঁর রাত যেন এতো দীর্ঘ হয়ে পড়েছে যা শেষ হবার নয়, যে রসূল গতকালও তাঁদের মাঝে ছিলেন যার সাথে কত কথা, কত স্মৃতি, যা মনকে শুধু কুরে কুরে খাচ্ছে। শুধু যে আব্দুল্লাহ নিজেই রসূলের শোকে শোকবিহ্বল হয়েছেন তা-ই-নয়, বরং তাঁর মত অসংখ্য সাহাবীর হৃদয় কান্নায় বিগলিত হয়েছে। যে কান্না সহ্য করার নয়। আব্দুল্লাহর ভাষায়-^{২৯}

تطاول ليلي واعتزنتي القوارع * وخطب جليل للبلية جامع
غداة نعى الناعي إلينا محمدا * وتلك التي تستك منها المسامع

আমার রাত্রি সুদীর্ঘ হয়ে পড়েছে এবং আমার উপর বিপদের বোঝা আরোপিত হয়েছে। এই গভীর রজনীতে বহু কথা জমা হয়ে আছে বুকের পিঞ্জরে। গতকাল এক ক্রন্দনকারী নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর জন্য কাঁদছিল। সে (করুণ) কান্না শোনার আগে আমার বখির হওয়াই শ্রেয় ছিলো।

দুঃখ ও শোক ভারাক্রান্ত আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস নবী বিরহে এতটাই ব্যথিত ছিলেন যে, তিনি মনে করতেন যদি তাঁর জীবনের বিনীময়েও রসূলকে ফিরে পেতেন তবে তিনি তাই করতেন। যদিও তিনি জানেন যে এটা অসম্ভব। আর তিনি শোকে এতটা স্তব্ধ যে আর কোন দুঃখ এ দুঃখের সমান হবে না। সুতরাং তিনি আর কখনো কোন শোকগাথাও রচনা করবেন না। কেননা তিনি এমন ব্যক্তির জন্য শোকগাথা রচনা করেছেন যিনি ছিলেন ক্ষমার আধার। তাইতো দেখা যায় মক্কা বিজয়ের পর নবী (সা.) তাঁর জীবনের দুঃশমন যারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে, যারা তাঁকে উহুদের প্রান্তরে আহত করেছে। এমনকি তাঁর ঠোট ও চেহারা যখম হয়েছে এবং একটা দাঁত শহীদ হয়েছে।^{৩০} সেই মক্কাবাসীকে প্রফুল্ল চিন্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন।^{৩১} তাইতো আব্দুল্লাহ বলেন-^{৩২}

فلو رد ميتا قتل نفسي قتلها * ولكنه لا يدفع الموت دافع
فأليت لا أثني على هلك هالك * من الناس ما أوفى ثبير وقارع

সত্যিই যদি মৃত্যুকে ফিরে দেয়া হতো আমার জীবনের বিনিময়ে, তাহলে আমি নিজেকে নিঃশেষ করে দিতাম; কিন্তু আল্লাহ তো মৃত্যুকে ফিরে দেন না। আমি আর কারো মৃত্যুতে মর্সিয়া গাইবো না তাঁর প্রস্থানের পর, যিনি তাঁর অভিষাপকারী আর আঘাতকারীকে ক্ষমা করেছেন।

আব্দুল্লাহ প্রিয় নবীর বিরহে শোকদগ্ধ হয়ে অবিরাম অশ্রু বিসর্জন করে এতটুকুতে সান্ত্বনা পান যে, একদিন তিনিও আল্লাহর নিকটই ফিরে যাবেন। রসূল (সা.) যেমন চলে গেছেন। আর যেমন রসূল (সা.) এর মতো সকল নবীই আল্লাহর নিকট ফিরে গেছেন।^{৭৬} পূর্ববর্তী নবীরা দীর্ঘ দিন জীবিত থাকলেও একদিন না একদিন তাঁরা আল্লাহর নিকটই ফিরে গেছেন। যেমন নূহ (আ.) ৯৫০ বছর এর বেশি জীবিত ছিলেন।^{৭৭} তারপর তাঁকে চলে যেতে হয়েছে। আর ক্ষমতামণ্ডলী সম্রাট, রাজা-বাদশাহ যেমন নমরুদ^{৭৮} বা শক্তিশালী ও কর্মপটু আদ^{৭৯} সম্প্রদায়। এক কথায় পৃথিবীর যত ভালমানুষ আর ক্ষমতামণ্ডলী মন্দ মানুষ কেউ-ই- চিরস্থায়ী হয়নি বরং একদিন না একদিন সকলকেই চলে যেতে হয়েছে। আর তাই আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস বলেন-^{৮০}

ولكنني بأك عليه ومتبع * مصيبتة أنى إلى الله راجع

وقد قبض الله النبيين قبله * وعاد أصيبت بالردى والتابع

কিন্তু তাঁর এই দুঃসময়ে আমি কেঁদেই চলেছি অবিরাম। অবশ্য আমি (তাঁর মতো) আল্লাহর দিকে ফিরে যাব। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর পূর্বে সকল নবীদের জীবনাবসান ঘটিয়েছেন। এমনকি আদ সম্প্রদায় এবং পূর্ববর্তী রাজাধিরাজ ধুলায় ধূসরিত হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রা.)

আবু বকর (রা.) এর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পুরুষ। তাঁর উপাধি ছিল আতীক। তিনি ছিলেন রসূলের হিজরতের সঙ্গী।^{৮১} রসূল (সা.) এর স্বশুর।^{৮২} তিনি রসূল (সা.) এর ঘনিষ্ঠ সহচর এবং ভালবাসা ও নৈকট্যের দিক দিয়ে রসূল (সা.) এর সবচেয়ে নিকটবর্তী।^{৮৩} ইসলামের ত্রাণকর্তা, এমনকি ইত্তিকালের পূর্বে একমাত্র তাঁর জন্যই রসূল (সা.) বলেছিলেন لَا يَفْقِدُ فِي الْمَسْجِدِ بَابَ إِلَّا سُدَّ إِلَّا^{৮৪} যে কথার মাঝেই আবু বকর (রা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। রসূলের জন্য নিবেদিত প্রাণ এ মহান ব্যক্তিত্ব রসূল (সা.) এর বিরোগ ব্যথায় দগ্ধ প্রাণে তাঁর করুণ অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন-^{৮৫}

يا عين فابكي ولا تسأمي * وحق البكاء على السيد

على خير خندف عند البلاء * أمسى يغيب في الملحد

فصلى المليك ولي العباد * و رب البلاد على أحمد

হে আখি! তুমি বিলাপ কর বিরক্ত হয়ো না। নেতার জন্য কান্না করা যথাযথ। বিপদের সময় তিনি উত্তম চরিত্রবান ছিলেন, সন্ধ্যায় তাঁকে কবরে রাখা হবে। মানুষের অভিভাবক ও পৃথিবীর প্রভু মালিক আল্লাহ আহমদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

দুঃখ ও শোক থেকে হযরত আবু বকরের অভিব্যক্তিতে যেন শুধু বিষাদের ছায়া। কারণ বিভিন্ন বিপদে তিনি রসূলকে খুব কাছ থেকে অবলোকন করেছেন। কঠিন বিপদে জাবালে সওরে রসূলের সেই সান্ত্বনা আবু বকর ভয় পেয়ে না আমরা দু'জন নই, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন^{৮৬} বা বদরের কঠিন মুহূর্তে রসূলের আল্লাহর নিকট আহাজারি,^{৮৭} সব কিছুতেই প্রকৃত নেতার যে পরিচয় তিনি পেয়েছেন সেই নেতাকে হারানোর কষ্ট যেন তাঁকে তাড়া করে ফিরছিল। এমন মহান নেতার মৃত্যু সহ্য করা কিভাবে সম্ভব হবে, যিনি ছিলেন তাঁর একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিশীল। যেমন কতক ব্যক্তি আবু বকরের সমালোচনা

করলে রসূল (সা.) বলেছিলেন-^{৪৫} هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟! আত্মার আত্মীয় সেই রসূলকে হারিয়ে অসহনীয় কষ্ট বুকে চেপে আবু বকর বলেন-^{৪৬}

فكيف الحياة لفقد الحبيب * وزين المعاشر في المشهد
فليت الممات لنا كلنا * وكنا جميعا مع المهتدى

বন্ধু ও সমাবেশে জনতার সভাকে হারানোর পর কিভাবে বেঁচে থাকা যায় বা জীবন কেমন হয়। হায় আমাদের প্রত্যেকের যদি মৃত্যু হত, আর আমরা সকলে অনুসূতের সাথে যেতাম।

প্রিয় নবী (সা.) এর ইতিকালের সংবাদ যখন আবু বকর (রা.) শুনতে পেয়েছিলেন, সেই সময়টা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম দিন। হৃদয় বিদারক সেই ঘটনায় আবু বকর (রা.) রসূলের হুজরায় প্রবেশ করে দেখতে পান রসূল (সা.) এর দেহ মুবারক ডোরাকাটা চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখা। তিনি সেই চাদরখানী সরিয়ে রসূলের শিয়রে বসে তাঁর পবিত্র কপালে চুমু খান অতঃপর বলেন- يا نبي الله - অতঃপর মাথা নুয়ে আবার নিজের মুখ লাগিয়ে তাঁর কপালে চুমু খান এবং বলেন- يا صفى الله - এরপর আবাবো চুমু খান আর বলেন- يا خليل الله -^{৪৭} মূলত সীমাহীন এ কষ্ট সহ্য করা যে কোনো মুমিনের জন্যই দূরহ। তাই তাঁর আক্ষেপ এমন ঘটনার পর বেঁচে থাকার যেন কোন অর্থ হয়না, যেন কিয়ামত সংঘটিত হওয়াই শ্রেয়। ধন, সম্পদ, সন্তানাদি যেন সবকিছুই অর্থহীন। আবু বকর (রা.) এর কষ্টের সেই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে নীচের কবিতায়-^{৪৮}

يا ليتني نبتت الغداة به * قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقد
ليت القيامة قامت بعد مهلكه * ولا نرى بعده مالا ولا ولدا
والله أثني على شيء فجعت به * من البرية حتى أدخل اللحد

হায়! আমি সকাল বেলা জানতে পেরেছি রসূল (সা.) নাই। তারা বলল রসূল মৃত্যুবরণ করেছেন এবং হারিয়ে গেছেন। হায়! তাঁর মৃত্যুর পর যদি কিয়ামত অনুষ্ঠিত হতো এবং তাঁর পরবর্তীকালে কোনো সম্পদ ও সন্তান দেখতে না পেতাম। আল্লাহ আমার নিকট এমন বিষয় দিয়েছেন যার জন্য সৃষ্টির মাঝে আমি কবরে প্রবেশ করা পর্যন্ত দুঃখ পেয়েছি।

যে রসূল (সা.) ছিলেন প্রাণাধিক প্রিয় ব্যক্তি। সুদিন-দুর্দিনে যিনি ছিলেন আশার আলো। সেই রসূল আজ নেই, তাঁকে কবরস্থ করে কিভাবে বেঁচে থাকা যাবে। এই বিরহ কিভাবে সহ্য করা যাবে। মনে হয় যেন বুকের পাজরের হাড়গুলো রসূলের শোকে ভঙ্গুর হয়ে গেছে। রসূলের ইতিকালে হযরত আবু বকর (রা.) এর কষ্ট ও শোক কবিতা হয়ে ঝড়ে পড়ে নীচের কবিতায়-^{৪৯}

لما رأيت نبينا متجندلا * ضاقت علي بعرضهن الدور
وارتعت روعة مستهام واله * والعظم مني واهن مكسور
أعتيق ويحك ان حبك قد ثوى * وبقيت منفردا وأنت حسير

যখন রসূল (সা.) কে শয্যাশায়ী দেখলাম, তখন প্রশস্ত বাড়িগুলো আমার নিকট সংকীর্ণ মনে হলো। আর আমি বেহুশ ও অস্থিরের ন্যায় ভয় পেলাম, যেন আমার হাড় ভেঙ্গে দুর্বল হয়ে পড়ছে। হে বুড়ো! তোমার বন্ধু কবরস্থ হয়ে গেছে, আর তুমি ক্লান্ত অবস্থায় একাকী বেঁচে আছো।

শুধু তাই নয় এমন দুঃসংবাদ শোনার আগেই যদি তিনি কবরস্থ হয়ে যেতেন তবে তো আর এ দুঃখ বয়ে বেড়াতে হতো না। রসূলকে ঘিরে তাঁর কত মধুময় স্মৃতি, নবীর কত সুন্দর সুন্দর উপদেশ, যা তাঁর প্রাণ জুড়িয়ে দিত। যা আর কখনই শুনতে পাওয়া যাবে না। এ আক্ষেপ পূরণ হবার নয়, এ দুঃখ কখনো ভুলবার নয়।

তাই তো হযরত আবু বকর (রা.) এর আক্ষেপভরা কাব্য-^{৫০}

فليتني حين نبئت الغداة به * غيببت في جدث علي صخور

فلتحدثن بدائع من بعده * تعيابهن جوانح وصدور

হায়! যখন সকাল বেলা তুমি মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়েছো, তখন যদি আমি পাথরে চাপা অবস্থায় কবরে লুকিয়ে থাকতাম। (হে আল্লাহর রসূল যদি তুমি বেঁচে থাকতে) তাহলে পরবর্তীতে তুমি এমন চমৎকার কথা বলতে, যাতে হৃদয় ও চতুর্পাশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

রসূল (সা.) কে দেখতে না পাবার জ্বালা হযরত আবু বকর (রা.) কে ব্যাকুল করে তোলে। যে নবীর চারিত্রিক মাধুর্যে তাঁর ঘোর শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হত। যে নবীর দয়া ও অনুগ্রহ মানুষকে ছাপিয়ে অন্যান্য জীবের প্রতি ও সমভাবে প্রযোজ্য হত। বিড়ালকে পানি পান করানোর জন্য পানির পাত্র এগিয়ে দেয়া,^{৫১} চতুষ্পদ গৃহপালিত পশুকে কষ্ট না দেয়ার শিক্ষা দেয়া।^{৫২} এ সকল চারিত্রিক মাধুর্যের কথা সাহাবারা সকলেই অবগত ছিলেন। যে নবীর প্রতি প্রাণ উৎসর্গ করতে সাহাবারা উদগ্রীব থাকতেন। এমন নবীর প্রতি প্রাণ উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে আবু বকর (রা.) বলেন-^{৫৩}

كم لي بعدك من هم ينصيني * إذا تذكرت اني لا أراك ابدًا

كان المصفي في الأخلاق قد علموا * وفي العفاف فلم نعدل به أحدًا

نفسى فداؤك من ميت ومن بدن * ما أطيب الذكر والأخلاق والجسدا

আপনার অনুপস্থিতিতে যখন আমার মনে পড়ে যে, আমি আপনাকে কখনো দেখতে পাব না, তখন কতই না দুঃখিন্তা আমাকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখে। তাঁর নির্মল চরিত্র সম্পর্কে সাহাবাগণ অবগত। পবিত্রতায় তাঁর বিকল্প কাউকে পাব না। আমার জীবন এমন মৃত দেহের জন্য উৎসর্গ হোক, যার আলোচনা, চরিত্র ও দেহ খুবই পবিত্র।

হযরত উমর (রা.)

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)। তিনি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। তিনি ছিলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব যার ইসলাম গ্রহণ ছিল বিজয় সদৃশ, যার হিজরত ছিল সাহায্য সদৃশ, আর যার খেলাফত ছিল রহমত সদৃশ।^{৫৪} তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ন্যায়পরায়ণ, কাব্য বিদগ্ধ ব্যক্তি।^{৫৫} ইসলামকে শক্তিশালী করতে নবী (সা.) উমরের ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন।^{৫৬} নবীর প্রেম আর ভালবাসায় অনন্য ব্যক্তিত্ব উমর (রা.)-ই সেই ব্যক্তি যিনি রসূল (সা.) কে বলেছিলেন তিনি নিজের জীবনের থেকেও রসূলকে বেশি ভালবাসেন।^{৫৭} তাঁর উপনাম আবু হাফস।^{৫৮}

নবী (সা.) এর ইন্তিকালে তিনি হতবিস্মল হয়ে পড়েছিলেন। রসূলের শোকে তিনি শোকগাথাও রচনা করেন।^{৫৯} রসূল (সা.) এর ইন্তিকালের পর তিনি বলেছিলেন যে রসূলের মৃত্যুর কথা বলবে তিনি তাকে হত্যা করবেন। রসূল মৃত্যুবরণ করেননি বরং তিনি তাঁর রবের সাথে দেখা করতে গেছেন।^{৬০} বাস্তবিক পক্ষে রসূলের প্রতি ভালবাসার আতিশয্যে তিনি এমন করেছিলেন। তবে শিবলী নুমানি তাঁর এই অস্থিরতাকে

মুনাফিকদের রসূলের অনুপস্থিতিতে বিপ্লব ঠেকানোর চেষ্টা বলে মনে করেন^{৬১} এবং যা তাঁর কাব্যমালায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও রসূল (সা.) কে হারানোর কথা সাহাবারা ভাবতেও পারতেন না; কিন্তু বাস্তবতা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা অতিরঞ্জন করতেন না। তাইতো দেখা যায় রসূলকে হারিয়ে হাজারো দুঃখ বুকে চেপে হযরত উমরের হাহাকার-^{৬২}

لعمري لقد أيقنت أنك ميت * ولكنما أبدى الذي قلته الجزع
وقلت يغيب الوحي عنا لفقده * كما غاب موسى ثم يرجع كما رجع
وكان هواي أن تطول حياته * وليس لي في بقاءه طمع
فلم تك لي عند المصيبة حيلة * أراد بها أهل السمات والفزع

আমার জীবনের শপথ! আমি নিশ্চিত যে, আপনি মৃত; কিন্তু আমি যে কথা বলেছি তা উৎকণ্ঠমূলক। আমি বললাম, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের নিকট ওহী আসার ধারা হারিয়ে যাবে, যেক্রপভাবে মূসা (আ.) হারিয়ে গিয়েছিলেন। অতঃপর অতীতের মত তা (ওহী) ফিরে আসবে যেক্রপ অতীতে তিনি (মূসা) ফিরে এসেছিলেন। আমার চাওয়া ছিল তিনি যেন দীর্ঘজীবী হোন। কোন মৃত মানুষের রেখে যাওয়া বস্তুর প্রতি কোন জীবিতের আকাঙ্ক্ষা থাকেনা। বিপদকালে আমার উদ্ধারের কোন কৌশল জানা ছিলনা, যা বিদ্বেষী ও গীবতকারীগণ কামনা করেছিল।

সূরা নহর অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল (সা.) বুঝতে পারেন এটা তাঁর বিদায়ী সূরা। তখন নবী (সা.) তাঁর মেয়ে হযরত ফাতেমা (রা.) কে ডেকে জানিয়ে দেন তাঁর বিদায়ের খবর এসে গেছে।^{৬৩} পাশাপাশি মহানবী (সা.) সাহাবাদের নিকট তাঁর ইন্তিকালের ইঙ্গিতপূর্ণ কথা “আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও তাঁর নিকট যা আছে এ দুটোর যে কোন একটি বেছে নেয়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন,” বলে জানান। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেলেন^{৬৪} এবং রসূলের বিদায়ের ইঙ্গিত বুঝে ফেলেন। প্রথম অবস্থায় সাহাবারা তা বুঝতে না পারলেও পরবর্তীতে তাঁরা বুঝে নেন আবু বকরই সঠিক বুঝেছেন এবং তিনিই তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী।^{৬৫} রসূলের ইন্তিকালের সেই ইঙ্গিতের কথা, তাঁর কষ্টের অভিব্যক্তি এবং নিজের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন-^{৬৬}

سوى أذن الله الذي في كتابه * وما أذن الله العباد به يقع
فلما كشفنا البرد عن حو وجهه * إذا الأمر بالجزع المرعب قد وقع
وقد قلت من بعد المقالة قوله * لها في حلوق الشامتين بها بشع
ألا انما كان النبي محمد * إلى أجل وافى به الوقت فانقطع

আল্লাহর তাঁর কিতাবে যে ঘোষণা দিয়েছেন এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে যা সংঘটিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন তা একাকার হয়ে যায়। তাঁর মহৎ মুখমণ্ডল হতে যখন আমরা পর্দা সরিয়ে নেই তখন ভয়ংকর অস্তিত্ব সৃষ্টি হয়। কথার পিঠে আমি একটি কথা বলেছি, সেকথা বিদ্বেষীদের কণ্ঠে বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়। জেনে রেখো মুহাম্মাদ (সা.) একটি সময়কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে গেলে তিনি (দুনিয়া থেকে) ছিন্ন হয়ে যান।

নবী হারানোর নিদারুণ ব্যথা আর কষ্ট অশ্রু হয়ে যখন তাঁর চোখ থেকে বয়ে পড়ছিল, সীমাহীন সেই কষ্টকে লাঘব করা যখন তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, তখন তিনি আপন মনে নিজের চোখকে নিজেই সম্বোধন করে আক্ষেপ করে বলছিলেন-^{৬৭}

وليت محزوناً بعين سخيئة * اكفكف دمعى والفؤاد قد انصدع

وقلت لعيني: كل دمع ذخرت به إن الشجي له دفع

আমি উত্তপ্ত আখি নিয়ে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি আমার অশ্রু মুছে যাচ্ছি, এদিকে আমার হৃদয় ফেটে গেছে। আমি আমার চক্ষুকে বলছি, তোমার মাঝে যত অশ্রু পুঞ্জীভূত করে রেখেছো তা বিসর্জন কর, কেননা এ অশ্রু বেদনা উপশম করে।

আলী ইবন আবী তালিব (রা.)

তিনি ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা। রসূল (সা.) তাঁর মেয়ে ফাতিমার সাথে তাঁকে বিবাহ দিয়েছিলেন।^{৬৮} ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে কিশোরদের মধ্যে তিনি সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিত্ব^{৬৯} আর যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনে রসূল (সা.) কর্তৃক ‘আসাদুল্লাহ’ উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি।^{৭০}

রসূল (সা.) এর স্নেহ ধন্য হযরত আলী একজন কবি ছিলেন। সাইদ ইবন মুসাইব তাঁকে বড় মাপের কবি মনে করতেন।^{৭১} রসূল (সা.) এর ইত্তিকালে আলী (রা.) অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঘরমুখো হয়ে থাকেন। নিজের অসহনীয় দুঃখ নিবারণ, স্ত্রী ফাতিমা (রা.) কে সান্ত্বনা দান এবং কুরআন সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কাজে তিনি মন দিতে সক্ষম হননি।^{৭২} তাঁর শোকাতুর হৃদয় রসূলের শোকে হাহাকার করছিল। তিনি রসূল (সা.) এর লাশ মোবারক গোসল দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।^{৭৩} রসূলের শোকে তিনি শোকগাথা রচনা করেন। যে শোকগাথায় তিনি তাঁর সীমাহীন কষ্টের কথা ব্যক্ত করেন। যেখানে দেখা যায় জীবনের চলতি পথে মানুষ কতনা দুঃখ আর কষ্টে পতিত হয়। কিন্তু রসূলকে হারিয়ে যে দুঃখ আর কষ্ট তিনি পেয়েছেন এ কষ্ট সমগ্র জীবনের যাবতীয় কষ্টের কাছে তুচ্ছ। এ কষ্ট ভুলবার নয়। এ দুঃখ নিবারিত হবার নয়। এ জ্বালা জীবন ভর শুধু তাড়িয়ে বেড়াবে। কষ্টের সেই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নিচের কবিতায়। তিনি বলেন-^{৭৪}

رزئنا رسول الله حقا فلن نرى * بذاك عديلا ما حيينا من الردى

আমরা রসূল (সা.) কে হারিয়ে এতটাই ব্যথিত মুহ্যমান হয়েছি যে, এত দুঃখ-কষ্ট জীবনে কখনোই আমাদের স্পর্শ করেনি।

রসূল আছেন যেন সব আছে। রসূল নাই যেন কিছুই নাই। এই রসূলকে মধ্যমণি করে বদর, ওহুদ, খন্দকসহ অসংখ্য যুদ্ধে তাঁরা জীবনবাজি রেখেছেন। হাজারো সফলতা তাঁদের পায়ে লুটে পড়েছে। রসূল যেন ছিলেন তাঁদের কাছে এক নিচ্ছিন্দ্র সুরক্ষিত দুর্গ সম। তাইতো তিনি বলেন-^{৭৫}

وكننت لنا كالحصن من دون أهله * له معقل حرز حريز من العدى

আপনি ছিলেন আমাদের জন্য সুরক্ষিত দুর্গ সরূপ। যা শত্রুর মোকাবেলায় আমাদের জন্য এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হতো।

প্রতিদিন সাহাবা আজমাইন নবী (সা.) থেকে কত না সুন্দর সুন্দর উপদেশ শুনে প্রাণ ভরাতেন। তাঁরা রসূলকে দেখতেন না মনে হয় তারা হেদায়েতের নুর দেখতেন। কেননা রসূলতো নিজের থেকে কিছুই বলতেন না। তিনি শুধু সেটাই বলতেন যা আল্লাহ তাঁকে বলার নির্দেশ দিতেন।^{৭৬} তাইতো তিনি বলেন-^{৭৭}

وكنا بمرأى النور والهدى * صباحا مساءً راح فينا أو اغتدى

সকাল সন্ধ্যা তিনি যখন আমাদের মাঝে উপস্থিত হতেন, তখন আমরা তাঁর সুদর্শনে হিদায়েত ও নূরের আলোক রশ্মি পেতাম।

হাসসান বিন সাবিত (রা.)

তিনি ছিলেন রসূল (সা.) এর সভাকবি।^{৭৮} ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে তিনি কাফেরদের কুৎসার জবাব দিতেন।^{৭৯} তিনি ইয়াসরিবের খাজরাজ গোত্রের আনসারী সাহাবী।^{৮০} রসূল (সা.) এর ইত্তিকালে তিনি এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে, রসূলহীন বেঁচে থাকা যেন তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হয়েছিল। তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, যদি তিনি রসূলের আগে মারা যেতে পারতেন। যেমন তাঁর করুণ অভিব্যক্তি-^{৮১}

ما بال عينك لا تنام كأنها * كحلت مآقيها بكحل الإثم
جز عا على المهدي أصبح ثاويًا * ياخير من وطئ الحصى لا تبعد
وجهي يفيك الترب لهفي ليتني * غيبت قبلك في بقيع الغرق

হে চোখ তোর ঘুম আসে না কেন? চোখের নীচে ও কোণে সুরমার মতো কালো দাগ হয়ে গেছে কেন? সেই পথিকৃৎ ও পথপ্রাপ্তের বিরহে শোকাতুর হয়ে, যিনি আপন ঠিকানায় পৌঁছে গেছেন। হে মাটিতে বিচরণকারীদের সেবা! দূরে যেয়ো না। জীবনভর হয়তো আমাকে এই দুঃখ নিয়েই বাঁচতে হবে, হায়! যদি আমি তোমার আগে মারা যেতাম, আমাকে দাফন করা হতো জান্নাতুল বাকীতে।

প্রিয় নবীর উপর নিজের মাতা-পিতাকে কুরবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি রসূলের শোকে হাহাকার করে আরো বলেন- হায়! যদি তাঁর জন্মই না হতো-তবে এ কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হতো না। হাসসানের ভাষায়-^{৮২}

بأبي وأمي من شهدت وفاته * في يوم الاثنين النبي المهدي
فظللت بعد وفاته متلبدا * متلددا يا ليتني لم أولد
أ أقيم بعدك في المدينة بينهم * يا ليتني صبحت سم الأسود

রসূল (সা.) এর উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হোক, তিনি সোমবার ইত্তিকাল করেছেন। তাঁকে হারিয়ে আজ আমি শোকাতুর, জড়বস্তুর মতো নিশ্চুপ, আজ আমি দিশেহারা, কিংবর্তব্যবিমূঢ়। আমার জন্ম যদি না হতো, তাহলে তো এই দৃশ্য দেখতে হতো না। আপনাকে ছাড়া এই মদিনায় কীভাবে বসবাস করবো? হায়! যদি সেই দিন প্রভাতে আমাকে কালো বিষ পান করানো হতো।

হযরত হাসসান তাঁর শোকগাথায় মা আমিনার ঘরে প্রিয় নবী (সা.) এর বরকতময় জন্মের কথা স্মরণ করেন। যে নবীর সংস্পর্শে গোটা অন্ধকার জগৎ আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। যিনি ছিলেন আলোর দিশারী। সেই নবীর বিরহ ব্যথা সহ্য করা কীভাবে সম্ভব? নবীর স্মৃতি যেন তাঁদের অস্থির করে তুলছিল। নবীর পদচারণায় মুখর জায়গাগুলো যেন আজ অজানা-অচীন বিজন কোন স্থান। এই নবীর মাধ্যমেই তাঁরা অধঃপতিত জাতি থেকে সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়েছিলেন। আর এ সকল স্মৃতিকথা ফুটে উঠেছে হাসসানের শোকগাথায়-^{৮৩}

يا بكر أمانة المبارك بكرها * ولدته محصنة بسعد الأسعد
نورا أضاء على البرية كلها * من يهد للنور المبارك يهتد
والله أسمع ما بقيت بهالك * إلا بكيت على النبي محمد
ياويح أنصار النبي ورهطه * بعد المغيب في سواء الملحد
ضاققت بالأنصار البلاد فأصبحت * سواد وجوههم كلون الإثم
والله أكرمنا به وهدى به * أنصاره في كل ساعة مشهد

হে আমিনার ছোট্ট দুলাল! তাঁর ছোট্ট দুলালটি অতি বরকতময়, তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন সতী নারীর উদরে সৌভাগ্যবান হয়ে। তিনি আলোকিত করেছেন পূর্ণ বসুন্ধরা, যে তাঁর আনীত হিদায়েতের অনুসরণ করবে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে। আল্লাহর শপথ! আমি যখনই কারো মৃত্যু খবর শুনি, তখনই নবী (সা.) এর বিরহ ব্যথায় কাতর হয়ে যাই, কান্নায় ভেঙ্গে পড়ি। নবী (সা.) কে কবরে সমাহিত করার পর তাঁর সাহাবীগণের জন্য হতাশা, কষ্ট আর দুর্ভোগই রয়ে গেলো। তাঁর ইত্তিকালের পর পরিচিত স্থানগুলোও আজ আনসারদের কাছে যেন অপরিচিত হয়ে গেছে। সুরমার মতো তাদের চেহারাগুলো কালো হয়ে গেছে। শপথ আল্লাহর! তাঁর বদৌলতে আজ আমরা সম্মানিত, তাঁর মাধ্যমেই উম্মত সর্বত্র সবক্ষেত্রে সুপথ পেয়ে ধন্য হয়েছে।

যুবারকন (রা.)

তিনি হলেন যুবারকান বিন বদর আত-তামীমী (রা.)। তিনি জাহিলী যুগে যেমন সম্মানিত ও নেতা ছিলেন তেমনি ইসলামী যুগেও মহান সম্মানের অধিকারী ছিলেন।^{৮৪} রসূল (সা.) তাঁকে তামীম গোত্রের জাকাত আদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন।^{৮৫} রসূল (সা.) এর ইত্তিকালে তিনি ব্যাখাতুর হৃদয়ে মরসিয়া পাঠ করেন। যে মরসিয়াতে তিনি রসূল (সা.) কে *يُدَّرِعُ بِدَرِّهِ* - উম্মতের *هادي* বলে আখ্যায়িত করেন। রসূলের এ শোকের পর তিনি আর কোন শোককে যেন শোক মনে করেন না। আর কারো জন্য অশ্রু ঝরান না। যে নবী আল্লাহর আয়াতসমূহ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আর বিন্দি রজনী আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থেকেছেন। এমনকি এ কারণে তাঁর পা মুবারক ফুলে যেতো।^{৮৬} আর তিনি উম্মতের রক্ষা কবজরূপে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। যুবারকনের ভাষায়-^{৮৭}

أَلَيْتَ لَا أَبْكِي عَلَى هَالِكٍ * بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَنَامِ
بَعْدَ الَّذِي كَانَ لَنَا هَادِيًا * مِنْ حَيْرَةٍ كَانَتْ وَبَدَرَ الظَّلَامِ
يَا مُبْلَغَ الْآيَاتِ عَنْ رَبِّهِ * فِينَا وَمَحْيَى اللَّيْلِ لَيْلِ التَّمَامِ
وَهَادِي النَّاسِ إِلَى رَشْدِهِمْ * وَشَارِعَ الْحَلِّ لَنَا وَالْحَرَامِ
أَنْتَ الَّذِي أَنْقَذْتَنَا بَعْدَمَا * كُنَّا عَلَى مَهْوَاةٍ جَرَفَ قِيَامِ

শ্রেষ্ঠ মানব রসূল (সা.) এর ইত্তিকালের পর কারো মৃত্যুতে আমার আর অশ্রু ঝরে না। তিনি ছিলেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো আলোকবর্তিকা, তিনি ছিলেন আমাদের জন্য পথপ্রদর্শক। তিনি পূর্ণরূপে আমাদের নিকট রবের আয়াত পৌঁছে দিয়েছেন, সারারাত ইবাদতে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন দিশেহারা মানুষের পথের দিশারী, হালাল হারামের বিধান দাতা। আমরা উপবিষ্ট ছিলাম পতনোন্মুখ অতল গহ্বরের প্রান্তে তখন আপনিই তো আমাদেরকে রক্ষা করেছেন।

উপসংহার

সাহাবীদের একের পর এক এরূপ দক্ষ হৃদয়ের করুণ আর্তনাদ, আরবী কাব্য সাহিত্যে শোকগাথা রূপে বিদ্যমান। যে শোকগাথাগুলো শতশত বছর ধরে মহানবী (সা.) এর অনাগত উম্মতের সামনে মহানবী (সা.) এর বিভিন্ন গুণাবলী, তাঁর চরিত্র মাধুর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষা তুলে ধরেছে। পাশাপাশি নবী (সা.) কে হারিয়ে তাঁর প্রিয় সাহাবীদের হৃদয়ের অনুভূতি, তাঁদের দুঃখ-কষ্ট, বেদনা-হাহাকার আর আক্ষেপকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। যা আরবী কাব্য সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে এবং গোটা মুসলিম উম্মাহকে নবী (সা.) এর প্রেম, ভালবাসা, চারিত্রিক মাধুর্য, শিক্ষা, ত্যাগ ও অনুসরণ আর অনুকরণে উদ্বুদ্ধ করবে। এ শোকগাথাগুলোর মাঝেই মুসলিম উম্মাহ তাঁদের প্রিয় নবী (সা.) কে খুঁজে পাবে।

১. الاحساس والشعور والخيال - শব্দটি বাবে নিবন্ধ - নব্বই এর মাসদার। شعر কবিতার আরবি প্রতিশব্দ। شعر শব্দটির অর্থ প্রকাশ করা, উপলব্ধি করা, العلم والفطنة বা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা। পরিভাষায় মানব মনের আকৃতি, আবোগ, উচ্ছাস প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। কবিতা এমন একটি অর্থপূর্ণ বাক্য, যাতে وزن وفنية ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

২. দ্রষ্টব্য. আবু হাতিম আল রাযী, *আয যীনাহ* (কায়েরো: দারুল কিতাব আল আরাবী, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ৮৩; আল হাওহারী, *আস-সিহহা*, ২য় খণ্ড (কায়েরো: মাতবা'তুল কাহিরাহ, ১৪০২ হি.), পৃ. ৬৯৯; কারনীলীউস কানদীক, *মুহীতুদ দায়রাহ* (মূলতান: মাদানী কুতুবখানা, তা. বি.), পৃ. ৩।

৩. رءاء শব্দের অর্থ শোক প্রকাশ করা, বিলাপ করা, দুঃখ অনুভব করা۔ رائء العروس من جواهر القاموس। اللين: حلبه على حامض فخر وهو الرئية۔ رائء تعدد مناقب الميت وإظهار التفجع والتهلل عليه واستعظام۔ رائى: انور رطابة في عمره فرر رطاب بولن- مृतباتية كرمات، دক্ষতা، बुद्धिमत्ता, साहसीकता, वीरतु, शौर्य-वीर्य एवं तार संपुणवली उल्लेख करे शोकाभिभूत है राफसोस, आफ्पेप ओ बया-वेदना उल्लेख करे ये कबिता रचना करा हय ताके रاء বলে।

৪. দ্রষ্টব্য. ড. মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, *আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বিয়াদ প্রকাশনী, জানুয়ারী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪১৬; সাইয়েদ মুহাম্মাদ মুরতাদা আল হুসাইনী আয-যাবিদী, *তাজুল আরকুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, ১ম খণ্ড (কুয়েত: মাতবা'আ হুকুমাহ, ১৪০৭ হি.), পৃ. ২৩৯; আহমদ আল-হাশেমী, *জাওয়াহিরুল আদাব*, ২য় খণ্ড (মিশর: আল মাকতাবাতুল তিজারিয়াহ কুবরা, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ২৭; উমার ফররুখ, *আল-মিনহাজ ফিল আদাবিল 'আরাবী ওয়া তারীখীহী*, ১ম সংস্করণ (বৈরুত: দারুল ইসলাম লিল মাল্লামীন, ১৯৫৯ খ্রি.), পৃ. ১২৮।

৫. ইবন রাশীক আল-কারফয়ানী, *আল-'উমদাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৪৭।

৬. হুসাইন জাম'আহ, *আর রাহা ফিল জাহিলিয়াতি ওয়াল ইসলামী* (দামেস্ক: দারু মা'দ লিন নাশর ওয়াত তাওয়ী, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২১।

৭. ফুয়াদ আকরাম আল বুস্তানী, *আশ-শিরুজ জাহিলী* (বৈরুত: আল মাকতাবাতুল কাছলিকিয়াহ, ১৯২৯ খ্রি.), পৃ. ১৬।

৮. ইবন কুতাইবা, *আশ-শির ওয়াশ শু'আরা* (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৩৪ জুরজী যায়দান, *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, ১ম খণ্ড (মিশর: দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ৬১।

৯. আশ 'শির ওয়াশ শু'আরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

১০. আল 'উমদাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

১১. আল 'উমদাহ, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

১২. শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন আহমদ আয যাহাবী, *সিয়াক 'আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড (কায়েরো: মাকতাবাতুন্নিব্যান দারু ইবনিল জাওয়াহী, ১৪৩৭ হি./২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৫৮।

১৩. ড. তুহা হুসাইন, *আল ওয়াদুল হক্ক* (আল কাহিরাহ: দারুল মাআ'রিফ, ১৯১৯ খ্রি.), পৃ. ১১০।

১৪. আল ওয়াদুল হক্ক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

১৫. আবুল ফিদা হাফেজ ইবন কাসির আদ দামেক্কী, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৫ম খণ্ড (কায়েরো: মাকতাবাতুস সাফা, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৮৭।

১৬. সফীউর রহমান আল-মুবরকপুরী, *আর-রাহীকুল মাখতুম* (আর-রিয়াদ: মাকতাবাতু দারিস-সালাম, ১৪১৪ হি.), পৃ. ৪৬৯।

১৭. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

১৮. ইবন আদিল বার, *আল-ইসতীয়াব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, ৩য় খণ্ড (কায়েরো: ইবদা' লিল ই'লাম ওয়ান নাসর, ১ম সংস্করণ, ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি.), পৃ. ৪০৬।

১৯. আল-ইসতীয়াব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৭; মুহাম্মদ আব্দুল মা'বুদ, *আসহাবে রাসুলের জীবন কথা*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ১৬৮; ইবন খল্লিকান, *অফিয়াতুল আ'য়ান ওয়ান আমবাউ' আবনাহী যামান*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ৩০০-৩০১।

- ১৮ আল-ইসতীযাব, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪০৭; আল-বিদয়াহ ওয়ান নিহায়াহ, প্রাণ্ডক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪।
- ১৯ আব্দুল্লাহ আত-তানতুবী, আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, ১ম খণ্ড (দামেস্ক: দারুল কলম, ২০০৭ খ্রি./১৪২৮ হি.), ২৯১।
- ২০ وحى শব্দের অর্থ- الإشارة، الرسالة، الإلهام، الخفى، ইঙ্গিত, বার্তা, ঐশি অনুপ্রেরণায় গোপন কথা ইত্যাদি।
দ্রষ্টব্য. ইবন মানযুর, লিসানুল 'আরাব, ৯ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪৩৪ হি.), পৃ. ২৪৫।
- ২১ জীত্রাইল: ফেরেস্টাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেস্টা। আল্লাহ ও তাঁর রসুলদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছেন। যার নাম রেখেছেন 'রুহুল কুদুস'।
দ্রষ্টব্য. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, ইসলামী আকীদার স্বরূপ ও প্রকৃতি (রাজশাহী: গৌরাহাঙ্গ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ১২৯।
- ২২ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯১।
- ২৩ যেমন মহিলা সাহাবী খাওলা বিনতে ছা'লাবার স্বামী তাঁর সাথে طهار করলে তিনি রসুলের কাছে এসে এর প্রতিকার চান এবং বলেন,
اللهم إني أشكك إليك - তখন আল্লাহ ওহী নাযিল করেন, فَذْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي لَخَ، আর সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।
দ্রষ্টব্য. কাবী মুহাম্মাদ ছানাতুল্লাহ, তাফসীরুল মাজহারী, ৯ম খণ্ড (দেওবন্দ: জাকারিয়া বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ১৯১।
- ২৪ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল-বুখারী, জামেউল সাহী আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, হাদীস নং: ৩৯৫০ (কায়রো: জমহুরিয়াতু মিশর আল-আরাবিয়াহ, ১৪৩২ হি.), পৃ. ২৩৭।
- ২৫ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯১।
- ২৬ ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ ফি মা'রিফতিস সাহাবাহ, ৩য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুস সাফা, তা. বি.), পৃ. ১৩৫।
- ২৭ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১১।
- ২৮ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১২।
- ২৯ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১৩।
- ৩০ শামসুদ্দীন আবু 'আদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন বাকর, যাদুল মা'আদ, ২য় খণ্ড (মিশর: মাতবা'আ মুত্তফা আল বাবিল হালাবী, ১৯২৮ খ্রি.), পৃ. ৯৩-৯৪।
- ৩১ ইবনে হিশাম, আস-সিরাতুন নাবাবিয়াহ, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪২৭ হি.), পৃ. ৩১৯।
- ৩২ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১৩-২১৪।
- ৩৩ যেমন আল্লাহ বলেন: فَذْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ الخ۔ দ্রষ্টব্য. সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৪৪।
- ৩৪ যেমন আল্লাহ বলেন: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ عِلْمًا الخ۔ দ্রষ্টব্য. সূরা আল-আনকাবুত, আয়াত: ১৪।
- ৩৫ নমরুদ: শব্দটি তামাররদা শব্দ হতে উৎপন্ন। এর অর্থ যে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইবরাহীম (আ.) তাকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে সে ইবরাহীম (আ.) কে হত্যা করার জন্য আওনে নিক্ষেপ করে। সে আল্লাহকে আক্রমণ করার লক্ষে তীর নিক্ষেপ করে।
দ্রষ্টব্য. ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ২৫৮।
- ৩৬ আদ: আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা এসেছে। যেমন-
وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۚ سُرًّا هَاجًا، আয়াত: ৬
فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ ۖ ۝ ١٥
وَعَادُ وَثَمُودَ ۖ فَذْ تَبَيَّنَ الخ ۝ ৩৮
আদ জাতি ছিল হুদ (আ.) এর সম্প্রদায়। তারা আহকাফে বাস করত। এটা ছিল ইয়ামেনের একটা শহর। তাদের উপর আল্লাহ প্রবল বাড় প্রেরণ করেন। কারণ তারা তাদের শক্তির বড়াই করত। কেউ তাদের মোকাবেলা করতে পারে তা তারা বিশ্বাসই করত না। আল্লাহর প্রেরিত বায়ুতে জমিন থেকে পাথর উঠে তাদের উপর বর্ষণ হতে থাকে। অবশেষে সেই বায়ু তাদের আকাশে তুলে উল্টোমুখে নিক্ষেপ করে। তারা কাওহীন খেজুর গাছের মত হয়ে যায়।
দ্রষ্টব্য. হাফেজ ইবনে কাসির, তাফসীরুল কুরআনুল কারীম, ৬ষ্ঠ খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ১৪৪০ খ্রি.), পৃ. ২৮৮-২৮৯।
- ৩৭ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১৪।

- ৮৮ আহমদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদে রাঈহ আল আন্দালুসী, *আল ইকদুল ফারিদ*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়াহ, ১৪১৭ হি.), পৃ. ১৪।
- ৮৯ ড. আহমদ আলী, *খালীফাতু রাসূলিয়াহ আবু বাকর আছছিন্দীক* (ঢাকা: আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ইসলামিক সেন্টার, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১০৪।
- ৯০ জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী, *তারীখুল খুলাফা* (দিল্লী: মাকতাবাতু ইশা'আতিল ইসলামী, তা. বি.), পৃ. ৪৩।
- ৯১ মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন সানি আল-হাশেমী, *আত-তাবকাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুতিবয়ান, দার ইবনি যাওয়ী, তা. বি.), পৃ. ১৭৯।
- ৯২ *আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
- ৯৩ মুহাম্মাদ আস-সুয়ানী, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়াহ কামা জাআত ফিল আহাদীছিস সহীফা*, ১ম খণ্ড (আর-রিয়াদ: মাকতাবাতুল আবীকান, ১৪২৪ হি.), পৃ. ২৬৩।
- ৯৪ *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।
- ৯৫ *জামিউস সহীহ আল-বুখারী*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং: ৩৬৬১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।
- ৯৬ *আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
- ৯৭ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।
- ৯৮ *আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
- ৯৯ তদেব।
- ১০০ তদেব।
- ১০১ আব্বাস মাহমুদ আল-আক্বাদ, *আল-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়াহ*, মুহাম্মাদ আস-সাদিক, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল লুবনানী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৮৮।
- ১০২ তদেব।
- ১০৩ *আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।
- ১০৪ ড. আলী মুহাম্মাদ আস-সাল্লাদী, *তারীখুল খুলাফা আর রাশিদীন*, সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) শাখসিয়াতিহী ওয়া আসরিহী, ২য় খণ্ড (কায়রো: মুআছাছাতু ইকরা, ১৪২৫ হি.), পৃ. ২২।
- ১০৫ *আল-উমদাহ*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।
- ১০৬ যাবী যাদাহ আলী ফাহমী, *সুহনুস সাহাবাহ ফী শারহে আশ'আরুছ ছাহাবাহ*, ১ম খণ্ড (মাতবাতা' রওশন, ১৩২৪ হি.), পৃ. ৩১৯।
- ১০৭ আবু ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবন ইলিয়াস আল-ফালুদাহ, *আল-মাউসু'আতু ফী সাহীহিস সীরাতনি নাবাবিয়াহ*, ১ম খণ্ড (মক্কাতুল মুকাররামাহ: মাকতাবাতুল মালিক ফাহাদ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ১৭।
- ১০৮ মুহাম্মাদ রেজা, *তারীখু ওয়া সীরাতু ওয়া মানাকীবু আমীরুল মু'মিনীন*, *আল ফারুক ইমর বিন আল খাত্তাব* (মিশর: মাকতাবাতুল জামিয়াহ, আল মাতবাতা'তুল মাহমুদিয়াহ আত-তিজারিয়াহ বিল আযহার, ১৩৫৫ হি.), পৃ. ৮।
- ১০৯ *আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।
- ১১০ *আত-তাবকাতুল কুবরা*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১০।
- ১১১ শিবলী নুমানী, *আল ফারুক* (ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয় বাংলাবাজার, ৫/১ গিরদে উরদু রোড, জুন ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২০।
- ১১২ *আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
- ১১৩ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১।
- ১১৪ *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩।
- ১১৫ *আর-রাহীকুল মখতুম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৬।
- ১১৬ *আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।
- ১১৭ তদেব।

-
- ৬৮ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৯৩।
- ৬৯ সাইয়েদ আহমদ আল-হাশিমী, জাওয়াহিরুল আদাব ফী আদাবিয়াতি ওয়া ইনশাই লুগাতিল 'আরাব, ২য় খণ্ড (মিশর: আল মাকতাবাতুত তিজারিয়াতুল কুবরা, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১১৯।
- ৭০ Syed Ameer Ali, *Short History of The Saracens* (London: Macmillan and Company Limited, 1949), p. 53.
- ৭১ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮০।
- ৭২ আল-ইসতিয়াব, প্রাণ্ডক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯০।
- ৭৩ ড. আলী মুহাম্মাদ সাদ্বাবী, আমীরুল মু'মিনীন 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.), ১ম খণ্ড (কায়রো: মাকতাবাতুস সাহাবাহ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৫৬।
- ৭৪ ড. ইউসুফ ফারহাত, শারহে দীওয়ানিল ইমাম 'আলী ইবন আবী তালিব (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরবী, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২২।
- ৭৫ তদেব।
- ৭৬ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ দ্রষ্টব্য। সূরা নাজম, আয়াত: ৩-৪।
- ৭৭ শারহে দীওয়ানিল ইমাম 'আলী ইবন আবী তালিব, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২২।
- ৭৮ ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ, ২য় খণ্ড (মাকতাবাতুস সাফা, তা. বি.), পৃ. ৩।
- ৭৯ তদেব।
- ৮০ তদেব।
- ৮১ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৬।
- ৮২ তদেব।
- ৮৩ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৭।
- ৮৪ উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১৭।
- ৮৫ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৩।
- ৮৬ ইমাম আবু ঈসা আত তিরমিযী, তিরমিযী শরীফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রি.), হাদীস নং: ৪২০৮, পৃ. ৪৯৮।
- ৮৭ আল-আ'লামুন নাছরিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৩৪।

যুররুম্মাহর কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি

ড. ছালেকুজ্জামান খান*

Abstract: The Poet Zurrumma is one of the best poets of the Umayyad era. He was endowed with extraordinary poetic talent. At his young age, he reached to a unique height in the world of Arabic poetry. The language of his poetry was easy, cognizable and coherent. He is called the magician of Simile and Metaphor in Arabic poetry. None of his contemporaries could surpass him in poetry of love and nature. The influence of the desert is noticeable in his life as the poet spent a long period of his life in the desert. He has highlighted the amazing beauty of the desert in his writings. He composes poems comparing his beloved to a deer standing in the desert in the evening. In creating analogies, the poet Zurrumma is compared to the poet-emperor *Imru' al-Qais* (in classical Arabic nominative *Imru'ul-Qays*) of the Jahiliyyah era. This paper focuses on the theme of love and the description of desert animals and mountain in his poems.

ভূমিকা

কবি যুররুম্মাহ হলেন উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি অসাধারণ কাব্যপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়স পেয়েও নিজ কর্ম ও যোগ্যতা দ্বারা আরবী কাব্য জগতে এক ঈর্ষণীয় স্থান দখল করে আছেন। তিনি আরবী প্রেমের কবিতায় উপমা শিল্পের জাদুকর ছিলেন। তিনি বিগুহু ভাষার কবি ছিলেন। প্রেম ও প্রকৃতির কবিতায় তার সমাসাময়িকদের কেউ তাকে অতিক্রম করতে পারেনি। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মাইয়া নাম্নী এক নারীকে ভালবেসেছেন এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর জন্য কবিতা রচনা করেছেন। কবির জীবনের বড় একটি অংশ মরুঅঞ্চলে অতিবাহিত হয় ফলে তিনি তাঁর কবিতায় মরুভূমি তথা প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে কৃপণতা করেননি। তিনি তাঁর প্রেমসীকে মরুভূমিতে গোধুলী বেলায় দাঁড়িয়ে থাকা হরিণীর সাথে তুলনা করেছেন। প্রেমমূলক কবিতায় উপমা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুররুম্মাহকে জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ইমরুউল কায়সের সাথে তুলনা করা হয়। বলা হয় ইমরুউল কায়স কবিতার সূচনা করেছেন এবং যুররুম্মাহ এর সমাপ্তি টেনেছেন। কবি যুররুম্মাহ প্রকৃতির মনোরম চিত্র তাঁর কবিতায় নানান রং দিয়ে এঁকেছেন। উষ্ট্রী, বন্যাগাভী, পাহাড়-পর্বত, প্রাণী-অপ্রাণী কোন কিছুই তিনি বাদ দেননি। সবকিছুর বর্ণনাই তাঁর কবিতায় বিদ্যমান।

পরিচয়

তাঁর নাম গায়লান ইবন 'উকবা। কুনিয়াত আবুল হারিস, উপাধি যুররুম্মাহ।^১ তাঁর মাতা ছিলেন বনু আসাদ গোত্রের যাবিয়া নাম্নী একজন প্রখ্যাত নারী।^২ তিনি যুররুম্মাহ নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। কবির এ উপাধিটি তাঁর প্রেমিকা মাইয়া কর্তৃক প্রদত্ত ছিল। একদা কবি তাঁর প্রেমিকার কাছে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন যখন সে তাঁর মায়ের পাশে বসে ছিলো। কবি তাঁর প্রেমিকার কাছে পানি পানের আত্মহ প্রকাশ করেন। মাইয়া পানি এনে যখন কবিকে দিতে গেলো তখন কবির ঘাড়ে এক টুকরো দড়ি ছিল যা দেখে মাইয়া কবিকে যুররুম্মাহ (দড়িওয়ালা) বলে সম্বোধন করে। প্রেমিকা কর্তৃক প্রদত্ত বিশেষণটি পরিবর্তীতে একটি স্বতন্ত্র নাম ধারণ করে। কবি এভাবে যুররুম্মাহ নামে পরিচিতি লাভ করেন।^৩

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শাওকী দায়ফ তার গ্রন্থে কবির যুররুম্মাহ উপাধি লাভের আরো দুটি কারণ উল্লেখ করেন।^৪ প্রথমটি হলো: যুররুম্মাহ এর কথা: رَمَّةُ التَّقْلِيدِ এর কারণে তাকে যুররুম্মাহ বলা হয়। দ্বিতীয়টি হলো: শৈশবে কবি অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে একটি সুতায় তাবিজ ঝুলিয়ে দেয়া হয়, যা থেকে তিনি পরবর্তীতে যুররুম্মাহ উপাধি লাভ করেন।

কবির বংশ পরিচয় গায়লান ইবন ‘উকবা ইবন নুহায়স ইবন মাউদ ইবন হারিসা ইবন ‘আমর ইবন মা‘ইদা ইবন কা‘ব ইবন ‘আওফ ইবন রাবী‘আ ইবন মিলকান ইবন ‘আদী ইবন ‘আবদ মানাত। তিনি বিখ্যাত মুযার গোত্রের লোক ছিলেন।^৫ ‘উমার রিয়া কাহালা বলেন-

غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود بن حارسة المضرى ويلقب بذي الرمة.^৬

কবি যুররুম্মাহ হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ দিকে ৬৯৬/৭৭ সালে আরব উপদ্বীপের ইয়ামামা অঞ্চলের মরুঅঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বেদুইন পরিবেশে পরিবারের সাথে লালিত-পালিত হন। যুররুম্মাহর তিন ভাই মাসউদ, জিরকাস ও হিশাম তিনজনই কবি ছিলেন।^৭

কবি যুররুম্মাহ মরুঅঞ্চলে বেড়ে উঠলেও কূফা ও বসরায় বিভিন্ন সময় যাতায়াত করেন। ফলে কবির জীবনাচরণ ও বাচন ভঙ্গিমাতে যথেষ্ট পরিমাণ শহুরে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যুররুম্মাহ খর্বাকৃতি, ক্ষীণকায়, কুৎসিত ও গোল চেহারা বিশিষ্ট মানুষ ছিলেন।^৮ যুররুম্মাহর দেহাবয়ব অসুন্দর হলেও তিনি অত্যন্ত মেধাবী, বিচক্ষণ, বিশুদ্ধ ভাষী, সৎ চরিত্রবান ও সুশিক্ষিত কবি ছিলেন। তিনি মরুঅঞ্চলের মানুষদেরকে পড়া-লেখা শিক্ষা দিতেন।^৯

কবি যুররুম্মাহ এমন এক পরিবেশে বেড়ে উঠেন, যখন উমাইয়া খিলাফতের অধীন হিযাজ, শাম, ইরাক ও মিসরসহ অন্যান্য অঞ্চলের মানুষদের সাথে অধিকহারে বেদুইনদের যাতায়াত ও মেলামেশার কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সভ্যতার বিনিময় ঘটে। ফলে সে সময়ে হিজায়সহ মরুঅঞ্চলে গজল কবিতার চর্চা হয়। দামেশকে খলীফাদের প্রশংসার জন্য কতিপয় কবির উদ্ভব হয়।^{১০} যুররুম্মাহ প্রাথমিকভাবে রজয (رجز) কবিতার মাধ্যমে কাব্যচর্চা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি শহুরে সভ্যতার সাথে পরিচিত হন এবং আরবী ভাষার পণ্ডিতদের সংস্পর্শ লাভে সক্ষম হন। নিজে আরবী ভাষার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও এর শব্দভাণ্ডার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানার্জন করেন। যুররুম্মাহর কাব্যচর্চার সূচনা হয় একজন রাখালের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। তিনি ছিলেন সেই রাখালের বর্ণনাকারী। বেদুইন কবিদের দ্বারা যুররুম্মাহ প্রভাবিত হলেও তাঁর কবিতায় শহুরে ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু পরিলক্ষিত হয়।^{১১}

কবি যুররুম্মাহ প্রাচীন আরবী কবিগণ ও তার সমসাময়িক কবিদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। যার প্রভাব তাঁর কবিতার মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন কবিদের মধ্যে ইমরুউল কায়স, মুরাক্কিশ, লাবীদ, ‘আনতারা, যুহায়র ছাড়াও অন্যান্য কবিদেরকে তাঁর কাব্য রচনায় অনুসরণ ও অনুকরণ করেন। প্রাচীন কবিদের পাশাপাশি সমসাময়িক কবি রুবা, আল-আজাজ, রাখাল কবিহসহ অন্যান্য কবিদের তিনি অনুসরণ করেন।^{১২}

যুররুম্মাহ ইরাকের কূফা ও বসরা শহরে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। সেখানে তিনি শাসকশ্রেণীর প্রশংসায় কবিতা রচনা করে তাদের প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। তিনি হিলাল ইবন আহওয়ায আল-মামিনী, আব্দুল মালিক ইবন মিশর ইবন মারওয়ান, উমর ইবন হুযায়রা আল-ফায়ারী, বিলাল ইবন আবু বুরদা আল আশ‘আরী প্রমুখ শাসকদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। কবি দামেশকের রাজা হিশাম ইবন আব্দুল মালিক ও মক্কার গভর্নর ইবরাহীম ইবন মিশাম আল-মাখযূমীর প্রশংসায়ও কাসিদা রচনা করেন।^{১৩}

ধর্ম

কবি একজন প্রকৃত মুসলমান ছিলেন। তিনি তাঁর বাস্তব জীবনে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলতেন। তিনি বিনয় ও একনিষ্ঠতার সাথে নামাজ আদায় করতেন। তাকে উত্তমরূপে নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে কবি এর উত্তরে বলেন-*ان العبد إذا قام بين يدي الله لحقيق أن يخشع*। “বান্দা যখন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাঁর দায়িত্ব হলো বিনয়ের সাথে দাঁড়ানো।”^{১৪} কবি যুররুম্মাহর অনেক কবিতায় তাঁর ধর্ম বিশ্বাস, তথা তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। নিম্নোক্ত কবিতায় তিনি বলেন-

فما زلت أدعو الله في الدار طامعا * بخفض النوى حتى تضمنها الخدر^{১৫}

‘আমি সর্বদা আল্লাহর কাছে দোআ করি যেন আমার দুরে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়, বরং আমি যেন গৃহেই অবস্থান করি।’

মৃত্যু

উমাইয়া যুগের এ মহান কবি মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে হিশাম ইবন আব্দুল মালিকের শাসনামলে ৭৩৫/১১৭ সালে ইহকাল ত্যাগ করেন। কবিকে মরুভূমিতে আবার কারো মতে ইস্পাহানে দাফন করা হয়।^{১৬} কবির মৃত্যুর কারণ ও স্থান নিয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি মত হলো: তিনি ইয়ামামার হিজর অঞ্চলে মৃত্যু বরণ করেন। অপর একটি মত হলো: তিনি বসরার নিকটবর্তী মরুঅঞ্চলে মৃত্যু বরণ করেন এবং মৃত্যুর কারণ ছিল তার বাহন উষ্ট্রী তাকে মরুভূমিতে ফেলে রেখে চলে যায় এমনাবস্থায় সে বাহনের উপর তাঁর খাদ্য-পানীয় মজুদ ছিল। তৃতীয় মত হলো: তিনি গুটিবসন্ত রোগে মৃত্যু বরণ করেন।

দীওয়ান

যুররুম্মাহর কবিতাসমগ্র তাঁর দীওয়ানে সংরক্ষিত আছে। কবির দীওয়ানটি বৈরুত ও কায়রোসহ একাধিক স্থান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। খতীব আত-তিবরীযীসহ একাধিক মনীষী তাঁর দীওয়ানের তাহকীক করেছেন।^{১৭}

যুররুম্মাহর কবিতায় প্রেম

যুররুম্মাহ আরবের একজন প্রসিদ্ধ প্রেমিক কবি ছিলেন। তিনি একাধিক নারীর প্রেমে পড়েছেন এবং তাদের উদ্দেশ্যে কবিতাও রচনা করেছেন। কবি তাঁর কবিতায় যে নারীর প্রসঙ্গ অধিকহারে তুলে ধরেছেন তিনি হলেন- মাইয়া বিনত মুকাতিল ইবন তালালা ইবন কায়স ইবন ‘আসিম আল-মিনকারী। যখন কবির বয়স ছিল মাত্র বিশ বছর তখন কবি মাইয়াকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। আর মাইয়া বয়সে কবির চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। মাইয়া ছিলেন একাধিক সন্তানের জননী। তথাপি মাইয়া একজন রূপবতী ও গুণবতী নারী ছিলেন। কবির প্রেমের কাহিনী কোন সাধারণ প্রেমের ঘটনার মত ছিলনা। এখানে শুধু কবিই সারা জীবন মনে প্রানে মাইয়াকে ভালবেসে যান। ভালবাসার প্রকাশ ছিল কবির কবিতায়। কবি তার ভালবাসার মানুষের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন-

ديار مية إذ مّ تساعفنا * ولا يرى مثلها عجم ولا عرب

براقة الجيد و البات واضحة * كأنها ظبية أفضى بهالبيب^{১৮}

‘মাইয়ার বাস্তবতা যে মাইয়া আমাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর মত (দানশীলা) আরব-অনারব কেউ দেখেনি।

তাঁর গ্রীবা উজ্জ্বল, আর কণ্ঠ মসৃণ। যেন হরিণীর মত যার বক্ষের উপরিভাগ প্রশস্ত।’

যেহেতু কবি মাইয়ার ভালবাসার যথাযথ প্রতিদান পাননি সেহেতু কবির কাছে মাইয়ার ভালবাসা ছিল আশা-নিরাশার মাঝে। কবির প্রতি মাইয়ার ভালবাসা ছিল অন্ধকার রাতের সেই পথিকের মত যার আলোর মশাল কখনো নিভু নিভু করে আবার কখনো প্রজ্জ্বলিত হয়।

وحيا لي سوادا الليل مرتعدا * كأنها النار تخبو ثم تلتهب^{১৯}

দীর্ঘ বিশ বছর কবি তাঁর প্রেমিকা মাইয়াকে ভালবাসলেও মাইয়া কখনো কবিকে ভালবাসেনি। এমনকি মাইয়া প্রথমে লোকমুখে জানতে পারে যে, কবি যুররুম্মাহ তাঁকে ভালবাসেন। কবির ভালবাসার কথা জেনে মাইয়া তাঁকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলেন। কবি এ কথা শুনে খুব রাগান্বিত হলেন।^{২০} তিনি মাইয়াকে হেয় করে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন।-

على وجه مَيَّ مسحَة من ملاحَة * وتحت الثياب العار لو كان باديا

ألم تر أن الماء يخبث طعمه * وإن كان لون الماء أبيض صافيا

كذلت مَيَّ في الثياب اذا بدت * وأثوابها يخفين منها المخازيا^{২১}

মাইয়ার চেহারায়ে রয়েছে লবণাক্ততার (অসুন্দরতা) ছাপ। আর তার পোশাক যার ভিতর থেকে প্রকাশিত হয় অপমান-অপদস্থতা। তুমি কি দেখনা যে, পানি কখনো স্বচ্ছ ও শুভ্র থাকার পরেও এর স্বাদ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এমনি ভাবে মাইয়া পোশাক পরিহিতা অবস্থায় মানুষের মাঝে প্রকাশিত হয়। অথচ তাঁর পোশাক লজ্জা আর অপমানকেই ঢেকে রাখে।

কবি যুররুম্মাহর প্রেম তাঁর জীবন প্রবাহের উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করেছিল। কবি যখন মাইয়াকে দেখে তখন প্রেমে পড়ে যায়। তাঁর হৃদয়মন্দিরে প্রেমের আবহ তৈরী হয়। কবি যখন মাইয়ার প্রতি হৃদয়ে প্রেম অনুভব করেন তখন তাঁর বয়স খুব বেশি ছিলনা। ফলে কবি তাঁর প্রেমের কথা নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিশামকে অবগত করেন। কিন্তু হিশাম তাঁর ভাইয়ের কথায় কর্ণপাত করেননি। কারণ মাইয়া ছিল অধিক সুন্দরী, প্রাপ্তবয়স্কা ও ভাল বংশের একজন নারী। সমতার বিচারে যুররুম্মাহ কোনভাবেই মাইয়ার উপযুক্ত ছিলনা। যুররুম্মাহ তাঁর প্রেমে অপর পক্ষের কোন সাড়া না পেয়ে মনোকষ্ট নিয়ে অর্থ উপার্জনের আশায় নিজ এলাকা ছেড়ে চলে যান। তিনি ইরাকে গমন করে রাজা-বাদশা ও শাসকশ্রেণীর প্রশংসায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। যুররুম্মাহ এভাবে দীর্ঘ সময় মাইয়া থেকে দূরে থাকেন। যখন যুররুম্মাহ প্রেমের টানে আবার মাইয়ার কাছে ফিরে আসেন তখন দেখতে পান যে মাইয়া তাঁর চাচাত ভাইয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার জীবন শুরু করে দিয়েছে। কবি বিরহ বেদনা নিয়ে কালাতিপাত করতে থাকেন। কিন্তু প্রেমিকের মন সব সময় প্রেমিকার সান্নিধ্য কামনা করে। কবির বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কবি একদা অন্ধকার রাতে অপরিচিত অতিথি হিসেবে মাইয়ার স্বামীর গৃহে উপস্থিত হয়। মাইয়ার স্বামী পরক্ষণেই কবির চালাকি টের পেয়ে যান। তিনি বুঝতে পারেন যে রাতের অতিথি আর কেউ নয় বরং সে কবি যুররুম্মাহ। যে মাইয়াকে বিবাহের পূর্বে ভালবেসেছে এবং তাকে নিয়ে প্রেমের কাসীদা রচনা করেছে। মাইয়ার স্বামী বিষয়টি আঁচ করতে পেরে প্রেমিক কবিকে নিজ বাড়ি থেকে বের করে দেয়। এ অবস্থায় কবি যুররুম্মাহ তাঁর মনকষ্ট লাঘবের উপায় না পেয়ে মাইয়ার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত কবিতার চরণটি আবৃত্তি করেন।^{২২}

কবি বলেন:

أ راجعة يا مَيَّ أيا منا التي * بذى الرمث أم لا مالهن رجوع^{২৩}

‘হে মাইয়া! যুলআছলনামক স্থানে অতিবাহিত আমাদের দিনগুলো কি ফিরে আসবে? হায় আফসোস! সে দিনগুলো আর ফিরে আসবেনা।’

কবি যুররুম্মাহ তাঁর প্রেয়সী মাইয়ার স্বামী ‘আসিমের মৃত্যু কামনা করেও কবিতা রচনা করেন। কবি বলেন-

ألا ليت شعري هل يموتن عاصم * ولم تثعبنى للمنايا شعوبها

رمى الله من حتف المنية عاصما * بقاصمة يدعى لها فيجيها^{২৪}

‘হায়! যদি ‘আসিম মৃত্যু বরণ করতো। মৃত্যু আমাকে তার থেকে আলাদা করে দিত। অর্থাৎ ‘আসিম আমার আগে মৃত্যু বরণ করলে আমি মাইয়াকে পেয়ে যেতাম।’

কবি যুররুম্মাহ তাঁর প্রেয়সী মাইয়াকে যেভাবে তাঁর হৃদয়পটে ঠাঁই দিয়েছিলেন তেমনি তাঁর কবিতাতেও মাইয়ার সাথে প্রেমের চিত্র অংকিত করেছেন। কবি তাঁর প্রেয়সীর বাসস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদেছেন, বাসস্থানকে সম্বোধন করে কথাও বলেছেন। আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের উদ্দেশ্যে রচিত কাসিদায় কবি মাইয়ার বাসস্থানের উল্লেখ করে বলেন-

وقفت على ربيع لمية ناقتى * فما زلت أبكى عنده وأخاطبه

وأسقيه حتى كاد مما أبته * تكلمنى أحجاره وملاعبه^{২৫}

‘আমি মাইয়ার বাড়ির আঙ্গিনায় আমার উষ্ট্রীকে থামালাম। অতঃপর তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলাম এবং তাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলাম। আমি তার বাস্তুভিটার চতুর্পাশে অশ্রুবিসর্জন করলাম। আমার সাথে তখাকার পাথরগুলো আর খেলনাগুলো কথা বলেছে।’

কবি যুররুম্মাহ মাইয়া ছাড়াও খারকা নাম্নী ভীন্ন এক নারীর প্রেমে জড়িয়েছেন। তিনি তাকে ভালবেসেছেন এবং তার জন্য কবিতা রচনা করেছেন। কবি বলেন:

لقد أرسلت خرقاء نحوى جديها * لتجعلنى خرقاء فيمن أضلت^{২৬}

‘খারকা আমার নিকট প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। সে আমাকে তাদের দলভুক্ত করতে চায় যাদেরকে সে বিভ্রান্ত করেছে।’

কবি যুররুম্মাহ তাঁর প্রেমিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে সুন্দর উপমা ও উত্তম উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। তিনি উপমা পেশ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইবন কুতায়বা বলেন:^{২৭} ذو الرمة أحسن الناس تشبيها وأجودهم تشبيها ‘যুররুম্মাহ মানুষদের মধ্যে অধিক সুন্দর উপমা উপস্থাপনকারী এবং চমৎকার প্রেমকাব্য রচনায় পারদর্শী।’ কবি যুররুম্মাহ তাঁর প্রেয়সীকে একটি হরিণীর সাথে তুলনা করেছেন যে গোধুলীর সময় বালুকাময় মরুভূমিতে আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে। কবি চমৎকারভাবে তাঁর প্রেয়সী আর হরিণীর উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, যার দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর।^{২৮}

যুররুম্মাহর কবিতায় প্রকৃতি

কবি যুররুম্মাহর কবিতায় প্রকৃতির মনোরম চিত্র ফুটে উঠে। কবি প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যকে আবেগ-অনুভূতি ও সত্যতার মাধ্যমে কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি জীবন ও প্রকৃতির মাঝে সেতুবন্ধন তৈরী করেছেন।

আবেগ আর ভালবাসা দিয়ে প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি যতটা প্রকৃতির দ্বারা মুগ্ধ হয়েছেন ততটা কবিতার গুণজিমালায় অংকন করে পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। তিনি কবিতায় মনের মাধুরী দিয়ে তার চারপাশের পরিবেশ তথা বিস্তীর্ণ বালুকাময় মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত, টিলা, উপত্যকা, ঝর্ণা, মরুভূমির বাহন ইত্যাদির চিত্র তুলে ধরেছেন। কবি প্রকৃতির সাথে মানব জীবনের ঘনিষ্ঠতার এক নবরূপের দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। কবি উষ্ট্রীর বর্ণনায় বলেন, ক্ষীণকায় উষ্ট্রী আহত অবস্থাতেও দ্রুতগামী উটকে অতিক্রম করে চলে এবং এত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় যে, তাঁর উপর উপবিষ্ট ব্যক্তি স্থির হয়ে থাকতে পারে না। তিনি স্বীয় উষ্ট্রীকে বিভিন্ন বিশেষণের জন্য কখনো বন্যাগাধা, কখনো হরিণীর সাথে তুলনা করেছেন।^{২৮} কবির দীওয়ানের প্রথম কাসীদাটি প্রকৃতির বর্ণনার চমৎকার উদাহরণ। কাসীদাটি কাসীদাতুল বাইয়্যাহ নামে পরিচিতি। এটি কবির দীর্ঘ কাসীদার মধ্যে অন্যতম। কাসীদাটির প্রথম চরণেই কবি নিজেকে নিজের অশ্রুবিসর্জনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। তিনি বলেন:

ما بال عينك منها الماء ينسكب * كأنه من كلى مفرية سرب^{২৯}

‘(নিজেকে সম্বোধন করে বলেন) তোমার চোখের কি হলো, অশ্রুবিসর্জন করে যাচ্ছে! মনে হয় ছিদ্রযুক্ত বড় পানির পাত্র থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে।’

কবি যুররুম্মাহ তাঁর কবিতায় মরুভূমির বর্ণনা এত চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন যে, তাঁর পূর্বকার কোন কবিই তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। কবি যেহেতু নিজে মরুঅঞ্চলে তাঁর জীবনের অধিক সময় অতিবাহিত করেন, সেহেতু মরুভূমির সাথে কবির একটি গভীর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। তিনি মাইয়াকে যেভাবে ভালবেসেছেন সেভাবে মরুভূমিকেও ভালবেসেছেন। কবিতায় মাইয়ার প্রেমের কথা যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তেমনি মরুভূমিতে তাঁর কাটানো দিন-রাত, এর পাথর, বালু, ঘাস, বৃক্ষলতা ও এর প্রাণীর বর্ণনাও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বাতাস, বজ্রপাত, বৃষ্টি, আকাশ, তারকারাজি, মেঘমালাসহ যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু যা কবি হৃদয়কে আকৃষ্ট করেছে তাই তিনি কবিতার ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। কবি মরুভূমির বাহন উষ্ট্রীর বর্ণনা নিজ কবিতায় উত্তম ভাবে তুলে ধরেছেন। কবি উষ্ট্রীকে শক্তি ও সামর্থের দিক থেকে উষ্ট্রের সাথে তুলনা করেছেন। উষ্ট্রটি যেন বিশাল আকৃতির শক্তিশালী ও মরুভূমিতে ক্লান্তিহীন ভাবে চলায় অভ্যস্ত। কবির উষ্ট্রীটি মরু অঞ্চলে তাঁর উত্তম সঙ্গী ও উপকারী বন্ধুর মত। কবি বলেন:

كأنها جمل وهم وما بقيت * إلا النخيزة والألواح والعصب

لا تشكى سقطه منها وقد رقصت * بها المفاز حتى ظهرها حطب^{৩০}

‘উষ্ট্রটি যেন শক্তিতে বিশালদেহী উটের মত। শুধু এর মাঝে উষ্ট্রীর স্বভাব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও শায়া বিদ্যমান।

এটি মরুভূমিতে চলার ক্ষেত্রে ক্লান্তির অভিযোগ করেনা। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলেও এর পিঠ উঁচু অবস্থায় থাকে।’

যুররুম্মাহর দীওয়ান পর্যালোচনায় দেখা যায় তিনি প্রকৃতির জড়বস্তু ও প্রাণীবাচক সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কবি দীওয়ানের প্রথম কাসীদায় লক্ষ করলে পাওয়া যায়- যে, তিনি প্রেমের কবিতার (غزل) দ্বারা সূচনা করেছেন। পরবর্তীতে মরুভূমির বর্ণনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি তার কাসীদার প্রথম ত্রিশটি চরণ মাইয়ার সাথে প্রেমের প্রসঙ্গ টেনেছেন এবং পরের একশটি লাইন প্রকৃতি তথা মরুভূমির চিত্র তুলে ধরেছেন।^{৩১}

মনীষীদের নিকট যুররুম্মাহ

কবি যুররুম্মাহ তাঁর সমসাময়িক মনীষীদের কাছে অনন্য প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁকে জাহিলী যুগের কবিসম্রাট ইমরুউল কায়সের সাথে তুলনা করা হয়। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় জারীর ও ফারায়দাক যুররুম্মাহর বাক্যপ্রতিভাকে ইরষার দৃষ্টিতে দেখত। কবি সম্পর্কে মনীষীদের কিছু মন্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো: আবু 'আমর ইবনুল 'আলা বলেন: ^{৩২} 'بدئ الشعر بأمرئ القيس وختم بذى الرمة' 'কবিতার সূচনা হয় ইমরুউল কায়সের মাধ্যমে, আর সমাপ্তি ঘটে যুররুম্মাহর মাধ্যমে।'

আল- 'উমদা গ্রন্থে বলা হয়েছে: ^{৩৩} 'الشعر ثلاثة: جاهلي واسلامي ومولد، فالجاهلي امرؤ القيس والإسلامى ذو الرمة' 'কবিগণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা জাহিলী, ইসলামী ও নব্যপ্রাচীনপন্থী। জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ইমরুউল কায়স, ইসলামী যুগের শ্রেষ্ঠ কবি যুররুম্মাহ এবং নব্যপ্রাচীনপন্থীদের ইবনুল মু'তায়।'

হাম্মাদ আর-রাবি'আ বলেন: ^{৩৪} 'أحسن الجاهلية تشبيهاً امرؤ القيس وذو الرمة أحسن الإسلام تشبيهاً' 'উত্তম উপমা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে ইমরুউল কায়স জাহিলী যুগে এবং ইসলামী যুগে যুররুম্মাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

হাম্মাদ আর-রাবি'আ বলেন: ^{৩৫} 'قدم علينا ذو الرمة الكوفة، فلم أر أفصح ولا أعلم بغريب منه' 'যুররুম্মাহ যখন কুফায় আগমন করলেন তখন তাঁর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধভাষী ও দূর্বোধ্য বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আমি কাউকে পাইনি।'

আসমা'ঈ বলেন:

ما أعلم أحدا من العشاق الحضريين وغيرهم شكاً حياً أحسن من شكوى ذى الرمة مع عفة وعقل ورصين

'আমি শহুরে ও বেদুঈন প্রেমিকদের মধ্যে পবিত্রতা বুদ্ধিমত্তা ও দৃঢ়তার সাথে প্রেম নিবেদন করে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে যুররুম্মাহর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে পাইনি।'

কবি জারীরকে যুররুম্মাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন: ^{৩৬} 'ذو الرمة أخذ من طريف الشعر وحسنه ما لم يسبقه إليه أحد غيره' 'যুররুম্মাহ কবিতায় বিরল ও অনন্য প্রতিভার অধিকারী। যাকে অন্য কেউ অতিক্রম করতে পারেনি।'

উপসংহার

কবি যুররুম্মাহ উমাইয়া যুগের একজন বিশিষ্ট কবি। তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মাঝে ঈর্ষার পাশ্বে পরিণত হন। কবি যুররুম্মাহ মাত্র চল্লিশ বছর জীবন পেয়েছিলেন। এই নাতিদীর্ঘ জীবনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে প্রেম ও প্রকৃতির কবি হিসেবে তিনি সমধিক সুনাম লাভ করেন। তাই আরবী সাহিত্যের পাঠকবর্গের হৃদয়ে তিনি আজও জীবন্ত আছেন, একজন সফল ও আদর্শ কবির মর্যাদা নিয়ে। এই মহান কবি থেকে প্রেরণা লাভ করে এ যুগের অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক আরবী ভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করে এ ভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বলাবাহুল্য এধারা চিরকাল অব্যাহত থাকবে। তাই সাহিত্যানুরাগী ও প্রকৃতি প্রেমিকদের কাছে যুররুম্মাহ একটি অমর নাম, একটি ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নাম।

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ

ড. মো. সেতাইর রহমান*

Abstract: Muhammad (SM) brought about a revolutionary change in the life of human beings. He is the messenger of peace and security all over the world. He put in his massive endeavors to establish peace and security in society. At first, he tried to establish a community with moral values. He established a legal boundary to keep peace and security in society which was equal to all. Islam is a code of peace and security, which literally means peace and submission. He migrated from Mecca to Medina by the order of Allah (SWT) and established there a new welfare state in 622 AD which was transparent and just. After entering Medina, he signed a peace treaty named *Charter of Medina* with all tribes of the city. Non-Muslims living there were granted a peaceful and safe life. He secured humanity from the harm of tongue and hands. In the present time, we are living with violence and anarchy. If we want a peaceful and safe life, we have to study and execute the principles of Muhammad (SM). So the objective of this paper is to explore the glorious contributions of Prophet Muhammad (SM) to establishing peace and security in the world.

ভূমিকা

মানবতার সামগ্রিক জীবনে শান্তির সৌরভ ছড়িয়ে দিতে নিরাপত্তা ও মুক্তির চিরন্তন সওগাত আর অফুরন্ত রহমতের প্রদীপ্ত প্রতিশ্রুতি নিয়ে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে আগমন করেন মুহাম্মদ সা.। তাঁর কর্মপ্রবাহ ও জীবনধারার মাধ্যমে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর সামনে এমন সুন্দরতম আদর্শ উপস্থাপন করেছেন যার তুলনা ইতিহাসে বিরল। জীবন ও জগতের সকল বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্ট সফল পথ নির্দেশনা ও দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে আছে। এ ব্যাপারে তিনি যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তাই পৃথিবীর ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মডেল। মহান আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

‘তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সা. এর জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ’।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনেক বড় বড় বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক, প্রতাপশালী রাষ্ট্রনায়ক আর মানব ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টিকারী মহানায়কদের সন্ধান লাভ করা যায়। কিন্তু নবী-রাসূলগণ ব্যতীত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না, যিনি মানব সমাজ ও সভ্যতাকে ভেতর থেকে বদলে দিতে সক্ষম হয়েছেন। সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ সা. মানুষের হাত ও জিহ্বার আক্রমণ থেকে সমস্ত মানুষের জীবন, মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরূকে নিরাপত্তা বিধানের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বর্তমানে প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার যুগেও আমরা প্রতিটি মুহূর্ত চরম অশান্তি আর উদ্বেগ-উৎকর্ষতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছি। তাই মানব জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনতে হলে রাসূল সা. প্রবর্তিত নীতিমালা ও বিধিবিধান অনুসরণ করা প্রয়োজন। অত্র প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে মুহাম্মদ সা. এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান তুলে ধরা, যাতে মানুষ তা অনুসরণ করার অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে।

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ সা. ও সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি

মুহাম্মদ সা. এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে মিসর, ভারত, ব্যাবিলন, গ্রীস ও চীনে সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। একমাত্র রোম ও পারস্যে তথাকথিত চোখ ঝলকানো ও জাঁকজমকপূর্ণ সভ্যতার পতাকা উড্ডীন থাকলেও সেসব নয়ানাভিরাম প্রাসাদের অভ্যন্তরে চলতো লোমহর্ষক যুলুম ও নির্যাতন। কঠিন দাসত্বের নিগড়ে বিবেক ও মন আবদ্ধ থাকায় ‘টু’ শব্দটি পর্যন্ত করার স্বাধীনতা ছিল না। নবীদের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ বিকৃত হওয়ায় ধর্মের নামে যা অবশিষ্ট ছিল, তা ধর্ম যাজকদের ব্যবসার পণ্যে পরিণত হয়েছিল। গ্রীস দর্শন থেকে শুরু করে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত সমস্ত দর্শন ও ধর্মীয় মতবাদসমূহ সবই হয়ে পড়েছিল নিষ্প্রাণ ও নিষ্ক্রিয়। ফলে ইতিহাসের ভয়াবহ বীভৎসতা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল বিশ্বজুড়ে।

মুহাম্মদ সা. খোদা যে আরবে জন্মগ্রহণ করেন তার পরিবেশ-পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ ছিল। মানুষে মানুষে সংঘাত-সংঘর্ষ, যুদ্ধ ও লুটপাটের তাণ্ডব চলছিল সর্বত্র। মানবতাহীন রুদ্ররূপ গ্রাস করেছিল সকল মানবীয় গুণাবলীকে। তাওহীদের বাণী ধুলায় ধূসরিত হয়েছিল শত শত দেবদেবীর চরণতলে। মদ, জুয়া ও ব্যাভিচারের সমন্বয়ে জাহিলী সংস্কৃতি শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করেছিল। মানুষ প্রবৃত্তির গোলামীর সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়ে মনুষ্যত্বহীন হিংস্র হয়েনো ও চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় জীবন যাপন করছিল। এমন অরাজক পরিস্থিতিতে মুহাম্মদ সা. সমাজের সর্বক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের পয়গাম নিয়ে এ পৃথিবীতে আগমন করেন। রাসূল সা. জন্মলগ্ন থেকেই এ বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। নবুওয়াত লাভের পর তিনি অহীর শিক্ষাকে পুঁজি করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর শুভাগমনে প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে সমাজের নিরাপত্তাহীন আর বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানবতা। ফলে সমাজে যা কিছু অন্যায়, অসুন্দর ও অশালীন কর্মকাণ্ড ছিল তা সুন্দর, শোভনীয় ও মানব কল্যাণের মোড়কে পরিবর্তিত হয়ে যায়। মানব জীবনের সর্বত্র কেবল গঠনমূলক তৎপরতা, উন্নতি ও প্রগতির ফল্লধারা সম্প্রসারিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মদ সা. এর হাতেই সুসম্পন্ন হয়েছিল মানব জাতির সর্বাঙ্গিক পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا^২

‘তোমরা তো জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে ছিলে, তিনি (আল্লাহ) তা থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন’।

মুহাম্মদ সা. কে সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। ইসলামের মূলমন্ত্র হল শান্তি, নিরাপত্তা, সাম্য, সহিষ্ণুতা এবং সৌভ্রাতৃত্ব। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা রাসূল সা. এর জীবনের মিশন, নিরাপত্তা বিধান তাঁর অঙ্গীকার, পরমত সহিষ্ণুতা তাঁর অলংকার, আকাশছোয়া উদারতা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল আবহ, সাম্যের চিরন্তন বাণী তাঁর শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য, সৌভ্রাতৃত্বের অন্তরঙ্গ আবেদন তাঁর প্রাণস্বরূপ, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার তাঁর সৌন্দর্য। মহান আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা‘আলা নিজেই রাসূল সা. কে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ^৩

‘আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ’। রাসূল সা. বলেন, ‘আমার আগে প্রত্যেক নবীকে পাঠানো হত স্ব-স্ব জাতির জন্য। কিন্তু আমাকে পাঠানো হয়েছে মানবকুলের জন্য’।^৪

বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ

শান্তিপূর্ণ পরিবেশ মানব জীবনের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া কোনো সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে ও বিকশিত হতে পারে না। ইসলাম তাই এ ব্যাপারে সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম অর্থই শান্তি। ইসলামে শান্তির ধারণা মৌলিক ও ব্যাপক। ইসলামের প্রকৃতি এবং রাসূল সা. এর জীবনের সাথে এ ধারণা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আল্লাহ বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ^৫

‘যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, কেবল আল্লাহর স্মরণেই মনের শান্তি অর্জিত হয়’।

রাসূল সা. মুসলমানদের পারস্পরিক অভিবাদনের যে পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তাতে পরস্পরের জন্য শান্তি কামনা করা হয়ে থাকে। প্রিয় রাসূল সা. শান্তির জন্য যে দু’আ করতেন তা লক্ষ্যণীয়:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ^৬

‘হে আল্লাহ তুমি শান্তি এবং তোমার থেকেই শান্তি, তুমি বরকত দান কর, হে মহিমাময় ও মহানুভব’।

শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের জন্য প্রয়োজন সুন্দর মনের মানুষ। এ লক্ষ্যে রাসূল সা. সমগ্র মুসলিম জাতির মন-মানস থেকে লোভ নামক রিপুটিকে নির্মূল করে ফেলেন। যাবতীয় পাপাচার, লোভের গতিকে তিনি ঘুরিয়ে দিয়েছেন কল্যাণ ও সাফল্যের দিকে। তিনি তাদের মাঝে উন্নত ও শান্তিপূর্ণ মানবীয় জীবন, মহত্তম চরিত্র-মাধুর্য, সর্বোপরি আল্লাহর সুমধুর সান্নিধ্য লাভের অপূর্ণ দীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন। কী অপূর্ব শিক্ষা ও আদর্শ কায়ম করেছিলেন মুহাম্মদ সা. যার সামনে জগতের সমস্ত ধন-রত্নের লোভ আর ভোগের অনায়াস প্রাপ্তি নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ফলে শান্তির অমীম ধারা সে সমাজে নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত ছিল।

পরিবার সমাজ জীবনের প্রথম আশ্রয়স্থল। তাই পরিবার জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে রাসূল সা. চেষ্টা করে গেছেন। যে ব্যক্তির রগ-রিশায় দ্বন্দ্ব সংঘাত, মনে অশান্তি, চিন্তে অস্থিরতা বিরাজমান, সে ব্যক্তি কখনও শান্তির নিষ্ঠাবান কর্মী হতে পারে না। ঘরের চার দেয়াল থেকেই গড়ে ওঠে স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ। সমাজের বিশাল কর্মস্থলে এমন অনেক ঘটনা আছে, যা ইতিহাসের গতিধারায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এর গোপন রহস্য পারিবারিক জীবনের সাধারণ ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে। পারিবারিক জীবনের ভিত্তি ও এর মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরীর বর্ণনা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ^৭

‘এটিও আল্লাহর অসীম কুদরতের অন্যতম নির্দশন যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। আর তিনিই তো তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যেই চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।’

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১৭ বছর বয়সে রাসূল সা. সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ে গঠন করেন হিলফুল ফযুল। যেখানে সংঘের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে অনাথ এবং ময়লুমকে সাহায্য করা, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও প্রীতির বন্ধন স্থাপন করা এবং তাদের জান-মাল ও মান-ইয়্যত রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করে।

৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে রমযান মাসে হেরা গুহায় রাসূল সা. প্রথম ওহী লাভ করেন। প্রথম ওহীর প্রথম কালাম ‘ইকরা’ (পাঠ করো) যা জ্ঞানার্জনের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার জোর তাগিদ প্রমাণ করে। জ্ঞানের আলো ছাড়া কোন সমাজ শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ হতে পারেনা। মদীনায় এসে রাসূল সা. মসজিদে নববীতে বসে প্রণয়ন করেন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান। ৫৩টি ধারাবিশিষ্ট এ দলিলটি ‘মদীনার সনদ’ বা ‘The Charter of Medina’^৮ নামে খ্যাত। এই সনদের দ্বারা একটি শান্তিরাষ্ট্র স্থাপনের প্রক্রিয়া সূচিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই যুগান্তকারী সনদ সম্পাদনের মাধ্যমেই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানিতে লিপ্ত ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানসহ বহু জাতীয় সম্প্রদায়গুলোর মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত: এর ফলে বিভিন্ন ধর্মের সর্বস্তরের নাগরিক সন্ত্রাসমুক্ত, শান্তিময় ও নিরাপত্তাপূর্ণ শংকাহীন জীবন যাপনের সুযোগ লাভ করে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এ দলিলের ধারাগুলো পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মাঝে বিদ্যমান হানাহানি ও ভুল বুঝাবুঝির কারণে সৃষ্ট বর্তমান বিশ্বের অশান্তি দূরীকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ রচনায় তা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাসূল সা. কে আল্লাহ তা‘আলার অনুমতিক্রমে অনেকগুলো যুদ্ধ মুকাবিলা করতে হয়। সবগুলো যুদ্ধই ছিল প্রতিরক্ষামূলক এবং শান্তিকে সূদৃঢ় বুনিয়েদের উপর সংস্থাপনের লক্ষ্যে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ^৯

‘তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না’।

ষষ্ঠ হিজরীতে পবিত্র হজ্জবৃত পালনের নিমিত্তে ১৪০০ সাহাবী নিয়ে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফিররা বাধা প্রদান করে। রাসূল সা. শুধুমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য হজ্জবৃত পালন না করেই ফিরে আসেন এবং তাদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত কুরায়শরা মাত্র দু’বছরের মধ্যে ভঙ্গ করে। রাসূল সা. অষ্টম হিজরীতে মক্কা অভিযানে বের হয়ে প্রায় বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে, বিনাযুদ্ধে তথায় প্রবেশ করেন। মক্কা বিজয় সম্পন্ন হলো। তিনি যে শত্রুদের জন্যও ছিলেন রহমতস্বরূপ মক্কা বিজয়ের ঘটনা তারই প্রমাণ বহন করে। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর প্রাণের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারতেন, কেননা তারা সুদীর্ঘ তের বছর তাঁর এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছিল। রাসূল সা. কা‘বার হারামে সমবেত জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

ماذا تظنون يا معشر قريش قالوا : خيرا ، أخ كريم ، وابن أخ كريم وقد قدرت ؛ قال : " وأنا أقول كما قال أخي يوسف لا تريب عليكم^{১০} .

‘বল, আজ তোমাদের কি ধারণা হে কুরায়শেরা?’ তারা সমস্বরে বলতে লাগল, ‘ভাল। তুমি আমাদের উদারচেতা ভাই ও উদারচেতা ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।’ উত্তরে রাসূল সা. বলেন, আমি ঐ দু’টি বাক্যই উচ্চারণ করছি যা হযরত ইউসুফ আ. স্বীয় অপরাধী ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।’ কা‘বার কুজিবাহক উসমান ইবন তালহাকে দরজা খুলতে আদেশ দিলেন। অনেক দিন পূর্ব থেকে তিনি কা‘বা ঘরের চাবি রাসূল সা. কে দিতে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অহমিকার প্রত্যুত্তরে তাকে শান্তি না দিয়ে রাসূল সা. বললেন, ‘এখন থেকে চিরকাল এ চাবি তোমার বংশেরই দায়িত্বে থাকবে।’^{১১}

আজকের যুদ্ধ ও যুদ্ধবন্দীদের বেলায় জেনেভা কনভেনশনের উল্লেখ করা হয়। অথচ আমাদের প্রিয় নবী সা. যুদ্ধবন্দীদের সাথে আচরণে ও তাদের মৌলিক মানবিক অধিকার সংরক্ষণে, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি

সম্পাদন ও তা প্রতিপালনে, যুদ্ধকালে নারী, শিশু, বৃদ্ধা ও নিরীহ মানুষের ক্ষতি না করার জন্য যে উন্নত মানবিক নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করেন, তাকে কোন তত্ত্ব বা ধ্যান-ধারণা আজও অতিক্রম করতে পারেনি। এভাবে রক্তপাতে বিমলিন হিংস্র অস্ত্রের এক সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবনে তিনি নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ^{১৭}

‘একের বোঝা অন্যে বহন করবে না।’

রাসূল সা. বলেন, ‘একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে শাস্তি দেওয়া যাবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে শাস্তি দেয়া যাবে না। কেউ কারো কর্মভার বহন করবে না’। প্রিয় রাসূল সা. মক্কা বিজয়ের দুই বছর পর বিদায় হজের ভাষণে বিশ্ব শান্তির অনুপম নীতিমালা ঘোষণা করলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ‘হে লোক সকল, তোমরা শোন, আইয়ামে জাহিলিয়াতের সকল কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অনাচার আমার পায়ের তলে পিষ্ট হল।’

মানব জীবনে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ সা. এর আদর্শ

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যেখানে নিরাপত্তাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলাম নিরাপত্তা চায় বলেই সে যেসব উপাদান নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতে পারে; যেমন: মদ, জুয়া, অশ্লীলতা ইত্যাদিকে হারাম করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.^{১৮}

‘হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক তীরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কাজ ছাড়া কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।’

মহাশত্রু আল-কুরআনে মানব-জীবনে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। রাসূল সা. এর জীবনাচার এবং তাঁর নির্দেশাবলী এক্ষেত্রে আজও উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে আলো বিকিরণ করে আসছে।

সামাজিক নিরাপত্তা

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রত্যেক ব্যক্তির জান, মাল ও ইজ্জত-আবরণর সর্বাধিক নিরাপত্তা বিধানকে বুঝায়। ইসলামী সমাজে এমন এক নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে যেখানে জান-মাল শুধু বিপদমুক্ত হবে না বরং প্রত্যেকটি মানুষ ইজ্জতের সঙ্গে বসবাস করতে পারবে। রাসূল সা. এ সম্পর্কে বলেন,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده^{১৯}

‘সেই প্রকৃত মুসলিম, যার হাত ও জিহ্বা হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে’।

রাসূল সা. আরও বলেন,

إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ^{২০}

‘তোমাদের জান-মাল ও তোমাদের সম্মান পবিত্র ও সম্মানার্হ।’

হাদীসে কুদসীতে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কর্তৃক বান্দাকে পীড়িত, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মানবতাকে সহায়তার ব্যাপারে প্রশ্ন করার কথা এবং সমাজের এসব বঞ্চিত মানবতার সহযোগিতা করলে আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।^{১৬} কী বিস্ময়কর কথা! রাসূল সা. এর বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্ব প্রতিপালক নিজে অসুস্থ, ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত মানুষের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। উক্ত হাদীসে নিগৃহীত মানবতার সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে রাসূল সা. এর ইতিবাচক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় ইয়াতীমেরা অনেক বেশি নির্যাতিত। ইয়াতীমের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রাসূল সা. যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীন স্বয়ং ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا^{১৭}

‘যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের উদরে আগুন ভক্ষণ করে। আর তারা শীঘ্রই আগুনে প্রবেশ করবে।’

রাসূল সা. মুমিনদেরকে সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে দূরে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন; এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। যেমন তিনি বলেন,

اجتنبوا السبع الموبقات "فُلْنَا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسَّحَرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيمِ^{১৮}

‘তোমরা সাতটি বড় বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। (সাহাবায়ে কেরাম বলেন) আমরা বললাম, সেগুলো কী হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন, ক. আল্লাহর সাথে শরীক করা খ. যাদু করা গ. ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা ঘ. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা ইত্যাদি।’

রাসূল সা. নিজে ও ইয়াতীমদের লালন-পালনকারী বেহেশতে একত্র থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين^{১৯}

ইয়াতীমের সাথে ভাল ব্যবহারকারী গৃহকে সর্বোত্তম এবং খারাপ ব্যবহারকারী গৃহকে সর্ব নিকৃষ্ট আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইয়াতীমের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে রাসূল সা.-এর বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি নিজে ইয়াতীম ছিলেন, বিধায় তিনি তাদের বেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। গরীব, মিসকীন, অসহায়, অনাথ, বিধবা, বিপদগ্রস্থ, মজলুম ও দুঃস্থ মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাসূল সা. সারাটি জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। মহাশয় আল-কুরআনে বলা হয়েছে,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^{২০}

‘তাদের (ধনীদের) সম্পদে প্রার্থনাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে’।

মহান আল্লাহ নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককে তার অধিকার প্রদান করতে এবং যাপনকারীকে ধমক না দিতে বলেছেন। তিনি দুর্গত মানবতার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। বস্ত্রত রাসূল সা. সমাজের দুর্বল শ্রেণির জন্য ছিলেন বিশেষ রহমত। রাসূল সা. বলেন,

أَنَا أَوَّلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تُوِّقِيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ^{২১}

‘যে লোক ধন-সম্পদ রেখে মারা যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে এবং যে লোক অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে মারা যাবে তার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে’। সহায়-সম্বলহীন মানবতার সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় তিনি কতটা যত্নবান ও দায়িত্বশীল ছিলেন উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শিশু অধিকার রক্ষায় বর্তমান বিশ্বে তৈরি হয়েছে নানা চমকপ্রদ শ্লোগান। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শিশু অধিকার দিবস ঘোষণা করা হলেও দিন দিন ক্রমাগতভাবে শিশু অধিকার ভুলুপ্তি হচ্ছে। অথচ সাড়ে ১৪ শত বছর পূর্বে শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তাকল্পে মহানবী সা. নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, ‘যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করেনা এবং আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়’। মহানবী সা. যখন কোন সওয়ারিতে আরোহণ করতেন তখন আগে-পিছে শিশুদেরকে তুলে নিতেন এবং পথিমধ্যে খেলাধুলারত শিশুদের আদর সোহাগ করাকে তাদের অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পুত্র-কন্যা উভয় শিশুকেই সমভাবে স্নেহ-মায়া প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। শিশুদের বিভিন্ন ক্রটি-বিচ্যুতি অপরাধ হিসেবে না দেখে মমতামাখা আদরে তা শুধরে দিতেন। তিনি শিশুদের শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়াকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উত্তম সদকা বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত প্রিয়নবী সা. ছিলেন সমাজের দুর্বল শ্রেণীর জন্য বিশেষ রহমত। শিশুদেরকে স্নেহ করা এবং বয়োঃবৃদ্ধদেরকে সম্মান প্রদর্শন করার আদর্শ তিনিই পেশ করেছেন। তিনি দুর্গত মানবতার সেবা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ^{২২}

‘যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ তায়ালাও তার প্রতি দয়া করেন না।’

নারীদের ব্যাপারে মহানবী সা. এরশাদ করেন, ‘যে পিতা একটি অথবা দু’টি অথবা তিনটি কন্যাসন্তান সম্বন্ধে চিন্তে লালন-পালন করে সুশিক্ষা দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবে সে পিতা-মাতা এবং আমি জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবো’।^{২৩} তিনি বলেন, ‘কন্যাসন্তান তোমার জান্নাতের উসিলা এবং জাহান্নামের বাধা’।^{২৪} স্ত্রী ও মাতা হিসেবেও নারীকে ইসলাম যে সম্মান ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে তা অতুলনীয়। আল-কুরআনে স্ত্রীদেরকে পুরুষের পোশাক এবং পুরুষদেরকে স্ত্রীদের পোশাক বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ^{২৫}’ ‘তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ।’ রাসূল সা. সন্তানের নিকটে পিতার চেয়ে মাতাকে সম্মান ও মর্যাদা লাভের বেশি অধিকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন।^{২৬}

মহানবী সা. বিধবা নারীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদেরকে সামাজিক মর্যাদার দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আয়েশা রা. ছাড়া তাঁর সব স্ত্রীই বিধবা ছিলেন। তিনি বিধবা ও ইয়াতীমদের সম্পর্কে ঘোষণা করেন, ‘যে কেউ কোন বিধবা ও ইয়াতীম এর কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট থাকে সে আল্লাহর পথে জিহাদরত কিংবা ঐ ব্যক্তি সমতুল্য যে দিনে রোজা রাখে এবং সারারাত ইবাদতে কাটায়’।^{২৭}

দাস-দাসীগণ ছিলেন সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত ও নিগৃহিত জনগোষ্ঠী। মহানবী সা. শ্রেণিবিভেদ দূর করে দাস-দাসীগণকে মানব সমাজের সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন,

إِحْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تَكْلَفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ^{২৮}

‘দাস-দাসীগণও তোমাদের মতই মানুষ এবং তোমাদেরই ভ্রাতা, ভগ্নি। আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। তোমরা নিজেরা যা খাও তাদের তাই খাওয়াও, নিজেরা যা পরিধান কর তাদেরকে তাই পরিধান করাও এবং তাদেরকে সাধের অধিক কাজ দেবে না, যদি দিতেই হয় তবে নিজেরাও সহায়তা করবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘দাস-দাসীর সাথে দুর্ব্যবহারকারী বেহেশতে প্রবেশ করবেনা’ (তিরমিযী)।

রাসূল সা. এর ভৃত্য হযরত আনাস রা. বলেন,

ما قال لشيئ صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيئ لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا^{৯৯}

‘রাসূল সা. কখনও আমাকে একথা বলেননি যে, হে আনাস! এ কাজটি কেন করেছ বা এ কাজটি কেন করনি?’ অথচ বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে দাস-দাসী প্রথা না থাকলেও বাড়ির কাজের পরিচারিকা, কিংবা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে বাসাবাড়ির কাজে নিয়োগ করে তাদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন পরিচালনা করা হয়। যারা বেশি প্রগতির ধারক ও বাহক তাদের ঘরেই বেশি নিরাপত্তাহীন শ্রমিক শ্রেণি। এমনকি জীবননাশের মত ঘটনাও ঘটছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মানব জীবনের নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান অংশ। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এজন্য ইসলাম একটি সুদৃঢ় ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছে এবং যে সমস্ত কর্মকৌশল ও উপায় এ জাতীয় গণমুখী ও কল্যাণধর্মী অর্থনীতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে সেগুলোকে নিষিদ্ধ করেছে। যেমন সুদ, ঘুষ, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, জবরদখল, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজী, কালোবাজারী, মজুতদারী, প্রতারণা ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, وَأَحْلَ اللَّهُ النَّبِيَّ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{১০০} এবং আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।^{১০১}

ইসলাম বাস্তব জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ ও গণমুখী জীবনাদর্শ হিসেবে মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্যকে ভালো নজরে দেখে না। কারণ প্রাচুর্য মানুষকে ভোগবাদী, আরাম ও বিলাসপ্রিয় করে তোলে। অপরদিকে, ইসলাম চরম দারিদ্রকেও সুদৃষ্টিতে দেখে না। নবী সা. বলেছেন, ‘দারিদ্র মানুষকে কুফরীর দিকে নিয়ে যায়।’ তিনি আরো বলেন, ‘যারা মানুষের নিকট ভিক্ষা চায়, অথচ তাদের জীবিকার্জনের জন্য সম্পদ, শক্তি ও সামর্থ্য রয়েছে—তারা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে তাদের মুখমণ্ডল গোশতহীন ও বীভৎস চেহারায় হাজির হবে’।^{১০২}

ইসলাম সমাজবদ্ধ জীবনে বিশ্বাস করে এবং সমাজের প্রত্যেকের একে অপরের প্রতি দায়িত্ব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে,

وَأَتِذَا الْفُرْزَى حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ^{১০৩}

‘নিকটাত্মীয়, মিসকীন ও নিঃস্ব পথিককে তার হক দাও’।

যারা কোনো কারণে নিজেদের প্রয়োজনীয় জীবনধারণের ব্যবস্থা করতে পারেনা তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব প্রধানত তাদের আত্মীয়-স্বজনের ও স্থানীয় সমাজের। ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বা সামাজিক প্রচেষ্টার অপ্রতুলতার কারণে যারা অভাববস্থ থাকবে বা দূর্বস্থার সম্মুখীন হবে তাদের অসুবিধা দূর করা এবং তাদের পুনর্বাসন করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের। রাসূল সা. এর ঘোষণানুযায়ী—^{১০৪} الْخُلُقُ عِيَالُ اللَّهِ ‘সমগ্র সৃষ্টিই আল্লাহর পরিবার’। এ পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ

থেকে খিলাফতের দায়িত্ব হিসেবে ইসলামী সরকারের। রাসূল সা. বলেন, ‘যে লোক ধন-সম্পদ রেখে মরে যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে এবং যে লোক অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে মারা যাবে তার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে’।^{৩৪}

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম তিন পর্যায়ে সামাজিক বিশেষ করে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমত: ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা, দ্বিতীয়ত: সামাজিক ব্যবস্থা এবং তৃতীয়ত: রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হলে কোন মুসলিম সমাজেই কোন ধরনের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিতে পারে না।

যাকাত হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান ভিত্তি। যাকাতের মাধ্যমে ইসলাম সমাজকে দারিদ্রমুক্ত করতে চায়। এ পর্যায়ে কোন কোন ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, যাকাত গ্রহীতাকে এক বছরের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিতে হবে। কেউ কেউ সারাজীবনের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়ার কথা বলেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআন বিধোষিত নীতি অনুযায়ী সালাত কায়েম, যাকাতভিত্তিক অর্থনীতি পরিচালনা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা আর অন্যায়ের প্রতিরোধসহ জনগণের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণার্থে নিরাপত্তা, শান্তি, স্বস্তি ও সুখের জন্য এক ন্যায়ানুগ শারয়ী আইন ও সরকারী কাঠামোকে দৃঢ় ভিত্তি দান করা হয়েছিল। এতে করে হত্যাকাণ্ড, দাসপ্রথা, লুটতরাজ, হানাহানি, ব্যভিচার, মদ্যপান, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মূর্তিপূজা, নারীর অবমাননা, শিশু হত্যা, বয়স্কের লাঞ্ছনা, ইয়াতীমের দুরবস্থা, দারিদ্রের বঞ্চনা, বংশ কৌলীণ্যের বড়াই ইত্যাদি যাবতীয় অনাচারের অপনোদন ও অপসারণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাসূল সা. বলেছেন, ‘সে মুমিন নয় যে পেট পুরে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে’।^{৩৫}

মান-সম্মান ও ইজ্জত-আবরূর নিরাপত্তা

ইসলাম মানুষের মান-মর্যাদা ও ইজ্জত-আবরূর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে রাসূল সা. এর দিক-নির্দেশনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি বলেন,

من سَتَرَ مسلماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ^{৩৬}

‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন’। তিনি আরো বলেন, ‘তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ কর না, ক্রোতাকে প্রতারিত কর না, ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ কর না, পরস্পর হতে মুখ ফিরিয়েনিয়ো না, একজনের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর অন্যজন ক্রয়-বিক্রয় কর না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তাকে যুলুম করতে পারে না, হেয় করতে পারে না এবং অপমান-অপদস্থও করতে পারে না। তাকওয়া এখানেই, এ কথাটি তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষস্থলের দিকে ইঙ্গিত করেন। কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট হবার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে’।^{৩৭}

রাসূল সা. বলেন,

وَاللَّهُ لِيَتِمَّنَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ^{৩৮}

‘আল্লাহর কসম! এ দ্বীন অবশ্যই পূর্ণতা লাভ করবে। এমন হবে যে, সান‘আ হতে হাজরামাউত পর্যন্ত ভ্রমণকারী ভ্রমণ করবে। তার জন্য আল্লাহর ভয় ব্যতীত আর কোনরূপ শংকা থাকবে না।’

প্রিয়নবী সা. এর বরকতে সমগ্র মানব জাতি আল্লাহর রহমতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। প্রিয় নবী সা. দু‘আ করেছেন, যেন তাঁর অবর্তমানে উম্মতের উপর এমন আযাব না আসে, যা তাদের চেহারা পরিবর্তন করে দেয়। যেমন: বনী ইসরাঈল জাতির কোন কোন লোককে আল্লাহ

পাক বানর-শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাঁর এ দু'আ কবুল করেছেন। ফলে এ উম্মতের লোকেরা জঘন্য গুণাহে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের চেহারা পরিবর্তন হয় না। মানবতার জন্য এহেন ভূমিকা গোটা মানবতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য নিরাপত্তা

সুষ্ঠু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া প্রকৃত নিরাপত্তাপূর্ণ ও কল্যাণধর্মী সমাজ গঠিত হতে পারে না। সেজন্য ইসলাম এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরও জোর দিয়েছে এবং জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষী ও নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে দেখতে চেয়েছে। করণার মূর্ত প্রতীক রাসূল সা. সমস্ত সমস্যা ও তার সমাধানের ব্যাপারে বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কোনই প্রয়োজন পড়েনা। বরং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্র থাকে প্রকৃত অর্থেই নিরপেক্ষ, সহানুভূতিশীল, পরধর্ম সহিষ্ণু। কোন ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত হলে সকল ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জীবনে শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দের ফলুধারা বয়ে যাবে। মদীনার আদর্শ রাষ্ট্র তারই বাস্তব প্রমাণ।

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষতার এ যুগে সভ্য মানুষ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এতদূর অগ্রসর হবার পরও আজ গোটা বিশ্বে অশান্তির আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বর্তমান বিশ্বের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখতে পাই যে, গণতন্ত্র ও মানবতার ফেরীওয়ালাদের দ্বারাই পৃথিবীর দেশে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাদের গোলাবারুদ আর বুলডোজারের আঘাতে প্রতিনিয়ত প্রাণ হারাচ্ছে হাজার হাজার নিরপরাধ নারী ও শিশু। বর্তমান বিশ্বে একদিকে চলছে জঙ্গিবাদ আর সন্ত্রাসবাদ, অপরদিকে তা দমনের নামে চলছে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। নির্ধাতিত, নিপীড়িত মানবতার আর্তনাদে ভারী হচ্ছে পৃথিবীর আকাশ বাতাস। যদিও সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের সদর দফতরে ও বাইরে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে বহু শান্তি সম্মেলন হচ্ছে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ۖ

‘জলে-স্থলে সমস্ত বিপর্যয়ই মানুষের নিজস্ব উপার্জন।’

রাসূল সা. বলেছেন, ‘মানুষের এমন কোন দুর্ভোগ নেই যা তারনিজেরই দু'হাত দিয়ে উপার্জিত নয়।’ তাই আজ যে অশান্তি বিশ্বে গ্রাসকরেছে তা বিশ্ববাসীর নিজস্ব উপার্জন। করোনা মহামারীতে গোটা বিশ্ব প্রায় দেড় বছর স্তব্ধ থাকাকালীন সময়ে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ড কিছুটা হ্রাস পেলেও বর্তমান সময়ে পৃথিবী আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই যে, মানব জীবনের সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা এখানে চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রিন্টও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ মানেই খুন, ডাকাতি, মাস্তানি, বোমাবাজি, ব্রাকমেইলিং, অপহরণ, শিশুপাচার, এসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতন, আত্মহত্যা, চোরাচালান, মাদকাসক্তি, ছিনতাই, রাহাজানি, দুর্নীতি, সড়ক দুর্ঘটনা ইত্যাদির সচিত্র প্রতিবেদন আমাদের সামনে ভেসে আসে। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এসব অন্যায়, অত্যাচার-অবিচারের প্রতিকারও প্রতিবাদের জায়গা সীমিত হওয়ায় এসব অপকর্ম দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে সমাজের অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘরে বাইরে সবখানেই মানুষ আজ চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সন্তানের হাতে পিতা-মাতা এবং পিতা-মাতার হাতে সন্তানের জীবনও নিরাপদ নয়। এমনকি স্নেহময়ী

মাতার হাতেও শিশুর প্রাণহানি সভ্যতার চরম বিপর্যয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সাধারণ মানুষ বন্ধু ভাবে পারছেন। কারণ তাদের হাতেই আইন লংঘনের ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। সন্ত্রাসের কারণে সমাজের সার্বিক নিরাপত্তা, শান্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে পড়েছে বিপর্যস্ত। শিক্ষাজনগুলোতে চরদখলের ন্যায় হলদখল, চাঁদাবাজি ও মাস্তানির কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার ও জীবনের নিরাপত্তা চরমভাবে উপেক্ষিত। মাদকের ছোবলে কোমলমতি তরুণ-তরুণীদের জীবন আজ ক্ষত-বিক্ষত। স্মার্টফোন, ল্যাপটপ আর কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ছবি ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ গোটা সমাজকে করে তুলেছে কলুষিত। এর ফলে তৈরি হচ্ছে অবৈধ সম্পর্ক যার চূড়ান্ত পরিনতি হিসেবে ঘটছে পারস্পরিক হত্যাকাণ্ড কিংবা আত্মহত্যার মত লোমহর্ষক ঘটনা। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে উন্নত আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষার অভাবে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হবার উপক্রম হয়ে আমরা নিরাপত্তাহীনতার দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে।

উপসংহার

মুহাম্মদ সা. এর আদর্শই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার একমাত্র গ্যারান্টি দিতে পারে। তিনি উন্নত জীবনের সওগাত নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন বৃহত্তর মানবতার বিস্তীর্ণ মোহনায়। এক্ষেত্রে সংকীর্ণতার কোন অন্ধকার তাঁর জীবনবোধকে কালিমালিপ্ত করেনি। সাম্প্রদায়িকতার অরুচিকর মানসিকতা এখানে সর্বৈব পরিত্যাজ্য। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জোর প্রয়োগের মধ্যযুগীয় বর্বরতা এক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্ন মানসিকতার কোন স্থান নেই তাঁর জীবন দর্শনে। বিশাল মহাসাগরের ন্যায় মুহাম্মদ সা. এর মহান জীবন সুবিস্তৃত। চিন্তা-চেতনার প্রতিটি শাখা-পল্লবে ছিল তাঁর সুমহান, শুভ্র-সমুজ্জল মনীষার প্রকাশ। মানব জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের এমন কোন বিভাগ নেই যেখানে রাসূল সা. এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, প্রতিভা ছিল বহুমুখী, অভিজ্ঞতা ছিল সুবিস্তৃত ও জ্ঞানছিল অপরিসীম। স্বভাবতই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনী তৈরিতে তাঁর অবস্থান অতি উর্ধ্বে, শীর্ষদেশে। ইতিহাসের আলোকে তাই তিনি এক ক্ষণজন্মা, মহান কর্মতৎপর, দূর-দ্রষ্টা সত্যসন্ধ মহাপুরুষ হিসেবে নন্দিত। মানব সমাজের জীর্ণ, ঘুণে ধরা কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাই তিনি অমিত তেজদীপ্ত বিরল ব্যক্তিরূপে সমাদৃত, শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, হৃদয়-গভীরে বরণীয়। তাই বাংলাদেশসহ পৃথিবীর চলমান পরিস্থিতিতে শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত মানবগোষ্ঠিকে সত্যিকারের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি ফিরিয়ে দিতে হলে এ ব্যাপারে রাসূল সা. কর্তৃক প্রদর্শিত ও উপস্থাপিত দৃষ্টান্তসমূহের পূর্ণ বাস্তবায়ন ও অনুসরণ ছাড়া বিকল্প পথ নেই। তিনি শান্তির পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে যে নীতিমালা রেখে গেছেন তা সর্বকালের সবার জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তিনি যে জীবন বিধান রেখে গেছেন তা পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে এবং সর্বক্ষেত্রে তার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও মুক্তি আসতে পারে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ সূরা আল আহযাব, আয়াত: ২১।
- ^২ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০৩।
- ^৩ সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭।
- ^৪ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হুসাইন আল-কুশাইরী আন-নীসাপুরী, সহীহ মুসলিম (বৈরুত, লেবানন: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তাবি), হাদীস নং ২২৩৫।
- ^৫ সূরা আর-রাআদ, আয়াত: ২৮।
- ^৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২২।

-
- ৭ সূরা আর-রুম, আয়াত:২১।
- ৮ Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution of the World*. London, 1941, pp. 31-42.
- ৯ সূরা আল বাকারা, আয়াত: ১৯০।
- ১০ রবী' ইবন হাবীব উবন উমার, আল-মুসনাদ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল হিকমাহ, ১৪১৫ খ্রি.), হাদীস নং-৪১৯, পৃ. ১৭০।
- ১১ আহমাদ ইবন আল-হুসাইন আল-বায়হাকী, আস-সুনানু, ১৩শ খণ্ড (দামিশক: দারুল কুতায়বা, ১৯৯১ খ্রি./১৪১২ হি.), হাদীস নং ৫৬৭৫, পৃ. ২৯৩।
- ১২ সূরা আল আন'আম, আয়াত: ১৬৪।
- ১৩ সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত: ৯০।
- ১৪ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ১০।
- ১৫ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৭৯।
- ১৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭২১।
- ১৭ সূরা আন-নিসা, আয়াত নং ১০।
- ১৮ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৩।
- ১৯ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৫৩০৪।
- ২০ সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ১৯।
- ২১ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ২২৯৮।
- ২২ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৭৩৭৬।
- ২৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৩১।
- ২৪ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২৯।
- ২৫ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৭।
- ২৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৪৮।
- ২৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮২।
- ২৮ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৩০।
- ২৯ সহীহ আল-বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ২৭৬৮, পৃ. ১৩।
- ৩০ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৭৫।
- ৩১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৪০।
- ৩২ সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৬।
- ৩৩ সুনানু বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ৭৪৪৪।
- ৩৪ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ২২৯৮।
- ৩৫ সুনানু বায়হাকী, হাদীস নং ৭৪৪৪।
- ৩৬ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৯৯।
- ৩৭ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৬৪।
- ৩৮ সহীহ আল-বুখারী, হাদীস নং ৩৬১২।
- ৩৯ সূরা আর-রুম, আয়াত: ৪১।

উমাইয়া যুগে আরবী কবিতায় ইসলামী আকীদাহ ও ভাবধারা

আব্দুল মমিন*

Abstract: Arabic literature is one of the few others in the world which are at the peak in terms of heritage. Like a lot of rich literature across the globe, the practice of Arabic literature also started through poetry. Religious ideology has made its way into Arabic poetry since ancient times. Understandably, new ideas walked into Arabic poetry after the advent of Islam. The investigation scope of this paper is the Arabic poetry of the Umayyad era: the contemporary era of the Companions of the Prophet (peace be upon him). Just as Islam was able to bring about a change in the way of life, feelings, thoughts and beliefs of the general masses of this age, it also caused a change in the thoughts and beliefs of the poets and writers. The poets of this age used to present to the people the real reflection of what they heard from the Qur'an, Hadith and the speeches of the Prophet (peace be upon him). For this reason, Islamic rules and regulations centring around such concepts as Aqeedah, Tawheed, Salat, Jihad, Charity, the Hereafter, Paradise, Hell, Justice, and the End of the World have found an unmistakable presence in the poetry of this age. This paper illustrates Islamic rules and regulations as reflected in the Arabic poetry during the Umayyad period.

ভূমিকা

আরবী ভাষা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম ভাষা। এ ভাষার সাহিত্যও প্রায় দুই হাজার বছরের প্রাচীন। মানুষের জীবনচাচরার প্রায় সকল বিষয়াবলী সাহিত্যের অন্যতম শাখা কবিতার মাধ্যমেই প্রকাশিত হত। কবিতার মাধ্যমেই মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আচার-ব্যবহার, শৌর্য-বীর্য, প্রেম-প্রীতি, ধর্মীয় বিধি-বিধান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিসহ সব কিছুই বর্ণনা করা হত। জাহিলী কাব্য সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে উল্লেখিত প্রবাদ-প্রবচন, অন্তর্মিল বিশিষ্ট শ্লোক, ধর্মীয় ও কুসংস্কারপূর্ণ রীতি এবং বাগ্মীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষণ আজও আমাদের সমাজে জীবন্ত। বাস্তবিক অর্থে আরবী কাব্যের জন্ম হয়েছে মরুভূমিতে। সে কারণে জাহিলী কাব্যে যাযাবর বেদুঈনদের ভ্রমণ, যুদ্ধ, লুণ্ঠন, বাস্তবতার বর্ণনা, উদ্ভীর বর্ণনা, অশ্বের বর্ণনা, কিংবা শরব পানের বর্ণনাসহ কল্পনাপ্রসূত বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা জাহিলী কাব্য সাহিত্যে তুলে ধরা হয়েছে। আরবী সাহিত্যে জাহিলী যুগ ও ইসলামী যুগের পরই উমাইয়া যুগের অবস্থান। উমাইয়া যুগ হলো ইসলামী নীতি ও আদর্শের যুগ। ইসলাম এ যুগের মানুষের জীবন-যাপনে যেমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তেমনি কবিদের চিন্তা চেতনায় ও ধ্যান ধারণায় এ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ যুগের লোকেরা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় জীবন যাপন করলেও কাব্য সাহিত্যে যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল অন্য কোন যুগে এ উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ যুগের প্রসিদ্ধ কবিগণ তাদের প্রচলিত জীবনধারা তাদের কবিতার মাধ্যমেই ব্যক্ত করতেন। উমাইয়া যুগে মুসলমানদের বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকে। যেমন ককেশাস, ট্রান্স অক্সেনিয়া, সিন্দু, মাগরেব ও আন্দালুসিয়া জয় করে মুসলিম বিশ্বের আওতাধীন করা হয়। এসব বিজিত অঞ্চলসমূহে আরব মুসলিমগণ এবং সাহিত্যিকগণ ব্যাপকহারে হিজরত করে তাদের কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। এভাবে উমাইয়া যুগে আরবী কবিতার বিকাশ ঘটতে থাকে। এছাড়া রাজনৈতিক দিক দিয়ে উমাইয়া আমলে কুফা ও বসরার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকলে জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে এবং সেখানে সাহিত্যের মজলিস বসতে শুরু করে। যেমন জাহিলী যুগের ‘উকায’ মেলার স্থান দখল করে

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নেয় বসরার ‘মিরবাদ’ ও কুফার ‘কানাসা’ মেলা। এভাবে মক্কা, মদিনা, নজদ, খুরাসান, সিরিয়াসহ বড় বড় শহরে কাব্যচর্চা ও কাব্যের বিকাশ ঘটতে থাকে।

আরবী কবিতায় ইসলামী আকীদাহ ও ভাবধারা

ইসলামি যুগে এসে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রভাবে এ যুগের কবিতায় জাহিলীয়াতের কুসংস্কারকে দূর করে ইসলামি ভাবাদর্শে কবিতা রচনা করতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে ধর্মীয় বন্ধন ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি জাহিলীয়াতের ধারা বর্জন করতে পারেননি। এ কারণে তাদের কিছু কিছু কবিতায় জাহিলী ভাবধারা যেমন: প্রেমিকার বাস্তবিকতার বর্ণনা, শরাব পানের বর্ণনাসহ বিভিন্ন বিষয় লক্ষ্যণীয়। পরবর্তীতে তারা রাসূলুল্লাহ (সা.) ও চার খলীফার যুগে ইসলামী অনুশাসন ও কুরআন হাদীছের প্রভাবে কবিদের কবিতায় ইসলামী মূলনীতির বিবিধ বিষয়াবলী নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন।

উমাইয়া যুগের কবিগণ কুরআন, হাদীছ ও সাহাবীদের বক্তব্যের মাধ্যমে যা শুনতেন তা তাদের কবিতায় স্থান দিতেন। সমাজ ও সাংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়াবলী তাঁদের কবিতার বিষয়বস্তুর পাশাপাশি তাওহীদ, জিহাদ, তাকওয়া, সালাত, সাওম, পরকাল, জান্নাত, জাহান্নামসহ অনেক ইসলামী বিধি বিধান নিয়ে কবিতা রচিত হয়েছে। নিম্নে উমাইয়া যুগের আরবী কবিতায় ইসলামী বিধি-বিধান পর্যালোচনা করা হলো-

তাওহীদ (توحيد): আরবী শব্দ। যার অর্থ একত্ববাদ বা এক আল্লাহর ইবাদাত করা।^১ ইসলামী পরিভাষায় তাওহীদ হলো সৃষ্টি ও পরিচালনায় মহান আল্লাহ তা‘আলাকে একক ও অদ্বিতীয় হিসাবে বিশ্বাস করা। তাঁর কর্তৃত্বগুণে ও ইবাদাত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। সকল কিছুর উপাসনা ত্যাগ করা। আল্লাহর সুউচ্চ নামসমূহ ও সুউচ্চ গুণাবলীকে একমাত্র তাঁর জন্যই সাব্যস্ত করা এবং দোষত্রুটি থেকে আল্লাহকে মুক্ত ঘোষণা করা।^২ বাস্তবিক অর্থে ইসলামে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বিষয় হলো তাওহীদ। অর্থাৎ মুসলিম হতে হলে একজন মানুষকে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা‘আলার একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হবে। ইসলামের সকল শিক্ষা ও সুমহান আদর্শ একত্ববাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দুনিয়াতে অসংখ্য নবী রাসূল এসেছেন সকলেরই দাওয়াতের মূল বিষয়ই হলো তাওহীদ। উমাইয়া যুগের অনেক কবির কবিতায় ইসলামের মূল বিষয় তাওহীদের স্বীকৃতি স্থান পেয়েছে। প্রকৃত তাওহীদে বিশ্বাসী ব্যক্তি মহান আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাতে ব্যস্ত থাকে। যেমন উমাইয়া যুগের কবি রা‘ইল ইবিল তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন-

أَخْلِيفَةُ الرَّحْمَنِ إِنَّا مَعَشَرٌ * حَفَاءَ نَسْجِدُ بَكْرَةَ وَأَصِيلًا^৩

[ওগো দয়াময় (আল্লাহর) প্রতিনিধি। আমরা এমন একটা দল যারা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ। আমরা সকাল-সন্ধ্যা তাঁরই (আল্লাহরই) উদ্দেশ্যে সিজদা করি।]

আর মহান আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য (সিজদা তথা ইবাদাত করা) নিয়ে পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^৪

[আমি মানুষ এবং জ্বীন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।]

উমাইয়া যুগের কবি সাহিত্যিকরা তাওহীদ তথা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। রাসূল (সা.) এর নির্দেশিত বিশুদ্ধ একত্ববাদের ছাপ তাদের কবিতায় স্পষ্টত লক্ষ্য করা যায়। উমাইয়া যুগের বিখ্যাত কবি ফারায়দাক তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেন-

سوى الله، ان الله لا شئ مثله * له الامم الاولى يقوم نشورها^৬

[আল্লাহর সমতুল্য কেউ নেই, নিশ্চই আল্লাহর সমকক্ষও কিছুই নেই, তিনি পূর্ববর্তী জাতি সমূহকে পুনর্জীবনে সক্ষম]

উমাইয়া কবিরা ইসলামী ভাবধারাকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁদের কবিতায় মহান আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি এবং সৃষ্টির বিশালতা নিয়ে কবিতা রচনা করা হয়েছে। যেটি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যেমন ফারায়দাক বলেন-

ان الذى سمك السماء بنى لنا * بيتا دعائمه أعز و أطول

بيتا بناه لنا المليك وما بنى * حكم السماء فانه لا ينقل^৭

[তিনি সেই সত্ত্বা যিনি আকাশকে উন্নত করেছেন। তিনি আমাদের জন্য একটি ঘর বানিয়েছেন। যার খুঁটি সবচেয়ে সম্মানী ও সব থেকে লম্বা। সে ঘর আমাদের প্রভু আমাদের জন্য বানিয়েছেন। আর যা তিনি বানিয়েছেন তা আকাশের সমপর্যায়ের। কারণ সেটি স্থানান্তর করা যায় না।]

জিহাদ: আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। জিহাদ অর্থ চেষ্টা করা, সংগ্রাম করা, লড়াই করা।^৮ কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োগ করাকে জিহাদ বলা হয়।^৯ পবিত্র কুরআনে জিহাদের কথা একচল্লিশ বার উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে ‘আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা’ অর্থে জিহাদ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ বার্নার্ড লুইসের মতে, কুরআন ও হাদীছের অধিকাংশ জায়গাতেই জিহাদ শব্দটি ধর্মযুদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।^{১০} যেমন পবিত্র কুরআনে জিহাদ শব্দটি এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে-

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{১১}

[তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাহে তোমাদের মাল-জান কুরবান করে জিহাদ করবে, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। যদি তোমরা অনুধাবন করতে পারো]

জিহাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে নিয়ে আসা এবং সকল প্রকার জুলুম ও শোষণের অবসান ঘটিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসাই জিহাদের উদ্দেশ্য। উমাইয়া যুগে আল্লাহর বিধি বিধান পালনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে উদ্বুদ্ধ ও প্রশংসা করে কবিতা রচিত হয়েছে। যেমন খালিদ ইবন ‘আব্দুল্লাহ আল কাসিরকে জিহাদ ও ধৈর্যের প্রশংসা করে উমাইয়া কবি জারীর বলেন-

حميت ثغور المسلمين فلم تضع * وما زلت راسا قائدا وابن قائد

وإنك قد أعطيت نصر على العدى * ولقيت صبورا واحتساب المجاهد^{১২}

[মুসলমানদের বিভেদ থেকে আপনাকে রক্ষা করা হয়েছে। আর আপনি সর্বদাই একচ্ছত্র নেতা ও নেতার পুত্র হয়ে রয়েছেন। আর আপনাকে (খালিদ ইবন ‘আব্দুল্লাহ আল কাসির) শত্রুর উপর সাহায্য করা হয়েছে। আপনাকে দেয়া হয়েছে ধৈর্য ও মুজাহিদদের বিনিময়ে আকাজক্ষা।]

জিহাদের মাধ্যমে অনেক শহর ইসলামের পতাকাতলে এসেছে। ইসলামের এ সকল বিজয়াভিযানের বর্ণনা দিয়ে কবি ফারায়দাক তাঁর কবিতায় বলেন-

فتحننا باذن الله كل مدينة * من الهند أو باب من الروم مغلق^{১২}

[আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা প্রতিটি শহর বিজয় করেছি। হিন্দুস্থান অথবা রোমের বন্ধ দরজার নিকটবর্তী পর্যন্ত।]

ইসলামের ইতিহাসে কারবালা একটি বিয়োগন্তক ঘটনা। ইমাম হুসাইন (রা.) ও তাঁর সহযোগীরা কারবালা প্রান্তরে ফোঁরাত নদীর তীরে ইয়াজিদ বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। উমাইয়া যুগে কারবালা যুদ্ধে শহীদদের নিয়েও কবিতা রচনা করা হয়েছিল। কবি কুছায়ির তাঁর কবিতায় ইবনুল হানফিয়ার মৃত্যু প্রসঙ্গে কবিতায় বলেন-

فبسط سبط ايمان وبر * وسبط عيبته كربلاء

وسبط لا تراه العين حيا * يقول الخيل يقدمها اللواء^{১৩}

[তার ঈমানদার সু-আকৃতির অধিকারী এবং কারবালার শহীদ। অন্য একজন পূণ্যশীল দৃষ্টির অগোচর এবং তিনি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের জন্য আসবেন।]

এছাড়া যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম মুজাহিদরা শৌর্য-বীর্য প্রকাশ করেছেন। ঈমানী শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে তারা যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এসব মুজাহিদদের বীরত্বগাঁথা নিয়ে কবি ফারায়দাক বলেন-

ضربت بسيف كان لاقى محمد * به اهل بدر عا قدين النواصبا^{১৪}

[আপনি এমন তরবারী দ্বারা আঘাত করেছেন যেমন তরবারী দ্বারা রাসূল (সা.) বদরী সাহাবীদের সাথে নিয়ে ললাট ভুলুণ্ঠিত করেছিলেন।]

যারা যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেও কবিতা রচনা করা হয়েছে। যেমন খালিদ আল কান্না তাঁর কন্যাদের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে ছিলেন। তখন কাতারী ইবনুল-ফুজ'আ তাকে উদ্দেশ্য করে কবিতা রচনা করেন। যেমন-

أباخالد يا انفر فلست بخالد * وما جعل الرحمان عذر القاعد^{১৫}

[হে আবু খালিদ যুদ্ধের জন্য চল। কারণ তুমি এখানে চিরস্থায়ী নও। আর দয়াময় আল্লাহর জিহাদ থেকে ঘরে বসে থাকা ব্যক্তির জন্য কোন ওয়র আপত্তি রাখেন নি।]

তাকওয়া (تقوى): তাকওয়া শব্দের অর্থ হল ভয় ভীতি বা আল্লাহভীতি।^{১৬} আল্লাহ তা'আলার ভয়ে সকল অন্যায় কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথ যথাযথ অনুসরণ করে বাস্তব জীবনে মেনে চলাকে তাকওয়া বলে। তাফসীরে ইবনে কাছীর এর মতে, তাকওয়ার মূল অর্থ হল, কোনটি আল্লাহ অপছন্দ করেন তা এড়ানো। বাস্তবিক অর্থে তাকওয়া শব্দের অর্থ হল, আল্লাহর ভয়ে সকল অনিষ্ঠ কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখা। তাকওয়া অর্জনের ফলে একজন মানুষ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে। তাকওয়া শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ^{১৭}

[হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর তোমরা সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।]

ঠিক এভাবেই পবিত্র কুরআনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উমাইয়া কবিগণ তাঁদের কবিতায় তাকওয়া'র বিষয়টি তাদের তীক্ষ্ণ লেখনীর দ্বারা তুলে ধরেছেন। যেমন খুরাসানের যুদ্ধে কবি নসর ইবন সায়্যার বলেন-

دع عنك دنيا واهلا انت تاركهم * ماخير دنيا وأصل لا يدومونها
واكثر تقى الله فى الاسرار مجتهدا * ان التقى خير ه ما كان مكنونا^{১৮}

[তোমার (মন) থেকে তুমি দুনিয়াকে ঝেড়ে ফেলে দাও এবং পরিবার পরিজনকেও ত্যাগ কর। পরিবার আমাদের কাছে স্থায়ী থাকবেনা। গোপনে তাকওয়া ও আল্লাহর ভয়-ভীতি অর্জনে বেশি চেষ্টা কর। উত্তম তাকওয়া ও আল্লাহভীতি তাই, যা গোপন থাকে।]

কবি এ কবিতার অংশ দ্বারা তুলে ধরেছেন যে, দুনিয়ার জগতে পরিবার পরিজন ও সম্পদের মোহে আমরা খোদাভীতির কথা ভুলে যাই। আমাদের উচিত হবে আরাম আয়েশ ত্যাগ করে খোদাভীতি অর্জনের চেষ্টা করা।

উমাইয়া খলীফাগণ ছিলেন সাহিত্যপ্রেমী। তাদের দরবারে সব সময় কবিদের পদাচারণা ছিল। কবিরা খলীফাদের প্রশংসায় কবিতা রচনা করতেন। খলীফাদের উত্তম চরিত্রের যেমন প্রশংসা করতেন তেমনি খলীফাগণ যে তাকওয়াবান সে বিষয়টি তাদের কবিতায় স্থান দিয়েছেন। কবি ফারায়দাক খলীফা সুলায়মানের খোদাভীতির কথা উল্লেখ করে বলেন-

فأنت أحق الناس بالعدل والتقوى وانت ترى الارض وطهورها^{১৯}

[মানুষের মধ্যে আপনিই (খলীফা সুলায়মান) ন্যায়বান এবং খোদাভীর। পৃথিবীতে আপনিই পবিত্রতা ও লজ্জাশীলতার আদর্শ।]

সালাত (صلوة): সালাত শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রার্থনা, অনুগ্রহ, ক্ষমা প্রার্থনা করা, নত হওয়া ইত্যাদি।^{২০} অর্থাৎ শরী‘আত নির্দেশিত পন্থায় মহান আল্লাহর নিকট বান্দার ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম হল সালাত। সালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী হয়। সালাত বান্দাদেরকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। যেমন:- সালাতের ব্যাপারে উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফারায়দাক বলেন-

لقد دلتهنى عن صلاتى وأنه * ليدعوا إلى الخير الكثير إقامها^{২১}

[আমার সালাত আমাকে (কল্যাণের) পথ দেখায়। নিশ্চয়ই সালাতের প্রতিষ্ঠাতা অনেক কল্যাণের দিকে আহ্বান করে]

সালাত আদায় করা আমাদের প্রত্যেকের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। কেননা সালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফির বলে বিবেচিত হয়। যারা সালাত আদায় করে না দুনিয়ায় তাদের শাস্তির কথা তুলে ধরে নসর ইবন সায়্যার বলেন-

وامنع جهادك من لم يرج اخرة * وكن عدوا لقوم لا يصلوننا
فاقتلهم غضبا لله منتصرا * منهم به ودع المرتاب مفتونا^{২২}

[যে আখিরাতের কামনা করে না তুমি তাঁর বিরুদ্ধে জিহাদ কর। আর তুমি সেই সম্প্রদায়ের শত্রু হও যারা সালাত আদায় করে না। আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হয়ে

প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তাদেরকে হত্যা কর। আর সন্দেহকারীকে ফিতনাগ্রস্থ ও গোমরাহ অবস্থায় ত্যাগ কর।]

কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদাত তথা সালাত আদায় করে তাদের অবস্থার কথা তুলে ধরে কবি জারীর বলেন-

فاما النصارى العابدون صليبيهم * فخابوا وأما المسلمون فأفلحوا^{২৭}

[খ্রিস্টান জাতি যারা ক্রুশের ইবাদাত করে তারা হতভাগ্য ও বঞ্চিত হয়েছে। আর মুসলমানরা তো সফলকাম হয়েছে]

সাওম (صوم): সাওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা, নিজেকে মুক্ত রাখা, সংযম ইত্যাদি।^{২৮} পরিভাষায় সুবেহ সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল প্রকার পানাহার, পাপাচার, কামাচার এবং যাবতীয় ভোগ বিলাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি মূল ভিত্তির অন্যতম তৃতীয় ভিত্তি হল সাওম। উমাইয়া কবিগণ ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ বিধান সাওমের উপর কবিতা রচনা করেছেন। যেমন বানু হাশিমের প্রশংসায় কবি আয়মন ইবন খুরায়ম বলেন-

نهاركم مكابدة وصوم * وليلكم صلوة واقتراء
وليتم بالقرآن وبالتزكى * فاسرع فيكم ذاك البلاء^{২৯}

[তোমাদের দিনগুলো কাটে কষ্টে এবং রোযা রেখে। আর রাতগুলো কাটে সালাত ও ইবাদাতে। তোমরা কুরআনের সাথে ও পবিত্রতার সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত রয়েছে। তাই তোমাদের মধ্যে বালা মুছিবত দ্রুত প্রবেশ করেছে।]

পরকাল (الخرة): ‘আকাইদের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করা। এটি ইসলামী বিধি-বিধানগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম দিক। ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া খলীফাগণ ছিলেন ইসলামী অনুশাসনে জীবন-যাপনকারী ব্যক্তি তারা দুনিয়ার তুলনায় পরকালকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন ইসলামের পঞ্চম খলীফা হযরত ‘উমার ইবন ‘আব্দুল আযীয (রহ) এর দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে কবি কুসায়ির বলেন-

تركت الذى يبنى وإن كان موقفا * واثرت مايبقى برأى مصمم^{৩০}

[দুনিয়া) যা ধ্বংস হয়ে যাবে সেটি তুমি ত্যাগ করেছো, যদিও তা আনন্দদায়ক। আর যেটি স্থায়ী থাকবে (পরকাল) সেটিকে তুমি প্রাধান্য দিয়েছো তোমার দৃঢ় অবিচল মতের দ্বারা।]

এভাবে পঞ্চম খলীফা ‘উমার ইবন ‘আব্দুল আযীয এর জন্য আল্লাহর নিকট দু‘আ, তাঁর শান্তি কামনা এবং প্রজা সাধারণকে পুনরুত্থান দিবসের কথা আলোচনা করে কবিতা রচনা করেছেন বিভিন্ন কবিরা। এ নিয়ে কবি জারীর কিয়ামতের কথা উল্লেখ করেন এভাবে-

وتدعوا الله مجتهدا ليرض * وتذكر فى رعيته المعاد^{৩১}

[আপনি কঠোর পরিশ্রমের সাথে আল্লাহকে ডাকেন যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। আর আপনি (‘আবদুল আজীয) আপনার প্রজাদের কাছে পুনরুত্থান দিবসের আলোচনা করেন।]

কিয়ামতের ভয়াবহতার কথা উল্লেখ করে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কবি ফারায়দাক বলেন-

إذا جئني يوم القيامة قائد * عنيق وسواق يسوق الفرزدقا

اخاف وراء القبران لم يعافني * أشد من القبر التهابا وأضيحا^{২৬}

[কিয়ামত দিবসে শক্তিবান নেতা যখন আমার নিকটে আসবেন। আর চালক যখন ফারায়দাককে পরিচালনা করে নিয়ে যাবে। আমি কবরের অবস্থাকে ভয় করি, (কারণ হ'ল) সংকীর্ণ ও তীব্র জালাময় সেই কবরে যদি আমাকে ক্ষমা করা না হয়]

জান্নাত-জাহান্নাম (جنة جهنم): মহান আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যারা আল্লাহকে তাঁর একমাত্র রব হিসাবে মেনে নিয়ে আল্লাহ নির্দেশিত রাসূল (সা.) প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী চলবেন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পুরস্কার স্বরূপ মহাসুখের স্থান জান্নাত দান করবেন। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর পথ অবলম্বন করবে সে তাঁর শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামের অধিবাসী হবেন। যেমন- কেউ যদি আল্লাহর আনুগত্য করে, আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী জীবন যাপন করে, আল্লাহর আদেশ নিষেধ সঠিকভাবে পালন করে তাদের আবাসস্থল সম্পর্কে মু'আবিয়া ইবন হিশামকে উদ্দেশ্য করে জারীর বলেন-

مشيت بكتاب الله مجتهد * في طاعة الله تلقى أمره رشدا

أعطيت من جنة الفردوس مرتقفا * من فاز يومئذ فيها فقد خلدا^{২৭}

[আপনি (মু'আবিয়া ইবন হিশাম) আল্লাহর কিতাব দৃঢ়ভাবে ধারণকারী, আল্লাহর আনুগত্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চেষ্টাকারী, আপনিই তাঁর আদেশ নিষেধ সঠিকভাবে পালনকারী। আপনাকে জান্নাতুল ফিরদাউসের আবাসস্থল দেয়া হয়েছে, সেদিন সেই সেখানে চিরস্থায়ী হবে যে সফলকাম হবে]

আল্লাহ মনোনীত ধর্ম ইসলামকে বাদ দিয়ে যারা অন্যধর্ম তালাশ করে এবং যে অনুযায়ী জীবন-যাপন করে তাদের পরিণতির কথা উল্লেখ করে কবিতা রচনা করেন। যেমন খ্রিষ্টান কবি আখতাল ও তাঁর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে কবি জারীর লেখেন-

وما رضىتم لأجساد تحرقهم * في النار إذا حرقت أرواحهم سقر

الأكلون حبيث الزاد وحدهم * والنار لون إذا واراها الخمر^{২৮}

[যে দেহগুলো নিয়ে তোমরা সম্ভ্রষ্ট আছো সেগুলো আগুনে জ্বালানো হবে। জাহান্নাম তাদের আত্মাগুলোকে দক্ষীভূত করবে। তারাই শুধু খারাপ জিনিষ ভক্ষণকারী এবং মদ যখন তাদেরকে ঢেকে নেয় তখন সে আসরে তারা অবতরণকারী।]

তৎকালীন যুগে, উমাইয়া ও হাশেমীদের মধ্যে কিংবা উমাইয়া ও খারেজীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘাত লেগেই থাকত। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত উমাইয়াদের সাথে খারিজীদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এ সকল যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক মানুষ নিহত হয়। উভয় পক্ষই নিজেদের সম্প্রদায়ের নিহত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ বলে মনে করেন। যেমন বুলুল আস-সুফরী হিশাম ইবন আব্দুল মালিকের সময় খারিজী মতবাদ গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে নিহত হন তাঁর মৃত্যুতে দাহ্‌হাক ইবন কায়স বলেন-

يا عين أذرع دموعا منك تهتنا * واياك لناصحة بانوا واخوانا

خلوا لنا ظام الدنيا وباطنها * واصبحوا في جنان الخلد جيرانا^{২৯}

[হে নয়ন! আমাদের সাথী-সঙ্গী ও ভাইদের জন্য তোমার থেকে অবিরাম অশ্রু প্রবাহিত কর। যারা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেছে তাদের জন্য দ্রুতদন কর। তোমরা আমাদের জন্য দুনিয়ার ভিতর ও বাইরের অংশ ছেড়ে দাও যাতে তাঁরা স্থায়ী জান্নাতের প্রতিবেশি হয়ে যায়।]

ন্যায় বিচার (عدل): ইসলামে সুমহান আদর্শ অনুযায়ী শাসক শাসিতের প্রতি যেমন ন্যায় বিচার করবে ঠিক তেমনি সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হল সর্বক্ষেত্রে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা। যে ব্যক্তি কোন মানুষকে হত্যা করবে সে গুণাহগার বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর শাস্তি তাঁর জন্য নির্ধারিত হবে। এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং হারাম। এ সকল আদর্শ ও বিধি-বিধান উমাইয়া কবিরা তাদের কবিতায় প্রচার করেছেন। যেমন:- কবি ফারায়দাক প্রিয়তমাকে অবহিত করে বলেন-

فاذا حلفت هناك إنك من دمي * لبرينة فتحلى لاتأثمي
فلئن سفكت دما بغير جريرة * لتخلدن مع العذاب الا لام^{৩৬}

[অতঃপর যখন তুমি শপথ করবে যে, আমার খুন থেকে তুমি মুক্ত, তখন তুমি কিছু শর্ত আরোপ করে দিও; তাহলে আর গুণাহগার হবে না। (জেনে রেখ) বিনা অপরাধে যদি তুমি আমার রক্ত প্রবাহিত কর তবে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির মধ্যে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।]

মানুষের কর্মকাণ্ডের প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই প্রদান করবেন। আমাদের প্রত্যেকেরই কর্মফল আমাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। কর্মফল অনুযায়ী আমাদের আমলনামা প্রদান করা হবে। ইসলামের এই সুমহান ন্যায় বিচারের বিধানটি উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জারীরের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন:- জারীর খ্রিস্টান পাদ্রীদের উদ্দেশ্য করে বলেন-

تغشى الملكة الكرام وفاتنا * والتغلبى جنازة الشيطان
يعطى كتاب حسابه بشماله * وكتابتنا بأكفنا الايمان^{৩৭}

[আমাদের ইন্তিকালের সময় সম্মানিত ফেরেশতাগণ আমাদের বেষ্টন করে থাকবেন। আর তাগলিবগণ হল শয়তানের জানাযা। তাদের (যারা অসৎ কর্ম করে অর্থাৎ খ্রিস্টানদের) আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। আর আমাদের (অর্থাৎ সৎ কর্মশীল মুসলমানদের) আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে।]

উমাইয়া যুগের অধিকাংশ খলীফাগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জীবন-যাপন করতেন। তাছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) ও চার খলীফার আদর্শ অনুযায়ী তারা বিচার ফয়সালা করতেন। খলীফাগণ প্রজাসাধারণের সাথে ন্যায় বিচার করতেন এবং তাদের প্রতি দয়াপরবশ ছিলেন। যেমন ফারায়দাক সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিককে উদ্দেশ্য করে বলেন:-

جعلت لاهل الأرض عدلا ورحمة * وبراء لاثار الجروح الكوال^{৩৮}

আপনাকে [সুলায়মান ইবন আব্দুল মালিককে] পৃথিবীর মানুষের জন্য ন্যায় বিচার ও দয়ার প্রতীক বানানো হয়েছে, আর মারাত্মক আহত ব্যক্তির আরোগ্যকারী বানানো হয়েছে।]

তাকদীরে বিশ্বাস: ইসলামে সাতটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। তাকদীরে বিশ্বাস তাঁর মধ্যে অন্যতম। তাকদীরকে আগানো বা পিছানো সম্পূর্ণ মহান আল্লাহ তা‘আলার সিদ্ধান্তের উপর

নির্ভরশীল। মৃত্যু যে পূর্ব নির্ধারিত একটি মহা সত্য উমাইয়া যুগের কবি ফারায়দাক সেটি তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন-

الأكل شئ في يد الله بالغ * له أجل عن يومه لا كول
وان الذي يغتر بالله ضائع * ولكن سينجي الله من يتوكل^{৩৫}

[সকল কিছুই আল্লাহর (কুদরতী) হাতে পৌঁছায়। আল্লাহর কাছেই রয়েছে শেষ দিবসের নির্ধারিত সময়। যেটি খণ্ডানোর কেউ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাথে প্রতারণাকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু আল্লাহর উপর নির্ভরশীলরা অচিরেই মুক্তি পাবে।]

দুনিয়া বিমুখতা: আল্লাহ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার অন্যতম দিক হল দুনিয়ার আরাম আয়েশ ত্যাগ করা এবং পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা। কারণ দুনিয়ার সম্পদ তো স্থায়ীভাবে ভোগ করা যায় না। মানুষকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। সারা জীবনের অর্জিত সম্পদ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে হবে। এ সকল বিষয়গুলো উমাইয়া যুগের কবি সাবিক আল বারবারি^{৩৬} তাঁর কবিতায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন-

أموالنا ذوى الميراث نجمعها * ودورنا الحزاب الدهر ننبهها
والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت * ان السلامة منها ترك ما فيها^{৩৭}

[আমাদের সম্পদ যা আমরা জমা করি তাতে আমাদের ওয়ারিশদের অধিকার রয়েছে; আর যে সকল ঘর-বাড়ী আমরা তৈরী করি সেগুলো কালের আবর্তে একদিন হারিয়ে যাবেই আমাদের আত্মা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত অথচ সে জানে যে, দুনিয়া থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা ত্যাগ করা।]

এই মোহের দুনিয়ার বিলাসিতা ও প্রাচুর্যতাকে অবগত করে কবি মিসকিন আদ-দারেমী^{৩৮} বলেন-

ما انزل الله من أمر فأكفه * الا سيجعل لى من بعده فرجا^{৩৯}

[আল্লাহ তা'আলা এমন কোন বিষয় অবতীর্ণ করেননি যা আমি অপছন্দ করি, এটা ছাড়া যে, এরপর আমার জন্য অতি সত্তর প্রাচুর্য আসবে।]

উপসংহার

উমাইয়া যুগের কবি সাহিত্যিকরা তাদের কাব্য চিন্তার মাধ্যমে আরবী সাহিত্যকে অন্যান্য মর্যাদায় সমাসীন করেছেন। তাঁদের কাব্যে, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির পাশাপাশি ইসলামী বিধি-বিধানগুলো অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। যার ফলে মানুষ সাহিত্যের কাব্যিকরূপ আশ্বাদনের পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

^১ ড. মুহাম্মদ ফজলুল রহমান, আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৩৩৬।

^২ The Fundamentals of Towhid (Islamic Monotheism) ICRS (Indonesian Consortium of Religious Studies, 2020-10-30.

^৩ আবু ফু'আদ যায়দ আল-কুরাশী, জামহারাতু আশ'আরিল 'আরব (মিসর: ১৩৩০ হি.), পৃ. ৩৪৫।

-
- ^৪ সূরাহ আয-যারিয়াহ, আয়াত: ৫৬।
- ^৫ আল-ফারায়দাক, *দীওয়ানু ফারায়দাক*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল সাদির, তা.বি.), পৃ. ৩৬৮।
- ^৬ *দীওয়ানু ফারায়দাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।
- ^৭ ইবন মানযুর, *লিসানুল 'আরব*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫; আল-মু'জামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, পৃ. ৩৮০।
- ^৮ আল-ফিরুযাবাদী, *আল-কামুসুল মুহীত*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাতবায়াতুল মিসরীয়্যাহ, ১৯৩৩ খ্রি.), পৃ. ২৮৬।
- ^৯ Bernard Lewis, *The Political Language of Islam* (University of Chicago Press, 1988), p. 72
William M. Watt *Islamic Conceptions of the holy war in: Thomas P. Murphy, The Holy War* (Ohio state University press, 1974), p. 143.
- ^{১০} সূরাহ আনফাল, আয়াত: ৩৫।
- ^{১১} *দীওয়ানু জারীর* (মিসর: আল মাতবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৩১৩ হি.), পৃ. ৭৪।
- ^{১২} *দীওয়ানু ফারায়দাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮।
- ^{১৩} ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ৩২৩; ইবন কুতায়বা, *আশ-শি'র ওয়াশ শ'আরা* (বৈরুত: লেবানন: দারুলছ-ছাকাফা, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩৩৪।
- ^{১৪} *দীওয়ানু ফারায়দাক*, ২য় খণ্ড (কায়রো: মাতবাতুল মাহাদ, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ৩৫৩।
- ^{১৫} ড. শাওকী দায়ফ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯।
- ^{১৬} ড. ফজলুর রহমান, *আল মুজামুল ওয়াফী*, পৃ. ৩০৫।
- ^{১৭} সূরাহ আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯।
- ^{১৮} আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, ৮ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কালাম, তা.বি.), পৃ. ২২৩।
- ^{১৯} *দীওয়ানু ফারায়দাক*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৭।
- ^{২০} ড. ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী*, পৃ. ৬৩২; Sachiko Murata, *Willim C. Chittic* (paragon House, 1994), *The Vision of Islam*, IBSN-978-1-55778-516-9.
- ^{২১} *দীওয়ানু ফারায়দাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৯।
- ^{২২} আত-তাবারী, *তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২২৩; ড. আবদুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৬৮।
- ^{২৩} *শারহু দীওয়ানু জারীর*, পৃ. ২১৩।
- ^{২৪} ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল মু'জামুল ওয়াফী*, পৃ. ৬৩৮।
- ^{২৫} আবুল ফারাজ আল ইসপাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: মুআসসাসাতুল জাম্মান, তা.বি.), পৃ. ২১; ড. শাওকী দায়ফ, *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯।
- ^{২৬} 'উমার ফাররুখ, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল-'ইলম লিল মালায়িন ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৬২১।
- ^{২৭} *দীওয়ানু জারীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।
- ^{২৮} *দীওয়ানু ফারায়দাক*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯।
- ^{২৯} *শারহু দীওয়ানু জারীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫।
- ^{৩০} *তদেব*, পৃ. ১১৬।
- ^{৩১} *তারীখুল উমাম ওয়াল-মলুক*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪।
- ^{৩২} *দীওয়ানু ফারায়দাক*, পৃ. ২২২।
- ^{৩৩} ড. সালাহুদ্দীন আল-হাদী, *ইত্তিহাজাতুল-শি'র ফিল 'আসরিল উমাবী* (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ১৪০৭ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩১২; *শারহু দীওয়ানু জারীর*, পৃ. ৬৫৫-৬৫৬।
- ^{৩৪} ড. মাহমুদ গানাবী আয-যুহায়রী, *নাকায়েদে জারীর ওয়াল ফারায়দাক* (বাগদাদ: দারুল মা'আরিফা: ১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ২৮৫।

^{৩৫} দীওয়ানু ফারায়দাক, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ৪০৩; ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, আরবী সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা (রাজশাহী: পরিলেখ প্রকাশনী, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

^{৩৬} সাবিক আল বারবারি: তিনি একজন কবি ও বড় ‘আলিম ছিলেন। আল মাওসিল এর রিক্কার কাযী ও মসজিদের ইমাম ছিলেন। তাঁর কবিতায় দুনিয়া বিরাগ ছাড়াও তাকওয়া ও পরহেযগারীর বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে।

^{৩৭} ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল ‘আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।

^{৩৮} মিসকিন আদ দারেমী: তিনি তামিম গোত্রের কায়স শাখায় জন্ম গ্রহণ করেন। কবির প্রকৃত নাম রবী‘আ ইবন আমির। তার অধিকাংশ কবিতায় নিজেকে অভাবগ্রস্থ বা মিসকিন বলে বর্ণনা করেছেন। সেখান থেকেই তাঁর উপনাম মিসকিন। মিসকিন আদ-দারেমী ছিলেন ইসলামী আদর্শে একজন অনুপ্রাণিত ব্যক্তি। তাঁর বহু কবিতা কালের আবর্তে হারিয়ে গেছে। তাঁর থেকে উদ্ধার হওয়া কবিতার পংক্তির সংখ্যা প্রায় ৩০০টি। কথিত আছে যে, হাশিম আত-তায়ান কবি মিসকিন আদ-দারেমীর অবশিষ্ট কাবতাসমূহ একটি দীওয়ানে সংকলন করেছেন। আব্দুল্লাহ আল জুবুরী ও খলিল ইবন আতিয়াহ কর্তৃক ৫৫টি বিচ্ছিন্ন অংশের একটি দীওয়ান ১৯৭০ সালে বাগদাদ থেকে মুদ্রিত হয়। এই দূর্লভ কবিতাসমূহ কবিকে একজন প্রতিভাবান কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। [সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৯০-১৯১]

^{৩৯} ড. শাওকী দায়ফ, তারিখুল ‘আদাবিল আরাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী : আরবী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অবদান

মো. মিনারুল ইসলাম*

Abstract: Khalil ibn Ahmad al-Farahidi was a linguist, an inventor of rhyme scheme of a particular type, and a legend of Arabic grammar. He was also the custodian of the Arabic dictionary. He collected and arranged the structure of Arabic letters that were not neatly arranged earlier. In private life, he was indifferent to earning a living. He worked hard to invent a rhythmic match between music and musical instruments. In his pursuit, he would spend the day without food and drink. Eventually he succeeded in becoming the discoverer of music in a scientific way. Apart from being the first discoverer of the rules of matching rhythm in Arabic, he made unique contributions to history and literature in every aspect of which he had a vocal foothold. The cities of Hebron and Busra are proud of his accomplishments. Following him, his student Chiba Weh completed many of his unfinished works. The life of Khalil ibn Ahmad al-Farahidi and his literary genius are described in this article.

ভূমিকা

আরবী ভাষা ও সাহিত্যকে নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মধ্যে খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে ভাষা-বিজ্ঞানী, আরবী ব্যাকরণবিদ, আরবী অভিধানের জনক, আরবী ছন্দ-বিজ্ঞানের পুরোধা, জ্যোতির্বিদ, আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ হরকত প্রদানকারী।^১ তিনি কবিতা ও সঙ্গীত রচনা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী তাঁর সময়ের অন্যতম বিস্ময়কর প্রতিভার নাম। তিনি গবেষণা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। এ জাতীয় জ্ঞান-অনুসন্ধানী মহৎ মানুষ পৃথিবীতে বিরল। সে যুগে তাঁর চেয়ে বুদ্ধিমান, অধিক জ্ঞানী, মেধাবী এবং অধ্যবসায়ী আর কেউ ছিল না।^২ তাঁর শিষ্যরা তাঁর জ্ঞান দিয়ে বিশ্বে বিখ্যাত হয়েছেন। তিনি শুধু তদানিন্তন যুগের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই ছিলেন না বরং সর্বকালের, সর্বযুগে শ্রেষ্ঠ ভাষা বিজ্ঞানী ছিলেন। তাছাড়া ব্যাকরণশাস্ত্র, অভিধানতত্ত্ব, ছন্দ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কবিতা সংকলন ও সঙ্গীত রচনায় তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। তিনি সর্বদাই লোকচক্ষুর আড়ালে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই জীবদ্দশায় নিজের জীবনী লিখে যাননি। তাঁর সমসাময়িক যুগ এবং পরবর্তী যুগের বিভিন্ন বইয়ে তাঁর সম্পর্কে খুব কমই তথ্য পাওয়া যায়। মুসলিম মনীষীদের মধ্যে অনেক মহান ব্যক্তিদের জীবনকর্ম কালের স্রোতে এভাবেই হারিয়ে গেছে। এজন্য তাঁর জীবন সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তবে তাঁর যুগশ্রেষ্ঠ ছাত্রবৃন্দের মাধ্যমে বিশ্বে তিনি আজও সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ। শিক্ষার্থীদের জন্য যা এখনও জ্ঞানের খোরাক হিসেবে সমাদৃত।^৩

খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীর জীবনী

তাঁর প্রকৃত নাম আল-খালীল, বাবার নাম ছিল আহমাদ^৪ আল-ফারাহীদী আল-ইয়াহমাদী। তাঁর পূর্ণনাম আবু ‘আব্দুর রহমান আল-খালীল ইবন আহমাদ ইবন ‘আমর ইবন তামীম আল-ফারাহীদী আল-আয্দী আল-বাসরী।^৫ তবে খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী নামেই অধিক প্রসিদ্ধ। فرهود শব্দটি فرهود এর جمع বা বহুবচন অর্থ এমন সিংহ বা বাঘের বাচ্চা যেটি এখনো শিকার গ্রহণ করা শুরু করেনি। আবাব فرهود শব্দটি ছোট্ট মেঘ বা ভেড়াকেও বলা হয়। তিনি বাল্যকাল হতেই অনেক মেধাবী ছিলেন।^৬

* এম. ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আল-খালীল আরব উপদ্বীপের ওমান রাষ্ট্রে ১০০ হিজরী মুতাবেক ৭১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই সেখান থেকে বর্তমান ইরাকের বসরা নগরীতে গমন করেন।^{১৫} কেননা জ্ঞান অর্জনের জন্য সে সময়ে বসরা ও কুফা বিশ্বে নগরী হিসেবে বিখ্যাত ছিল। এখানেই তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা এই তিনি নগরীতেই সমাপ্ত করেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ নগরী হওয়ায় লেখাপড়া শেষ করে এখানেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।^{১৬}

তিনি বসরাতে শিক্ষা গ্রহণকালে বিভিন্ন গুণী পণ্ডিতবর্গের সংস্পর্শে আসেন, তাদের জ্ঞানের আলোতে আলোকিত হন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু ‘আমর ইবনুল ‘আলা (৭০-১৫৪ হি.), আইয়ুব আস-সাকতিয়ানি আল-বুসরি, আসিম আর আহওয়ার ইবন আন-নদর আল-বুসরি, ‘উছমান ইবন হাদির আল-আযদী, আল-আওয়াম ইবন হাওশিব, গালিব ইবন খাতাফ আল কাতান, ‘ঈসা ইবন ‘উমার (মৃ. ১৪৯ হি.) অন্যতম। এরপর তিনি নিজে আরবী ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের শিক্ষক হিসেবে বসরায় গমন করেন।^{১৭} সমসাময়িক ও অন্যান্য আরবী ভাষাবিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের মধ্যে ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকুফফা (মৃ. ১৪৩ হি.), সুফইয়ান আছ-ছাওরী (মৃ. ১৬১/৭৭৮), আল-ফারা’ (মৃ. ২০৭ হি.), আবু ‘উবাইদা (১১৪-২১০ হি.), আবু ‘আমর আশ-শাইবানী (মৃ. ২১৩ হি.), ইবনুল ‘আরাবী (মৃ. ২৩১ হি.), আবু হাতিম আস-সিজিসতানী (মৃ. ২৫৫ হি.), আল-জাহিয (মৃ. ২৫৫ হি.), ইবন কুতাইবা (মৃ. ২৭৬ হি.), আবুল ‘আব্বাস আল-মুবারাদ (২১০-২৮৫ হি.), আল-জাওহারী (২৩২-২৯৩ হি.), আল-আযহারী (২৮২-৩৭০ হি.) প্রমুখ সাহিত্যিকদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।^{১৮} এ সময়ে অসংখ্য ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেন। আল-খালীলের এ ধরনের ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন সীবাওয়াইহ (মৃ. ১৮৩/৭৯৬), ‘আব্দুল মালেক ইবন কারী আল-আসমা’ঈ (১২৩-২১৭ হি.), হামাদা ইবন ইয়াজিদ, আল-কারী আইয়ুব ইবন ইয়াজিদ আল-বাসরী, বাদল ইবন মুহাব্বির দাউদ ইবন মুহাব্বির, ‘আলী ইবন নাসর আল-জাহযামী আল-কাবীর, আওন ইবন আম্মারা, হারুন ইবন মুসা আন-নাহবী, ওয়াহাব ইবন জারীর ইবন হাযিম, ইয়াজিদ ইবন মুররাহ, আল-কাসাঈ (মৃ. ১৮৯ হি.), মুআবিজ আস-সাদুসী (মৃ. ১৯৫ হি.), আন-নাদর ইবন শুমাইল (মৃ. ২০৩ হি.), আল-লাইজ ইবন মুজাফফারমুখ উল্লেখযোগ্য।^{১৯}

খালীল ইবন আহমাদ একজন প্রখর স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা সম্পর্কে সমসাময়িক পণ্ডিতগণ অকোপটে স্বীকার করেছেন। ইবন খাল্লিকান এভাবে বর্ণনা করেছেন, আল-খালীল সারারাত ধরে ‘আব্দুল্লাহ ইবনুল-মুকুফফার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। পরবর্তীতে একজনকে আরেকজন সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে আল-খালীল বলেন, ‘দেখলাম ইবনুল মুকুফফার বুদ্ধির চেয়ে বিদ্যা বেশী।’ পক্ষান্তরে ইবনুল মুকুফফা আল-খালীল সম্পর্কে বললেন, ‘আমার মনে হল, লোকটির বিদ্যার চেয়েও বুদ্ধি বেশী।’^{২০} আবু তাইয়্যিব আল-লাগভী আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেন, একদা মক্কা নগরীতে আরব উপদ্বীপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক এবং ফকিহদের একত্র করে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাঁর মধ্যে সবাই নিজস্ব জ্ঞান গরিমা এবং প্রতিভা নির্ভরশীল বক্তব্য ও প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। আল-খালীলও সেখানে অংশ গ্রহণ করেন। উপস্থিত সবাই একবাক্যে ঘোষণা করেন, *فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أنكى العرب، وهو مفتاح العلوم* অর্থাৎ ‘আল-খালীল আরবের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ও বিচক্ষণ এবং তিনি জ্ঞানের চাবিকাঠি।’ সুফিয়ান ইবন উয়াইনা বলেন, *من أراد أن ينظر إلى رجل من ذهب، فليظر إلى الخليل بن أحمد* অর্থাৎ ‘যদি কোন ব্যক্তি স্বর্ণ ও সুগন্ধি যুক্ত মানব হিসেবে কাউকে দেখতে চান সে যেন খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীরকে দেখেন।’ তিনি বলেন, মানুষের স্তর চারটি এবং সে অনুযায়ী তাদের সঙ্গে আচরণ বা ব্যবহার করতে বলেছেন।^{২১}

প্রথমত: জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানী হিসেবেই জানেন। আর উনারা প্রকৃতই জ্ঞানী। তিনি তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন।

দ্বিতীয়ত: জ্ঞানী ব্যক্তি নিজেকে জ্ঞানী হিসেবে অনুভব করেন না, উনারা অসচেতন। তিনি তাঁদেরকে সচেতন করতে বলেছেন।

তৃতীয়ত: অশিক্ষিত ব্যক্তি নিজেকে অশিক্ষিত হিসেবেই জানেন তাকে শিক্ষা গ্রহণ করতে বলেছেন।

চতুর্থত: অশিক্ষিত ব্যক্তি নিজেকে শিক্ষিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে জানেন। এটি বেকুবের কাজ। এদের থেকে দূরে থাকতে সাবধান করেছেন।^{১০}

আল-খালীল তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় আর্থিক অনটনের মধ্যে অতিবাহিত করেন। বর্ণিত আছে, আহওয়াযের গভর্ণর সোলায়মান ইবন আলী অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে স্বীয় পুত্রকে শিক্ষাদানের জন্য আল-খালীলকে তলব করেছিলেন। ‘আল-খালীল সোলায়মানের দূতকে আপ্যায়নের জন্য একটি মাত্র শুকনো রুটি দিয়ে বলেছিলেন, ‘নি, আমার কাছে এছাড়া আর কিছুই নেই। তবে যতক্ষণ আমার এই শুকনো রুটি জুটতে থাকবে, ততক্ষণ আমি সোলায়মানের মুখাপেক্ষী হতে চাইনে।’ আল-খালীলের আর্থিক অনটন ও সরলতার বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁরই ছাত্র নাদির ইবন শুমাইল বলেন, ‘আল-খালীল বসরার একটি কুঁড়েঘরে দিন কাটাতেন এবং সাথে যা থাকতেন তা দিয়ে আহা করতেন।’^{১১}

তাঁর ইত্তিকাল সম্পর্কে জানা যায়, তাঁর একজন দাসী এক দোকানীর নিকটে জটিল এক হিসাবে আটকে যায়। এটির সঠিক সমাধান করতে না পারলে দাসী ঠেকে যায়। তিনি সে বিষয় নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হন। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। চিন্তিত অবস্থায় অন্যমনস্ক হয়ে মসজিদের স্তম্ভের সাথে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পরে যান এমতাবস্থায় তিনি ইত্তিকাল করেন। অধিকাংশের মতে, তিনি ৭৮৬ অথবা ৭৯১ সালে মৃত্যুবরণ করেন।^{১২}

খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীর সাহিত্য প্রতিভা

জ্ঞানের এই মহান সাধক আল-খালীল আজীবন জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের নতুন নতুন সূত্র উদ্ভাবন করেছেন, নানা বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ছাত্রদের মাঝে অকাতরে জ্ঞান বিতরণ করেছেন। তাঁর জ্ঞান সাধনার প্রধান ক্ষেত্র তিনটি: আরবী ব্যাকরণ, আরবী কবিতায় ছন্দ ও আরবী অভিধান। তিনি স্বল্পসংখ্যক কবিতাও রচনা করেছেন। তাছাড়া সঙ্গীতের সুর, তাল ও লয় সম্পর্কে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। আল-খালীলের গ্রন্থ-তালিকায় ইবনুন নাদীম স্বরলিপির বই ‘কিতাবুন নাগাম’ এবং তাল ও লয় সম্পর্কিত বই ‘কিতাবুল ঙ্কা’-র কথা উল্লেখ করেছেন। তবে ব্যাকরণ, ছন্দশাস্ত্র ও অভিধান-এই তিনটিই হচ্ছে আল-খালীলের প্রতিভা বিকাশের প্রধান ক্ষেত্র। ক্ষেত্র তিনটিতে আল-খালীলের যথার্থ ভূমিকা ও অবদান মূল্যায়ন করলে তাঁকে আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনকারী, আরবী ছন্দশাস্ত্রের গোড়াপত্তনকারী এবং প্রথম পূর্ণাঙ্গ আরবী অভিধানরচয়িতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।^{১৩}

আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রে অবদান

আরবী ব্যাকরণের প্রথম প্রবর্তক আবুল আস্‌ওয়াদ আদ-দুআলী। খালীল ইবন আহমাদ-এর পূর্বেই কিছু ব্যাকরণবিদ আরবী ব্যাকরণের অনেক নিয়মাবলি উদ্ভাবন করেছিলেন। তার মধ্যে ‘ঈসা ইব ‘উমার আছ-ছাকফী, হারুন ইবন মুসা অন্যতম। তবে আল-খালীল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণের গ্রন্থ রচনা করেন আল খালীলের ছাত্র সীবাওয়াইহ।^{১৪}

খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদী একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাকরণবিদ এবং যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। নগরীর পাঠদানের গৃহসহ তাঁর বাসস্থানে সর্বদায় জ্ঞান পিপাসুদের সমাগম হতো। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সীবাওয়াইহ। তিনি আরবী ব্যাকরণে আল-খালীলের নিকট হতে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং এই শাস্ত্রে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করেন। সীবাওয়াইহ রচিত ‘কিতাব ফিন-নাহ্’ নামক ব্যাকরণ গ্রন্থটি ‘আল-কিতাব’ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আল ফাখরী আন-নাজিদীর বর্ণনায়, সীবাওয়াইহ তাঁর উক্ত কিতাবে মোট ৮৫৮ স্থানে অন্যান্য পণ্ডিতদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। তাঁর মধ্যে ৫২২ স্থানেই আল-ফারাহীদীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। ফলে উক্ত কিতাবটি সীবাওয়াইহ লিপিবদ্ধ করলেও মূল রচনায় খালীল ইবন আহমাদ বলতে বাধা নাই। এটি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ কিতাবই নয় বরং যুগে যুগে অন্যান্য আরবী ব্যাকরণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিসেবে প্রসিদ্ধ। আজও তাঁর অবস্থানের বা সমমানের কিতাব পাওয়া যায় না।^{১৮}

ছন্দ শাস্ত্রে অবদান

খালীল ইবন আহমাদ আল-ফারাহীদীকে ছন্দ বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। খালীলের পূর্বে কেউই ছন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণে আত্মনিয়োগ করেননি। খালীল ইবন আহমাদই প্রথম ব্যক্তি, যিনি প্রচলিত সকল ছন্দের গঠন-প্রণালী নির্ণয়সহ যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় বিন্যস্ত করেন। প্রতিটি ছন্দের পৃথক পৃথক নামকরণ করেন এবং ছন্দ প্রকরণের সূত্র ও নিয়মাবলী একত্র করে পৃথক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ‘আল-আরুদ নামে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন। এই শাস্ত্রে আল-খালীল রচিত গ্রন্থের নাম ‘কিতাবুল আরুদ’। গ্রন্থটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এই শাস্ত্রে তাঁর ব্যবহৃত প্রায় সকল পরিভাষা আজও অপরিবর্তিত রয়েছে। ছন্দশাস্ত্রে আল-খালীলের আগ্রহ সৃষ্টির কারণটি আকস্মিক ছিল। একবার বসরার বাজারে তামার হাড়ি-পাতিল বানানোর দোকানে তিনি হাতুড়ির ঠুং ঠাং শব্দ শুনতে পান। বিভিন্ন তালের শব্দবাংকারে তিনি কবিতার ছন্দের এক চমৎকার মিল লক্ষ্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন, আরবী কবিতার সকল প্রচলিত ছন্দ নির্ণয় করে তাদের গঠনপ্রণালী ও আভ্যন্তরীণ নীতিমালা নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত করবেন। শুরু হয় নিরলস প্রচেষ্টা আর ঐকান্তিক সাধনা। ঘন্টার পর ঘন্টা নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসে তিনি কবিতা আওড়াতে আর ছন্দের তালে তালে অঙ্গুলি নাড়াতে।^{১৯} একবার তার পুত্র তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলেছিল, ‘বাবা পাগল হয়ে গিয়েছেন।’ পুত্রের এহেন জবাবে আল-খালীল ‘কামিল’ ছন্দের দুই লাইন কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন,

لو كنتَ تعلم ما أقول عذرتني * أو كنتَ تعلم ما أقول عذرتك

لكن جهلتَ مقالتي فعذرتني * وعلمتَ أنك جاهل فعذرتك^{২০}

[তুমি যদি জানতে, আমি কি বলছি, তাহলে আমায় দোষ দিতে না। তবে যদি বুঝতে, তুমি কি বলছ, তাহলে আমি তোমাকে তিরস্কার করতাম। কিন্তু আমার কথা না বুঝেই তুমি আমাকে তিরস্কার করছ। আর আমিও জেনেছি, তুমি একটি মূর্খ। তাই তোমায় দোষ দিলাম না।]

আল-খালীল আরুদ শাস্ত্রের শুধু গোড়াপত্তনই করেননি, তিনি একে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেছেন। তাঁর সামগ্রিক উপস্থাপনা এবং সার্থক বিন্যাস এতই জনপ্রিয় এবং সর্বজন স্বীকৃত হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে কোন কবি আল-খালীল প্রদর্শিত ছন্দ সীমার বাইরে কবিতা রচনার ঝুঁকি নেননি।

অভিধান শাস্ত্রে অবদান

আল-খালীল অভিধান শাস্ত্রের একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম আরবী ভাষার পূর্ণাঙ্গ অভিধান সংকলন করেন। তাঁর রচিত ‘কিতাবুল আইন’ আরবী ভাষার প্রথম সংকলিত অভিধান। তাঁর পূর্বে

বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অভিধান সংকলন করা হলেও সেগুলো ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি, শাব্দিক তালিকা সংকলিত এবং সংক্ষিপ্ত। যেগুলোকে কেউ সার্বজনীন বলে স্বীকৃতি দেয়নি। এসব খণ্ডপুস্তক সম্পর্কে আল-খালীল নিজেও অবহিত ছিলেন। তবে সেগুলো নিতান্তই সীমিত উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে প্রণীত। সার্বিকভাবে আরবী ভাষার শব্দাবলীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয়লাভ এসব পুস্তক দ্বারা একবারেই অসম্ভব ছিল। তিনি তাই একটি কার্যকর ও সুশৃঙ্খল পূর্ণাঙ্গ অভিধান রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ‘কিতাবুল ‘আইন’ তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার সার্থক ফসল। অভিধান শাস্ত্রে এটি তাঁর অসামান্য অবদান। এটি আজও আরবী ভাষায় অমর হয়ে আছে।^{২১}

কিতাবুল আইন আরবী ভাষা ও সাহিত্যে একটি অনন্য গ্রন্থ। এটি আরবী ভাষায় বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিধান। তবে আরবী বর্ণমালার হরফগুলো যে ধারাবাহিকতায় প্রচলিত, তিনি কিতাবুল ‘আইনে তা অনুসরণ করেননি। তিনি বর্ণের উচ্চারণস্থল ভিত্তিক স্ব-উদ্ভাবিত এক নতুন বর্ণক্রম অবলম্বন করেছেন। নিরেট (সহীহ) বর্ণসমূহের মধ্যে প্রথমে কঠ, তারপর জিহ্বা, তারপর দন্ত এবং সবশেষে ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হরফগুলো সাজিয়েছেন। পরিবর্তনশীল (মু‘তাল) বর্ণসমূহের স্থান রেখেছেন সবশেষে। কিতাবুল ‘আইনে ব্যবহৃত ২৯টি (২৫টি নিরেট ও ৪টি পরিবর্তনশীল) হরফের বিন্যাসক্রম এইরূপ,

ع، ح، ه، غ، خ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، ز، ط، ت، د، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، ا، و، ي، ء
বর্ণমালার এই ক্রম অনুযায়ী আল-খালীল তাঁর অভিধানকে মোট ২৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। ‘আইন’ থেকে ‘মীম’ পর্যন্ত ২৫টি নিরেট বর্ণের প্রত্যেকটি দ্বারা একটি করে অধ্যায় এবং সবশেষে ৪টি পরিবর্তনশীল বর্ণ দিয়ে অপর একটি অধ্যায় রচনা করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট বর্ণের নামে প্রতিটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন। প্রথম অধ্যায়টির নাম ‘কিতাবুল ‘আইন’ হওয়াতে পরবর্তীকালে গ্রন্থটি ঐ নামে পরিচিত হয়ে যায়।^{২২}

এটি রচনা করতে তাকে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করে এটি বিশ্লেষণে আনার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী সময়ে খুরাসানে অবস্থানকালে আল-খালীল তাঁর ছাত্র আল-লাইছ ইবনুল মুযাফফারের সহায়তায় কিতাবুল ‘আইনের রচনা সম্পন্ন করেন। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি খোরাসানের শাসক তাহিরীয়দের গ্রন্থাগারে থেকে যায়। আল-খালীলের মৃত্যুর (১৭৫ হি.) অনেক পরে ২৪৮ হিজরীতে জনৈক পুস্তক-ব্যবসায়ী কিতাবুল ‘আইনের পাণ্ডুলিপি সেখান থেকে বসরায় নিয়ে আসেন। এতকাল পর আত্মপ্রকাশ করায় বসরার পণ্ডিত মহলে গ্রন্থটির যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অনেকে আল-খালীলের রচনা বলে একে মানতে চাইলেন না। যাই হোক, আল-খালীলের নামেই কিতাবুল ‘আইনের সেই পাণ্ডুলিপি চালু হয়ে গেল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই গ্রন্থের একচেটিয়া প্রভাব বজায় থাকে। ইতিমধ্যে এই পাণ্ডুলিপির অনেক কপি তৈরী হয়ে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে যায়। এরপর খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ কিতাবুল ‘আইনের পাণ্ডুলিপির সন্ধান ছিল। তারপর প্রায় পাঁচশত বছর এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। এ সময়ে গ্রন্থটির কোন কোন খণ্ডিত অংশ এবং অন্যান্য গ্রন্থকারদের বিভিন্ন রচনায় এর অসংখ্য উদ্ধৃতি কিতাবুল ‘আইনের অস্তিত্ব আংশিকভাবে টিকিয়ে রেখেছিল। তবে দীর্ঘ বিরতির পর বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে আবার কিতাবুল ‘আইনের পাণ্ডুলিপির সন্ধান মিলতে থাকে।^{২৩}

তবে আল-খালীলের পরবর্তী গ্রন্থকারদের বিভিন্ন রচনায় উদ্ধৃতিস্বরূপ কিতাবুল ‘আইনের একটি বিরাট অংশ সবসময়ই অক্ষত ছিল। উদাহরণস্বরূপ সীবাওয়াইহের ‘আল-কিতাব’, আবু ‘আলী আল-কালীর ‘আল-বারি’, আস-সুয়ুতীর ‘আল-মুযাহির’ ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করা যায়। তাছাড়া স্পেনীয় অভিধান-প্রণেতা আবু বাকর মুহাম্মাদ আয-যুবাইদী (মৃ. ৩৭৯/৯৮৯) কিতাবুল ‘আইনের যে সংক্ষেপিত সংস্করণ ‘মুখতাসার কিতাবিল ‘আইন’ তৈরী করেছেন, তাঁর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান।^{২৪}

আরবী অভিধান জগতের পথিকৃৎ হওয়া সত্ত্বেও কিতাবুল আইনের বিরুদ্ধে কিন্তু কিছু ভুল-ত্রুটির অভিযোগ রয়েছে। এসব ভুলের মধ্যে আছে বানান-বিভ্রাট, শব্দমূল নির্ণয়-সংক্রান্ত ভুল, অশ্রুতপূর্ব অর্থে শব্দের

ব্যবহার, ভাষার মূলনীতি বিষয়ক ভুল তথ্য পরিবেশন ইত্যাদি। ‘আত-তাসহীফ ওয়াত তাহরীফ’ গ্রন্থে আল-হাসান ইবন ‘আবদিল্লাহ আল-আসকারী (২৯৩-৩৮২ হি.) কতিপয় ভুলের উল্লেখ করেছেন। আল-ফীরোযাবাদী, আস-সুয়ুতী প্রমুখ অভিধানশাস্ত্রবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানী উল্লিখিত ভুল-ত্রুটির ক্ষেত্রে আল-খালীলের পক্ষে ওকালতি করে কিতাবুল-‘আইনের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছেন। আমাদের মতে, কিছু কিছু ভুলত্রুটি থাকলেও খালীল ইবন আহমাদের গ্রন্থ ‘কিতাবুল ‘আইন’ নিঃসন্দেহে একটি কালজয়ী সার্থক অভিধান।^{২৫}

খালীল ইবন আহমাদের ‘কিতাবুল ‘আইন’ শুধু আরবী ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিধানই নয়, গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে শতাব্দীর সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী রচনাও বটে। এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ও প্রভাব এতই প্রবল ছিল যে, পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্য কোন গ্রন্থ রচনায় কেউই ব্রতী হননি। শুধু তাই নয়, তৎপরবর্তীকালে রচিত প্রখ্যাত অভিধানগুলোরও প্রায় প্রত্যেকটিতে কিতাবুল ‘আইনের প্রভাব বেশ সুস্পষ্ট। এসব অভিধানের মধ্যে আল-আযহারীর (২৮৩-৩৭০ হি.) ‘কিতাবুত তাহযীব’, ইবনে দুরাইদের (২২৩-৩২১ হি.) ‘আল-জামহার’, আবু ‘আলী আল-কালীর (২৮৮-৩৫৬ হি.) ‘আল-বারি’, ইবনে সীদার (৩৯৮-৪৫৮ হি.) ‘আল-মুহকাম’ ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।^{২৬}

আরবী কাব্য ও সংস্কৃতিকে আরব ছন্দ ও সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করণ

ইসলাম পূর্ব আরব কবিদের শ্রুতি কাব্যচর্চার প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল ছন্দ ও অন্ত্যমিল। বেদুইন সংস্কৃতি ও চিন্তার অসারতা কাব্য চর্চায় ছন্দ ও অন্ত্যমিল এ দুটি উপাদানের উৎকর্ষতা অর্জনে সাহায্য করেছে। যখন পৃথিবীব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রসার এবং অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে আরব সংস্কৃতির একটা সংমিশ্রণ হচ্ছিল তখন আল খালীল ইবন আহমাদ আল ফারাহিদী এ নিয়ে গবেষণা অনুসন্ধান করেন। তিনি সঙ্গীত ও কবিতার বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। কারণ, তখন আরব সংস্কৃতিকে আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা দরকার হয়ে পড়ে। পৃথিবীর অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে আরব সংস্কৃতির নিজস্ব ভিন্নতা ও উৎস জানারও প্রয়োজন হয়। সে ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্ব ছন্দ ও অন্ত্যমিল সমৃদ্ধ শ্রুতি কাব্যচর্চার রীতিনীতি সবার আগে চলে আসে। আরবদের কাব্য প্রতিভা ছিল অসাধারণ বটে, কিন্তু ব্যাকরণগত কোনো নিয়মাবলী তারা মানত না। তবে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় শ্রুতিরীতি ও লিখিত রীতির বৈশিষ্ট্যে তেমন একটা পার্থক্য ধরা পড়েনি বরং পরবর্তী সময়ের লেখ্যরীতিকে শ্রুতি রীতির একপ্রকার দুর্বল অনুকরণই মনে করেছেন তিনি। আল ফারাহীদী জাহিলী যুগের কাব্যচর্চার মান নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। তিনি উল্লেখ করেন, আরবদের পরিচয়কে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে ওই সময়ের কবিতা একটি শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। এ কথা সবাই স্বীকার করে নেয় এবং কারও পক্ষেই অস্বীকারের সামান্য সুযোগ নেই। এমনকি যদি কেউ এ সত্যটি এড়াতে চায়, তবে সে আরবদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করবে।^{২৭}

তিনি ওই সময়ের কবিতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, প্রাচীন আরবদের কবিতা পরবর্তী সময়ের কবিদের জন্য একটি অনুকরণীয় কাঠামো। এটি অন্যান্য ভাষার কবিতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। প্রাচীন আরবরা তাদের কবিতা রচনা করত একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র কল্পনা করে। কখনো কখনো এই চরিত্রগুলোয় থাকত ধর্মীয় হিতোপদেশ বা সমাজের বিভিন্ন বাস্তবতার দৃশ্য। আল ফারাহীদী শ্রুতি কাব্যচর্চাকে সর্বপ্রথম তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন, যদিও তিনি ছন্দ নিয়ে বেশি কাজ করেছেন।^{২৮}

আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অবদান

- (১) **كتاب العين في اللغة** - এই কিতাবটি আল-খালীলের বিখ্যাত অভিধান। যেটির পূর্বে এমন কিতাব কেহ রচনা করেননি। শব্দের গঠন, পরিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া শব্দ ও বর্ণের উৎস, উচ্চারণ প্রণালী উল্লেখ করা হয়েছে এটি এখনো কালজয়ী অভিধান হিসেবে বিবেচিত।
- (২) **كتاب "فائت العين"** - এই কিতাবটি কিতাবুল আইনের অসমাপ্ত অংশের বাকি অংশ।
- (৩) **كتاب النقط والمصاحف** - উক্ত কিতাবে তিনি অক্ষরগুলোর চিত্র বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।
- (৪) **كتاب النغم** - এই কিতাবটি তিনি সঙ্গীত সম্পর্কে রচনা করেছেন। এখানে সঙ্গীতের তাল, লয় ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। এ কিতাবটির সহায়ক হিসেবে তিনি আরও কয়েকটি কিতাব রচনা করেছেন।
- (৫) **كتاب الجمل** - এই কিতাবটি আরবী ব্যাকরণে বাক্যের ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কিত কিতাব বই।
- (৬) **كتاب الشواهد** - এই কিতাবটি আরব বেদুঈনদের থেকে নেওয়া পাণ্ডুলিপির একমাত্র সংস্করণ।
- (৭) **كتاب العروض** - কবিতার গঠন, ওজন ও ছন্দমিলের নিয়ম সম্পর্কিত কিতাব।
- (৮) **كتاب العوامل** - এলমুন নাহ বা আরবী শব্দের নিয়মনীতি সম্পর্কিত কিতাব।
- (৯) **كتاب تصريف الأفعال ، ومعنى الحروف** - এই কিতাবটিতে আরবী বাক্যে ক্রিয়ার পরিবর্তন ও অক্ষর বা বর্ণের সাংকেতিক চিহ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- (১০) **كتاب النقط والشكل وغيرها** - এই কিতাবটিতে বাক্যের অন্যান্য চিহ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।^{২৯}

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, আল-ফারাহীদী জ্ঞান জগতের একজন মহাপুরুষ। যিনি তাঁর তপস্বী মনোভাব, ধর্মীয় স্বভাব চরিত্র, এবং গভীর মনোযোগের সাথে নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। এমন অনেক শাস্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যার কোন নমুনাও পূর্বে ছিলনা। আর পরবর্তী সময়ে তাঁর থেকে বেশী অবদান রেখে যাওয়া ব্যক্তিও উল্লেখযোগ্য নয়। কিতাবুল আইন ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এ কারণে আরবী সাহিত্য প্রেমীদের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহরিসুত*, সম্পা. ড. ইউসুফ 'আলী তাবীল, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪০; ইবনুল 'ইমাদ আল হানবালী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৪৪২; ইবন কাছীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৩ খণ্ড (বৈরুত: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৫৬৩-৫৬৫; ইবন মু'তাজ, *তাবাকাতুশ শ'আরা* (বৈরুত: দারুল মাকতাবাতিল হিলাল, তা.বি.), পৃ. ৪৮৬।
- ^২ ড. আব্দুল মাজিদ মোহাম্মদ খলিফা, *আল খলীল বিন আহমাদ আল-ফারাহীদী আল-আযদী, শে'রুহ ওয়াজুদুহ ফি খিদমাতিল আরাবীহা* (সৌদিআরব: জামিয়া উম্মুল কুরআ), পৃ. ২।
- ^৩ ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৯।

- ^৪ ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহরিসত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২।
- ^৫ ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড (মিসর: মাকতাবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৩৫৩ হি.), পৃ. ২৪৮; আব্দুল বাকী আল-ইয়ামানী, *ইশারাতুত আত-তায়াহিয়্যিন ফী তারাজ্জিমিন নুহাত ওয়াল-লাগবীন* (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ. ১১৪।
- ^৬ ইবনুন নাদীম, *আল-ফিহরিসত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩; আবু সাইদ সিরাকী, *আসবারুন নাহবীয়্যিন আল-বুসরীয়্যিন* (মিসর: দারুল এহতেসাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি.), পৃ. ১৪২।
- ^৭ আবু 'আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল হামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১১ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৭৪।
- ^৮ ইবনুন-নাদীম, *আল-ফিহরিসত*, পৃ. ৬৩; ড. রাহাব খাদিও আকাবী, *মাওসুয়াতী আবাকেরাতুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৯।
- ^৯ আবু 'আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল হামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১১ খণ্ড, পৃ. ৭৪; জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল মাকতাবাতিল হায়াত, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ৪২৭-৪২৮; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ১০।
- ^{১০} আবু 'আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল হামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১১ খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩।
- ^{১১} আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: দারুল মা'আরিফাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩৭২; আবু আত-তাইয়্যিব আল-লাগবী, *মুরাতিবুন নাহবীয়্যিন*, পৃ. ৫৬।
- ^{১২} আবু 'আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল হামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১১ খণ্ড, পৃ. ১৮২-১৮৩।
- ^{১৩} ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ১০; আবু 'আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল হামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১১ খণ্ড, পৃ. ৭৪।
- ^{১৪} ইবন কাছীর, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৫৬৫।
- ^{১৫} ইবন আনবারী, *ফী তাবাকাতুল উদাবা* (মিসর: দারুল নাহযাহ, তা.বি.), পৃ. ৪৮; আবু 'আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল হামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১১ খণ্ড, ৭৭; জামাল উদ্দীন আল-কিফতী, *ইনবাহর রুওয়াত ওয়া আনবাউন নুহাত*, ১ম খণ্ড (কায়রো: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৩৮১।
- ^{১৬} আলী ফাখরী আন-নাজদী, *সীবওয়াইহ ইমামুন নুহাত* (কায়রো: ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৯৮; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড (ঢাকা: ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫৭০।
- ^{১৭} আলী ফাখরী আল-নাজদী, *সীবওয়াইহ ইমামুন নুহাত* (মিসর: কায়রো, ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৯৮।
- ^{১৮} জামাল উদ্দীন আল-কিফতী, *ইনবাহর রুওয়াত ওয়া আনবাউন নুহাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২।
- ^{১৯} *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭০।
- ^{২০} জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২; ইবনে খাল্লিকান *ওয়াফয়াত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫।
- ^{২১} আব্দুল হামিদ মুহাম্মদ ও শাবান আব্দুল আযীম, *মুহাদারাত ফিল মা'আজিমিল আরাবিয়া*, পৃ. ৪৯-৫০।
- ^{২২} আব্দুল হামিদ মুহাম্মদ ও শা'বান আব্দুল 'আযীম, *মুহাদারাত ফিল মা'আজিমিল 'আরাবিয়াহ* (মিসর: ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৪৯-৫০।
- ^{২৩} জামাল উদ্দীন আল-কিফতী, *ইনবাহর রুওয়াত ওয়া আনবাউন নুহাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৩৮০।
- ^{২৪} ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।
- ^{২৫} *তদেব*।
- ^{২৬} 'আবদুল্লাহ দারবেশ, *আল-মা'আজিমুল 'আরাবিয়াহ* (কায়রো: ১৯৫৩ খ্রি.), পৃ. ৮১।
- ^{২৭} জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *আল-মুযহির*, ১ম খণ্ড, (সম্পা.) মুহাম্মদ আহমাদ জাদুল মাওলা ও অন্যান্য, পৃ. ৭৪।
- ^{২৮} ইবনুল 'ইমাদ আল হানবালী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪২; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আরব মনীষা*, পৃ. ২২।
- ^{২৯} আবু 'আবদুল্লাহ ইয়াকুত আল হামাবী, *মু'জামুল উদাবা*, ১১ খণ্ড, পৃ. ৭৩; ইবন খাল্লিকান, *ওয়াফয়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬; জামাল উদ্দীন আল-কিফতী, *ইনবাহর রুওয়াত ওয়া আনবাউন নুহাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।

শাসক শ্রেণীর সমালোচনায় রচিত মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরীর কবিতায় দর্শন

মো. ওবায়দুল্লাহ*

Abstract: Muhammad Mahdi Al Zawahiri is one of the best Arabic poets of the twentieth century. A poet by nature, he has a distinct identity as a rebel poet. As a patriot, he spoke against the tyrants, oppressors, occupiers and foreign rulers of the country. He wrote poems for the liberation of the people who had fallen under the tyranny of the colonial rulers of war-torn Iraq. After the fall of the Ottoman Empire, Iraq was taken prisoner by the British. The ruling class would attack the people with the slightest deviation. They used to oppress and exploit. In such an environment, al-Zawahiri's poetry awakens the desperate, devastated crowd. The people of the country became revolutionary, protestant and optimistic. As a result, the government became more oppressive. The poet wins the hearts of the deprived, oppressed people by using his poetry as a tool. As a result, Al-Zawahiri's poetic world is filled with patriotism and love of the people. His poems have witnessed the tyranny, injustice and boundless cruelty of the oppressive ruler. Muhammad Mahdi al Zawahiri is the burning proof that a single person's protest can always keep the ruling class busy. This article depicts the philosophy in the poetry of Muhammad Mahdi al-Zawahiri, a critique of the ruling class.

ভূমিকা

আধুনিক আরবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী। এ যুগে আরবী কাব্যে যারা সফলতা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ইতোমধ্যে তিনি শতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আরবী কবির সম্মান লাভ করেছেন।^১ তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক, মানব দরদী ও স্বাধীনচেতা কবি। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন স্বাধীনতার শ্লোগান রয়েছে, অন্যদিকে চিত্রিত হয়েছে সমাজের শোষিত ও বঞ্চিত মানবতার করুণ দশা। সমাজ নিয়ে, দেশের মাটি ও মানুষ নিয়ে, মানুষের স্বভাব ও অক্ষমতা নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা নিয়ে, বিশেষ করে সরকারের অত্যাচার, অন্যায় ও স্বৈচ্ছাচারিতা নিয়ে নিয়মিত সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতেন। অপরদিকে উপনিবেশবাদী ও প্রশাসনের কাছাকাছি থাকা মানুষের দ্বারা শাসিত ভূখণ্ডে প্রায়শই কোনো রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ থাকতে দেওয়া হয়না। এমনই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইরাক। শাসক ছিলো সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের অনুগত। সংঘবদ্ধ কোনো প্রতিবাদী গ্রুপ ছিলনা, ছিলনা স্বীকৃত কোনো রাজনৈতিক দল। সহজেই তারা মানুষকে দমন, পীড়ন ও শোষণ করত। এহেন অবস্থা কবি জাওয়াহিরীকে বেশ পীড়া দিত। তাই তাঁর কবিতার সিংহভাগই শাসকশ্রেণির সমালোচনা, প্রতিবাদ ও জনমানুষের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে রচিত। সাধারণভাবে বর্তমান সমাজের কবিদের জন্ম হয় প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক, অনুভূতি, স্বপ্ন আর বিরহ নিয়ে। তারপর মানব-মানবীর এই সম্পর্ককে ভিত্তি করে সমাজ জীবনে চলে আসে তাঁর কবিতা। পরবর্তীতে নাগরিক ভাবনা, সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি জায়গা করে নেন ধীরে ধীরে। কিন্তু কবি আল-জাওয়াহিরী ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর কাব্যিক জীবন শুরুই হয়েছে দেশের মাটি ও মানুষ নিয়ে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে। তাই তাঁর কাব্য জগত ভরে গেছে দেশমাতৃকা আর জনমানুষের ভালোবাসা দিয়ে।^২ তিনি কোনো দলের অনুসারী না হয়েও সফল রাজনীতিক, আধুনিক আরবের শ্রেষ্ঠ কবি ও সমাজ বিপ্লবী, সর্বস্তরের মানুষের ভালোবাসার মানুষ। কবিতাকে জীবনসঙ্গী করে কবি মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী শাসকশ্রেণির সমালোচনায় যে কাব্যিক দর্শন পেশ করেছেন, সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তা উপস্থাপন করা হল।

* এম. ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরীর সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচরমা

মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী আধুনিক ইরাকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক। তিনি ১৯০০^০ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুলাই সাহিত্য-সংস্কৃতির লীলাভূমি ইরাকের প্রসিদ্ধ শিয়া নগরী নাজাফে জন্মগ্রহণ করেন।^৪ কেউ বলেন, তাঁর জন্ম ২৬ জুলাই ১৮৯৯^৫ খ্রিষ্টাব্দে। আবার কারো মতে, ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তিনি সম্ভ্রান্ত এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে^৬ জন্ম গ্রহণ করেন। আল-জাওয়াহিরী তাঁর পারিবারিক উপাধী।^৭ তাঁর জনৈক পূর্বপুরুষ শায়খ মুহাম্মাদ হাসান আল-জাওয়াহিরীর নামেই এ উপাধি ব্যবহার করেন।^৮ শায়খ মুহাম্মাদ হাসান ফিকহ বিষয়ে একটি কিতাব লেখেন। যার নাম দেন “জাওয়াহিরীল কালাম ফী শরহি শারাইয়িল ইসলাম”^৯ “جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام” এ কিতাবটি শিয়া সম্প্রদায়ের ফিকহের কিতাব হিসেবে বেশ সমাদৃত হয়। সেই থেকে শায়খ মুহাম্মাদ হাসানের নামের লকব হিসেবে আল-জাওয়াহিরী যুক্ত হয়। তাঁর বংশের পরিচিতিতে আল-জাওয়াহিরী উপাধী প্রতিষ্ঠা পায়।^{১০} শৈশবকাল থেকেই কবি মাহদী আল জাওয়াহিরী কবিতা লিখতেন। নাজাফের কাব্যের আসরগুলি তাঁর সুপ্ত প্রতিভাকে তাড়িত করত। তিনি স্বাচ্ছন্দে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের কথাগুলো কাব্যে প্রকাশ করতেন। ইরাক ও আরবের বিভিন্ন সাময়িকীতে তাঁর লেখা কবিতা ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। অল্প বয়সেই তিনি দেশের বিশিষ্ট কবিদের সারিতে জায়গা করে নেন।^{১১} পরিণত ও প্রথিতযশা মহান কবিদের পাশে ২২/২৩ বছরের যুবক কবি আল-জাওয়াহিরীর অবস্থান সত্যিই চমকে দেওয়ার মত বিষয়। ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম খাওয়াতিরুশ শি’রি ফীল হুববি ওয়াল ওয়াতানি ওয়ার রবী’রী (خواطر الشعر في الحب والوطن والربيع)^{১২} নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এর সাথে আরো কিছু কবিতা যোগ করে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে দীওয়ানু মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরী (ديوان محمد مهدي الجواهري) নামে প্রকাশ করেন।

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত জারবীনি (جربيني) কবিতার^{১৩} ব্যাপারে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপত্তি করা হয়। এরপর আল-ফুরাত (الفرات) পত্রিকায় তাঁর ২০টি কবিতা ছাপা হয়। এতে করে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে কবি বেশ মর্মান্বিত হন।^{১৪} এ সময় আমির ফয়সাল ইবন ‘আব্দুল ‘আজীয আল সউদ ইরাক সফরে আসেন। তাঁর প্রশংসায় কবি একটি কবিতা রচনা করেন। এতে বাদশা ফয়সাল প্রভাবিত হন এবং মক্কা থেকে প্রকাশিত সৌদি জার্নালে তা প্রকাশ করা হয়।^{১৫}

১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ দীওয়ানুল জাওয়াহিরী (ديوان الجواهري) নামে প্রকাশিত হয়।^{১৬} ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে ইনকিলাব পত্রিকায় বাকর সিদকির নেতৃত্বে সেনাবিদ্রোহ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হয়। কিন্তু এরই মধ্যে পত্রিকায় তথ্য অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় শোষণ নীতির বিরুদ্ধে সেনা বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে চলেছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তখন শুরু হলো সরকারের দমননীতি। এর ফলশ্রুতিতে প্রশাসন পত্রিকা বন্ধ করে কবিকে তিন মাসের কারাদণ্ড দিলেন।^{১৭} কবির ইনকিলাব পত্রিকা ‘আররাই আলআম’ নামধারণ করেও টিকতে পারেনি। রাষ্ট্রনীতির ধারাবাহিক সমালোচনা লেখার কারণে বন্ধ হয়েছে বারবার।^{১৮} কবি জাতির স্বার্থে ভিন্ন নামে অনেকগুলো পত্রিকা ব্যবহার করতেন। তাছাড়া আরো যেসব পত্রিকার মাধ্যমে প্রতিবাদ করতেন তাদের মধ্যে আল ওয়াকতু, আল-বাগদাদীয়া, আল উসুর, আস-সিয়াব, আল-জিহাদ, আদ-দস্তুর উল্লেখযোগ্য।

১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে আবুল ‘আলা আল মা‘আররী বার্ষিক স্মরণসভায় ইরাকের প্রতিনিধি হিসেবে কবি আল জাওয়াহিরী দামেস্কে পৌঁছান এবং তাঁর লিখিত কবিতা (ابو العلاء المعري) উপস্থাপন করেন। কবিতাটি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ‘আররাই আল‘আম’ (الراي العام) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।^{১৯} কবি তাঁর লিখিত কবিতাগুলো সংযোজন করে প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থাকারে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।^{২০}

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে ইরাকের উপর অটোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব বলতে আর কিছু থাকেনা। কিন্তু ইরাক আবার অধীন হয়ে যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের। সরাসরি দখলে না নিয়ে হেজাজে প্রতিষ্ঠিত রাজপরিবারের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার ১৯২১ থেকে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরাক নিয়ন্ত্রণ করে। তারা ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট হাশেমী রাজবংশের ফয়সাল ইবন হুসাইন ইবন ‘আলীকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে ইরাকের রাজা হিসেবে নিয়োগ করে। আর বিদেশী সমর্থনপুষ্ট কারো কর্তৃত্ব ও নজরদারী জনসাধারণ মেনে নেবেনা এটাই স্বাভাবিক। তাই নিয়োগপ্রাপ্ত বিদেশী শাসকেরা প্রজা-সাধারণের উপর বরাবরই দমননীতি চালিয়েছেন। তাই রাজা ফয়সাল-১, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষমতায় এসেই প্রজা-সাধারণের উপর জুলুম নির্যাতন শুরু করেন। আর যারা তাঁর জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায় বা সমালোচনা করে তাদের প্রতি চলে বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা। এমতাবস্থায় কবি আল-জাওয়াহিরী প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। আর জাগিয়ে তোলেন জাতির যুবকদের তার লেখা ثورة العراق (ইরাক বিপ্লব) কবিতা দ্বারা। সেখানে বাক স্বাধীনতা হরণের বিষয় ফুটে উঠেছে। যেমন কবি বলেন-

لا عاش شعب اهله * لسانهم مقيد^{২১}

[জনগণ এভাবে বেঁচে থাকতে পারেনা, যাদের বাক-স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই।]

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মত সরকারের সমালোচনা

কবি আল-জাওয়াহিরী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মত সরকারের কড়া সমালোচক ছিলেন। দেশ ও জাতির দুরাবস্থায় তিনি ক্ষুদ্ধ হতেন এবং প্রতিবাদ করতেন। প্রজা-সাধারণের প্রতি সরকারের বাড়াবাড়ি আর স্বৈচ্ছাচারিতা দেখে কবি চূপ থাকতে পারেননি। তিনি সরকারকে অত্যাচারী আখ্যা দিয়ে বলেন, তারা নাগরিক সাধারণকে বধিত করে নিজেরা ভোগ বিলাসিতায় ডুবে আছে। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে শহিদ আদনান মালিকি স্মরণে লিখিত ذكرى المالكى কবিতা স্মরণ করেন। কবি বলেন-

من كل فرعون بها * من تحتها الانهار^{২০}

[প্রত্যেক ফেরাউনের (জালিম সরকার) বিলাসিতার নমুনা হল, তাদের প্রাসাদের তলদেশে ঝরণা প্রবাহিত।]

কবি আল জাওয়াহিরী ইরাকের অত্যাচারী সরকারের দুঃশাসনে বড়ই মর্মান্বিত হতেন। সরকারের প্রতি তাঁর সমালোচনা কখনো নিয়ম রক্ষার ছিলনা। তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ করতেন। শাসকদের সম্বোধন করে কবি বলেন, তোমাদের স্বৈচ্ছাচারিতা এমন যে, জনগণকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করছো। যখন যাকে খুশী কাছে টেনে নিবে আবার সুযোগ শেষে দূরে ঠেলে দিবে এটা হওয়া উচিত নয়। তোমরা তাদেরকে দাসের মতো ব্যবহার করছো। তিনি ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ অক্টোবর আল-জিহাদ পত্রিকার ১৩৩ তম সংখ্যায় ماتشؤون কবিতা উল্লেখ করেন। কবি বলেন-

ماتشؤون فاصنوها * فرصة لا تضيع

فرصة ان تحكموا * وتحطوا وترفعوا

وتدلو على الرقاب * وتعطوا وتمنعوا

قد خلقتم لتحصدوا * وعبيدا ليزرعوا^{২১}

[তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, সুযোগ নষ্ট করোনা। সুযোগ পেয়েছো, শাসন করছো, (তোমাদের স্বার্থে কাউকে উপরে তুলছো, আবার কাউকে নিচে নামাচ্ছে। (জনগণের) ঘাড়ের চেপে বসেছো, (মনে চাইলে) কাউকে দান করছো, আবার কাউকে বধিত করছো। যেন তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে ফসল (মানুষ) নষ্ট করার জন্য। জনগণ শুধুই দাস, তারা সৃষ্টি হয়েছে (তোমাদের বিলাসিতার) ফসল ফলানোর জন্য।]

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে লিখিত انينا কবিতায়^{২২} কবি আল জাওয়াহিরী দেশ ও জনতাকে নিয়ে মনের অস্থিরতা প্রকাশ করেন। তিনি শেকল ভেঙ্গে মুক্তি পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়ে, অসহ্য যন্ত্রণা জয় করে উদ্দেশ্যে পানে ছুটে চলার দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তাছাড়া অসহায়ত্বের দীর্ঘসূত্রিতার অবসান ঘটিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে কবি ব্যকুলতা প্রকাশ করেন।

এটা ছিল মৃত প্রায় জীবনের ক্ষোভের পরিণতি। অধিকার বধিত শোষিত জনসাধারণের ভয়কে জয় করার প্রত্যয়ে বিক্ষোভনোমুখ হয়ে অপেক্ষা করছে। যদি এই সংকটাপন্ন ও স্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে কোনো পথ খুঁজে পাওয়া যায়। এমন আবেগের প্রকাশ ঘটেছে এই (انينا) কবিতায়। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির

জন্য, মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য, দেশের মাটি ও মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য, জন্মভূমিকে সাম্রাজ্যবাদীদের গোলামী থেকে মুক্তির জন্য তিনি নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। ফলে জেল-জুলুম আর যন্ত্রণার মাঝেও কবি আল জাওয়াহিরী ভালোলাগা অনুভব করেন। কবি বলেন-

انى وجدت "أنيت" لاح يهزنى * طيف لوجهك رائع القسمات^{৩৩}

[হে আমার মাতৃভূমি "অনিত", আমি যখন তোমার উজ্জ্বল চেহারা কল্পনা করি, তখন আমি আশাবাদী হই।]

অতঃপর শাসকশ্রেণির অত্যাচার, অনাচার আর জনতার গোলামী জীবনের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন-

حسبى وحسبك شقوة ! وعبادة ! * أن ليس تفرغ منك كأس ! حياتى^{৩৪}

[(হায় আমার জন্মভূমি) এই গোলামী আর নরক যন্ত্রণা কি আমাদের (নেতার) পরিণতি! মৃত্যু পেয়ালা (যন্ত্রণা) কি আমাদের থেকে দূর হবে না। (অবশ্যই দূর হবে) আমরা (আবার স্বাভাবিক) জীবন ফিরে পাব।]

শাসক বর্গকে জাতির শত্রু আখ্যায়িত করা

শাসকশ্রেণির উপর্যুপরি শোষণ-নির্যাতনের ফলে প্রজা-সাধারণ আজ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। তারা এমন জড়াগ্রস্ত ও নির্বাক প্রাণীতে পরিণত হয়েছে যে, মৃত্যু কামনা তাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে হতাশ, বিপর্যস্ত, অলস ও ঘুমন্ত নাগরিক অত্যাচারী শাসকের টিকে থাকার সহায়ক শক্তি। ফলে শাসকবর্গ হয়ে ওঠে আরো স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী। ক্ষমতার লোভ তাদের অন্ধ করে ফেলে। এর ফলে তারা নীতিহীন, আদর্শহীন এবং সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাসে পরিণত হয়। বিদেশী প্রভুদের খুশি করতে দেশের সম্পদ ধ্বংস করে। সরকারের অত্যাচারের নমুনা পেশ করতে গিয়ে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত تنويمه الجياع কবিতা। কবি বলেন-

نامى جياع الشعب نامى * حرسك الهة الطعام

نامى جياع لشعب نامى * النوم من نعم السلام^{৩৫}

[হে ক্ষুধার্ত, ঘুমন্ত জাতি, খাদ্যের অভাব তোমাদের শান্ত (নিরাপদ) রেখেছে। হে ক্ষুধার্ত, ঘুমন্ত জাতি, এতো রহমতের (অক্ষমের) ঘুম।]

কবি আরো বলেন, হে জাতির শত্রু তোমাদের শেষ রক্ষা হবেনা। তোমাদেরকে এর শান্তি পেতেই হবে। ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বৈরুতের দারুল আওদাহ থেকে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত خزات কবিতা থেকে কবি বলেন-

ياحاکمی ياخصیمی * اقض ما انت قاض^{৩৬}

[হে আমার শাসক, হে আমার দুশমন, যা ইচ্ছে করো (তবে শেষ রক্ষা হবেনা।)]

অত্যাচারী শাসক কবিকে যখন থামাতে পারছিলেন, তখন তাকে বন্দী করে সব থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। যেখানে শাসকেরা নেশাগ্রস্ত প্রেমিকের ন্যায় উল্লাস করছে, সেখানে প্রজা-সাধারণ কষ্ট আর দুর্দশার জীবন কাটাচ্ছে। তাদের জীবনে বঞ্চিতের হতাশা আর বেঁচে থাকার আকুতি আকাশ বাতাস ভারি করে তুলছে। এর প্রতিবাদ করতে গেলে কবিকে কারাবরণ করতে হয়। সরকার বিরোধী আন্দোলনে সহযোগিতা করার অভিযোগে কবির পরিচালিত الجهاد পত্রিকার অক্টোবর-নভেম্বর/১৯৫২ ইং সংখ্যা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং

কবিকে আবু গারিব কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। তিনি কারাগারে বন্দী অবস্থায় লেখেন *الظلام* কবিতা। এ কবিতায় কবি সরকারকে বিদেশী প্রভুদের সেবাদাস উল্লেখ করে বলেন-

كان السموات قفريبور
كان يد من وراء الستور^{৭৭}

[যেন আসমান রিয়িকশুন্য, ব্যর্থ। যেন পর্দার আড়াল থেকে কেউ নির্দেশনা দিচ্ছে।]

তিনি অত্যাচারী শাসকের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অভিযোগ করেন, এরা বিদেশীদের বন্ধু, ভিনদেশী আত্মসী। শত্রুরা আজ দখলে নিয়েছে আমার জন্মভূমি। আর এদেশের ক্ষমতালোভী অত্যাচারী সেই বিদেশী প্রভুদের সেবাদাস হয়ে সমাজটাকে নিকৃষ্টতম স্থলে পরিণত করেছে। আর প্রজা-সাধারণকে নরকের জ্বালানী বানিয়েছে। এদের মধ্যে দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে কবি মারুফ আর রুসাফীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন-

لقى لنا المستعمرون عصابة * كانت تضم شتاتهم احباب
ثم انكفانا نصطلى بوقيرة * نحن الوقود لها نحنى النار^{৭৮}

[আধিপত্যবাদীরা আমাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে, জনগণ আজ নির্বাক পাথর (দোজখের জ্বালানী)। অতঃপর আমরা বিভক্ত হয়ে জ্বালানির উত্তাপ (দহন যন্ত্রণা) অনুভব করছি। আমরাই জ্বালানী, আমরাই আগুন।]

নীতিহীন ও আদর্শহীন সরকার

শাসকবর্গের সমালোচনা করে কবি বলেন, সরকার উপনিবেশবাদের অনুগত। তাদের কোনো আদর্শ নেই, তারা আদর্শহীন। তাদের কোনো ধর্ম নেই, ক্ষমতাই তাদের ধর্ম। লোভ তাদের অন্ধকারে রেখেছে। তারা ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বপ্ন নিয়ে বিদেশী প্রভুদের খুশি করতে দেশের সম্পদ নষ্ট করেছে। দেশবাসীর উপর অত্যাচার করেছে এবং দেশপ্রেমিক লোকদের প্রতি জুলুম নির্যাতন ও দোষারোপ করেছে। তাই কবি আফসোস করে বলেন-

حدث عميد الدار كيف تبدلت * يؤراقباب كن امس محاربا
كيف استحال المجد عار اينقى * المكرومات من الرجال معانبا^{৭৯}

[হে গৃহের মালিক (দখলদার শাসক) বলুন, সুরম্য গম্বুজসমূহ কীভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল? অথচ গতকালও সেগুলো প্রাসাদ ছিল। গৌরব কীভাবে পরিত্যাজ্য কলঙ্কে পরিবর্তিত হল এবং কীভাবে সৎ লোকেরা অসৎ হয়ে গেল।]

অবৈধ শাসকেরা কখনো দেশকে ভালোবাসেনা। তারা দেশ ও জাতির শত্রু। দেশ ধ্বংস করতে তারা দেশের শহিদদের অসম্মান ও একঘোরে করে রেখেছে। আবার প্রজা-সাধারণের নির্যাতনকারীদের পুরস্কৃত করেছে। কবি স্পষ্ট ভাষায় এর প্রতিবাদ করে বলেন-

أعرفت مملكة يباح شهيدها * للخائنين الخادمين اجانبها
مستأجرين يخربون ديارهم * ويكفأون على الخراب رواتبا^{৮০}

[আপনি কি চিনেন এমন রাজ্য, যার বীর শহিদকে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়েছে এবং পরসেবী ও ভাড়াটিয়াদের জন্য হালাল করা হয়েছে, যারা দেশকে ধ্বংস করেছে। আবার সেই ধ্বংসকারীদের পুরস্কার ও ভাতা প্রদান করা হয়েছে।]

দেশটা আজ করদরাজ্য হয়ে গেছে। দেশের মানুষ আজ আশ্রিত, বঞ্চিত, বুভুক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। জনগণ যেটুকু পায়, সেটা তাদের বড় অনুগ্রহ। শাসকেরা মজলুমের কথা শুনতে পায়না, দেখতে পায়না তাদের দুঃখ কষ্ট। যেন দেশে কোনো শৃঙ্খলা নেই, কোনো নীতি-নৈতিকতা নেই। তাই কবি বলেন-

ان السياسة لم تنق * على البلاد ولم تنذر^{৪১}

[(অবস্থা এমন) দেশে আজ না আছে শাসকের নীতি; না আছে (জুলুম থেকে) জনগণের বাঁচার কোনো পথ।]

রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ও পরিমার্জনে রাজনৈতিক শক্তি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা রাষ্ট্রের শক্তিকে আশ্রয় করে জনগণের উপর জুলুম-শোষণ ও নিপীড়ন করছিল। তাঁর থেকে মুক্তির জন্য কবি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। আর সেই চিন্তা থেকেই তিনি ‘আল ইউনাইত আল ওয়াতানী’ (الاتحاد الوطني) নামে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। দল গঠনের পরেই দলের প্রথম সম্মেলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি মূলত যুবকদের উৎসাহী করতে المناضلين (সংগ্রামীদের প্রতি) নামে একটি কবিতা পাঠ করেন। এ কবিতায় তিনি সরকারের সমালোচনা করে জাতির যুবকদের দেশ-মাতৃকার জন্য কাজ করতে উৎসাহ দেন। কবিতাটি ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে الرأي পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি বলেন-

اطلوا ، كما اتقد الكوكب * ينور ماضبط الغيب
سيروا وان بعدت غاية * وشقوا الطريق ولا تتعبوا
مدوا سوا عدكم انما * معين من الجهد لا ينضب
هاتوا قلوبكم أفرغت * على نجدة الحق، او فاذهبوا^{৪২}

[জেগে ওঠো, আকাশের তারকার মতো। আলোকিত হও, যাতে করে অন্ধকার দূরীভূত হয়।

চলতে থাকো, গন্তব্য যতই দূরে হোক। (মুক্তির) রাস্তা বের করো। আর (জালিম শাসকের) অনুগামী হয়োনা।

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। নিশ্চয় সকল প্রকার চেষ্টার মধ্যে (আর্থিক) সহযোগিতা এমন (সম্পর্কের মাধ্যম) যার প্রভাব ফুরায় না।

(জন-মানুষের প্রতি) হৃদয় উজাড় করে দাও। তোমাদের অন্তর কি সত্য বিমুখ হয়ে গেছে? সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সহযোগিতা করো। অন্যথায় দল ছেড়ে চলে যেতে পারো।]

দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়ে কবি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। তিনি নিপীড়িত মানুষদের নিয়ে কথা বলতেন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দল ইরাকে আগমণ করেন। মিসরীয় কবি আহমাদ শাওকী ছিলেন সে প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য। কবি আল জাওয়াহিরী তাদের সামনে যে ‘الى’ ‘بعثة المصرية’ কবিতা পাঠ করেন। তাতে ছিল ইরাকের স্বাধীনতা রক্ষার কথা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার কথা, নিপীড়িত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা। দেশপ্রেমিক জনতাকে বাঁচানোর আহ্বান জানিয়ে কবি বলেন-

وضع العراق خذوه من * عذ بات اقلام آخر
ولحفظ حريتهم * من أن تراس وتحترق^{৪০}

[ধ্বংসপ্রায় ইরাক, একে ধ্বংস থেকে বাঁচাতে কলম ধর। (কলম ধর) তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় এবং তাদের লাঞ্ছনা আর নিপীড়ন থেকে বাঁচাতে।]

তিনি ছিলেন আপোসহীন

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কবি আল জাওয়াহিরী বরাবরই আপোসহীন ছিলেন। তিনি নিজেও নির্যাতিত ও গৃহবন্দী হন। অনেক জুলুম নিপীড়নেও কবি ন্যায্যদৃষ্ট হননি, জালিমদের কাছে বিকৃত হননি। তাদের জুলুম-অত্যাচারকে কবি দেশের জন্য, জাতির জন্য মর্যাদার মনে করতেন। তিনি জালিমদেরকে নেশাখস্থ প্রেমিকের সাথে তুলনা করতেন। কবি বলেন-

ماذا يضر الجوع؟ مجد شامخ * انى اظل مع الرعية لاغيا
يتجحون بان موجا طاغيا * سدوا عليه منها قذا ومساربا^{৪১}

[ক্ষুধা কীবা ক্ষতি করবে? যেখানে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। আমি তো প্রজা-সাধারণের সাথে কষ্ট আর জিল্লতির জীবন কাটাচ্ছি। তারা শাসকশ্রেণি আজ আনন্দ উল্লাস করছে নেশাখস্থ প্রেমিকের ন্যায়, যা চতুর্দিকের (আশা-আকাঙ্ক্ষার) পথ ও ছিদ্র বন্ধ করে দিয়েছে।]

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কারবালা অঞ্চলের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করেন।^{৪২} কারণ তিনি শাসক কর্তৃক রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী কাজ আর উপনিবেশনীতির কড়া বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন, সাম্রাজ্যবাদী দখলদারদের সাথে গোলামী চুক্তি জাতির জন্য আত্মঘাতি। ফলে জনগণও কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারিতে (معركة الجسر) জাসার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে কবির ছোট ভাই জা'ফর সেখানে গুরুতর আহত হন পরবর্তীতে ৪ ফেব্রুয়ারি শহিদ হন। এর প্রতিবাদে বাগদাদে السباع মিলনায়তনে ইরাকী ছাত্র ঐক্যের সাধারণ সভায় কবি আল জাওয়াহিরী يوم الشهيد কবিতাটি সম্পূর্ণ উপস্থাপন করেন।^{৪৩} আর শাহাদাতের স্মরণে শহিদের কবরের পাশে পরিপূর্ণ সমাবেশে শোকসভায় কবি يوم الشهيد কবিতার আংশিক উপস্থাপন করেন। শহিদের স্মৃতিচারণ, নির্যাতিত মানুষের কথা এবং শাসকশ্রেণির অত্যাচারের বর্ণনা ইত্যাদি يوم الشهيد কবিতায় বর্ণিত হয়। কবি বলেন-

واولاء اشرار لان شعارهم * بين الشعوب محبة وسلام
وكان ارحاما ترص افریضة * وكان افخاذا تلز لزام^{৪৪}

[তারা সর্বনিকৃষ্ট, কেননা জাতির মধ্যে তাদের শ্লোগান হলো ভালোবাসা আর শান্তি। (অথচ তাদের কাজ এর বিপরীত) তাদের ভালোবাসার উদাহরণ হল (প্রতিবাদীদের) গাঙ্গাদি করে জেলে বন্দী রাখা আর উরুতে এমনভাবে আঘাত করা যাতে মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিত হয়।]

নাগরিক-জনতার উপর প্রশাসনের জুলুম-নির্যাতনের চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আরো বলেন, মানুষ আজ এত অসহায়, বঞ্চিত এবং নিস্তেজ হয়ে গেছে যে, তাদের অক্ষমতা আজ ঈমান নষ্টকারী এবং ধৈর্যের রশি ছিন্ন হওয়ার পথে। তিনি বলেন,

كاد الضعيف يشلك في ايمانه * والصبر كاد يشله استسلام^{৪৮}

[অক্ষমতা আজ ঈমান নষ্টের অভিযোগ করে। ধৈর্য আজ আসার, অবসন্ন প্রায়।]

অত্যাচারী শাসকদের ধ্বংস কামনা করে কবি বলেন, পূর্বসূরীরা আমাদের এই ধ্বংসের কারণ। জনগণ আজ মৃত্যুকামনা করে। নির্যাতন নিপীড়ন এর প্রান্তসীমায় আমরা উপনীত হয়েছি। তাই কবি বলেন-

تباله وله عاجزين توهموا * ان الحلومة بالبساط تدام
والويل للماضين في احلامهم * ان فر عن حلم يروع منام^{৪৯}

[ধ্বংস (নিশ্চিত) সেই রাষ্ট্রের জন্য, যার সাধারণ জনতা বিশ্বাস করে সরকার টিকে আছে অস্ত্রের জোরে। ধ্বংস ঐসব পূর্বপুরুষদের জন্য, যাদের দুর্বলতার জন্য (প্রজাসাধারণ) অক্ষমতার ঘুমে (আচ্ছন্ন)।]

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী আধুনিক আরবী সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা কবি। তিনি আধুনিক আরবী কাব্যরীতির অন্যতম প্রবক্তা যা তাঁর লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও আপোষহীন। তিনি স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী সরকারের ঘোর বিরোধী ও কড়া সমালোচক ছিলেন। একজন প্রজাহিতৈষী, দেশপ্রেমিক, জনবান্ধব, আপোসহীন, বিপ্লবী নেতার মত সারা জীবন তিনি কাজ করে গেছেন। দেশমাতৃকার জন্য তিনি জেল-জুলুম ও দেশান্তর সব সহ্য করেছেন আপন মনে। তিনি যা করেছেন সবই কবিতার ভাষায়। এ কারণে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ স্থায়ী, জোরালো ও আবেদনময়ী ছিল। তাঁর কথাগুলো ছিল যেমনি যুক্তিপূর্ণ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। তিনি ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা কবি, তাঁর লেখনীতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, দেশাত্ত্ববোধ, রাজনীতি ও সামাজিক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো ও সমাজে বিদ্যমান সমস্যাবলী চিত্রায়নে তিনি অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ফলে দেশাত্ত্ববোধের জন্য দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. শাওকী দায়ফ, তারীখুল আদাবিল 'আরাবী ফী মিসর (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ২৮০: উইকিপিডিয়া ফাউন্ডেশন ২৭ জুলাই/২০২০ খ্রিষ্টাব্দে কবির ২৩তম মৃত্যুবার্ষিকে সর্বশেষ ১০০ বছরের শ্রেষ্ঠ আরব কবি হিসেবে তাঁকে এওয়ার্ড প্রদান করেন। সমাজ সংস্কার এবং রাজনীতি সমালোচক হিসেবে তাকে এ পদক দেওয়া হয়। দ্র: উইকিপিডিয়া ফাউন্ডেশন, মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, এ কনটেমপোরারী অফ কিংস এন্ড প্রেসিডেন্ট (উইকিপিডিয়া সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃ. ১।
- ^২ ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ (১৩তম শীতকালীন সংখ্যা, ইরান আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়), পৃ. ২।
- ^৩ ড. আহমাদ আলী, আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস (চট্টগ্রাম: আকিব প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ২৯২।
- ^৪ হান্না আল-ফাখুরী, আল মু'জাযু ফীল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখুহ, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল জীল, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ২২০।
- ^৫ উইকিপিডিয়া, মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরী, আল জাওয়াহিরী (সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃ. ২।
- ^৬ আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৯২।

- ^৭ মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরী, *আল জাওয়াহিরী ফীল উয়ুনি মিন আশ'আরিহী* (দামেস্ক: দারুল তালাস, তা. বি.), পৃ. ৩৩।
- ^৮ 'উমার রিযা কাহালা, মু'জামুল মুয়াল্লিফীন, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: মুয়াসসিসুর রিসালা, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২২৮।
- ^৯ উইকিপিডিয়া, *মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরী* (১৮ জুলাই ২০২১), পৃ. ২।
- ^{১০} মুহাম্মাদ মাহদী আল জাওয়াহিরী, *আল জাওয়াহিরী ফীল উয়ুনি মিন আশ'আরিহী*, পৃ. ৩৩।
- ^{১১} তদেব।
- ^{১২} তদেব, পৃ. ৩৪।
- ^{১৩} তদেব, পৃ. ৮৮।
- ^{১৪} আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৯৩।
- ^{১৫} মু'জামুল মুয়াল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩০।
- ^{১৬} মু'জায ফীল আদাবিল আরাবী ওয়া তারীখুহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১।
- ^{১৭} আহমাদ কবিবশ, *তারীখুশ শি'র আল আরাবী আল-হাদীছ* (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৩৫০।
- ^{১৮} তদেব, পৃ. ৩৫১।
- ^{১৯} তদেব।
- ^{২০} আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৯৪।
- ^{২১} উইকিপিডিয়া, ১৮ জুলাই ২০২১, পৃ. ২।
- ^{২২} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আল জাওয়াহিরী ফীল উয়ুনি মিন আশ'আরিহী*, পৃ. ৩৬।
- ^{২৩} তদেব, পৃ. ৩৭।
- ^{২৪} তদেব, পৃ. ৩৭।
- ^{২৫} তদেব, পৃ. ৩৭-৩৮।
- ^{২৬} তদেব, পৃ. ৩৮।
- ^{২৭} উইকিপিডিয়া, ১৮ জুলাই ২০২১, পৃ. ৪।
- ^{২৮} তদেব, পৃ. ৫।
- ^{২৯} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আল জাওয়াহিরী ফীল উয়ুনি মিন আশ'আরিহী*, পৃ. ৪৫।
- ^{৩০} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আদ দীওয়ান*, ১ম খণ্ড (বাগদাদ ১৯৮২), পৃ. ৫৩।
- ^{৩১} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আল জাওয়াহিরী ফীল উয়ুনি মিন আশ'আরিহী*, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯।
- ^{৩২} তদেব, পৃ. ২৮০।
- ^{৩৩} তদেব, পৃ. ২৮০।
- ^{৩৪} তদেব, পৃ. ২৮০।
- ^{৩৫} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *মুজাকারাতি*, ২য় খণ্ড (রিয়াদ: দারুল মুজতাবা, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৫৬-৩৫৭।
- ^{৩৬} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আদ দীওয়ান*, ১ম খণ্ড (বাগদাদ: মাতবা'আতুল গাররীযী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২১৪।
- ^{৩৭} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আদ দীওয়ান*, ৪র্থ খণ্ড (বাগদাদ: মাতবা'আতুল গাররীযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৪২।
- ^{৩৮} আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ২৯৫।
- ^{৩৯} তদেব।
- ^{৪০} তদেব।
- ^{৪১} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আদ দীওয়ান*, ২য় খণ্ড (বাগদাদ: মাতবা'আতুল গাররীযী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৪২।
- ^{৪২} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আল জাওয়াহিরী ফীল উয়ুনি মিন আশ'আরিহী*, পৃ. ২৩৬।
- ^{৪৩} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আদ দীওয়ান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২।
- ^{৪৪} ড. আহমাদ আলী, পৃ. ২৯৫।
- ^{৪৫} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *আল জাওয়াহিরী ফীল উয়ুনি মিন আশ'আরিহী*, পৃ. ৩৫।
- ^{৪৬} তদেব, পৃ. ২৬৬।
- ^{৪৭} তদেব, পৃ. ২৭০।
- ^{৪৮} তদেব, পৃ. ২৬৮।
- ^{৪৯} মুহাম্মাদ মাহদী আল-জাওয়াহিরী, *মুজাকারাতি*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।

জারীর কবিতায় মরু সংস্কৃতি

মুহাম্মদ আব্দুছ ছাত্তার*

Abstract: The desert poet Jarir has highlighted the contemporary desert culture in his poems. Remembrance of the beloved, description of the abandoned home of the lover, description of the departure of the lover, bleeding in the heart of the lover for the beloved, and crying for the lover are some of the elements of desert culture. Family culture improved considerably during the Umayyad period. At this time, besides praise, there is also mention of kinship. The praise of the caliphs, the praise of the chief of the tribe, the praise of the lover and the condemnation of one another were also expressed through poetry. Rebellion, oppression, robbery and war are an integral part of the desert life. Everyone would appreciate the rich complexity of words, the excellence of thoughts and the clarity of language used in his poetry. The camels, known as the ships of the desert land, the driving force of the desert economy and animal husbandry are described in Jarir's poetry. This paper depicts desert culture as illustrated in Jarir's poems.

ভূমিকা

উমাইয়া যুগের নাকায়িদ সাহিত্যের প্রসিদ্ধ তিন কবির একজন হচ্ছেন জারীর। এ যুগের কবিকুলের মধ্যে তিনি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সমকালীন অপর দু'জন কবি আল-ফারায়দাক ও আল-আখতালের মধ্যে সংঘটিত কাব্য যুদ্ধ তথা নাকায়িদ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি উমাইয়া যুগের আরবী কাব্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে আবির্ভূত হন। তিনি নিজ বৈপ্লবিক জীবনের উত্তরণ ঘটিয়ে উমাইয়া রাজদরবারে প্রতিনিধিত্বমূলক কবির মর্যদা লাভে ধন্য হন। তিনি পরিশুদ্ধ স্বভাব, প্রখর অনুভূতি প্রবনতা, পরিচ্ছন্ন অবয়ব, ধর্মনিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রের মত অনন্য গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুতে মরু সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। ব্যক্তি সংস্কৃতিতে প্রেমসীর স্মৃতিচারণ, পারিবারিক সংস্কৃতি, সমাজ প্রধানের আনুগত্য, সামাজিক সংস্কৃতি, যাযাবর জীবন, পশু পালন ইত্যাদি তাঁর কবিতায় গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। এই প্রবন্ধে জারীর কবিতায় মরু সংস্কৃতি মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছি।

জারীর জীবন পরিচ্রমা

নাম জারীর, কুনিয়াত আবু হাযরাহ, ইবনুল মুরাগাহ ও উপাধি আল খাতাফা।^১ পিতার নাম 'আতিয়া ও মাতার নাম উম্মু কাইস বিনত মু'য়ীদ। তাঁর বংশ পরিচ্রমা হল জারীর ইবন 'আতিয়া ইবন হুযায়ফা (আল খাতাফা) ইবন বাদর ইবন সালামাহ ইবন আউফ ইবন কুলাইব ইবন যারবু ইবন হানযালাহ ইবন মালিক ইবন যায়দ মানাত ইবন তামীম।^২ তিনি তৎকালীন আরবে সুবিখ্যাত তামীম বংশের কুলাইব গোত্রের যারবু শাখায় জন্ম গ্রহণ করেন। কবির দাদা ছিলেন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি প্রাচীন 'আরবের সুনামধন্য কবিও ছিলেন। ফলে কাব্যিক প্রতিভা কবি জারীরের মধ্যে প্রবাহমান। কিন্তু জারীরের দাদা প্রাচীন 'আরবে কৃপণ ব্যক্তি হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন।^৩ কবির পিতা বেটে আকৃতির এবং তাঁর দুটো পা ছিলো বাঁকা। তিনি সংকীর্ণ ও ছোট মনা লোক ছিলেন। কবি জারীরের জন্ম সাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। মুহাম্মদ ইবরাহিম জাম'আহ-এর মতে, তিনি ২৯ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন।^৪ কবি জারীরের দীওয়ান সংকলক মুহাম্মদ ইবন হাবীবের মতে, কবি সৌদী 'আরবের ইয়ামামা প্রদেশের মরু অঞ্চলে এক দরিদ্র পরিবারে ৩০

* পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হিজরী মোতাবেক ৬৫০ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। মাহদী মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীনের মতে, ৩৩ হিজরী ৬৫৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।^৭ জারীর কবি পরিবারে জন্ম নেন এবং উত্তরাধিকারী সূত্রে কাব্য প্রতিভা লাভ করেন। জারীরের পরিবারকে জাহিলীয়া যুগের কবি যুহায়র ইবনে আবী সুলমার পরিবারের সাথে মিলানো যায়। কবির পিতার আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল ছিল বিধায় কবি গোত্রের লোকেরা কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাই অন্যদের মতো কবিও মরুভূমিতে পশু চরাতে। মরুভূমির বুকো বাল্যকাল অতিবাহিত করায় কবি সুস্পষ্টভাষী হয়ে বেড়ে উঠেন। তাঁর ভাষা ছিল সাবলিল ও বিশুদ্ধ।^৮

আল-য়ামামায় জন্মগ্রহণকারী কবি জারীর আল-মাররুত উপত্যকায় বসবাস করতেন, যার অবস্থান প্রসিদ্ধ নগরসমূহ হতে দূরে ছিল। অপরদিকে তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি আল-ফারায়দাক বসবাস করতেন ইরাকে, যা তৎকালীন কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং লোক সমাগমস্থল ছিল। তাই কবির গোত্র বানু যারবু'-এর লোকেরা কবিকে ইরাকে আগমন করার অনুরোধ করেন। যাতে ফারায়দাকের ন্যায় তাদের গোত্রীয় কবির সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। গোত্রীয় লোকদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কবি ইরাকে বসবাস করা আরম্ভ করেন।^৯ এরপর হতে প্রতিপক্ষ কবি আল-ফারায়দাক এবং জারীর উভয়ে আল-মিরবাদ বাজারে দীর্ঘদিন কাব্য প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন এবং এই দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ৪০ বছর স্থায়ী হয়। কবির কবিতায় তাঁর দুই জন ভাই এর নাম উল্লেখ রয়েছে। যথা: 'আমর ও আব্দুল ওয়ারদ। তাঁর তিন স্ত্রী ছিল একজনের নাম 'উমামা'। উমামাকে লক্ষ্য করে কবি কবিতা রচনা করে বলেন, 'হে উমামা বিদায় দাও। তোমার নিকট থেকে যাত্রা করার সময় নিকটবর্তী হয়েছে। প্রেমিকের জন্য বিদায়ের সময় খুব অল্প। অন্য দু'জন স্ত্রীর নাম যথাক্রমে- সালমা ও খালিদা বিনত সা'দ।'^{১০}

প্রথম স্ত্রী উমামার গর্ভে জারীরের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। যথা: হাকীম, নূহ ও বিলাল। আর উমামা ছিলেন অনারব তাই তাঁর ভাষায় জড়তা ছিল বিধায় জারীর তাকে অন্যান্য মানুষের সামনে কথা বলতে নিষেধ করেন। কবি জারীর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তাঁর আচরণও সুন্দর ছিলো। প্রতিশ্রুতি পালনে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। উমাইয়া খলিফা আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান এর প্রশংসায় তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে চাইলে খলিফা তাকে কায়স গোত্রের সমার্থক যুবায়রী কবি বলে তাঁর কবিতা শুনতে রাজি হননি। পরে কবি খলিফার নিকট এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, তিনি কখনো 'আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা)' এর প্রতিনিধিত্ব করবেন না এবং কর্ম ও কবিতা দিয়েও তাদের গোত্রের সহযোগিতা করবেন না। পরবর্তীতে বাস্তবেও কবি উমাইয়াদের রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ করেননি এবং কবিতাও লিখেননি। জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিশ্রুতিতে অটল ছিলেন।^{১১} আর এসবের প্রাচল্য প্রভাব তাঁর কবিতায় দেদীপ্যমান। ফলে শৈলীগত সৌন্দর্য, প্রণয়গীতির মধুরতা, ব্যঙ্গকবিতার তিক্ততা, শোকগীতির বিষাদভরা চমৎকারিত্ব, সর্বোপরি কবিতার সকল শাখায় তাঁর সরব পদচারণায় উমাইয়া কাব্যজগতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছেন।

তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসে একনিষ্ঠ আল্লাহর উপর বিশ্বাসী ছিলেন। রাত জেগে ইবাদতে কাটানো এবং সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া তার জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, মহান আল্লাহর উপর ভরসা করেই তার জীবনের পথ চলা, সংকটে কখনো ধৈর্য্যহারা হননি।^{১২} অবশেষে কবি জারীর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১১০ হিজরী মৃতাবিক ৭২৮ খ্রিষ্টাব্দে যামামায় ইন্তিকাল করেন।^{১৩} মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আশি বছর।^{১৪}

জারীর প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি পরিশুদ্ধ স্বভাব, প্রখর অনুভূতি প্রবণতা, পরিচ্ছন্ন অবয়ব বিশিষ্ট ছিলেন। আর এসবের প্রাচল্য প্রভাব তাঁর কবিতায় দেদীপ্যমান। ফলে শৈলীগত সৌন্দর্য, প্রণয়গীতির

মধুরতা, ব্যঙ্গ কবিতার তিক্ততা, শোকগীতি বিষাদভরা চমৎকারিত্ব, সর্বোপরি কবিতার সকল শাখায় তাঁর সরব পদচারণায় উমাইয়া কাব্য জগতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন।

জীরীরের কবিতার মূল প্রতিপাদ্য হলো- (১) আল-মাদহ বা প্রশংসামূলক (২) আল-রিছা বা শোকগাঁথা (৩) আল-ফাখর বা গৌরবগাঁথা (৪) আল-হিজা বা ব্যঙ্গ কবিতা এবং (৫) আল-গাযাল বা প্রেমমূলক কবিতা।

জারীরের কবিতায় মরু সংস্কৃতি

কবি জারীরের কবিতায় মরু সংস্কৃতিতে ব্যক্তিকেন্দ্রীক সংস্কৃতি লক্ষণীয়। ব্যক্তি সংস্কৃতিতে প্রেয়সীর স্মৃতিচারণ তৎকালীন সময়ের কবিতার মাধ্যমে জানা যায়। প্রণয় কবিতার মাধ্যমে মরু সংস্কৃতি সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। প্রেয়সীর স্মৃতিচারণ কিংবা প্রেমিকার পরিত্যক্ত বাস্তবতার বর্ণনা দিয়ে কবির মূল উদ্দেশ্য নিন্দা, প্রশংসা, গৌরব কিংবা প্রণয়ের বিষয় উপস্থাপন ইত্যাকার গতানুগতিক রীতি অনুসৃত হওয়া কবির বহু কবিতায় চর্চিত চর্চণ লক্ষ্য করা যায়। প্রেমিকার বিদায় বেলার বর্ণনা ও প্রেমিকার জন্য প্রেমিকের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হওয়া এবং প্রেমিকার জন্য ক্রন্দন করাই মরু সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান যা জারীরের কবিতায় এসেছে-

يا أم ناجية السلام عليكم * قبل الرواح وقبل لوم العزل
وإذا غدوت فباكرتك تحية * سبقت سبروح الشاحجات الحجل
لو كنت أعلم أن آخر عهدكم * يوم الرحيل فعلت مالم أفعل
أو كنت الزهب وشك بين عاجل * لقنعت أولسألت مالم يسأل-^{১৭}

[হে উম্ম নাজীয়া! তোমার প্রস্থান ও সমালোচকের সমালোচনার পূর্বে তুমি (আমার বিদায়ী) সালাম গ্রহণ কর। পাখির কল-কাকলীর পূর্বে অতি প্রত্যুষে তোমার কাছে আমার প্রেম সম্ভাষণ পৌঁছে। হায়! যদি আমি জানতাম যে তোমার সাথে এটাই হবে শেষ সাক্ষাত, তবে আমি এমন কিছু করতাম যা এর আগে কখনো করিনি। অথবা তোমার বিদায়ের মুহূর্ত এতো নিকটবর্তী হবে জানতাম, তাহলে হয়ত আমি তৃপ্ত হতাম নয়ত তোমার কাছে এমন কিছু চাইতাম যা এর আগে কখনো চাইনি।]

জারীর সবচাইতে অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন প্রণয়মূলক কবিতায়। তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি ফারায়দাকের ন্যায় প্রেমিক হওয়ার ভান করেননি অথবা আখতালের মত মদ খেয়ে মাতালও হননি। তবুও প্রেম সম্পর্কে তাঁর রচিত কবিতা ফারায়দাকের ঈর্ষার বস্তু ছিল। জারীর বলেছেন- আমি কখনও কারও সঙ্গে প্রেম করিনি। যদি করতাম তাহলে এমন প্রেমের কবিতা রচনা করতাম, যা শুনে বৃদ্ধা তাঁর যৌবনের জন্য কাঁদতো।^{১৮} যেমন কবি বলেন-

أهواك فوق هوى النفوس ولم يزل * مذبذبت قلبي كالجنح الخافق-^{১৯}

[আমি তোমাকে আমার জীবনের চেয়েও বড় করে পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু যখন তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তখন আমার অন্তর জবাই করা মুরগীর মত ঝাপটাতে লাগল।]

তিনি আরো বলেন-

إن العيون التى فى طرفها جور * قتلنا، ثم لم يحيين قتلنا-^{২০}

[এ সুন্দর চোখগুলোর পুতুলি খুব কৃষ্ণ এবং সাদা অংশ খুব শুভ্র। যেগুলি আমাদেরকে নিহত করেছে এবং নিহতদের আর পুনরায় জীবিত করেনি।]

কবি জারীর উপস্থিত ক্ষেত্রে কবিতা রচনা করতে পারতেন। তিনি সুন্দরী সূশী উমামাকে উদ্দেশ্য করে গভর্নর হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফের দরবারে তৎক্ষণাত কবিতা আবৃত্তি করেন-

ودع أمامة حان منك رحيل * أن الوداع لمن تحب قليل
مثل الكئيب تمايلت اعطافه * فالريح تجبر منته وتهيل
هذي القلوب صواديا تيمثها * وأرى الشفاء وما إليه سبيل-^{১৭}

[(হে অন্তর) উমামাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাও, কেননা (সফর থেকে) তোমার প্রস্থানের সময় এসে গেছে। তুমি কি জাননা যে, তাঁর বিদায় যে বালির স্তপের মত, যার একাংশ ঢলে পড়ে কিন্তু বাতাস এসে আবার ঠিক করে দেয় ও নতুন বালুস্তর সৃষ্টি করে। সে অন্তর ভালোবাসার কাঙাল যে অন্তর তাঁর প্রেমে বন্দী হয়ে আছে। আমি এক প্রেম পাগল, আমি এর প্রতিকার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বন্দীত্ব ছাড়া এর কোন গতান্তর নেই।]

উমামাকে লক্ষ্য করে কবি পুনরায় বলেন-

أنا كان طيكم الدلال فانه * حصن دلالك يا إمام جميل-^{১৮}

[হে প্রেমের সওদা! যদি তোমার চিকিৎসা প্রেমিকের সাথে অভিনয় করা হয়ে থাকে, তবে এটা নিঃসন্দেহে উত্তম। হে ‘উমামা তুমি বিশ্বাস কর, তোমার প্রেমের অভিনয়ও কিন্তু কম সুন্দর নয়।’]

পারিবারিক সংস্কৃতি উমাইয়া আমলে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এ সময় প্রশংসার পাশাপাশি আত্মীয়তার কথা উল্লেখ করতেন। খলীফা হিশাম ইব্ন ‘আব্দিল মালিক এর প্রশংসায় কবি জারীর আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে বলেন-

واذكر قرابة قوم بره منكم * فالرحم طالبة وترضى بالرضا-^{১৯}

[আপনি কাওমের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করুন। কেননা সম্পদ রক্ষার এটাই সময়। এরা আপনার প্রতি রাজী ও খুশী হয়ে যাবে।]

তৎকালীন সমাজে প্রধানের আনুগত্য একটি অনন্য ঘটনা। পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে গোত্র এবং গোত্র থেকে গোত্রের প্রধানের কথা সবাই মেনে চলতেন। যেমন কবি বলেন-

رضينا بالخليفة، حين كنا * له تبعاً وكان لنا إمام-^{২০}

[আমরা খলীফার প্রতি সম্মতি সে সময় থেকে, যে সময় থেকে আমরা তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছি এবং আমরা তাকে নেতা বানিয়েছি।]

কবি জারীর পারিবারিক সমস্যাপূর্ণ পরিবেশেও শুধুমাত্র ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাসের কারণে কবিতা রচনার জন্য ইরাকে বসরায় গমন করেন। ইরাক গমন করে কবি নিজেই বলেন-

وإذا شهدت لغرق قومي مشهداً * أثرت ذاك على بني ومالي-^{২১}

[যখন জাতির প্রতিরোধে সময় আসে তখন সেটাকে আমি নিজের সন্তান-সন্ততি এবং মালামালের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি।]

সামাজিক সংস্কৃতির একটি অন্যতম অংশ ছিল খলীফাদের প্রশংসাগাঁথা রচনা করা। আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের প্রশংসায় রচিত কবিতা কবি জারীরের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। উমাইয়াদের প্রতি কবির সমর্থন অকৃত্রিম না হলেও খলীফা আব্দুল মালিক খ্রিষ্টান কবির পরিবর্তে একজন মুসলিম কবিকে দরবার কবি হিসেবে কাছে পেয়ে তাকে উপযুক্ত সম্মান ও দান-দক্ষিণা প্রদানে কার্পন্য করেননি। প্রাচীন আরবী কবিতার রীতি অনুসরণ করে কবি কাসীদার উদ্বোধনী পাঠে প্রেয়সীর স্মৃতিচারণ করে খলীফার প্রশংসা আরম্ভ করেন।^{২২} পাশাপাশি খলীফার প্রতিপক্ষ ‘আব্দুল্লাহ ইবন জুবায়র এর প্রতি কটাক্ষ করে খলিফার মন জয় করার প্রয়াস পান। আলোচ্য কাসীদায় কবির প্রশংসাগীতির কৃত্রিমতা ও তোষামদি চরিত্র ফুটে উঠে। তবে খলিফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান এই কবিতা শুনে এতই অভিভূত হন যে, প্রতিদান স্বরূপ কবিকে একশত উট, আটটি গোলাম ও একটি রৌপ্যের পানপত্র উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করেন এবং উপস্থিত সভাসদকে এই বলে ঘোষণা দেন তোমাদের কেউ যদি আমার স্মৃতি গাও তবে এইরূপেই গাইবা নয়তো নীরব থাকবা।^{২৩} কবি বলেন-

فإني قد رايت على حفا * زيارنى الخليفة وامتداحى
سأشكر أن رددت على ريشى * وأنبئت القوادم فى جناحى-^{২৪}

[খলিফার সাক্ষাত দর্শন ও প্রশংসাগাঁথা গাওয়া আমি আমার উপর কর্তব্য মনে করি। আমি অচিরেই আপনার প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করব, যদি আপনি আমার ডানায় পালক পুনঃস্থাপন করেন (আমার আর্থিক অনটন মুছন করলে আমি আপনার প্রশংসায় কাব্য রচনা করব।]

সামাজিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে তৎকালীন সমাজে ঘাত প্রতিঘাত, অত্যাচার, রাহাজানী ও যুদ্ধের দামামা মরু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু সুসময়ে নয় যুদ্ধের ময়দানেও কবিতা নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হয়েছে। খুরাসানের গভর্নর মুহল্লব ইবন আবী সুফরহ খারিজীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করেছেন। এমনি সময় তিনি তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে কোলাহল লক্ষ্য করেন। সে সময় জারীর ও ফারায়দাকের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে কে শ্রেষ্ঠ কবি এ নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলেছে। তখন বিষয়টি মীমাংসা করতে গভর্নরকে অনুরোধ করেন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত দিতে পারবোনা। তোমরা খারিজীদের নিকট যাও, তারা কবিদের ভয় করেনা, তারা কবিতার মহত্ব ও তার সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। পরের দিন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই গভর্নরের দু’জন সৈন্য বিপক্ষদলের ‘আবীদা ইবন হিলালকে ডাক দিলেন।^{২৫} ‘আবীদা ইবন হিলাল যুদ্ধের আহবান মনে করে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রণকৌশলে বেরিয়ে আসলেন। কাছাকাছি আসলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি জারীর ও ফারায়দাক এ দুজনের মধ্যে কাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন? ‘আবীদা ইবন হিলাল ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, আব্দুল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করুক الله دارك May Allah destroy you বিরোক্ত হয়ে তিনি বললেন, এ কবিতাটি যার সেই শ্রেষ্ঠ। কবিতাটি ছিল জারীরের

طوى القيادة مع الطراد بطونها * طوى التجار بحضر موت برودا-^{২৬}

[ভ্রমণের ক্লান্তিতে এবং শত্রুপক্ষকে তাড়া করতে করতে তাদের পেট এমন চিহ্নের ভাজ পড়েছে যেন ব্যবসায়িক দল হাযরা মাউতে চাদরগুলো গুছিয়ে রেখেছে।]

জারীর উত্তরাধীকার সূত্রে কাব্য প্রতিভা লাভ করেন। কবির কাব্য প্রতিভা যেন হিমালয় সমান উচু। শব্দের গাঁথুনী চিন্তার উৎকর্ষতা ও ভাষার প্রাঞ্চলতা সমসাময়িক কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চস্থানে আরোহন করেন।

যেমন কবি বলেন, আমি কবিতায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছি এবং গৌরবগাঁথা কবিতা প্রণয়ন করে আশিজন কবিকে পরাজিত করেছি। শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠিতে আমিই শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে প্রশংসাগাঁথা কবিতা। যেমন খলীফা হিশাম ইবন ‘আদিল মালিক-এর প্রশংসায় কবি বলেন-

ولو لم يرض ربك لم ينزل * مع النصر الملا نكة الغضابا
ترى نصرا لامام عليك حقا * إذا لبسوا بد ينهم ارتيابا
دعا الحجاج مثل دعاء نوح * فأسمع ذا لمعارج فاستجابا-^{২৭}

[প্রভু যদি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট না হতেন তাহলে আপনার সাহায্যের সাথে (আকাশের) ফেরেশতার গযব নাথিল হত। আপনি এমন সময়ে নেতার সহযোগিতা করা দায়িত্ব মনে করছেন, যে সময় মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসে সন্দেহ করছিল। আপনি নূহ (আ.) এর মত সাহায্য প্রার্থনা করেন (আল্লাহর নিকট) তা আল্লাহ কবুল করেন।]

কবি জারীর তাঁর কবিতায় মরু সংস্কৃতির বিষয়ে আলোকপাত করেন। যাযাবর আরবরা বিভিন্ন দিকে ঘুরে বেড়াতো। দুপুরের রোদে আগুনের ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হতো। অসহনীয় প্রাকৃতিক আবহাওয়ার মধ্যেও তাদের এক জাতি অন্য জাতির মধ্যে উচু নিচু ভেদাভেদ করতে ভুল করতো না। তাদের রক্তে মরু সংস্কৃতির ধারা উপধারা বিদ্যমান। যেমন কবি জারীর বলেন-

وأنتم قيون تصقلون سيوفنا * ونعصى بها في كل يوم مشهرا
فوارس كراون في حومة الوغا * إذا خرجت ذات العريش المخدر-^{২৮}

[তোমরা তো কামার জাতি যাদের কাজ আমাদের অস্ত্রগুলোকে ধার দেওয়া যে অস্ত্র দিয়ে আমরা প্রত্যেক যুদ্ধে লড়াই করি যখন পর্দানশীন নারীরা বাহিরে বেরিয়ে পড়ে তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত অশ্বারোহী বীর যুদ্ধাগণ বার বার আক্রমণ করে।]

জীবিকা উপার্জনের জন্য আরবরা উট, বকরি, ভেড়া ইত্যাদি পালন করতো। তাদের পশু পরিপালনের জন্য যারা কাজ করতো তাদের (عرا) বলা হতো। উটের ভ্রমণ ও কুপের সন্ধানে বিভিন্ন দিক গমন এবং পশু চারণের কঠিন জীবন যাপন ও ভ্রমণ কালের নানা জটিলতা সম্পর্কে জারীরের কবিতায় পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন-

وقد سرني ألا تعد مجاشع من المجد * إلا عقر ناب بصوار-^{২৯}

[এই বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করে সাওয়ার নামক স্থানে মুজাশি গোত্রের উদ্ভীয় যবাই ছাড়া অহংকার করার মত কিছুই নেই।]

একইভাবে বলেন-

لقد سرني أن لا تعد مجاشع * من الفخر إلا عقرناب بصوار-^{৩০}

[এ বিষয়টি আমাকে আনন্দিত করে সাওয়ার নামক স্থানে উদ্ভি যবাই ছাড়া মুজাশি গোত্রের অহংকার করার মত কিছুই নেই।]

আল-য়ামামায় জন্মগ্রহণকারী কবি জারীর আল-মাররুত উপত্যকায় বসবাস করতেন যার অবস্থান প্রসিদ্ধ নগর সমূহ হতে দূরে ছিল। অপর দিকে তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী কবি আল-ফারায়দাক বসবাস করতেন ইরাকে, যা তৎকালীন কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং লোক সমাগম স্থান ছিল। আল-

ফারায়দাক এবং জারীর উভয়ে আল-মিরবাদ বাজারে দীর্ঘদিন কাব্য প্রতিযোগীতা করতেন।^{১১} কবি জারীর ৮০ লাইনের একটি হিজা কবিতা রচনা করেন। সে কবিতাটি নিদিষ্ট স্থান মিরবাদ বাজারে আবৃত্তি করেন-

فغض الطرف انك من نمير * فلا كعبا بلغت ولاكلابا-^{১২}

[দৃষ্টি অবনত কর, নিশ্চয়ই তুমি নুমায়র গোত্রের লোক, যে নুমায়র গোত্র কোন দিক দিয়েই কা'ব ও কিলাব গোত্রের সমকক্ষ নয়।]

জারীরের ভাষা সহজ, তিনি কঠিন ও বিরল শব্দ খুব কম ব্যবহার করেছেন, এজন্য সাধারণ লোকদের নিকট তাঁর কদর ছিল। সহজবোধ্য বলে তার কবিতা সকলেই পড়তো এবং অল্প সময়ে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে যেতো। আখতাল ও ফারায়দাক দুজনেই এ সত্য স্বীকার করেছেন।^{১৩}

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় কবি জারীর উমাইয়া যুগের একজন শীর্ষ স্থানীয় কবি ছিলেন। কবিতা চর্চার মাধ্যমে বৈপ্লবিক জীবনের উত্তরণ ঘটিয়ে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। জারীর তাঁর কবিতায় আরব সংস্কৃতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। দীওয়ানু জারীর তাঁর উল্লেখযোগ্য দলিল, যা আমাদের মাঝে আজোও বিদ্যমান। উমাইয়া যুগের আরবী কবিতায় অসাধারণ অবদান রাখার জন্য তিনি এ সাহিত্যের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে চির ভাস্বর হয়ে থাকবেন।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ মুহাম্মাদ ইবরাহীম জাম'আহ, *দীওয়ানু জারীর* (কায়রো: দারুল মা' আরিফ, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৭।
- ^২ আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (মিসর: দারুল জিল, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১২২; আবুল ফারাজ আল-ইস্পাহানী, *কিতাবুল আগানী*, ৮ম খণ্ড (বৈরুত: মু'আসসাযাতু জাম্মাল, তা.বি.), পৃ. ৫; ড. মোহাম্মাদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন* (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৪২৭।
- ^৩ মুহাম্মাদ ইবন হাবীব, *শারহু দীওয়ানি জারীর* (কায়রো: দারুল মা' আরিফ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১১।
- ^৪ আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২; সম্পাদনা পরিষদ, *দায়িরাতুল মা' আরিফ আল-ইসলামীয়াহ*, ৭ম খণ্ড (পাঞ্জাব: পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি: ১৯৭১ খ্রি.), পৃ. ২১৪
- ^৫ মাহদী মুহাম্মাদ নাসির উদ্দীন, *শারহু দীওয়ানু জারীর* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১১শ খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৪৯৩; আ. ত. ম মুহলেহ উদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৯৭; গোলাম সামদানী কোরাযশী, *আরবী সাহিত্যের সর্গক্ষণ ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৭২; Ignaze Gold Ziher, *A Short History of Arabic Literature* (Translated and Enlarged by Joseph Dc Somogyi, Hyderabad: Deccan), p. 27.
- ^৬ আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।
- ^৭ ইবন কুতায়বা, *আশ-শি'রু ওয়াশ শ'আরা*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১১৬; ড. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরী, *প্রাচীন আরবী কবিতা ইতিহাস ও সংকলন* (চট্টগ্রাম: আহমদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ৪২৮।
- ^৮ সম্পাদনা পরিষদ, *দায়িরাতুল মা' আরিফ আল ইসলামীয়াহ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩; আহমাদ আল ইসকান্দারী, *আল-মুফাসসাল ফী তারীখিল আদাবিল আরাবী*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহয়াউল 'উলুম, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১৩৫; জুরজী যায়দান, *তারীখুল আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়াহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: মানশুরাতু দারুল মাকতাবাতুল হায়াহ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৫২; হান্না আল-ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল 'আরাবী* (বৈরুত: মাতবা'আ বুলিসিয়া, তা. বি.), পৃ. ৩৯৪।
- ^৯ আহমাদ হাসান আয যাইয়াত, পৃ. ১২৩; হান্না আল-ফাখুরী, পৃ. ২৯৪; জারীর ইবন 'আতিয়া, *শারহু দীওয়ানু জারীর* তাজ্জুদীন শালাক সম্পা. (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৮।

-
- ^{১০} P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: 10th Edition), p. 252; শারহু দীওয়ানু জারীর, পৃ. ৮।
- ^{১১} জুরজী যায়দান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৩; R.A Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (Combridge: 1953), p. 244.
- ^{১২} শারহু দীওয়ানি জারীর, পৃ. ১০; H.A.R Gibb, *Arabic Literatare* (Oxford, 1963), p. 42-43.
- ^{১৩} শারহু দীওয়ানি জারীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫৯-৩৬০।
- ^{১৪} আ.ত.ম. মুসলেহ উদ্দীন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০১।
- ^{১৫} শারহু দীওয়ানি জারীর, প্রাণ্ডক্ত, ৩২১।
- ^{১৬} তদেব, পৃ. ৪৭৫।
- ^{১৭} শারহু দীওয়ানি জারীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৫৯।
- ^{১৮} তদেব, পৃ. ৩৬১।
- ^{১৯} শারহু দীওয়ানি জারীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১১২।
- ^{২০} তদেব, পৃ. ৪৪১।
- ^{২১} শারহু দীওয়ানি জারীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৭৭।
- ^{২২} ইবন কুতায়বা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৬।
- ^{২৩} প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, পৃ. ৫১৭।
- ^{২৪} শারহু দীওয়ানি জারীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৮১।
- ^{২৫} তদেব, পৃ. ৮২।
- ^{২৬} আহমদ হাসান আয-যায়াত, উর্দু অনুবাদ, পৃ. ১৯৫।
- ^{২৭} শারহু দীওয়ানি জারীর, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১।
- ^{২৮} তদেব, পৃ. ১৭০।
- ^{২৯} তদেব, পৃ. ১৬৩।
- ^{৩০} তদেব, পৃ. ১৬০।
- ^{৩১} প্রাচীন আরবী কবিতা: ইতিহাস ও সংকলন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৮।
- ^{৩২} জুরজী যায়দান, পূর্বোক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
- ^{৩৩} আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২০১।

খলিল মুতরানের কাব্যে প্রেম ও রোমান্টিকতা: একটি পর্যালোচনা

ড. মো. মনিরুজ্জামান*

Abstract: Love and romance are among the most important things that inspire in the poet the strength of poetry. These two aspects had been missing in Arabic poetry. Khalil Mutran came as a pioneer of romance in modern Arabic poetry. Arab poets were accustomed to modelling their poetry on the poets from the ancient era where the Badi (rhetoric) used to outweigh everything. In the beginning of his literary career, Khalil Mutran wrote poetry imitating the ancient poets. But later he tried to introduce new topics and modern ideas such as politics, sociology, and so on into poetry not present in ancient poetry. When he had immigrated to France and read French writers, he turned to their methods of poetry. He left the Badi and old topics in favour of new forms and formulations, obviously gravitating towards poetry free from the traditions of the ancient poets. Love and romance, resultantly, found a prominent place in his writing. In a sense, he is the first creator of the modern school of Arabic poetry. This paper attempts to present an analysis of love and romance as they appear in Khalil Mutran's poetry.

Keywords: Khalil Mutran's poetry, Love, Romance

ভূমিকা

উনবিংশ শতকের গোড়ালীলগ্নে এবং বিংশশতকের প্রথমার্ধ ব্যাপী আরবি সাহিত্যজগতে যে ক'জন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব আলোর দ্যুতি ছড়াতে সক্ষম হন, তাদের মাঝে খলিল মুতরান অন্যতম। এ সময়কালে আরবি কাব্যের আধুনিকায়নে কবিদের যে কাফেলা নেতৃত্ব দেন, মুতরান তাদের দলের অগ্রগামী সদস্য ছিলেন। তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আধুনিকায়নের জন্য ক্ষেত্র তৈরি হয়। তিনি প্রাচীন কাব্যরীতি ও আধুনিক কাব্যরীতির সমন্বয়ক ছিলেন। কিছু কিছু কবিতায় তিনি প্রাচীন কাব্যরীতির অনুকরণে কবিতা রচনা করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতি লঙ্ঘন করেন। কবিতার বিষয়বস্তু, কাঠামো ও গঠনে পরিবর্তন আনয়নের প্রয়াস পান। তার জীবনের বড় অংশ অতিবাহিত হয় সাংবাদিক হিসেবে। তিনি সাংবাদিকতায় পরম উৎকর্ষ সাধন করেন। কিন্তু তার কাব্যপ্রতিভা এতটা শক্তিময় ছিল যে, অন্যসকল পরিচয়কে পেছনে ফেলে কবি পরিচয়ই প্রাধান্য বিস্তার করে। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার মিশ্রণে রচনা করেন নতুনধারার কবিতা। প্রাচীন কবিতা একটি কবিতায় বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করতেন, কিন্তু তিনি একক বিষয়বস্তুর উপর কবিতা রচনার ধারা সৃষ্টি করেন। কাহিনীকাব্য তার অনবদ্য সৃষ্টি। আরবী কবিতায় রোমান্টিক ভাবধারা তারই সৃষ্টি। তিনি ব্যক্তি ও প্রকৃতিকে একই বৈশিষ্ট্যে একাকার করে ভাবতেন এবং সে ভাবনা কবিতায় ফুটিয়ে তুলতেন। তার কবিতার বিষয়বস্তু জীবন থেকে গ্রহণ করা হয়। তুহা হোসাইন এ কবি সম্পর্কে বলেন, ‘আপনি কবিগুরু, প্রাচীনপন্থীদের শিখিয়েছেন কি করে চিন্তাধারা উন্নত করতে হয়। আধুনিক চিন্তকদের শিখিয়েছেন কিভাবে বাড়াবাড়ি পরিহার করতে হয়। আপনি এদেরকে এবং ওদেরকে শিখিয়েছেন যে, শিল্প স্বাধীন বিষয়, যা পরাধীনতা জানেনা’।^১ মুতরান প্রেম ও রোমান্টিকতাকে কবিতার পরতে পরতে প্রবেশ করেন। তার দিওয়ানের তিন-চতুর্থাংশই প্রেম ও রোমান্টিক ভাবধারার কবিতায় ভরপুর।

কবি পরিচিতি

খলিল মুতরান ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে লেবাননের প্রসিদ্ধ শহর বা'লাবাকে বসবাসরত আরব বংশোদ্ভূত গাস্‌সান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল মুতরান বিকা' উপত্যকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ভূমিপুত্র। তাঁর

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্বপুরুষেরা ইয়েমেনের আযদ গোত্রের অন্তর্গত ছিলেন। তারা মা'রাব বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার পর ইয়েমেন থেকে হিজাযে গমন করেন এবং তিহামা নামক স্থানে অবস্থিত গাসসান নামক বার্গার নিকট বসতি স্থাপন করেন। অতঃপর সেখান থেকে হিজরত করে শামে চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসতি গড়ে তোলেন।^১ তাঁর মাতার নাম মালিকা সাব্বাগ। তিনি ফিলিস্তিনী বংশদ্ভূত। তাঁর পিতা হাযফার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের একজন। মূলত তাঁর দাদার সাথে আক্কা অঞ্চলের শাসকের বিবাদ সূত্রে তাঁর দাদা লেবানন গমন করেন। মালিকা সাব্বাগ একজন সংস্কৃতিমনা নারী, যিনি কবিতা আবৃত্তিতে পারঙ্গম ছিলেন। মুতরান যাহলার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিতের সূত্র ও বিজ্ঞান রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর বৈরুতের একটি বিশপ স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শায়খ খলিল আল ইয়াযেজী ও তাঁর সহোদর ইবরাহিম আল ইয়াযেজীর মতো প্রথিতযশা পণ্ডিতদের জ্ঞান-ভাণ্ডার হতে গভীর জ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেন। সে সময় তাঁর গুরু ও শায়খ আব্দুল্লাহ সুবায়ীর মাঝে আরবি ভাষায় সম্প্রতি ব্যবহৃত বিদেশী ভাষার জন্য নতুন আরবি তৈরি করা নিয়ে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তখন মুতরান তাঁর শিক্ষকের পক্ষ নেন এবং যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে নিজেকে উপস্থাপন করেন। আর এসকল কার্যক্রমের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার বিকাশ ঘটে।^২ পিতা তাকে কবিতা চর্চা করতে বারণ করেন। তিনি বলতেন, 'হে বৎস! এ শিল্পের চর্চা করো না। কেননা, কোনো কবির গায়ে জামা থাকতে দেখিনি'।^৩

শৈশবেই মুতরানের মাঝে কাব্যপ্রতিভার স্কুরণ ঘটে। প্রফেসর আলবির মুতরান তাঁর বালাবাক বিষয়ক বক্তৃতায় বলেন, মুতরানের বয়স যখন আট বছর তখন তিনি বোনের সাথে ঘুমাতে। রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় ইবনে ফারিদ, আবু তাম্মাম, বুহতারীর কবিতা আবৃত্তি করতেন। বোনের ঘুমের ব্যাঘাত হতো বিধায় বোন পিতার নিকট অভিযোগ করেন। পিতা তাকে ডেকে পাঠান ও শাসিয়ে বলেন, গরিব হতে চাইলে কবি হও, বাদ্য বাজাও। প্রত্যুত্তরে মুতরান বললেন, বাবা, বিষয়টি আমার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়; বরং এটি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে থাকে।^৪ মুতরান বিশপ স্কুলে অধ্যয়নকালে সাড়াজাগানো এক বিপ্লবী কবিতা রচনা করেন, যার শিরোনাম হলো "মা'রিকাতু ইয়ানা"- নিজেদের সাথে যুদ্ধ। কবিতাটি দু'দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, কবিতায় প্রাচীন রীতির অনুসরণ না করে এক নতুন রীতির অনুসরণ করা হয়, যেজন্য কবি স্বীয় শিক্ষকমণ্ডলী ও সমালোচকদের তীব্র বিরোধীতার সম্মুখীন হন। তার নতুন রীতির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ইবরাহিম আল ইয়াযিজী কবিকে জিজ্ঞেস করেন, কবি কি করে কবিতায় নেপোলিয়নের নাম 'নাবিলিউন' ব্যবহার করেন? জবাবে কবি তার নতুন কাব্যরীতির প্রতি দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, 'আমাদের কবিতা বলার রীতি প্রাচীন আরবদের কবিতা রচনার রীতির মতো হওয়া অপরিহার্য নয়; বরং তাদের যুগ তাদের, আর আমাদের যুগ আমাদের। তাদের সাহিত্য, স্বভাব, প্রয়োজন ও জ্ঞান তাদের মতো। আমাদের সাহিত্য, স্বভাব, প্রয়োজন ও জ্ঞান আমাদের মতো। কাজেই, আমাদের কাব্য আমাদের ভাবনা ও অনুভূতির প্রতিনিধিত্ব করবে, তাদের ভাবনা ও অনুভূতির নয়'।^৫ দ্বিতীয়ত কবিতার বিষয়বস্তু সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করে রাজনীতি ও সমাজ-দর্শন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। কবি তুর্কী সুলতান আব্দুল হামিদের শাসন-নীতির সমালোচনা করেন এবং জাতীয় সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক নিপীড়ন প্রতিরোধের কথা বলেন।

কবি বন্ধুদের নিয়ে দলবেঁধে লেবাননের পাহাড়ের চূড়ায় বসে উসমানী শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লবী সংগীত মার্সেলিজ গাইতেন, যা তৎকালীন সময় বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী শ্রেণির কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। তাঁর এমন কার্যাবলিকে তুর্কী সুলতানের গোয়েন্দারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচনা করে। এজন্য মুতরানকে বন্দী করা হয়। পরবর্তীতে সরকার তাকে মুক্তি দিলেও নানাভাবে নজরদারীতে রাখা হয়। এতে কবির জীবন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। আর সেজন্য ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে পাড়ি জমান সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র ফ্রান্সের প্যারিসে। এখানে তিনি সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে পড়াশুনা করেন এবং ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের সান্নিধ্যে আসেন এবং নিজেকে সমৃদ্ধ করেন।^৬ তখন প্যারিসে তিন শ্রেণির সাহিত্যধারা প্রচলিত ছিল। এক. বার্নাসীধারা : এধারার

সমর্থকদের মতে, কবিতাই শেষকথা, শিল্পের জন্য শিল্প, সৌন্দর্য সৃষ্টি বা প্রকৃতি হতে সুন্দর আহরণই সাহিত্যের কাজ। তাতে কোনোরূপ নৈতিকতা রক্ষার বিষয় অপ্রধান। দুই. সিম্বলিকধারা : এধারার অগ্রজ হলেন স্ট্যাপেন মালার্মি। এ গোষ্ঠীর মতে, রঙ, ছাণ ও আওয়াজ পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ এককসুর সৃষ্টি করে। এমতের অনুসারীদের নিকট কাব্যে সুর ও শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম। তারা কাব্যে ক্ষীণ আবরণে তাত্ত্বিকতাকে আবৃত রাখেন এবং মনের গহীনে স্বপ্নচারী হয়ে ওঠেন। তিন. রোমান্টিকধারা : এধারার অনুসারীদের মতে, সাহিত্য সত্তার বিবরণ দান করে, এখানে নীতিনৈতিকতা প্রধান, বুদ্ধি নয়। সাহিত্যে অতীতের কথা বা বর্তমানে ছড়িয়ে থাকা নানা উপাদানকে ঘিরে কল্পনার ফানুস উড়ে। মুতরান তিনশ্রেণির সাথেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তার সাহিত্যধারায় রোমান্টিকতারই প্রতিফলন ঘটে।^৮

প্যারিসে থাকাবস্থায় অটোমান গোয়েন্দারা মুতরানের জীবনকে বিষিয়ে তোলেন। তারা কবির স্বাভাবিক জীবনযাপনে একের পর এক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কবি ও তার সহপাঠী দু'বন্ধু-সেকীব আরসালান ও ইলয়াস সালেহ কবিতা রচনা করতেন। একদা মুতরান স্বাধীনতা বিষয়ে কবিতা লিখেন। তুর্কী সরকারের গোয়েন্দারা এজন্য মুতরানকে টার্গেট করেন এবং তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে শয়ন কক্ষে গুলি ছুঁড়েন। তারা ভেবেছিল, মুতরান বিছানায় আছেন। কিন্তু কবি সেদিন কক্ষে ছিলেন না। তাই বেঁচে যান। গ্রীষ্মের একরাতে তিনি কক্ষে ফিরে দেখেন, তার খাটে গুলিজনিত ছিদ্র দেখা যাচ্ছে। বুঝতে বাকী নেই যে, এটি একটি হত্যা প্রচেষ্টা। পথ খুঁজেন মুক্তবাসের, স্বাধীন জীবনযাপনের। প্যারিসকে তিনি আর নিরাপদ ভাবছেন না। তাই ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে পাড়ি জমান মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায়।^৯ এখানে তার বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি কাব্য ও নাটক রচনার পাশাপাশি সাংবাদিকতায় কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন। আল আহরাম পত্রিকার স্বত্বাধিকারী সেলিম তকলা (১৮৪৯-১৮৯২) এর মৃত্যুতে শোকগাঁথা রচনা করে সুধীমহলে পরিচিতি লাভ করেন। তার সহোদর বাশারাত তকলা (১৮৫২-১৯০১) তার সাহিত্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আল আহরাম পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। এসময় আহমদ শাওকীর মতো কবিও তার সান্নিধ্যে থেকে ছন্দবিদ্যার জ্ঞান আহরণ করেন।^{১০} তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে *আল মাজাল্লাতুল মিসরিয়্যাহ* নামক ষাণ্মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে তিনি *আল জাওয়াইবুল মিসরিয়্যাহ* নামক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ “মিরআতুল আয়্যাম” দু'খণ্ডে প্রকাশ করেন। শেক্সপিয়ারের বেশকিছু নাটকও তিনি আরবিতে অনুবাদ করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যেসব কবিতা রচনা করেছেন, তা “দীওয়ানুল খলিল” নামক সংকলনে প্রকাশ করেন। মিসর সরকার তাকে আল জামইয়্যাতুল মিসরিয়্যাহ আল মালাকিয়্যাহ কৃষি সংস্থায় সহকারী সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। মিসর সরকার তার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে মিসরের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এক সম্মাননা সভার আয়োজন করে। সভাটি সরাসরি দ্বিতীয় খেদিভ আব্বাসের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানকে তৎকালীন সময়ে আরব বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাহিত্য আয়োজন মনে করা হতো। অনুরূপ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কবির সম্মানে একটি জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কবিকে ‘শা’ইরুল কুতরাইন’ বা দু’ভূখণ্ডের কবি ও ‘শা’ইরুল আকতারিল আরাবিয়্যাহ’ বা আরব ভূখণ্ডের কবি খেতাবে ভূষিত করা হয়।^{১১} খলিল মুতরান গিঁটবাতে আক্রান্ত হয়ে ৩০ জুন, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে পঙ্গু অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।^{১২}

মুতরানের কাব্যে প্রেম

সম্পাদক ও সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে ১৮৯৭ সালে মুতরান একদা কায়রোর একটি পার্কে গমন করেন। পার্কে একজন তরুণীকে মৌমাছি দংশন করে। কবি তরুণীর কাছে যান এবং তাকে সেরে উঠতে সহযোগিতা করেন। প্রথম দর্শনেই কবি তরুণীটির প্রেমে পড়েন। এ সাক্ষাতের সূত্র ধরে ধীরে ধীরে উভয়ের মাঝে গভীর প্রণয় তৈরি হয়। গোপনে দু'জন মিলিত হতেন, কেউ টের পেতোনা। বন্ধুদের কেউ

একজন তাদের প্রেমের কথা ফাঁস করে দিলে তরুণীটি দুঃখ পান। একদা তরুণী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরিবারের সিদ্ধান্তে তাকে সিরিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘকাল দুজনের মাঝে দেখা নেই। তথাপি তাদের ভালোবাসা একটুও কমেনি। কবির এক বাল্য-বন্ধু সংবাদ দেন যে, মেয়েটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তারও কিছুদিন পর জানতে পারেন, মেয়েটি ইহুদাম ছেড়ে গেছে। কবি ভেঙে পড়েন, অজোরে কান্না করেন। অতঃপর সারাটি জীবন প্রেমিকার বিচ্ছেদের যাতনা নিয়ে কাটিয়ে দেন। তাঁর অবর্তমানে হৃদয়ের মনিকোঠায় আর কাউকে স্থান দিতে পারেননি। তাই চিরকুমার থেকে গেছেন।^{১৩}

এ তরুণীকে ঘিরে কবি রচনা করেন অসংখ্য প্রেমের কবিতা। কখনো মমতা মিশ্রিত অনুভূতির প্রকাশ করেছেন, আবার কখনো গভীরের যন্ত্রণা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। তার দিওয়ানে অনেক নারীর নাম উল্লেখ রয়েছে, যেমন- হিন্দ, সালমা, লায়লা ইত্যাদি। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য তার একমাত্র প্রেমিকাই।^{১৪} কবি তার প্রেমের কাহিনী গোপন রাখতে চেয়েছেন। কেননা, তাদের সম্পর্কের বিষয় জানাজানি হলে প্রেমিকা পরিবারের পক্ষ থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন। যেমন কবি هو أنت কবিতায় বলেন-^{১৫}

يا منى القلب ونور ال عين مذ كنت وكنت
لم أشأ أن يعلم النا س بما صنت وصنت
ولما حاذرت من فط نهم فينا فطنت
إن ليلى وهندي وسعادي من طننت
تكثر الأسماء ل كن المسمى هو أنت

‘হে মনের বাসনা, চোখের জ্যোতি! যে অবধি আমি ছিলাম, তুমি ছিলে, আমি চাইনি মানুষ জানুক যা আমি করেছি, তুমি করেছ। আমি তাদের চালাকির ব্যাপারে ভীত ছিলাম যা তুমি বুঝতে, লায়লা, হিন্দ ও সুয়াদ নামে যাদের কথা তুমি জান, তারা অনেক নাম বটে; কিন্তু এ নামের মানুষটি সে তুমিই।’

কবির সমকালীন কেউ কেউ উল্লেখ করেন যে, আল আহরাম পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে কবি খেদীভ আব্বাসের সফরসঙ্গী হয়ে ইস্তাম্বুল গমন করেছিলেন। সেখানে তুরস্কের আইনমন্ত্রী জাওদাত পাশার কন্যার প্রেমে পড়েন এবং তার উদ্দেশ্যে বেশকিছু প্রণয়কবিতা আবৃত্তি করেন। কিন্তু কবি তার এসম্পর্কের কথা অস্বীকার করেন।^{১৬} সাহিত্যিক মুনির কারিদিয়াহ একটি প্রবন্ধে বলেন, আমি খলিলকে তার জীবনে কোনো নারী আছে কি জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে জানান যে, ঘটনা অনেক লম্বা, আমি তা তোমার নিকট বলবো না। তবে বিশ্বাস রেখো যে, আমার জীবনে একজন নারী ছিল, সে আজও আছে এবং যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, ততদিন সেও থাকবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাকে উদ্দেশ্য করে কি গান গাওয়া হয়েছে? কবি বললেন, অনেক করেছি। তার জন্য আমার শেষ পরিবেশনা ছিল-^{১৭}

فشاب بنو ليلى وشاب بنو ابنا وحرقة ليلى في الفؤاد كما هيا

‘লায়লার গোত্র ও তাদের সন্তানেরা যুবা হয়েছে বটে, কিন্তু তার প্রেমের দহ আজও আমার অন্তরে সে আগের মতই জ্বলছে।’

কবির দিওয়ানের তিন-চতুর্থাংশ প্রেম ও রোমান্স ঘিরে আবর্তিত। কবিতা ব্যক্তির অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। সে অর্থে বলা যায় যে, কবির জীবনের তিন-চতুর্থাংশই প্রেম ও রোমান্সে ভরা ছিল।^{১৮} কবির দৃষ্টিতে প্রেমের

উৎসস্থল দু'টি। এক. চোখ, যা দেখতে পায়। দুই. অন্তর, যা কাছে টানে ও আকৃষ্ট করে।^{১৯} প্রেমিকার প্রতি ভালোবাসার গভীরতার বিবরণ দিতে গিয়ে কবি حكاية عاشقين কবিতায় লিখেন-^{২০}

وكم عرضت لي غانيات فعفتها وصنت ضميري واللسان المشبها
وكم بلد وافيته متلهيا فغادرته أدمى فؤادا وأكابا
وما زال هذا الحب في مؤيدا مكينا نبت عنه السنون وما نبا

‘কত শিল্পী আমার জীবনে এসেছে আমি তাদের পাত্তা দেইনি, আমার হৃদয় ও রসনাকে তাদের প্রেমের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি। কত শহরে আমি ভোগবিলাসে মত্ত ছিলাম অতঃপর রক্তাক্ত ও বিষণ্ণ হৃদয়ে সে শহর ছেড়ে এসেছি। এ ভালোবাসা আমার মাঝে সুদৃঢ় ও স্থায়ীভাবে অবস্থান করেছিল, যার কারণে অনেক কষ্টের পাথরকে এড়ানো সম্ভব হয়েছিল।’

একদা প্রিয়সী কবিকে বললেন, আচ্ছা বলতো নারীকে কোন রঙের পোশাকে সুন্দরী দেখায়? সাদা না কালো। কবি কোনো রঙকে প্রাধান্য দিলেন না। কারণ, প্রিয়সীকে সাদা পোশাকে প্রভাতের সূর্যের মতো দেখায় এবং কালো পোশাকে রাতের আকাশে পূর্ণিমা চাঁদের মতো দেখায়। কবির ভাষায়-^{২১}

إذا ما ترديت البياض لتنجلي فكالشمس يجلوها الصباح لتسطعا
وان تؤثر سود المطارف ملبسا فكالبدريختار الليالي مطالعا

‘যখন তুমি সাদা পোশাক পরিধান কর, তখন মনে হয়, প্রভাতি সূর্য চমকায়। আর যখন তুমি কালো পোশাক পরিধান কর, তখন মনে হয় যেন চাঁদ রাতকে উদয়স্থল হিসেবে মনোনীত করেছে। আর যখন তুমি কালো পোশাক পরিধান কর, তখন যেন রাতের আকাশে চাঁদ হাসে।’

কবি রাত্রিনিশিতে প্রিয়সীর সাক্ষাতে যেতেন, যেন পশুপক্ষি টের না পায়। কিন্তু তাদের কোন বন্ধু তাদের প্রেমে বাঁধ সাধে। সে পরশ্রীকাতর হয়ে প্রিয়সীর নিকট কবির নামে কুৎসা রটায়। প্রিয়সীর নিকট একথা পৌছামাত্র সে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। তারপর উভয়ের মাঝে সম্পর্কের টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়। যখন সে চিকিৎসার জন্য সিরিয়ায় চলে যায়, কবি তার বিরহে দ্বারে দ্বারে বিলাপ করেন। বন্ধুদের আহ্বান করেন তার সাথে বিলাপ করতে। কবি বলেন-^{২২}

فيا وردني ما ذا أحالك جمرة ويا جنني ما ذا أشارك نارا؟
جزى الله إخوانا وشوا بي عندها فكانوا لسعدى حين تم عثارا
يسرون لي شرا ويبدون رأفة أكانوا إذن يبغون عندي ثارا؟

‘হে আমার গোলাপ! কিসে তোমায় অগ্নিস্কুলিঙ্গ বানিয়েছে, হে আমার স্বর্গ! কিসে তোমায় অগ্নিতে পরিণত করেছে? আল্লাহ আমার ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রতিদান দিন, তারা তার নিকট আমার নিন্দা করেছে, আমার এ হোঁচট খাওয়ায় নিশ্চয় তারা খুশি হয়েছে। তারা গোপনে গোপনে আমার অমঙ্গল চাইতো, আর বাহ্যত আমার প্রতি মায়া দেখাতো। তবে কি তারা আমার থেকে বদলা নিতে চেয়েছিল?’

কবি তাদের দুজনের সম্পর্কের বর্ণনায় বলেন, ভালোবাসার সূত্রধরে দুটি পবিত্র মনের মিলন ঘটেছে। কবি বলেন-^{২৩}

إلفين في الفردوس مرتعنا كنا وكان الحب يجمعنا

لا نبتغي أمرا فيوجعنا لا شيء بعد الحب يطمعنا

أخفاقنا في المطلب الصعب

بل زهرتي غصن تعانقنا كنا كغصني دوحه نبتنا

وتساقطنا لما تعاشقنا بل حبتين بزهره نمنا

نار الغرام مع الندى العذب

‘আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমরা দুজন ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, ফেরাডাইসে আমরা বিচরণ করতাম। ভালোবাসার পর আমাদের আর কোনো চাওয়া নেই, আমরা এমন কোনো ঘটনার অবতারণা চাইনা, যা আমাদের কঠিন চাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের মনে পীড়া দিবে। আমরা একটি বৃক্ষের দুটি অঙ্কুরিত শাখা বা একই ডালের দুটি ফুল, যারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে আছে। বরং আমরা একটি ফুলের দানা, যা প্রেমের জন্য উৎপন্ন হয়েছে ও সিম্বিত হয়েছে। এ যেন সুমিষ্ট শিশিরে প্রেমের অনল।’

কবি গাছের ডালে বসা পাখিকে সম্বোধন করে স্থায়ী প্রেমের গল্প বলেন, স্থায়ী দুঃখবেদনা প্রকাশ করেন। পাখিকে অনুরোধ করেন তাকে দূরে কোথাও নিয়ে যেতে। পাহাড়, উপত্যকা, স্থাপনা ও ছায়া দেখে মুগ্ধ হবেন, রাতের আকাশে তারা গুণবেন। কবি غناب কাসিদায় বলেন-^{২৪}

أحببت حسناء ذات دل تهوى المنى في جمالها

لو أبصر الراهب المصلى طلعتها عاد والهيا

رأت غرامى فعاهدتني على الهوى الطاهر المباح

ثم جففتى وباعدتني بغير إثم ولا جناح

‘আমি স্নেহময়ী রূপসীকে ভালোবেসেছি, যার রূপে স্বপন গড়ায়, উপাসনারত পাদ্রী যদি তার মুখায়ব দেখতে পেত তাহলে সে উদাসী হয়ে যেত, প্রিয়সী আমার ভালোবাসা দেখে আমাকে পবিত্র প্রেমের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অতঃপর অন্যায়ভাবে, বিনা অপরাধে আমার প্রতি অবিচার করে এবং আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়।’

প্রভাতের মৃদু সমীরণে যেভাবে কবি হৃদয়ে ভাবের জন্ম হয় তদ্রূপ প্রেয়সীর প্রেমের স্মৃতি কবির মনে দোলা দেয়। সাহিত্যসরে নতুন নতুন কবিতা যুক্ত হয়। সৃজনশীলতার উল্লাসে কবি প্রেমের কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রেয়সিকে হারানোর পর তার কোনো স্মৃতি কবির নিকট ছিলনা। শুধুমাত্র একটি রুমাল, যা প্রেয়সী কবিকে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ দিয়েছিলেন। রুমালে প্রেয়সীর নাম খচিত ছিল। কিন্তু পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে রুমালটি নরম ও দুর্বল হয়ে যায়। আজ তাতে প্রেয়সীর নামের দুটি অক্ষর ছাড়া আর কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই। সে রুমালটি কবিমনকে আন্দোলিত করে, তার কাব্যক্ষমতাকে উদ্ভুদ্ধ করে।

কবি তার المنديل কবিতায় বলেন-^{২৫}

أعد أمها المنديل ذكرا محببا وأنطق به الطيب الذي فيك مطربا

وأطنب بما تحكيه عنا فإنه إذا ساء أطناب حبيبك مطنبا

فذلك ذكر الحب أنت تعيده بل العمر أشهى ما يكون وأعذبا

وما بك من نشر ففي القلب مثله طواه الهوى قدما وما زال طيبا

‘হে রুমাল! প্রিয় স্মৃতি ফিরিয়ে দাও, রুমালে থাকা সুঘ্রাণ, যা তোমাকে আনন্দ দিতো তার কথা বল। প্রেয়সির বর্ণনা দীর্ঘ কর, কেননা দীর্ঘ বর্ণনা যখন খারাপ লাগবে তখন আমি তোমাকে দীর্ঘকাল ভালোবাসবো। তুমি ভালোবাসার আলোচনা বারংবার করলে জীবনটাকে বড় মজাদার ও মিষ্টিময় মনে হয়। তোমার থেকে যে ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে মনের মাঝেও সেটির অনুরূপ অনুভব রয়েছে, বহুকাল থেকে ভালোবাসা সে অনুভূতিটুকু তাও করে রেখেছে। তা সবসময় সুগন্ধময়।’

প্রেয়সীর মৃত্যুতে কবি হতবিস্বল হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। হৃদয়ের ব্যথাবেদনা প্রকাশে রচনা করেন অজস্র কবিতা। প্রেয়সীর মৃত্যু সংবাদকে মিথ্যা অভিহিত করে النبا تكذيب শিরোনামে একটি কবিতা রচনা করেন। এ কবিতায় কবি বলেন-^{২৬}

ماتت وكل ضاحك جذل ما للورى ولموت من جهلوا

لا قلب يبكيها ولا مقل بل نبليها واللفظ والأمل

وشبابها وطهارة القلب

‘সে মৃত্যুবরণ করেছে, বিদ্রূপকারী আনন্দে মত্ত। জগতের কি হলো যে, তারা অচেনাদের মৃত্যুতে শোকাহত হয়না। তার জন্য কারো অন্তরে কান্না নেই, না আছে চোখের দৃষ্টিতে বেদনার ছাপ, সে ছিল নিতান্তই ভদ্র, কোমল ও আশার আলো, তার যৌবন ও অন্তর ছিল পবিত্র।’

প্রেমিকার মৃত্যুবার্ষিকীতে কবি এক অনবদ্য কবিতা রচনা করেন। যার শিরোনাম ছিল ‘একটি গোলাপ ঝরে গেল’। কবি এ কবিতায় বলেন-^{২৭}

ما الذي تبغين من حوبك يا شقيقات الطير؟ قالت وأبانت

نحن آمال الصبي كانت لنا ههنا محبوبه عاشت وعانت

كانت الورد في جنتنا ملكت بالحق، والجنة دانت

ما لبثنا أن رأيناها وقد هبطت عن ذلك العرش فبانت

فترانا نتحرى أبدا أثرها أو نتلاقى حيث كانت

‘হে পাখির দল! তোমরা কি চাও? তারা বলল, আমরা শৈশবের আশা-আকাঙ্ক্ষা, এখানে আমাদের একজন প্রেমিকা বাস করতো, সে জীবনে বহু কষ্ট পেয়েছে। সে ছিল আমাদের উদ্যানের গোলাপ, প্রকৃত রানী। উদ্যানটি কাছে এলে আমরা তাকে দেখতে পেতাম। কিন্তু একদা সে সিংহাসন থেকে ছিটকে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তুমি আমাদেরকে দেখতে পাবে, আমরা সারাক্ষণ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যেখানেই সে থাকুক না কেন আমরা তার সাথে সাক্ষাৎ করবো।’

মুতরানের কাব্যে রোমান্টিকতা

খলিল মুতরান আশৈশব রোমান্টিক ছিলেন। এপ্রসঙ্গে আলবির কবির বাল্যকালের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। কবি তিন বছর বয়সে আপন দু'চাচাতো বোনের সাথে খেলা করছিলেন। তখন আকাশ ছিল মেঘলা, আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। খেলা শেষে ক্লান্ত বদনে তারা আগুনের উষ্ণতা নিচ্ছিলেন। চাচাতো বোনদের একজন ছিল শুভ্র সুন্দর এবং অপরজন ছিল লাল সুন্দর। আগুনের তাপে দু'বোনের গাউদে অপেক্ষা সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। মুতরান দুবোনের এ সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'বস্তুত প্রকৃতি সুন্দর অসুন্দর অনেক কিছু দান করে থাকে, বাদামী রঙকে রক্তিমবর্ণে পরিবর্তন করে দেয়, যা দেখতে চমৎকার মনে হয়না। আবার সাদা রঙকে সুমিষ্ট রক্তিম বর্ণে রূপান্তরিত করে, যা দেখতে ভালো লাগে।' এ কথা বলে কবি উঠে গিয়ে দু'বোনকে চুম্বন করেন। কবির এ প্রতিক্রিয়ায় উপস্থিতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, কবি ছিলেন সৌন্দর্যপ্রিয়।^{২৮} যাহলা কবির জন্মস্থান। এখানেই কবির বাল্যকালে কবির মনের প্রেমের সমীরণ বয়ে গেছে। শৈশবের প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করে 'মনে পড়ে কি?' কবিতায় কবি বলেন-^{২৯}

هل تذكرين، ونحن طفلان ، عهدا بزحلة ذكره غم
إذ يلتقي في الكرم ظلان يتضاحكان وتأنس الكرم؟
هل تذكرين بلاءنا الحسننا حين اقتطاف أطايب العنب
نعطي ابتسامات بها ثمننا وبنا كنشوتها من الطرب؟
هل تذكرين غداة نخطر عن ملكين حفا بالمسرات
بين السماوات النواضر من عليا ودنيا والثريات؟
والنهر... هل هو لا يزال كما كنا لذاك العهد نألفه
يسقي الغياض زلاله الشبما ويزيد بهجتها تعطفه

'তোমার কি মনে পড়ে? আমরা যে যাহলায় খুব সুখে শৈশব কাটিয়েছি। আগুর বাগানে দুটি হাস্যোজ্জ্বল ছায়া মিলিত হতো এবং তুমি আগুর পছন্দ করত। মনে পড়ে কি, ভালো ভালো আগুরগুলো পাড়ার কষ্টের কথা? হাসিতে সে কষ্টের মূল্য দিতাম এবং আনন্দে নেচে উঠতাম? মনে পড়ে কি সে সকালের কথা, যখন আমরা হাসিখুশিতে মজে থাকা দুই রাজার গল্প করতাম। কাছের এবং দূরের উজ্জ্বল আকাশ ও ভূমির মাঝে ছিল যাদের রাজত্ব। আমরা যে নদীর তীরে বসে গল্প করতাম, তা কি সেই আগের মতো আমাদের ভালোবাসা নিয়ে বয়ে চলেছে? সে নদী থেকে বাগিচার ফসলী বৃক্ষগুলোতে পানি সেচ দেয়া হতো এবং তার স্নেহপরশে বাগানের শোভা বৃদ্ধি পেত।'

কবি সর্বদা রোমান্টিকতা লুক্কায়িত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু মনের গহীনে অবস্থানকারী রোমান্টিকতা কবির কাব্যস্পৃহাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতো। একদা কবি মিসরের বাড়ির বাহিরে প্রাতঃভ্রমণে বের হন। রাস্তায় দেখতে পান সাদাকাফনে মোড়ানো পুষ্পাবৃত একটি কফিন, যার পিছু পিছু হাঁটছে একদল ফরাসি তরুণ। জিজ্ঞেস করলে কোন এক পথিক কবিকে মৃত সম্পর্কে অবগত করেন যে, যুবকটি প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আত্মত্যাগ করেন। ফলে লোকেরা তাকে শেষবিদায় জানাচ্ছে। কবি বলেন, আমিও সে প্রেমের বলি তরুণকে শেষবিদায় জানাতে শোভাযাত্রায় যোগদান করি এবং তাকে উদ্দেশ্য করে একটি শোকগাঁথা রচনা করি।^{৩০} কবিতার শিরোনাম হলো تشييع جنازة-কফিনের শোভাযাত্রা। তন্মধ্যে কতিপয় চরণ নিম্নরূপ-^{৩১}

فَرَبَّيْنَهُ فَمَا ارْتَوَى وَجَفَّنَهُ فَمَا ارْعَوَى

غَادَةٌ مَنْ سَعَى إِلَى غَايَةٍ عِنْدَهَا غَوَى
 جُنْ فِيهَا وَقَبْلَهُ جُنْ قَيْسٌ مِنَ الْهَوَى
 وَقَضَى خَالِدُ النَّوَى يَتَدَاوَى مِنَ النَّوَى
 فَدَفَنَاهُ بَرْدَ الْغَيْثِ قَبْرًا بِهِ نَوَى
 مَنْ قَضَى هَكَذَا شَرِي دَأْفَمِنْ أَهْلِنَا هُوَا
 كُلُّ نَاجٍ إِلَى مَدَى لَاحِقٌ بِالَّذِي نَوَى
 فَالْشُّجَاعُ الَّذِي مَضَى قَبْلَنَا يَحْمِلُ الْيَوَا
 وَالْجَرِيءُ الَّذِي افْتَنَى وَالْبَطِيءُ الَّذِي نَوَى

‘তরুণীটি তাকে কাছে টানলেও সে পরিতৃপ্ত হয়নি, সে তার সাথে রূঢ় আচরণ করলেও সে তার পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি। যে তরুণীটির কাছে ভিড়তে চেষ্টা করেছে সে পথ হারিয়েছে। সে তার জন্য উন্মাদ হয়ে গেছে, তারও পূর্বে কায়স লায়লার প্রেমে উন্মাদ হয়েছিল। চিরস্থায়ী গন্তব্য হলো তার ব্যাপারে চূড়ান্ত, দূরবর্তী গন্তব্যই তার চিকিৎসা। আমরা তাকে দাফন করলাম, বৃষ্টি সমাহিত কবরকে শীতল করে দিল। যে এপথে শহীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিবে, সে আমাদের একজন। একটি সময় পর্যন্ত যে বেঁচে যায় সেও সমাহিতের সাথে মিলিত হয়। যে বীর আমাদের পূর্বে চলে গেল সে পতাকাবাহী হবে। সাহসী সে, যে পিছু পিছু এসেছে, আর অলস সে, যে দূরে থেকেছে।’

এর চেয়ে গভীর রোমান্টিকতা আর কি হতে পারে! একজন প্রেমিকের আত্মদানে কবি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হন। কবি তার জন্য যে শোকাগাঁথা রচনা করেন তা শুধু সহমর্মিতার আবরণে আবৃত নয়; বরং তাতে কবির রোমান্টিক মননেরই বহিঃপ্রকাশ অন্যতম অনুসঙ্গ হিসেবে কাজ করেছিল।

কবির মতে নদ-নদী মানুষের মতো। জীবনে যেমন অস্থিরতা, স্বপ্ন ও অনুভূতি থাকে, তদ্রূপ নদীর মাঝেও এসকল গুণাবলি বর্তমান আছে। কবি গ্রীষ্মের ভ্রমণে দুদিনের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় গমন করেন। হঠাৎ কবির মনে হলো, তার শরীর অসুস্থ। তিনি ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলেন। কবিকে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় কিছু সময় কাটাতে সমুদ্রতীর ম্যাক্সে যেতে পরামর্শ দেন। কবি সেখানে দুমাস অতিবাহিত করেন। সেখানে মুক্তবাতাস, সমুদ্রের গর্জন, আকাশে মেঘের ভেলা ও মেঘমালায় সূর্যের লুকোচুরি খেলা দেখে কবি মুগ্ধ হন এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলেন কল্লনার রাজ্যে। জীবনের পড়ন্ত বিকেলে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে যে অপরূপ দৃশ্য তিনি উপভোগ করলেন তা তার কাব্য রচনায় নতুন উপাদান যুক্ত করল। মনের মাধুরি মিশিয়ে রচনা করলেন “আল মাসা” সন্ধ্যা নামক একদীর্ঘ রোমান্টিক কবিতা।^{৩২} কবিতার কতিপয় চরণ নিম্নরূপ-^{৩৩}

دَاءُ أَلَمٍ فَخِلْتُ فِيهِ شَفَائِي مِنْ صَبَوْتِي فَتَضَاعَفَتْ بُرْحَانِي
 يَا لِلضَّعِيفَيْنِ اسْتَبَدَّ بِي وَمَا فِي الظُّلَمِ مِثْلُ تَحَكُّمِ الضُّعَفَاءِ
 قَلْبٌ أَذَابَتْهُ الصَّبَابَةُ وَالْجَوَى وَغِلَالَةٌ رَثَتْ مِنَ الْأَذْوَاءِ
 وَالرُّوحُ بَيْنَهُمَا نَسِيمٌ تَهْدِي فِي حَالِي النَّصُوبِ وَالصُّعْدَاءِ

وَالْعَقْلُ كَالْمَصْبَاحِ يَغْشَى نُورُهُ كَدْرِي وَيُضْعِفُهُ نُضُوبُ دِمَائِي

‘আমি রোগাক্রান্ত হওয়ার পর ভাবলাম ভালোবাসার রোগ থেকে পরিত্রাণ পেলাম। কিন্তু আমার ক্ষত বেড়েই গেল। দুশ্চেষ্টার দুর্বলতা (অসুস্থতা ও প্রেম) আমার প্রতি অন্যায় করেছে, দুর্বলের উপর পীড়াপীড়ি করা সবচেয়ে অবিচার। আমার হৃদয়কে ভালোবাসা বিগলিত করে ছেড়েছে, আর আমার শরীরের আবরণটি ওষুধ খেতে খেতে জীর্ণ হয়ে গেছে। আমার আত্মাটি নিঃশ্বাসের বাতাসে পরিণত হয়েছে, কখনো সঠিকভাবে যাওয়া আসা করে আবার কখনো উর্ধ্বশ্বাস দেখা দেয়। বিবেকবুদ্ধি আলোকবর্তিকা স্বরূপ। কিন্তু আমার কদর্যতা সেটিকে আচ্ছাদন করে রাখে। আর আমার রক্তশূন্যতার ফলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে।’

কবির রোমান্টিক কবিতার সংখ্যা ভুরি ভুরি। তিনি بدر بدر কবিতায় বলেন-^{৩৪}

لم أنس حين التقينا والروض زاه نضير
إذ العيون نيام والليل راء حسير
نشكو الغرام دعايا ورب شاك شكور
وفي الهوى حنين من الهوى وزفير
وللمياه أنين تذوب منه الصخور
وللنسيم حديث على المروج يدور
وللأزاهر فكر يرويه عنها العبير

‘বালমল উদ্যানে মিলনের দিনগুলোর কথা আজও ভুলিনি। তখন চোখে থাকতো ঘুম আর রাত হতো ক্লান্ত দর্শক। আমরা রসিকতা করে ভালোবাসার অভিযোগ করতাম, অনেক অভিযোগকারীই কৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। বাতাসে ছিল ভালোলাগার মমতা ও দীর্ঘশ্বাস। পানিতে ছিল কান্না, যার জন্য পাথর গলে যেত। বাতাসেরা বাগানের সাথে গল্প জড়াতো। চারিদিকে ছড়ানো ফ্রাণ ফুলের ভাবনার কথা বলে বেড়াতো।’

তিনি تيرئة - অব্যাহতি’ কবিতায় বলেন-^{৩৫}

وإن الذي عاب منك السفو ركن قال للشمس يا سافره
وإني أهواك ملء عيو ني وملء حشاشتي الصابرة
أليس الهوى روح هذا الوجو د كما شئت الحكمة الفاطره؟
فيجتمع الجوهر المستدق بآخر، بينهما أصره؟
ويأثلف الذرو هو خفي فيمثل في الصور الظاهرة؟
ويحتضن التراب حب البذا زفير جنة زاهرة؟

‘যারা তোমার খোলামেলা চলাফেরার কারণে তোমাকে দোষারোপ করতো, তারা যেন সূর্যকে বলতো ‘উলঙ্গ। আমি তোমাকে দু’চোখ ভরে পূর্ণ আনন্দের সাথে ভালোবাসি। স্বভাবজাত প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী ভালোবাসা কি এ জগতের প্রাণ নই? সুস্বাদু পদার্থ কি

পরস্পর মেলবন্ধনের চুক্তিতে যাবেনা? অণু কি সুপ্ত থেকে বাহ্যিক রূপে প্রকাশ পাবেনা?
মাটি কি বীজ ধারণ করে উজ্জ্বল বাগান বানাবেনা?’

তিনি قلعة بعلبك বা ‘লাবাক কিল্লা-কবিতায় আনন্দঘন শৈশব ও জীবনের প্রথম প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করেন। এ কবিতার কতিপয় চরণ হলো-^{৩৬}

ذَكِّرْنِي طُفُولِي وَأَعْيِدِي رَسْمَ عَهْدٍ عَنْ أَعْيُنِي مُتَوَارِي
مُسْتَطَابِ الْحَالَيْنِ صَفْوًا وَشَجْوًا مُسْتَحَبِّ فِي النَّفْعِ وَالْإِضْرَارِ
يَوْمَ أُمِئِّي عَلَى الطُّلُولِ السَّوَاجِي لَا أَفْتَرِزُ فِيمَنْ إِلَّا أَفْتَرِزِي
نَزْفًا بَيْنَهُنَّ غَرًّا لَعُوبًا لَاهِيًا عَنْ تَبَصُّرٍ وَاعْتِبَارِ
يَوْمَ أَخْلُو "بِهْنَد" نَلْهُو وَنَزْهُو وَالْهَوَى بَيْنَنَا أَلِيفٌ مُجَارِي
كَفَرَّاشِي الرِّبَاضِ إِذْ يَتَبَارَى مَرَحًا مَا لَهُ مِنْ اسْتِفْرَارِ
نَلْتَقِي تَارَةً وَنَشْرُدُ أُخْرَى كُلُّ تَرْبٍ فِي مَخْبِئٍ مُتَدَارِي
فَإِذَا الْبُعْدُ طَالَ طَرْفَةً عَيْنٍ حَتَّى الشَّوْقُ مُؤَذِّنًا بِالْبِدَارِ

‘হে দুর্গ! আমার শৈশবের স্মৃতিচারণ কর, আমার দৃষ্টির অগোচরে থাকা সময়ের চিত্র ফিরিয়ে দাও। আনন্দ-বেদনা উভয় অবস্থাই ভালো ছিল, লাভ-ক্ষতি সবই প্রিয় মনে হতো। যেদিন আমি শান্ত বাস্তবিতায় হেঁটে চলতাম এবং আমি প্রথম পলায়ন করতাম। আবেগে ভাবনাহীনভাবে খেলাধুলোয় মগ্ন থাকতাম। যেদিন আমি প্রেয়সী হিন্দের সাথে আনন্দবিনোদন করে সময় কাটাতাম, সেদিন ভালোবাসাই আমাদের নিকটতম সঙ্গী ছিল। বাগানে প্রজাপতি যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে দিকবিদিক ছুটাছুটি করে আমরাও তদ্রূপ একবার একসাথে চলতাম, আবার দলছুট হয়ে যেতাম, প্রত্যেক সহপাঠী মমতার ঝুপড়িতে আশ্রয় নিতাম। দূরে চলে যাওয়ার পর দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলে ভালোবাসাই আমাদেরকে একত্রিত হতে উৎসাহ যোগাতো।’

তিনি بدر بدر - কবিতায় বলেন-^{৩৭}

إِنْ كَانَ صَبْرِي قَلِيلًا فَإِنَّ وَجْدِي كَثِيرُ
لَيْسَ الْمَحِبُّ صَدُوقًا فِي الْحُبِّ وَهُوَ صَبُورُ
يَا بَدْرُ سَمَّيْتُ بِدْرًا وَأَيْنَ مِنْكَ الْبُدُورُ
أَيْنَ الْجَمَادُ مُنِيرًا مِنْ ذِي حَيَاةٍ يُنِيرُ
أَيْنَ الصَّبَاحَةُ فِيهِ وَأَيْنَ مِنْهُ الشُّعُورُ

‘আমার ধৈর্য কম হলেও আমার বেদনা অনেক। ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রেমিককে ধৈর্যশীল বলে বিশ্বাস করা যায় না। হে চাঁদ! তুমি নিজেকে চাঁদ নাম দিয়েছ, বলতো তোমার চমক কোথায়? নিশ্চয় কি করে প্রাণের মাঝে আলো ছড়াতে পারে? কোথায় তার উজ্জ্বল্য কোথায় তার অনুভব?’

মুতরান জীবন ও প্রকৃতি থেকে যা অনুভব করেছেন, কল্পনায় যা কিছুকে স্থান দিয়েছেন, মনের মাধুরি মিশিয়ে সেসব বিষয়কেই কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। তিনি কফির পেয়ালাকে সৌরমণ্ডল ও বিশ্ব ভূমণ্ডলের সাথে তুলনা করে রচনা করেন *فنجان قهوة* শিরোনামের কবিতা। এ কবিতার কতিপয় ছন্দ নিম্নরূপ-^{৩৮}

ليلى أجلي الطرف فيه تنظري سر الكيان وأية الأزمان
تجدي سماوات وسعن عوالما فتانة الإبداع والإتقان
منثورة الأفراد منظومة جمعا بما لا تدرك العينان
سيارة بين الجهات حوائرا مرتادة في البحث كل مكان
كل يصير إلى حبيب مرتجي حتى يدانيه فيلتصقان
فيذوب كل منهما في صنوه وكذاك يحيا بالهوى الصنوان
جسمان يعتديان جسما واحدا كتوحد الحبيين يقتربان
روحان تمتزجان حتى تصبحا شبه الصبا والطيب يمتزجان

‘প্রিয়সী লায়লা! কফির কাপে দৃষ্টি ফেরাও, দেখবে পৃথিবীর রহস্য ও যুগের নিদর্শন। দেখতে পাবে অনেকগুলো আকাশ অনেক জগতকে ধারণ করে রেখেছে। আকর্ষণীয় সৃষ্টি ও সৃজনশীলতা। ছড়িয়ে থাকা জিনিসগুলো সুবিন্যস্ত হয়ে আছে, যা চোখে দেখা যায়না। চতুর্দিকে অস্থির হয়ে ভ্রমণ করছে, সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। সকলে প্রত্যাশিত বন্ধুর সন্ধানে ছুটে চলেছে, যে পর্যন্ত না কাছে গিয়ে মিলিত হচ্ছে। প্রত্যেকে স্বজাতির ভেতরে বিগলিত হচ্ছে। এভাবে দুশ্রেণি ভালোবাসায় বেঁচে থাকছে। দুটি দেহ একদেহে রূপান্তরিত হচ্ছে, যেমন দুবন্ধু মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পুবালি বাতাস ও ভালোলাগা যেমন পরস্পরের সাথে মিলেমিশে আছে তদ্রূপ দুটি প্রাণ পরস্পরের মাঝে মিলেমিশে একাকার।’

মুতরানের একটি চমৎকার রোমান্টিক কবিতা হলো *الجنين الشهيد* কবিতা। এ কবিতাটিকে আধুনিক আরবি সাহিত্যের অন্যতম রোমান্টিক কবিতা বলা চলে। কবিতার প্রেক্ষাপট হলো, এক হতদরিদ্র নিঃস্ব তরুণী কায়রো শহরে বসবাস করেন। ঘর-বাড়িতে কাজ করে বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরণপোষণের যোগান দেন। একদা জনৈক দুঃস্রষ্ট্রবান যুবক তাকে প্রলুব্ধ করে। তরুণীটি তার লালসার শিকার হন। হয়ে পড়েন গর্ভবতী। লম্পট তরুণীকে ছেড়ে চলে যায়। রেখে যায় ভ্রূণ, যা তরুণীর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে। সে গর্ভপাত করতে চায়। কেননা, শিশুটি জন্ম নিলে কি হবে তার পিতৃপরিচয়? অর্থাৎ অনটন, লাঞ্ছনা, অপমান চিরসঙ্গী হবে তার। তার চাইতে মৃত্যুই যে শ্রেয়! কবি এ ঘটনাটি জানার পর মর্মান্বিত হন। ঘটনাটি তার মাঝে গভীর আবেগের সঞ্চার করে। সে আবেগ থেকে রচনা করেন কালজয়ী এ কবিতা। কবিতার কতিপয় চরণ নিম্নরূপ-^{৩৯}

فيا ولدي المسكين فلذة مهجتي ويا نعمة عوقبت فيها بنقمة
ومن كنت أرجوه لسعدي وبهجتي وكان ياجيه ضميري بمنيتي
وأمل أن يحيا ويرجع لي بعلي
تموت ولما تستهل مبشرا تموت ولم أنظر محياك مسفرا

تفارق قبراً فيه عذبت أشهراً إلى جدت منه أبروأطهراً

وتحيا صغار الطير دونك والنحل

تموت وما سلمت حتى تودعا وأملك تسقيك السموم لتصرعا

وتنفيك من جوف به كنت مودعا لتخلص من عيش ثقيل بما وعى

من الحزن والألام والفقر والذل

‘হে আমার নিঃস্ব সন্তান, আমার প্রাণের টুকরো! হে নেয়ামত, যার জন্য আমি শান্তির সম্মুখীন! যাকে আমার সুখ ও আনন্দের জন্য চাইতাম, যার সাথে আমার মন স্বপ্নের কথা আলোচনা করতো। আর আমি চাই, সে বেঁচে থাকুক এবং আমার স্বামীকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনুক। আজ সুসংবাদের আওয়াজ না তুলে তুমি মরে যাবে, তোমার উজ্জ্বল মুখায়ব না দেখতেই তুমি নাই হয়ে যাবে! যে কবরে তুমি কতিপয় মাস শান্তি ভোগ করেছ, অচিরেই সে কবর ছেড়ে তার চেয়ে পবিত্র সমাধিতে স্থানান্তরিত হবে। তোমার অনুপস্থিতিতে ছোট ছোট পাখি আর মৌমাছিরা বেঁচে থাকবে। তুমি মরে যাবে, সালাম না জানিয়েই বিদায় নিবে। তোমার মাতা তোমাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করবে। তুমি যে গর্ভে আমানত ছিলে, সেখান থেকে তোমাকে নির্বাসনে পাঠাবে, যেন সে কষ্ট, দুঃখ, যন্ত্রণা, অভাব ও লাঞ্ছনার জীবন থেকে রেহাই পেতে পারে।’

পরিসমাপ্তি

খলিল মূতরান স্বভাবজাতভাবে একজন রোমান্টিক কবি। সমাজ-সভ্যতার দায় তার ধমনিতে সজীব ছিল। তাই তিনি প্রেম-ভালোবাসার পাশাপাশি জুলুম, অত্যাচার ও স্বাধীনতা বিষয়ে অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। সমাজের নিপীড়িত মানুষের দুঃখ-কষ্ট, হাসি-কান্না, আবেগ-অনুভূতি কবিতায় স্থান দিয়েছেন। তার আবেগ ও সাহিত্যরুচি অনেক শক্তিশালী ছিল। একজন তরুণীর ভালোবাসা আজীবন তাকে পুড়িয়েছে। সে দহনে সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন রোমান্টিক কবিতা। মানুষ ও প্রকৃতি ছিল তার ভাবনার প্রধান ক্ষেত্র। এ দু’টিকে পাশাপাশি রেখে তিনি কবিতার গঠন কল্পনা করতেন। তার প্রতিটি কবিতায় প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য ফুটে ওঠেছে। উৎপ্রেক্ষা, উপমার মাধ্যমে প্রেয়সির আবেগঘন বর্ণনা ফুটিয়ে তুলেছেন। এককথায় তাকে রোমান্টিকতার অনন্য কবি বলা চলে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. সালিম আল মা’উশ, *ফিল আদাবিল হাদীস* (বেনগাজী : দারুল কুতুব আল ওয়াতানিয়াহ, তা. বি.), পৃ. ৫০৩-৫১১।
- ^২ ড. মুহাম্মদ মান্দুর, *মুহাদারাতুন ‘আন খালীল মূতরান* (কায়রো : মুআসসাসাতু হিন্দাজী, ২০১৭), পৃ. ৮।
- ^৩ ড. ইসমাঈল আদহাম, *মাজাল্লাতু আল মুকতাতাফ*, জুন ১৯৩৯, পৃ. ৮৫।
- ^৪ *মাজাল্লাতু আল মুসাওয়ায*, ১৫ জুলাই, ১৯৪৯, সংখ্যা : ১২৯২, পৃ. ৮।
- ^৫ জামালুদ্দীন আল রামাদী, *খালীল মূতরান শা’ইরুল আকতারিল আরাবিয়াহ* (মিসর : দারুল মা’আরিফ, ১৯৫৪), পৃ. ১৫।
- ^৬ ইসমাঈল আদহাম, প্রবন্ধ : *খালীল মূতরান শা’ইরুল আরাবিয়াহ আল ইবদায়ী*, আল মুকতাতাফ, জুন ১৯৩৯ : ৩/৮৮।
- ^৭ *খালীল মূতরান শা’ইরুল আকতারিল আরাবিয়াহ*, পৃ. ১৯।
- ^৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১; ইসমত মাহদী, *Modern Arabic Literature* (হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৩), পৃ. ৮৭।
- ^৯ খালীল মূতরান *শা’ইরুল আকতারিল আরাবিয়াহ*, পৃ. ২৩।

-
- ^{১০} হান্না আল ফাখুরী, *তারীখুল আদাবিল আরাবী* (বলিবিয়া প্রকাশনী), পৃ. ১০১৯-২০।
- ^{১১} আহমদ কবিরশ, *তারীখুল শি'রুল আরাবী আল হাদীস* (বৈরুত : মাকতাবাতু আন নূর, ১৯৭১), পৃ. ১৯৫।
- ^{১২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।
- ^{১৩} *Modern Arabic Literature*, পৃ. ৮৯।
- ^{১৪} হাদীস মা'আ খালীল মুতরান, মাজাল্লাতু আদ দুস্তুর, সংখ্যা ৯, ১৯৩৮।
- ^{১৫} খালীল মুতরান, *দীওয়ানুল খালীল*, (মিসর : দারুল হিলাল, ১৯৪৯), খ. ২, পৃ. ৩২৬।
- ^{১৬} মুহাম্মদ মান্দুর, *মুহাদারাত 'আন খালীল মুতরান* (মিসর : মুআসাসাতু হিন্দাজী সি আই সি), ২০১৭, পৃ. ৮।
- ^{১৭} ড. মিশাল জুহা, *খালীল মুতরান: বাকুরাতু তাজবীদ ফিশ শি'রিল আরাবী আল হাদীস* (বৈরুত : দারুল মাসীরাহ, ১৯৮১খ্রি.), পৃ. ৮৫-৮৬।
- ^{১৮} আদ দুস্তুর পত্রিকা, *হাদীস মা'আ খালীল মুতরান*, সংখ্যা ৯, ১৯৩৮।
- ^{১৯} হান্না আল ফাখুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২৫।
- ^{২০} *দীওয়ান*, খ. ১, পৃ. ২২০।
- ^{২১} *খালীল মুতরান শা'ইরুল আকতারিল আরাবিয়াহ*, পৃ. ১০০।
- ^{২২} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।
- ^{২৩} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।
- ^{২৪} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।
- ^{২৫} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।
- ^{২৬} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।
- ^{২৭} *Modern Arabic Literatur*, পৃ. ৯৩।
- ^{২৮} *খালীল মুতরান শা'ইরুল আকতারিল আরাবিয়াহ*, পৃ. ১৬।
- ^{২৯} আনতুন আল জুমায়িল ও আশ-শায়খ আমীন তাকীউদ্দীন, *কিতাবু মাজাল্লাতি 'আয যুহুর' আল মিসরিয়্যা-আযহার ও আশওয়াক*, খ. ২, সংখ্যা : ১৯ (মিসর : দারুল সাদির, ১৯১০), পৃ. ৪৩৫।
- ^{৩০} *মুহাদারাত 'আন খালীল মুতরান*, পৃ. ১৪-১৫।
- ^{৩১} *দীওয়ান*, খ. ১, পৃ. ২০।
- ^{৩২} *খালীল মুতরান আশ শা'ইর*, পৃ. ৯২।
- ^{৩৩} *দীওয়ান*, খ. ১, পৃ. ১৪৪-১৪৫।
- ^{৩৪} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩।
- ^{৩৫} *প্রাগুক্ত*, খ. পৃ. ৫৩।
- ^{৩৬} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।
- ^{৩৭} *দীওয়ান*, পৃ. ২৩।
- ^{৩৮} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।
- ^{৩৯} *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩।

নাজীব কিলানীর সাহিত্যে বৈশ্বিক ভাবনা

ড. মো. কামারুজ্জামান*

Abstract: Najib Al-Kilani is a well known and famous name in modern Arabic literature. He is one of the pioneers in establishing Islamic ideology in Arabic literature. He had substantive roaming in every branch of literature. He was a novelist, poet, playwright, critic, researcher, orator and organizer. Islamic ideology and perceptions are the salient feature of his literary works. He hugely attempted to Islamize the literature during his life time. High quality and artistic charm of his literary works have always delighted literary connoisseurs. As a recognition of his indomitable contribution to literature, he received various national and international prizes. His literary works have been translated into Italian, English, Turkish, Urdu, Bangla, Afghan languages and some others. His writings focused on the overall images of the people of the entire Muslim world and their sorrows, social and political problems, religious perversions and moral degenerations. His writings on various important issues in different countries of the world are: *Saraefu Habibati*, *Azraiyo Zakarta*, *Layali Turkistan* and *Amaliqatush Shimal*. The main goal of this paper is to analyze Najib Al-Kilani's thoughts and literary works written on international issues.

ভূমিকা

আধুনিক আরবী সাহিত্যে নাজীব কিলানী একটি সুপরিচিতি ও বিখ্যাত নাম। আরবী সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান পথিকৃত তিনি। জাতীয় এবং ইসলামী বিষয়সহ সমসাময়িক আন্তর্জাতিক নানা ইস্যুকে তিনি তাঁর সাহিত্য চর্চার বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ছিল তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণা। তিনি ছিলেন একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার, সাহিত্য সমালোচক, গবেষক, বাগ্মী, দক্ষ সংগঠক এবং সুচিকিৎসক। নাজীব কিলানী ছিলেন একজন বাস্তববাদী লেখক আর তাঁর রচনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত এবং বৈচিত্র্যময়। সমস্যা চিহ্নিতের পাশাপাশি তা সমাধানের দিক নির্দেশনাও থাকত তাঁর লেখায়। আধুনিক আরবী সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির প্রবর্তক ছিলেন তিনি। মিসরের আধুনিক আরবী সাহিত্যের লেখক ও কথাসিদ্ধী নাজীব কিলানী তাঁর অধিকাংশ লেখায় বৈশ্বিক চিন্তাধারার সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন অত্যন্ত সফলভাবে। তাঁর এ ধরনের সাহিত্যিকর্ম আলোড়ন সৃষ্টি করার পাশাপাশি সাহিত্যপ্রেমীদের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

তাঁর পূর্ণ নাম হলো নাজীব ইবন আব্দুল লতিফ ইবন ইব্রাহিম আল-কিলানী। তিনি পশ্চিম মিসরের যেফতা প্রদেশের শারশাবা গ্রামের একটি কৃষক পরিবারে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ০১ জুন মৃতাবিক ১৩৫০ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন।^১ তিনি ছিলেন পিতা মাতার প্রথম সন্তান। কৃষক পরিবারে জন্ম হওয়ায় গ্রামের আর দশটা ছেলের মত তিনিও বাবার সঙ্গে ক্ষেত খামারের কৃষি কাজে অংশ নিতেন।

শিক্ষাজীবন

তৎকালীন বিভাগীয়দের প্রাথমিক নাজীব কিলানী মাত্র চার বছর বয়সে নিজ গ্রামের মজবে যাতায়াত শুরু করেন। মজবেটি তখনকার সময়ের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবিদদের দ্বারা পরিচালিত হতো। আরবী বর্ণমালার সাথে এখানেই তাঁর পরিচয়। সিরাত (নবীদের জীবনী) হস্তলিপি ও অংকসহ তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রামের এ পাঠশালায়। পড়ালেখার প্রতি কিলানীর অত্যধিক আগ্রহ থাকায় তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন তাকে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রদানে তৎপর ছিল। গ্রামের মক্তবে বিবিধ জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি তিনি একটি স্কুলে পড়ালেখা করেন। আট বছর বয়সে তার নানা তাঁকে পাশ্চাত্য সানবাত গ্রামের একটি আমেরিকান মিশনারি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন।^২ সেখানে তিনি ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। এরপর তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৫১ সালে প্রথম ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমান কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়) মেডিক্যাল বিভাগে ভর্তি হন।^৩ চতুর্থ বর্ষের ছাত্র থাকাকালে ‘মুসলিম ব্রাদারহুড’ এর সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ১৯৫৫ সালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১০ বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়।^৪ ১৯৫৯ সালে অসুস্থতার জন্য তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। ১৯৬০ সালে পুনরায় মেডিক্যালে ভর্তি হয়ে তিনি চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।^৫

কর্মজীবন

কৃষক পরিবারে জন্ম হলেও নাজীবের স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হওয়া। জীবনের অনেক ঘাত প্রতিঘাত পিছনে ফেলে নাজীব কিলানী কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারি পড়াশোনা শেষ করে ১৯৬১ সালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন মিসরের মাতৃসেবা হাসপাতালে। সেখান থেকে নিজ গ্রামেও তিনি চালু করেন চিকিৎসা সেবা। কিছুকাল তিনি মিসরের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে বেশ কিছু দিন চাকরি করেন। জামাল আব্দুল নাসের এর শাসনামলে ব্রাদারহুড নেতা কর্মীদের উপর ব্যাপক ধরপাকড় ও নিপীড়ন-নির্যাতন শুরু হলে ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় বারের মত তিনি কারাবন্দি হন।^৬ সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল পরেই তিনি মুক্তিলাভ করে ১৯৬৮ সালের ৩১ মার্চ কুয়েতে চলে যান। এরপর কুয়েত, সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হিসেবে দীর্ঘকাল কর্মরত ছিলেন।^৭ আরব আমিরাতে তিনি ১৬ বছর অতিবাহিত করেন।

বিবাহ

নাজীব কিলানী ১৯৬০ সালে বিশিষ্ট লেখিকা কারীমা শাহীনকে বিবাহ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেক সুখী জীবন যাপন করতেন। তার চারটি সন্তান ছিল যারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। তারা হলেন: ড. জালাল, প্রকৌশলী হুসাম, আইনজীবী মাহমুদ ও একমাত্র কন্যা ড. ইজ্জাত।^৮

ইত্তিকাল

প্রবাস জীবন কাটিয়ে এই বিশিষ্ট লেখক মৃত্যুর মাত্র একবছর পূর্বে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেন। ফিরে আসার কিছুদিন পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও চিকিৎসার জন্য সৌদি আরব গমন করেন এবং সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯৯৫ সালের ৬ মার্চ ৬৪ বছর বয়সে ইত্তিকাল করেন।^৯

পুরস্কার ও সম্মাননা

নাজীব কিলানীর অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ড. তুহা হুসাইন স্বর্ণপদক, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আরবী ভাষা একাডেমী পুরস্কার ও পদক এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক স্বর্ণপদক প্রভৃতি। পরবর্তীতে তাঁর লেখাকে উপজীব্য করে বহু নাটক, সিনেমা ও টিভি সিরিয়াল নির্মিত হয়েছে। এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্মের উপর গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে।^{১০}

আরবী সাহিত্যে নাজীব কিলানীর অবদান

আধুনিক আরবী সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় নাজীব কিলানীর পদচারণা ছিল লক্ষ্য করার মত। তিনি কিশোর বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, কবিতা ও সমালোচনা সাহিত্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তবে উপন্যাস ও গল্পেই তাঁর অবদান বেশি এবং এ ক্ষেত্রে তিনি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির পাশাপাশি আমৃত্যু তিনি তাঁর লেখনী চালিয়ে গেছেন। তিনি আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইসলামী ধারা তৈরিতেও সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। পেশায় ডাক্তার হলেও নাজীবের ভেতরে বসবাস করত একজন কবি ও সাহিত্যিক মন। ছাত্রজীবন থেকেই উপন্যাস ও কবিতা লিখতেন। ১৯৫৬ সালে তাঁর রচিত উপন্যাস الطريق الطويل (দীর্ঘ পথ) মিসরের সরকারি পাঠ্যপুস্তকে সংযোজিত হয় এবং এর জন্য তিনি সরকারিভাবেও পুরস্কৃত হন। ১৯৬০ সালে তিনি তার اليوم الموعود (প্রতিশ্রুত দিবস) উপন্যাসটির জন্য মিসরের ভাষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর লিখিত نور الله الحميدية এবং رحلة الى الله، رجال وذناب، أميرة الجبل আরববিশ্বে ব্যাপক সাড়া ফেলে। উপন্যাস ছাড়াও তিনি বহু কবিতা, ছোটগল্প, গান, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও চিকিৎসাগ্রন্থ রচনা করেছেন। ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা, উপাদান, বৈশিষ্ট ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ করে তিনি বহু লেখালেখি করেছেন।^{১১}

আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তাঁর সাহিত্যকর্ম ইতালি, উর্দু, তুর্কি, ইংরেজি, আফগানী এবং বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।^{১২} পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলো এখনো পূর্ণাঙ্গরূপে সংকলিত হয়নি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হলো:

নাটক

১. سراييفو حبيبتى (সারায়েভো আমার প্রিয়া))	৪. الوجه المظلم للقمر (চাঁদের মলিন বদন)
২. على أسوار دمشق (দামেশকের প্রাচীরে)	৫. محاكمة الاسود العنسي (আসওয়াদ আনসির বিচারের রায়)
৩. حسان بابل (ব্যাবিলনের রূপসী)	৬. الجنرال علي (জেনারেল আলী)

উপন্যাস

১. الطريق الطويل (দীর্ঘ পথ)	২৪. الرجل الذى امن (ঈমানদার লোকটি)
২. رمضان حبيبي (আমার প্রিয় রমজান)	২৫. الرايات السوداء (কালো নিশানগুলো)
৩. عذراء جاكارتا (জাকার্তার কুমারী)	২৬. النداء الخالد (স্বাশত আহ্বান)
৪. أميرة الجبل (পাহাড়ের সম্রাজ্ঞী)	২৭. رحلة الى الله (আল্লাহর পথে যাত্রা)
৫. امرأة عبد المتجلى (আব্দুল মুতাজ্জলার স্ত্রী)	২৮. طلائع الفجر (প্রভাতের উদয়)
৬. اليوم الموعود (প্রতিশ্রুত দিবস)	২৯. نور الله (জ্যোতি- ২য় খণ্ড)
৭. على ابواب خيبر (খায়বারের ফটকে)	৩০. ابتسامة فى قلب شيطان (শয়তানের হৃদয়ে মুচকি হাসি)
৮. دم لفطير صهيون (সিয়োনের রুটির খামিরের জন্য রক্ত)	৩১. الظل الاسود (কৃষ্ণ ছায়া)

৯. الكأس الفارغة (শূন্য গ্লাস)
 ১০. عبد المتجلى (আব্দুল মুতাজ্জলী)
 ১১. ليالى السهاد (বিনিদ্র রজনীগুলো)
 ১২. حمامة سلام (শান্তির পায়রা)
 ১৩. رجال وذناب (মানুষ ও নেকড়ে)
 ১৪. أهل الحميدية (হামিদিয়াবাসী)
 ১৫. اعترافات (অনুমোদনগুলো)
 ১৬. أرض الاشواق (আকাঙ্ক্ষার ভূমি)
 ১৭. عمر يظهر فى القدس (আল-কুদুসে উমরের প্রকাশ)
 ১৮. فى الظلام (অন্ধকারে)
 ১৯. ارض الانبياء (নবীদের ভূমি)
 ২০. عمالقة الشمال (উত্তরের দৈত্য)
 ২১. رأس الشيطان (শয়তানের শিরোমণি)
 ২২. ليل الخطايا (ভুলের রাত্রি)
 ২৩. قاتل حمزة (হামজার ঘাতক)
৩২. حكاية جاد الله (জাদুঘোর কাহিনী)
 ৩৩. الذين يحترقون (দহনকারীরা)
 ৩৪. مواكب الاحرار (মুক্তদের মিছিল)
 ৩৫. نور الله (জ্যোতি- ১ম খণ্ড)
 ৩৬. الربيع العاصف (বৈরি বসন্ত)
 ৩৭. ملكة العنب (আঙ্গুরের রাণী)
 ৩৮. عذراء القرية (গ্রামের কুমারী)
 ৩৯. ليالى تركستان (তুর্কিস্তানের রজনীগুলো)
 ৪০. ليل العبيد (দাসের নিশি)
 ৪১. يوميات الكلب شملول (শামলুল কুকুরের রোজনামাচা)
 ৪২. لقاء عند زمزم (যমযমের নিকটে সাক্ষাৎ)
 ৪৩. مملكة البلعوطي (বালাউতি রাজ্য)
 ৪৪. قضية ابو الفتوح الشرقاوي (আবুল ফুতুহ আশ্শারকাভীর মামলা)

গল্প সংকলন

১. عند الرحيل (প্রস্থানের সময়)
 ২. حكايات طيب (ডাক্তার কাহিনী)
 ৩. العالم الضيق (সংকীর্ণ পৃথিবী)
 ৪. دموع الامير (নেতার অশ্রুধারা)
৫. موعدنا غدا (আমাদের আগামী প্রতিশ্রুতি)
 ৬. فارس هوزان (হাওজানের অশ্বারোহী)
 ৭. الكابوس (দুঃস্বপ্ন)
 ৮. رجال الله (আল্লাহর লোকেরা)

আত্মচরিত

১. لمحات من حياتى (আমার জীবনের কিছু মুহূর্ত, ১ম খণ্ড)
 ২. لمحات من حياتى (আমার জীবনের কিছু মুহূর্ত, ২য় খণ্ড)
 ৩. لمحات من حياتى (আমার জীবনের কিছু মুহূর্ত, ৩য় খণ্ড)
 ৪. لمحات من حياتى (আমার জীবনের কিছু মুহূর্ত, ৪র্থ খণ্ড)
 ৫. لمحات من حياتى (আমার জীবনের কিছু মুহূর্ত, ৫ম খণ্ড)
 ৬. لمحات من حياتى (আমার জীবনের কিছু মুহূর্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

কাব্য সংকলন

১. أغاني الغرباء (পর্যটকদের সঙ্গীত) ৫. كيف ألقاك؟ (তোমার সাথে সাক্ষাত করবো কিভাবে?)
২. عصر الشهداء (শহীদদের যুগ) ৬. مهاجر (দেশ ত্যাগী)
৩. مدينة الكبار (বড় পাপের নগরী) ৭. نحو العلاء (উচ্চতার দিকে)
৪. أغنيات اليل الطويل (দীর্ঘ রজনীর গীত) ৮. لؤلؤة الخليج (উপসাগরের মুক্তা)

গবেষণা ও অন্যান্য

১. الطريق الى اتحاد اسلامي (ইসলামী ঐক্যের পথ)
২. الاسلاميه والمذاهب الادبية (ইসলামী এবং সাহিত্যিক মতাদর্শ)
৩. أدب الاطفال في ضوء الاسلام (ইসলামের আলোকে শিশু সাহিত্য)
৪. نحو مسرح اسلامي (ইসলামী নাট্যশালার দিক)
৫. القصة الاسلاميه وأثرها في نشر الدعوة (দাওয়াত প্রসারে ইসলামী গল্পের প্রভাব)
৬. حول الدين والدولة (ধর্ম ও রাষ্ট্র প্রসঙ্গ)
৭. حول المسرح الاسلامي (ইসলামী নাটক প্রসঙ্গ)
৮. تجربتي الذاتية في القصة الاسلاميه (ইসলামী গল্প বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা)
৯. رحلتي مع الادب الاسلامي (ইসলামী সাহিত্যের সঙ্গে আমার যাত্রা)
১০. أفق الأدب الإسلامي (ইসলামী সাহিত্যের দিগন্ত)
১১. مدخل الى الأدب الإسلامي (ইসলামী সাহিত্যের প্রবেশ পথ)
১২. الاسلام والقوى المضادة (ইসলাম বনাম বিরোধী শক্তি)
১৩. المجتمع المريض (রুগ্ন সমাজ)
১৪. شوقي في ركب الخالدين (শ্বশতদের কাফেলায় আমার আকাঙ্ক্ষা)
১৫. اقبال الشاعر الثائر (বিপ্লবী কবি ইকবাল)
১৬. الثقافة في ضوء الاسلام (ইসলামের আলোকে সংস্কৃতি)
১৭. تحت راية الاسلام (ইসলামের পতাকা তলে)
১৮. نحن والاسلام (আমরা ও ইসলাম)
১৯. الثقافة الصحيحة (সুস্থ সংস্কৃতি)
২০. مستقبل العالم في صحة الطفل (শিশু স্বাস্থ্যে আগামীর বিশ্ব)
২১. الصوم و الصحة (রোজা ও স্বাস্থ্য)
২২. في رحاب الطب النبوي (মহানবীর চিকিৎসার বিশাল অঙ্গনে)
২৩. اعداء الاسلاميه (ইসলামী আদর্শের শত্রুরা)
২৪. الأدب الاسلامي بين النظرية والتطبيق (তত্ত্ব ও প্রয়োগের মাঝে ইসলামী সাহিত্য)
২৫. الاسلام وحركة الحياة (খুজ় اول) (ইসলাম ও জীবনের গতি, ১ম খণ্ড)
২৬. الاسلام وحركة الحياة (খুজ় ثانی) (ইসলাম ও জীবনের গতি, ২য় খণ্ড)
২৭. رعاية المسنين في الإسلام (ইসলামে সুন্যাতের রক্ষণাবেক্ষণ)

নাজীব কিলানীর সাহিত্যে বৈশ্বিক ভাবনা

একজন মিসরীয় হয়েও নাজীব কিলানী আন্তর্জাতিক সমসাময়িক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গবেষণা ও চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর লেখায় একইসাথে ইসলামী ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো যেভাবে স্থান পেয়েছে অন্যান্য সাহিত্যিকের লেখায় সেভাবে পরিলক্ষিত হয়না। তাঁর প্রতিটি লেখাই ছিল স্বতন্ত্র ও বৈচিত্রময়। কিলানীর নিপুন হাতের ছোঁয়ায় তাঁর এসব সাহিত্য হয়ে উঠেছে জীবন্ত। সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা এবং ধর্মীয় ও নৈতিক অবক্ষয়ের সার্বিক চিত্র উঠে এসেছে তাঁর রচনায়।^{১০} এর পাশাপাশি তিনি তাঁর বৈশ্বিক ভাবনাগুলো স্থায়ী সাহিত্যে অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, রূপকথার স্রষ্টা ছিলেন না। তাঁর সাহিত্যের সর্বজন গ্রহণযোগ্যতার এটিই প্রধান কারণ। নাজীব কিলানীর বেশকিছু নাটক-উপন্যাসে সমকালীন মুসলিম বিশ্বে একটি সামগ্রিক চিত্র উঠে এসেছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকটি অত্যন্ত সার্থকতার সাথে এসব লেখায় ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর লেখনিতে শ্লায় যুদ্ধের সময়কালে দুই পরাশক্তি প্রভাবিত অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারগুলোর গণবিরোধী কর্মতৎপরতার একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মগুলো নিম্নে পর্যালোচনাসহ বিশ্লেষণ করা হলো:

سراييفو حبيبتي (সারায়তো আমার প্রিয়া)

নাজীব কিলানী রচিত এটি একটি বিখ্যাত নাটক। আলোচ্য নাটকে নাজীব কিলানী বসনিয়া যুদ্ধের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন। তিনটি দৃশ্যের এই নাটকে শব্দচয়ণ, ঘটনা বর্ণনা ও ভাবার্থের বহিঃপ্রকাশের অসামান্য পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে নাট্যকার তাঁর প্রতিভার অনন্য সাধারণ প্রতিভার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

প্রেক্ষাপট

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সমাজতান্ত্রিক যুগোস্লাভিয়া ফেডারেশন ভেঙে যায়। এ ভাঙ্গন দীর্ঘ দিন চলতে থাকে। অবশেষে যুগোস্লাভিয়া আটটি স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। দেশগুলো হচ্ছে- বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, কসোভো, মেসিডোনিয়া, মন্টিনিগ্রো, সার্বিয়া, ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া ও আলবেনিয়া। ১৯৯২ সালের ১ মার্চ যুগোস্লাভিয়ার কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। কিন্তু সদ্য স্বাধীন দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তখন শুরু হয় দ্বন্দ্ব। তিন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বসনিয়াক নামে পরিচিত ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান। তারা ছিল স্বাধীন বসনিয়া গঠনের পক্ষে। অপর দুই জাতি বসনিয় ক্রোয়েট ও বসনিয় সার্বরাও নতুন করে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবি তোলে। ক্রোয়েটরা প্রতিবেশী ক্রোয়েশিয়ার সঙ্গে আর সার্বরা সার্বিয়ার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। সার্বদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেতে যুগোস্লাভিয়ার মুসলমান ও ক্রোয়েটরা বরাবরই স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে আসছিল। মূলত যুগোস্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে তারা মুসলিম কমিউনিস্টের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর নির্যাতনের পথ বেছে নেয়। তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের দান-সম্পত্তি (ওয়াকফ) বাজেয়াপ্ত করে। অধিকাংশ মসজিদ এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়। ১৯৪১-৪৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সার্বরা ১ লক্ষ ২০ হাজার মুসলিমকে হত্যা করে। একমাত্র দ্রীনা নদীর দুই তীরে ৬০ হাজার মুসলিমকে যবেহ করে নদীতে ফেলে দেয়ায় নদীর পানি লাল হয়ে যায়।^{১১} কিন্তু বসনিয়দের স্বাধীনতা এই দাবির বৈধতা অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও মার্কিন সরকার। তারা গণভোটের শর্ত জুড়ে দেয়। বসনিয় সার্বরা গণভোট বর্জন করে তাদের নেতৃত্বে একটি রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানায়। কিন্তু বসনিয়ার সরকার পূর্বসমঝোতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী গণভোট দেয়। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ওই গণভোটে দেশটির ৬৪ শতাংশ নাগরিক একটি অবিভক্ত ও স্বাধীন বসনিয়া গড়ার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ইউরোপীয় কমিউনিটির

স্বীকৃতির দিনই ১৯৯২ সালের ৭ এপ্রিল সার্ব আত্মসনের শিকার হয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনা। বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব-বিভেদ সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে বসনিয়ার পূর্বাঞ্চলে। এই সুযোগে সার্বিয়ার সীমান্ত লাগোয়া ওই অঞ্চলে সার্বিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় সার্ব জাতীয়তাবাদীরা। বহিরাগত ও দখলদার এই সার্বদের নেতৃত্ব দেন রাদোভান কারাদজিচ। সার্বিয়ার সেনাবাহিনীর সহায়তায় তিনি ১৯৯২ সালের ২ মে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো দখল করেন।^{১৫} বসনিয়াক ও ক্রোয়েটদের বিতাড়িত করে বসনিয়ার বিশাল অংশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সার্বদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করেন। আর নিজেকে ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে। দখল করা এ রাষ্ট্রের সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন সার্বিয়ার সাবেক সেনা কর্মকর্তা রাতকো ম্লাদিচ। ‘বসনিয়ার কসাই’ নামে কুখ্যাত ম্লাদিচের নেতৃত্বে সার্ব সেনারা বসনিয়ার একের পর এক এলাকার দখল নিতে শুরু করে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ক্রোয়েট ও মুসলমানরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। বসনিয়ার যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৯২ সালের ৭ এপ্রিল আর শেষ হয় ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বরে। প্রায় চার বছর স্থায়ী এই যুদ্ধে মূলত বসনিয়ার মুসলমানদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে জাতিগত ‘শুদ্ধি অভিযান’ চালায় সার্বরা। সার্বরা নির্বিচার গণহত্যা ও ধর্ষণকে যুদ্ধজয়ের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। পঙ্গু পুরুষ, ধর্ষণ ও নির্যাতনে অর্থহীন নারী ও শিশুরা এক টুকরো রুটির আশায় সারায়েভো বিমান বন্দরে জাতিসংঘ শিবিরের সামনে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। এ অবস্থাতেই গুলি চালিয়ে তাদেরকে খুন করতে থাকে সার্বরা।^{১৬} ইতিহাসের অন্যতম রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে এক লাখের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে আর বাস্তুচ্যুত হয় ২২ লাখ। বসনিয়াতে মুসলিমদের যেভাবে হিংস্র, পাষাণ্ড সার্বদের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং জালিম ও মজলুমের এ যুদ্ধে পাশ্চাত্য সমাজ যেভাবে দ্বিমুখী পলিসি গ্রহণ করেছে তাতে করে মুসলিম জাতি পাশ্চাত্যের তথাকথিক প্রগতিবাদী সভ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়েছে এবং তাদের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।^{১৭}

নাটকের প্রধান চরিত্র

শেখ মুহাম্মদ (পিতা), জেনারেল আলী (নায়ক), চাচা মারুফ (শেখ মুহাম্মদের ভাই), বালালুফিতাশ (শেখ মুহাম্মদের দ্বিতীয় ছেলে), সালুন (শেখ মুহাম্মদের ছোট ছেলে), কয়েকজন বন্দি ও আরো কয়েকটি অপ্রধান চরিত্র।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

নাটকের প্রথম দিকেই দেখা যায় সারায়েভো শহরের কোন এক ঘরের বিশাল হল রুমে শেখ মুহাম্মদ, চাচা মারুফ, বালালুফিতাশ ও সালুন আলোচনা করছেন সার্বিয়ার বর্বরতা নিয়ে। সেই আলোচনায় উঠে আসে সার্বিয়ার দ্বারা মুসলমানদের মসজিদ হোটেল ধ্বংস করা, মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেওয়া সহ মুসলিম নারীদেরকে নির্বিচারে ধর্ষণ করার কথা। অতঃপর সেখানে মুসলমানদের উপর এমন বিপদ নেমে আসার কারণ ও সেখান থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা চলছে। এ বিপদের কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে অলসতা আর ইসলামের বিধানকে অমান্য করা। যেমন-শেখ মুহাম্মদের উক্তি-

كنا نعيش لنأكل، لم نفكر في المستقبل... لم نتعلم أصول ديننا لنعمل بها...^{১৮}

“আমরা শুধু পেটের জন্য জীবন যাপন করছি কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে মোটেও ভাবিনি এমনকি আমরা ধর্মের মৌলিক বিধান থেকে আমল করার শিক্ষাও গ্রহণ করিনি।” আলী (শেখ মুহাম্মদের পুত্র) সেখানে ফিরে আসে যে এক সময় পাহাড়ে চলে গিয়েছিল এবং ছিনতাইকারীতে পরিণত হয়েছিল। এক সময় সে তাঁর ভুল বুঝতে পারে এবং আল্লাহ তা’আলা ও উপস্থিত সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা আলীর কাছ থেকে জানতে পারে যে সার্বিয়ারা তাদের ভগ্নিপতি আলীর মা ও বার বছরের শিশুকে হত্যা করেছে। আলী চিৎকার

করে বসনিয়দের আরো পরিশুদ্ধ হয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানায়। যেমন নাটকে এসেছে-

يا أهل البوسنة والمهرسك، عودوا الى الله واحملوا كل ما تملكون من سلاح ، وتصدوا للكفر وأذنابه اما النصر ، او الموت-^{১৯}

“হে বসনিয়া ও হার্জেগোবিনার অধিবাসীগণ তোমরা আল্লাহ তা’আলার নিকট ফিরে যাও; তোমরা তোমাদের অস্ত্র হাতে তুলে নাও এবং কাফের ও তাদের দালালদের প্রতিহত কর। আর জেনে রাখ হয়তো বিজয় নয়তো মৃত্যু।”

এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতেও পাহাড়ের গুহায় জেনারেল আলী ও একদল সৈন্য নামাজ আদায় করছেন। সেখানে তিনজন বন্দিকে আনা হয়। তাদের মধ্যে একজন বন্দি অনেক মুসলিম পুরুষ, শিশু ও নারীদেরকে নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে। আরেকজন একসাথে পাঁচ শিশুকে জবাই করে হত্যা করেছে। আর তৃতীয়জন এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে যিশুর সন্তুষ্ট করার জন্য। তারা(বন্দিরা) তাদের ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের ধারণা ধর্ম এবং বাইবেল শুধু গির্জার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমন এক বন্দি যুক্তি পদর্শন করে বলে যে, পার্থিব জগত আর ধর্ম দু’টি আলাদা বিষয়। জেনারেল আলী তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তাদের (বন্দিদের) কৃত অপরাধ কোন ধর্ম কিংবা আইন কখনোই স্বীকৃতি দেয়না। তাদেরকে পাকড়াও করে বন্দিশালার দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন জেনারেল আলী। সেখানে সৌদি প্রতিনিধি, পাকিস্তানি জেনারেল ও মিসরীয় আলিম উপস্থিত হন যারা বসনিয়দের সাহায্য করছেন যুদ্ধের ময়দানে। আলীর সাথে সাক্ষাৎ শেষে তারা সেখানে বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের সাহায্যের ধরণ ও কর্মকাণ্ডের বর্ণনা প্রদান করেন। সেখানে মুসলিম মুজাহিদরা উপস্থিত হয়ে সংবাদ প্রদান করে যে, তারা ২০ জনের একটি সার্বিয় সামরিক কাফেলা ধ্বংস করে ফেলেছে। আর তাদের কাছে সংবাদ আছে আগামীপরশু দিন সার্বিয়রা বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে আক্রমণ করবে। অতঃপর জেনারেল আলী তাদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দেন।

শেখ মুহাম্মদের বাড়ির প্রশস্ত চত্বরে আছেন শেখ মুহাম্মদ এবং তাঁর তিন সন্তান ও চাচা মারুফ। জেনারেল আলীকে শেখ মুহাম্মদ তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছেন। অন্যদিকে পুলিশ জেনারেল আলীকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। কিন্তু সারায়েভোর জনগণ জেনারেল আলীকে মহানায়কের উপাধি দিয়েছে। সার্বিয়দের দখলদারিত্ব ও অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে এখানে। যুক্তরাষ্ট্র সার্বিয়দের বিরুদ্ধে বিমান হামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাদের বিচারের ঘোষণা দিয়েছে। অথচ জাতিসংঘের প্রস্তাবের আলোচনায় তারা সার্বিয়দের পক্ষপাতিত্ব করেছিল। এদিকে বালালুফিতাশ জানায় যে, সার্বিয়রা শেখ মুহাম্মদের পাশের ভবনেই বিমান হামলা চালিয়েছে। এতে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। গৃহপালিত পশু-পাখিসহ অসংখ্য ফল ও ফসলের বাগান পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। সার্বদের এ নিষ্ঠুরতা বসনিয়া নয় বরং এর লক্ষ্য মুসলমানদের নির্মূল করা। আন্তর্জাতিক বিশ্বের নীরবতায় তারা আরো বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে লাখ লাখ নিরাপরাধ বসনিয় মুসলিম উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে। জেনারেল আলী সবাইকে নিরাপদ অশ্রয়স্থলে চলে যেতে বলে তাদের পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য আর বালালুফিতাশ আফসোস করে বলতে থাকে ^{২০} “القرار ينتهك كل يوم-” “কোথায় জাতিসংঘ? আর কোথায় তাদের (নিরাপত্তা পরিষদের) গৃহীত রায়? এটা তো প্রত্যহ ভঙ্গ করা হচ্ছে।”

এরপর বালালুফিতাশ চেষ্টা করেন জেনারেল আলীকে তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু জেনারেল আলী তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে এভাবে কাপুরুষের মত বেঁচে থাকার চেয়ে যুদ্ধের ময়দানে বীরের বেশে অবস্থান করা ও বীরের বেশে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। এরপর জেনারেল আলী ওয়্যারলেসের মাধ্যমে শত্রু ঘাঁটিতে পাল্টা বোমা হামলার নির্দেশ দেয়। জাতিসংঘের প্রস্তাব উপেক্ষা করে সার্বিয়দের বোমা হামলায় জেনারেল

আলী ক্ষুদ্ধ হয় এবং প্রস্তাবের কাগজগুলো চুল্লির মধ্যে নিক্ষেপ করে। জেনারেল আলী বালালুফিতাশকে কিছু উপদেশ দিয়ে সে তাঁর অস্ত্রসহওয়ারলেস হাতে তুলে নিল। এরপর সে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালো এবং সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে বিজয়ের ইঙ্গিত দিল। যেমন নাটকে এসেছে-

اننى أرى من بعيد أضواء الفجر الأتى- انه ليس حلما يا بلالوفيتش-^{২১}

“আমি দূর থেকে আসন্ন প্রভাতের আলো দেখতে পাচ্ছি হে বালালুফিতাশ!”

অতপর বালালুফিতাশ তার ভাই আলীর দেহ কোলে টেনে নিল। যার বাম পার্শ্বের কাঁধ থেকে বুকের উপর দিয়ে রক্ত ঝরছিল। আর এভাবেই যুদ্ধাহত আলীর কণ্ঠে বিজয়ের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি হয়।

عذراء جاكارتا (জাকার্তার কুমারী)

নাজীব কিলানী ইন্দোনেশিয়ার চরমপন্থী কমিউনিস্ট গেরিলাদের সশস্ত্র সংগ্রাম আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে এ বিখ্যাত উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এখানে আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে।

প্রেক্ষাপট

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা এবং এর কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জের ঘটনা উক্ত উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এই উপন্যাসে লেখক ইন্দোনেশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির একটি কমিউনিস্ট বিপ্লব এবং দেশটিতে ক্ষমতা দখলের প্রয়াস নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান সুকর্ণো ও চীন কমিউনিস্ট প্রজাতন্ত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল। কমিউনিস্ট ও ইন্দোনেশিয়ান ইসলামিক দল *মাসুমি* (মাশুমী) এর প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এতে অনেকে শহীদ অনেকে বন্দি হয়েছিল ও অনেককে গুম করা হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ছিল এটি। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট কর্নেল উনতুঙ এর নেতৃত্বে হালিম বিমান ঘাঁটি হতে ৬জন জেনারেলকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনাকে সাম্যবাদী আভ্যুত্থান বলে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন।^{২২} এই গণহত্যা চালিয়েছিল দেশটির সামরিক বাহিনী। ওই সময় কমপক্ষে ৫ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়। অন্যদিকে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়েছে। বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল হলো সম্প্রসারণবাদী শক্তি হিসেবে জাপানের ক্ষমতা হ্রাস, ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপীয় উপনিবেশ শাসিত শক্তিগুলোর কলেবর সঙ্কোচন, জার্মানির বিভাজন, ভারতের স্বাধীনতা লাভ পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সম্প্রসারণ এবং সারা দুনিয়াতে স্বাধীনতা যুদ্ধ বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি এবং চার্চিলের ঘোষণা অনুযায়ী পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে লৌহ যবনিকার উদ্ভব এবং নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও সেখানে উত্থান ঘটেছে শ্রমশাসকদের। কমিউনিস্ট দ্বারা বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের দুর্বল ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার প্রয়াস তারা চালিয়েছিল। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরু হলে এর প্রভাব ইন্দোনেশিয়ার জাভাতেও এসে পড়ে। রাশিয়া ও চীনের সহযোগিতা নিয়ে কমিউনিস্টরা হরতাল-ধর্মঘট আন্দোলন করে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলে।^{২৩} ইন্দোনেশিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো উক্ত উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আরও উপস্থাপন করেছেন মুসলমানদের বীরত্ব ও ইসলামের জন্য তাদের ত্যাগের কথা।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র

হাজী মুহাম্মাদ ইদ্রিস (ইন্দোনেশিয়ান ইসলামী দল *মাসুমি* এর একনিষ্ঠ সদস্য), ফাতেমা (নায়িকা ও হাজী মুহাম্মাদ ইদ্রিসের কন্যা), আবুল হাসান (নায়ক), জামিলা (সংগঠনের সদস্য), আনানজ (কারারক্ষক) এবং যাইম নামক এক গোয়েন্দা বিভাগের সেনা কর্মকর্তা।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

জাকার্তা একটি আশ্চর্যজনক শহর। সেখানকার মহামূল্যবান জাঁকজমকপূর্ণ অট্টালিকার আশ্চর্যজনক গালিচা, বিস্ময়কর ঝাড়বাতি, নির্মাণের বিস্ময়কর কৌশল, চারিদিকে ফুল-ফলে ভরা মনোরম বাগান এবং সেখানে কিছু অপরিচিত গাছও যার সুগন্ধ সমস্ত দুর্গন্ধকে দূর করে দেয়। ফাতেমা একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং ইন্দোনেশিয়ান ইসলামী দল *মাসুমী* (মাসুমী) এর একজন সদস্য। হাজী মুহাম্মদ ইদরীস হলেন ফাতেমার পিতা। তিনি আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা অর্জনসহ হজ ও একবার ইউরোপ ভ্রমণ করেছেন। তিনিও এই দলকে মনে প্রাণে ভালোবাসেন। ফলে তার উপর নানারকম অত্যাচার নির্যাতন নেমে আসে। ইন্দোনেশিয়ার চরমপন্থী কমিউনিস্ট গেরিলাদের সশস্ত্র সংগ্রাম আর মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতিরোধের প্রেক্ষাপটে রচিত এ উপন্যাসে দেখা যায়, ফাতিমা একজন নারী হয়েও স্বজাতির আদর্শের লড়াইয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। এমনকি ফাতিমা ইসলামের বিজয়ের জন্য নিজের জীবন উৎর্গস করতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

আবুল হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে ফাতেমাকে পছন্দ করে এবং ফাতেমার সাথে তার বিবাহ হওয়ার কথা আছে। সে বিভিন্নভাবে যুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করে। যায়িম নামক এক সেনাকর্মকর্তার স্ত্রী ‘তানাতি’ তাকে বলে আমি তোমার সকল অপকর্মের বিষয় জানি, তুমি তোমার খ্যাতি ও সন্মানের জন্য এসকল অন্যায় কাজ করো। আমি অন্যায়কারীকে ঘৃণা করি। যায়িম ইন্দোনেশিয়ার একটি কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষের সমতা বিষয়ে বক্তব্য দেয় এবং বলে সামন্তবাদ ও কিছু ধর্মের গোঁড়ামীর কারণে নারীদের কাজে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। তার বক্তব্য শেষ হলে সেখানে ফাতেমাও তার বক্তব্যের বিরোধিতা করে এবং যুক্তি খণ্ডন করে বলে যে, নারী পুরুষ সমান কথাটি পুরোটাই ভুল। কেননা পুরুষের হরমোন আর নারীর হরমোন এক নয়। পুরুষের শরীরের গঠন, শক্তি ও নারীর শরীরের গঠন ও শক্তি কখনোই এক নয়। যায়িম গোয়েন্দা দপ্তরে ঢুকে কিছু ফাইল খোঁজাখুঁজি করে। সেখানে রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী এমনকি ধর্মীয় নেতাদেরও গোপন ফাইল রয়েছে। এদিকে হাজী মুহাম্মদ ইদরীস অনেক চিন্তায় রয়েছেন। কারণ ইন্দোনেশিয়ার অবস্থা দিনদিন খুব খারাপের দিকে যাচ্ছে। দেশের অবস্থা আমলা ও রাষ্ট্রের ধনীক শ্রেণীর হাতে চলে গেছে। তাদের ইচ্ছানুসারে দেশ পরিচালিত হচ্ছে। আর গতদিন কলেজ থেকে ফাতেমা ফ্যাকাশে ও ভীত চেহারায়া বাড়ি ফিরে কান্না শুরু করে। এদিকে হাজী মুহাম্মদ ইদরীস অপহৃত হন। অপহরনকারীরা তার দুচোখ ও হাত বেঁধে রেখেছে। তিনি হাতদুটো খোলার চেষ্টা করছেন কিন্তু খুলতে পারেন না। তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন, এটাই কি আমার সেই প্রিয় দেশ? কখনো তুমি এমন হতে পারো না। ফাতেমা কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে তার বাবা এখনও ফিরে আসেনি। বাড়ির সবাই চিন্তায় অস্থির। সকলেই তাকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। লেখকের ভাষায় ফাতেমার এ দূর্বাবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে এভাবে-

عدت فاطمة من الجامعة شاحبة الوجه، شاردة النظرات، متعبة ان أبها لم يعد-^{২৪}

“ফাতেমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফ্যাকাশে বিবর্ণ চেহারায়া বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে তার বাবা এখনও ফিরে আসেনি।”

হাজী মুহাম্মদ ইদরীস এর বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এসেছে। তারা সবাই চিন্তিত। তারা তাকে খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন ধরনের চিন্তা করছে। একদিন বৃষ্টির দিন সকালে ফাতেমা দরজার নিচে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি পায় যাতে লেখা আছে হাজী মুহাম্মদ ইদরীস তোমাদের কাছে সাহায্য চায় এবং কারাগার থেকে মুক্তির জন্য জরুরী মধ্যস্থতার অনুরোধ করছে। তিনি বড় ধরনের সমস্যার মধ্যে আছেন। তার পরিবারের সকলেই পেরেশান হয়ে যায় এবং চিঠির উদ্দেশ্য বের করার চেষ্টা চালায়। যারফুদিন নামে এক ব্যক্তি ফাতেমাদের বাড়িতে শুক্রবার দশটার সময় আসে। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নিজেকে গোয়েন্দা কর্মকর্তা হিসেবে উল্লেখ করে। ফাতেমার মা তাকে ভেতরে আসার অনুমতি প্রদান করে। আর সে দেওয়ালের আরবী

লেখাগুলো পর্যবেক্ষণ করে। ফাতেমা তাকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি বাবাকে পেয়েছেন? সে উত্তরে বলে ماشومي ‘মাশুমি’ দলের সাথে আপনাদের কোন দ্বন্দ্ব ছিল কি না। তারা তাকে জানায় যে, না আমার বাবা একজন সৎ মানুষ ছিল। তার সাথে কোন ব্যক্তির শত্রুতা ছিল না। আবুল হাসানের পিতার বয়স পঁয়ষট্টি বছর। তিনি তিন বছর ধরে বাড়ির বাইরে যেতে পারেন না। তার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। তিনি ভালোভাবে কথা বলতে পারেন না। তার বাবা তার মাকে জিজ্ঞাসা করে আবুল হাসান কি ফিরে আসবে? কান্না ছাড়া তার মা কোন কথা বলতে পারেনা। হাসানের পিতা তার মায়ের কাছে খাবার চায়। তিনি বলেন ঘরে কোন খাবার নেই। তিনি দুঃখ করে বলেন, আমি মরার আগ পর্যন্ত আবুল হাসান আর ফিরে আসবে না। যায়িম নেতার প্রাসাদে যায়। নেতার প্রাসাদ চমৎকার। সেখানে অনেক ধরনের গোলাপ ফুলের গাছ। বিভিন্ন ধরনের গাছপালা। নেতার কাছে গিয়ে নেতাকে সন্মান প্রদর্শন করে প্রথমে নেতার স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা করে। ফাতেমা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। কোন কিছু আর তাকে ভালো লাগে না। সে মনে মনে চিন্তা করে এটাই হলো আমার জাকার্তা যেখানে মানুষ নিয়ম নিজে বানিয়ে নেয়। এসব চিন্তা করে অনেক পরে সে বাড়ি ফিরে। ফাতেমা সবকিছু হারিয়েও নিজ আদর্শ ও দেশের জন্য তার স্বগতোক্তি ছিল:

إذن لن يعود أبي ... ولن يخرج أبو الحسن ... و سيتحول رجال الإسلام خلف الأسوار إلى عظام نخرة... ستموت كل القيم الفاضلة في بلادنا الحبيبة...^{২৫}

“এখন আমার বাবা আর ফিরবেন না কোনদিন, আবুল হাসানও আর কখনও বের হবে না... ইসলামপন্থীরা প্রাচীরের আড়ালে চলে যাবে... প্রিয় দেশ মাতৃকার প্রতিটি মর্যাদাবান শক্তি নিঃশেষ হতে থাকবে....।”

যায়িম তার স্ত্রীকে বলে যে, আমাদের উচিত ফাতেমার বাবা হারিয়ে যাওয়াতে তাদের সহযোগিতা করা। কেননা তারা আমাদের প্রতিবেশী। জেলখানায় বন্দি আবুল হাসানের মনে পড়ছে বৃদ্ধ বাবা অসহায় মা ও ফাতেমার কথা। সে মনে মনে বলে এখানে কোন অর্থনীতি, দর্শন এবং সমাজের কোন দাম নেই এবং মানুষেরও কোন মূল্য নেই। এসকল চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খায়। ফাতেমার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসটি শেষ হয়। সব কিছু শূন্যে পড়ে থাকে। তার বাবা দুচোখের পানি ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করে কান্না করে। আর এদিকে আবুল হাসান ফাতেমাকে মনে প্রাণে চায়। তাকে ছাড়া তার বাঁচা অসম্ভব মনে হয়। তাকে খাবার, বাতাস ও পানির মত প্রয়োজন মনে হয়। সে তাকে নিজের প্রাণের মত ভালোবাসে যেমন উপন্যাস এসেছে-
شعر أبو الحسن بغير قليل من الحزن وهو يتذكر (فاتمة) ادرك أنها ضرورة له كالماء والهواء والطعام-^{২৬}

“আবুল হাসান কিছুটা হতাশা অনুভব করে। সে ফাতেমাকে খাবার, বাতাস ও পানির মত প্রয়োজন মনে করছে।”

ليالي تركستان (তুর্কিস্তানের রাত্রিগুলো)

ليالي تركستان (তুর্কিস্তানের রাত্রিগুলো) বিশ্বনন্দিত লেখক নাজীব কিলানীর প্রথম উপন্যাস। এটি মুসলমানদের দুর্দশার কথা বলে। তুর্কিস্তান দখল করার পর চীনারা ইসলামের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এবং মূল্যবোধ ধ্বংস করতে শুরু করে। উপন্যাসটি পূর্ব তুর্কিস্তানের বর্তমান জিনজিয়াং অঞ্চল চীনা দখল এবং সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের নীতির উপর তাদের সরাসরি আগ্রাসনের বিশদ বর্ণনা করে। এ উপন্যাসটি উনিশটি অধ্যায় নিয়ে গঠিত।

প্রেক্ষাপট

উপন্যাসটি পূর্ব তুর্কিস্তানের বর্তমান জিনজিয়াং চীনা দখল এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবন ও ইসলামের নীতির উপর তাদের সরাসরি আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে রচিত। চীনারা ইসলামের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন এবং মূল্যবোধ ধ্বংস করতে শুরু করে। তারা জোরপূর্বক মুসলিম নারীদের বিবাহ করতে বাধ্য করেছিল।

১৯৩০ সালে কুমুল প্রদেশটি চীন দখল করে নেয় এবং এই অঞ্চলে চীনা নেতা শাসক নির্বাচিত হয়ে আদেশ জারি করে যে, তুর্কি কন্যাকে যেকোন চীনা ভিন্ন ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ করতে পারবে। তিনি কুমুলের আমিরের কন্যার সঙ্গে চীনা নেতার বিবাহ দিতে বলেন। কিন্তু আমির তার সাথে বিবাহ দিতে অস্বীকার করে। কেননা কোন মুসলমানের সাথে কাফেরের বিবাহ ইসলাম সম্মত নয়। চীনা সেনাপতি ক্ষুব্ধ হয়ে আমিরে কুমুলকে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করে। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পারিবারিক ইসলামী আইন রহিত করা হয়। ১৯৫১ সালের ২৯ এপ্রিল ফাঁসির ময়দানে নিয়ে উসমান বাটোরকে ফাঁসি দেওয়া হয়। পুরোদমে মুসলিম বিরোধী অভিযান শুরু হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। অধিকাংশ মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়। আযান নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের বন্দি করা হয়। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সমস্ত মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা বিশেষ করে পূর্ব তুর্কিস্তান, কানুস এবং মঙ্গোলিয়ায় অমুসলিমদের বসতি গড়ার প্রতি একটি সমন্বিত প্রয়াস হাতে নেয়া হয়। মুসলমানদের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমশঃ দখল, লুটপাট এবং ধ্বংস করে দেয় হয়। ফলে একদিকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থা অন্যদিকে বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুসলমানদের ঘরে ঘরে দুর্ভিক্ষ এনে দেয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে চীনের সংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় মুসলমানদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। মসজিদগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে ইমামকে হত্যা ও কুরআন-হাদিস নিষিদ্ধ করা হয়। এতে পূর্ব তুর্কিস্তান ও অন্যান্য স্থানে মুসলমানরা বিদ্রোহ করে।^{২৭} রাশিয়া পশ্চিম তুর্কিস্তান দখল করে। চীনা সৈন্যরা মুসলমানদের উপর কঠিন আক্রমণ করেছিল কিন্তু তারা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারেনি। রুশরা এই ঘটনাগুলি সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছিল। রুশ দখলে থাকা মঙ্গোলিয়া রাজ্যে স্টালিন তার অনুসারীদেরকে পূর্ব তুর্কিস্তানের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি ‘জাগাম সিন দরগান’ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল খাজা নেওয়াজের সাথে দেখা করতে পাঠান এবং তাকে সামরিক সাহায্যের প্রস্তাব দেন। কিন্তু খাজা নেওয়াজ এই সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তিনি দেখেন যে রাশিয়াও তাদের শত্রু। বিদ্রোহ তার পথ ধরেই এসেছে। রাশিয়া ও চীনের চাপের মুখে মুসলিম পুরুষরা পাহাড়ে অবস্থান নিতে বাধ্য হয় এবং তাদের হাজার হাজার লোক যুদ্ধে মারা যায়।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র

মুস্তফা মুরাদ হযরত (উপন্যাসের নায়ক), নাজমুন নাহার (উপন্যাসের নায়িকা), মনসুর দরগার (নায়কের বন্ধু), খাজা নেওয়াজ, জেনারেল শরীফ, মাওলানা সাবেত, উসমান বাটোর, শেখ আলী খান ও প্রেসিডেন্ট আলী খান।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

উপন্যাসটিতে লেখক প্রথমে তার এবং ব্যবসায়ী মুস্তফা মুরাদের মধ্যে মক্কা থেকে আগত তুর্কি টুপি, তসবীহ ও জায়নামায সম্পর্কে সংলাপের বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যবসায়ী মুস্তফা মুরাদ তুর্কিস্তান থেকে আগত। লেখক তার নিকট তুর্কিস্তান সম্পর্কে জানতে চান কারণ তিনি তা চেনেনা না। মুস্তাফা কষ্ট পেয়ে বললেন অনেকে তুর্কিস্তান চেনে না অথচ এটি একটি ইসলামি রাষ্ট্র। ইমাম বুখারী, ইবনে সিনা, আল-ফারাবি এবং আল-বিরূনির মত অনেক বড় বড় পণ্ডিত তুর্কিস্তানের অধিবাসী ছিলেন। এটি উপনিবেশ দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কিস্তানে বিভক্ত ছিল। রাশিয়া পশ্চিম তুর্কিস্তান দখল করে আর পূর্ব তুর্কিস্তান চীনারা দখল করে। স্বর্ণযুগে যেই তুর্কিস্তানকে ‘দ্বিতীয় আন্দালুস’ বলা হতো তার গৌরব আজ হারিয়ে গেছে। উপন্যাসের নায়ক মুস্তফা ১৯৩০ সালের ‘কুমুলে’ বসবাস করতো। সে সেখানকার প্রাসাদের রক্ষক ছিল। চীন এই প্রদেশটি দখল করে নেয় এবং এই অঞ্চলে চীনা নেতা শাসক নির্বাচিত হয়। একদিন চীনা নেতা একটি আদেশ জারি করে যেকোন তুর্কি কন্যাকে যেকোন চীনা বিবাহ করতে পারবে। কুমুলের আমিরের কন্যা নাজমুন নাহারকে চীনা নেতার সাথে বিবাহ দিতে বলা হয়। কিন্তু আমির তার সাথে বিবাহ দিতে অস্বীকার করে। কারণ কোন

মুসলমানের সাথে অমুসলিমের বিবাহ ইসলাম সম্মত নয়। চীনা সেনাপতি ক্ষুব্ধ হয়ে আমিরে কুমুলকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। এই ঘটনার পর থেকে প্রতিটি তুর্কি কন্যা হিজরত করার পূর্বে একজন মুসলিম পুরুষকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে প্রবিবাহ করার জন্য। উপন্যাসের ভাষায়-

المنشور يلزم أى تركستاني بأن يزوج ابنته من أى صيني يتقدم لطلب يدها، برغم اختلاف العقيدة.^{২৮}
“তুর্কিস্তানী কন্যাদের কোন চীনা বিবাহের প্রস্তাব দিলে জোরপূর্বক বিবাহের জন্য বাধ্য করা হতো ভিন্ন বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও।”

এদিকে কুমুলের অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। চীনা পুলিশ তুর্কি কন্যাদের চীনা সৈন্য ও অভিবাসীদের বিয়ে করতে বাধ্য করে। এই পরিস্থিতিতে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে। তার নাম খাজা নিয়াজ হাজী। যিনি তুর্কি মুসলমানদের ধর্ম, সমাজ ও দেশ রক্ষায় সংগ্রাম করতে উৎসাহিত করেন। খাজা নিয়াজ হাজী মুস্তফাকে কারাগারে আমিরের কাছে গিয়ে একটি উপায় খুঁজে বের করতে বলেন। আমির কিছু কৌশল ঠিক করে চীনা নেতার কাছে একটি চিঠি লিখেন, যাতে তিনি চীনা নেতার কাছে ক্ষমা চান এবং তার সাথে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। চীনা নেতার সাথে তার বৈঠক হয় এবং আমির তাকে তুর্কিস্তানের ইসলামিক পণ্ডিতদের কাছে মুসলিম কন্যা অমুসলিমদের সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য ধর্মীয় ফতোয়া তলব করেন। চীনা আমির তাতে রাজী হয়। যেমন আমিরে উক্তি:

ودخل الامير قصره، همست زوجته: مابك؟؟ رفع اليه عينين مبللتين بالدموع وقال: إننى انتظر امر الله، انهم لايفرقون الرحمة، القائد يريد ان يتزوج ابنتى، في اية كريمة او دين يفرض على الفتاة ان تتزوج برغم ارادتها، العلاقة يا فتاتى بين الغالب والمغلوب لا تلتفت للمبادئ او الارادة الحرة.^{২৯}
“আমির তার প্রাসাদে প্রবেশ করলে স্ত্রী ফিসফিস করে বলল: আপনার কি হয়েছে? তিনি অশ্রুশ্রিত নয়নে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন: আমি আল্লাহর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি। তারা দয়া-মায়া বোবোনা। চীনা নেতা আমার কন্যাকে বিয়ে করতে চায়। ভিন্ন ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও কন্যাকে ইচ্ছার বাইরে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করছে। হে আমার কন্যা, সম্পর্ক হচ্ছে বিজয়ী আর পরাজিতের মধ্যে। এখানে ইচ্ছে বা স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই।”

ইসলামী পণ্ডিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে আমির পরামর্শ করেন এবং খাজা নেওয়াজও তাতে অংশ নেয়। খাজা নেওয়াজ অমুসলিমের সাথে মুসলিম কন্যার বিবাহ দিতে সম্মতি প্রকাশ করেন। উপস্থিত আলিমগণ তা মানতে অসম্মতি জানান কিন্তু আমির খাজা নেওয়াজের সাথে একমত হন। জমকালো সংবর্ধনার মাধ্যমে কুমুল রাজপ্রাসাদে বিয়ের আয়োজন করা হয়। চীনা সৈন্যরা যখন মদপান এবং পার্টি উপভোগ করতে মনোযোগী হয়ে পড়ে তখন তুর্কি মুসলমানগণ তাদের আক্রমণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে চীনা সেনাপতিসহ তার বড় বড় কর্মকর্তারা মারা যায়। এর পর সকলে চীনা সৈন্যদের উপর আক্রমণ করে এবং কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্ত করে। মুস্তফা জিহাদের জন্য তুর্কি মুসলমানদের প্রস্তুত হতে বলে। এদিকে শত্রুদের মোকাবিলার কৌশল অনুসন্ধানের জন্য একটি বড় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় কয়েকজন বক্তা যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের অসম্মতি প্রকাশ করে এবং আলোচনা করার পরামর্শ দেয়। খাজা নেওয়াজ তাদের উপর ক্ষুব্ধ হন এবং দৃঢ়চিত্তে বলেন যে, চীন আমাদের ভূমি দখল করার চেষ্টা করছে ও আমার ধর্মের উপর তাদের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সুতরাং আমাদের অবশ্যই নিজ মাতৃভূমি রক্ষা ও ইসলাম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে হবে। পরে সকলেই খাজা নেওয়াজের সাথে একমত হয় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পরে চীনা সৈন্যরা মুসলমানদের উপর কঠিন আক্রমণ করেছিল কিন্তু তারা মুসলমানদের পরাজিত করতে পারেনি। রুশরা এই ঘটনাগুলো সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। রুশ দখলে থাকা মঙ্গোলিয়া রাজ্যে স্টালিন তার অনুসারীদেরকে পূর্ব তুর্কিস্তানের বিদ্রোহীদের সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি ‘জাগাম সিন দরগান’ এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল খাজা নেওয়াজের সাথে সাক্ষাত করতে পাঠিয়ে তাকে সামরিক সাহায্যের

প্রস্তাব দেন। কিন্তু খাজা নেওয়াজ এই সহায়তা প্রত্যাখান করেন। কারণ তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে রাশিয়াও তাদের শত্রু।

মুসলিম বাহিনীর জোরালো আঘাতে চীনা দুর্গগুলো ভেঙে পড়ে এবং পূর্ব তুর্কিস্তানে উপর চীনা শাসন ‘জীন গুরেন’ এর প্রাধান্য শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে সে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চীন রাশিয়ার কেছে সহায়তার অনুরোধ জানালে রাশিয়া কিছু শর্ত দিয়ে তাতে সম্মত হয়। তুর্কিস্তানে রশদের প্রবেশ কালে যুদ্ধটি আরো সহিংস হয়ে উঠে। তারা শুধু চীনকে যুদ্ধে সহায়তা করেনি বরং বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণা চালিয়েছিল। রাশিয়া ও চীনের চাপের মুখে মুসলিম পুরুষরা পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছিল। তাদের হাজার হাজার লোক যুদ্ধে মারা গিয়েছিল অস্ত্র, অর্থ ও খাবারের তীব্র সংকটের কারণে। মুসলিম পুরুষরা কয়েক মাস পাহাড়ে অবস্থান নিয়ে কঠিন আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। খাজা নেওয়াজ তাদের কয়েকজনকে সারাদেশে খবর সংগ্রহ করতে এবং শত্রুদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেন। মুস্তফা ‘কাশগর’ ‘উরুমজি’ এবং অন্যান্য স্থানে তথ্য সংগ্রহ করে কুমুলে পৌঁছে। সেখানে তার বন্ধু মনসুর দরগার সাথে দেখা হয় অতপর তাদের মাঝে যুদ্ধ নিয়ে সংলাপ হয়। সেই সাথে তার প্রেমিকা নাজমুন নাহার সম্পর্কে জানতে পারে যে, সে একজন চীনা অফিসারকে বিয়ে করেছে। এ খবরে মুস্তফা মর্মান্বিত হয়। যুদ্ধে অনেক তুর্কি অংশগ্রহণে মুসলিম বাহিনী বৃদ্ধি পায়। খাজা নেওয়াজের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী তাদের শত্রুদের উপর আক্রমণ করে কাশগর শহর জয় করে। তারপর খাজা নেওয়াজকে তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করা হয় এবং মাওলানা সাবোতকে সরকার প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয় কিন্তু শত্রুদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমানদের পাহাড়ের দিকে পিছু হটতে হয়েছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়া ও চীনা কমিউনিস্টদের সাথে যুদ্ধ শেষ হয়েছিল খাজা নেওয়াজ, জেনারেল শরীফ এবং অন্যান্যদের শত্রুদের হাতে বন্দি হওয়াসহ তাদের মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে। এই ঘটনায় মুজাহিদদের বিজয়ের সকল আশা শেষ হয়ে যায়। তুর্কিস্তানের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে থাকে এবং এক লক্ষ তুর্কিকে বিভিন্ন উপায়ে শত্রুরা হত্যা করে। আর প্রায় এক-চতুর্থাংশকে বন্দি করা হয়। আলিমদের সাথে দুর্ব্যবহার করাসহ তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ, মূল্যবান পুস্তক এবং ইতিহাসকে ছিন্ন ভিন্ন করা হয়। মসজিদগুলোকে দোকান ও থিয়েটার বানানো হয়।

নাজমুন নাহার তার স্বামীকে পছন্দ করেনা বরং সে তাকে ঘৃণা করে। কারণ সে অমুসলিমদের হয়ে লড়াই করেছে এমনকি অনেক তুর্কি যুবককে হত্যা করেছে। এক পর্যায়ে উরুমজিতে নাজমুন নাহারের সাথে মুস্তফার সাক্ষাত হয়। উরুমজিতে মুস্তফা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে ছদ্মবেশে কুলির কাজ করে। বেশ কয়েকটি নাম ব্যবহার করে যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। একদিন মুস্তফা নাজমুন নাহারের সাথে সাক্ষাত করে এবং নাজমুন নাহার তাকে প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানায়। প্রাসাদে মুস্তফা নাজমুন নাহার ও তার স্বামীর চাকর হিসেবে কাজ করে। নাজমুন নাহার মুস্তফাসহ স্বীয় রাজপরিবারকে রক্ষার ঘটনাসহ বাওডেনের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার সকল বিষয় তাকে অবহিত করে। তাকে তার স্বামীর প্রতি ঘৃণার কথাও জানায়। সে তাকে হত্যাও করতে চায়। যেমন তার উক্তি:

لقد كنت افكر في الانتقام طول حياتي من هؤلاء المعتدين، لكن أين الانتقام؟؟

“আমি এই আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিশোধের কথা ভাবছি। কিন্তু কোথায় প্রতিশোধ?”

উসমান বাটোরের নেতৃত্বে নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়। নাজমুন নাহারের হাতে তার স্বামী নিহত হয়। কিন্তু চীনের কেউ জানে না যে কে তার হত্যাকারী। মুস্তফা নাজমুন নাহারকে একটি পার্টির আয়োজন করার প্রস্তাব দেয়। সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের একটি দলকে আমন্ত্রণ জানানোর কথা বলে। ঐ পার্টিতে সে একজন চাইনিজের সাথে বাগদান ঘোষণা করার কথা বলে। নির্ধারিত রাতে মুস্তফা ও নাজমুন নাহার প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যায়। তারা প্রাসাদ থেকে দূরে সরে যাওয়ার সাথে সাথে বিস্ফোরণের শব্দ হয় এবং প্রাসাদে

অবস্থিত চীনা গণ্যমান্য ব্যক্তির মারা যায়। অন্যদিকে মুস্তফা উরুর্মজি ত্যাগ করে তারা একটি পাহাড়ে অবস্থান নেয়। সেখানে উসমান বাটোর ও তার লোকজন জড়ো হয়। যাওয়ার পথে তারা আলতাই পর্বতের একটি গ্রামে বিশ্রাম নেয়। সেখানে থাকাবস্থায় মুস্তফা নাজমুন নাহারকে বিবাহ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রাশিয়ায় জার্মান অনুপ্রবেশের কারণে রাশিয়ান বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। জাপানের সাথে চীনও যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানরা সেই সুযোগ গ্রহণ করে উসমান বাটোরের নেতৃত্বে তাদের ভূমি স্বাধীন করতে ও তাদের ধর্মকে রক্ষার জন্য মহান বিপ্লবের মাধ্যমে যুদ্ধ করে। সেই সময় মুসলমানদের সংগ্রাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে এবং তারা একটি মহান বিজয় লাভ করে।

এদিকে সিন শী তিসাই ‘তুশানেজ কাই শেক’ এর সাহায্যে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ছয়টি আত্মঘাতী স্কোয়াড উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। দুই দলের মধ্যে আবারো তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। চীনের লোকসংখ্যা অনেক বেশি ছিল। মুসলমানরা নতুন কৌশল অবলম্বনের জন্য একটি পাহাড়ে অবস্থান নেয়। সেই সময় ‘ইলি’ প্রদেশে শেখ আলী খানের নেতৃত্বে আরেকটি জনপ্রিয় বিপ্লব সংঘটিত হয়। তিনি চীনাদের সাথে যুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে প্রদেশটি দখল মুক্ত করতে সক্ষম হন। শেখ আলী খান ইসলামিক রিপাবলিক অব ইস্ট তুর্কিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। জেনারেল উসমান বাটোর তার লোকজন নিয়ে খানের সাথে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে রাশিয়া ‘ইলি’ ‘আলতাই’ ও ‘চুশাক’ নামের তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট আলী খান ক্ষুব্ধ হয়ে তার লোকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে নিয়ে যায় একদল কমিউনিস্ট যুবক। যখন রাশিয়ান বাহিনী আলতাই দখল করতে আসে, জেনারেল উসমান বাটোর তার লোকদের নিয়ে আবির্ভূত হন এবং রুশ বাহিনীর মুখোমুখি হন। এভাবে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলমানদের যেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দুশমনদেরও অনেক ক্ষতি হয়। তারা পাহাড়ে ফিরে আসে। মসজিদে রুশদের হাতে মনসুর দরগার মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যুর আগে মনসুর সেই মসজিদটিকে কমিউনিস্টদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল যারা মসজিদটিকে দখল করে ভাগাড়ে পরিণত করতে চেয়েছিল। পরিশেষে উসমান বাটোর ও মুসলমানদের সাথে চীনাদের যুদ্ধ বাধে যা তিন মাস ব্যাপি স্থায়ী ছিল। মুসলমানরা ‘শিনহাই’ রাজ্য ত্যাগ করলেও শত্রুরা তাদের ঘিরে ফেলে। চারিদিক থেকে তারা যুদ্ধ করে। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হয় এবং মুসলমানরা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধে নামে। শেষে উসমান বাটোর শত্রুর হাতে আটক হয়। ১৯৫১ সালের ২৯ এপ্রিল তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মুস্তফা বিদ্রোহীদের সাথে তুর্কিস্তান থেকে কাশ্মীরে চলে যায়। কাশ্মীর গিয়ে মুস্তফা তার পরিবারের সাথে সাক্ষাত করে। অবশেষে একদিন সপরিবার মক্কায় চলে আসে। আর এ ঘটনার মধ্য দিয়েই এ উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে।

عمالة الشمال (উত্তরের দৈত্য)

লেখক নাজীব আল কিলানী তার লেখায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত। ‘উত্তরের দৈত্য’ তার অন্যতম একটি উপন্যাস। ২২টি অধ্যায় নিয়ে ২৪৮ পৃষ্ঠার উপন্যাসটিতে ষাটের দশকে (১৯৬৫-১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধে মুসলমানদের করুণ অবস্থা এবং একই দেশে ধর্মীয় মতবিরোধের জন্য ধর্মপ্রচারকদের উপর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা, কুরআনী বার্তা, কাব্যিক অনুচ্ছেদ এবং কিছু সামাজিক পরিস্থিতির মিশ্রণ ঘটেছে।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্রসমূহ

১. উসমান আমিনু- উপন্যাসের প্রধান চরিত্র (নায়ক)। তিনি উত্তর নাইজেরিয়া থেকে আসা জনগোষ্ঠীর লোক ছিলেন। ২. নূর- ইসলাম প্রচারের সফরে উসমান আমিনুর বন্ধু ও সঙ্গী। ৩. জামাকা- একজন নার্স। উপন্যাসে উসমান আমিনু তাকে ভালোবাসে এবং সে উপন্যাসের নায়িকা। ৪. শাইখ আবদুল্লাহ- তিনি কাদিরিয়া মতাদর্শের অন্যতম সুফি সাধক। ৫. আবদুল রহিম- তিনি লাগোস এবং ইগবো সফরে এবং যুদ্ধে

উসমানের সঙ্গী। ৬. ফাদার টম- তিনি একজন ইংরেজ ধর্মপ্রচারক যিনি ইগবো গ্রামে থাকেন। ৭. ম্যাডাম আলিয়া- লাগোসের আরবীয় এলাকার এক হোটেল মালিক।

প্রেক্ষাপট

নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ, যা সাধারণভাবে বায়াফ্রার যুদ্ধ (The Biafran War) নামে পরিচিত (৬ জুলাই ১৯৬৭ - ১৫ জানুয়ারি, ১৯৭০) নাইজেরিয়ার সরকার এবং বায়াফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। ইসরায়েল ও নাইজেরিয়া ১৯৬০ সালে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইসরায়েল এই সম্পর্কের সূত্র ধরে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের উন্নতির স্লোগানে নাইজেরিয়া এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। নাইজেরিয়ার এসব অঞ্চলের কৃষি, শিক্ষা, ঔষধ এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে উন্নতি ও আধুনিকায়নের নামে কয়েকশত ইসরায়েলী বিশেষজ্ঞ, কৃষক, শিক্ষাবিদ, চিকিৎসক এবং প্রকৌশলী হিসেবে পাঠানো হয়, যারা পরোক্ষভাবে নাইজেরিয়ার অঞ্চলসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। স্বচ্ছসেবা ও সমাজসেবায় তারা প্রত্যক্ষভাবে এসব অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। এদের সকলেই ইসরায়েলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো। এভাবে সেবা ও উন্নতির অজুহাতে নাইজেরিয়ার অঞ্চলসমূহে খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এভাবে তারা এসব অঞ্চলে বসতি গড়ে তুলে। এর ফলে নাইজেরিয়ার এসব অঞ্চল ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অঞ্চলে নাইজেরিয়ার মুসলিম অধিবাসীরা বসবাস করে। অন্য অঞ্চলে আগত খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীরা বসবাস করে। নাইজেরিয়ার মুসলমানরা আগত খ্রিস্টানদের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে পারেনি। খ্রিস্টানরা নাইজেরিয়ার প্রশাসনের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং বিভিন্ন ভাবে মুসলমানদের উপর নির্যাতন করতে থাকে এবং বায়াফ্রা অঞ্চলকে নাইজেরিয়া থেকে স্বাধীন করে ভিন্ন একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতিগত সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে এই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলেও এই বিবাদে মূল কারণ ছিলো ধর্মীয় উত্তেজনা। ১৯৭০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ বন্ধ হয়। তবে যুদ্ধের একটি বড় প্রভাব পড়ে পরবর্তী সময়ে। নাইজেরিয়ায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার ক্ষয়-ক্ষতি যুদ্ধ থেকে কোনো অংশে কম ছিলো না। এই দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়।

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখা যায়, নাইজেরিয়ার বিভক্ত অঞ্চলসমূহের বর্ণনা, ১. পুরানো অঞ্চল যেখানে নাইজেরিয়ার মুসলিম অধিবাসীরা বসবাস করে। ২. নতুন অঞ্চল যেখানে বহিরাগত খ্রিস্টানরা বসবাস করে। মুসলিম অঞ্চলে ইসলামী রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি চললেও, অমুসলিমদের অঞ্চলের অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাদের মাঝে ছিলো মদ, জুয়া, সিনেমা ও পতিতালয়ের আধিক্য। যেমন উপন্যাসের বর্ণনায় এসেছে,

المدن عندنا في شمال نيجيريا تنقسم إلى قسمين، القسم القديم وفيه تسيطر التقاليد الإسلامية، والآداب المرعية، ويلتزم الناس رجالاً ونساءً بأخلاقيات لا تسمح بالانحراف والتحلل، أما القسم الآخر للمدينة فهو الأحياء الجديدة، ونطلق عليها بلغتنا "يابون غري" أي المدينة الجديدة، وفيها يقيم الأجانب، وتنتشر الملاهي، وتتوارى في شوارعها -والعياذ بالله- بيوت الدعارة والعبث وحانات الشرب، فالمدينة كما يقول أحد الفسقة قسمين بين الله والشيطان.^{৩৫}

“উত্তর নাইজেরিয়ার শহরগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত। পুরানো অংশ, যেখানে ইসলামিক ঐতিহ্য এবং শিষ্টাচার প্রাধান্য পেয়েছে পুরুষ এবং মহিলা নৈতিকতা মেনে চলে যা বিচ্যুতি এবং বিলীন হতে দেয় না। নতুন অংশ, যেখানে বিদেশী এবং বিনোদন পার্ক ছড়িয়ে পড়েছে, পতিতালয় এবং মদ্যপানের বার রাস্তায় লুকিয়ে থাকে (আল্লাহ মাফ করুন) যেমন একজন দার্শনিক শহরটি সম্পর্কে বলেছে, এটা আল্লাহ এবং শয়তানের মধ্যে বিভক্ত।”

খ্রিস্টানরা মুসলিমদের মাঝে তাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে গড়ে তুলেছিলো বড় বড় গীর্জা। এসবের কারণে মুসলমানদের মাঝে এর মারাত্মক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং তারাও মদ-জুয়ায় অভ্যস্ত হতে থাকে। নাইজেরিয়ার মুসলমানদের এই সংকটময় অবস্থায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়ান উসমান আমিনু, যিনি এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তিনি বিধর্মীদের মাঝে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। তিনি তার বন্ধুদেরকে নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত দিতে বের হন। এর কারণে তিনি বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হন। এক পর্যায়ে তিনি কারাগারে বন্দি হয়ে দীর্ঘদিন কারাবাস করেন। কারাগারে তিনি একজন সুফি সাধকের সান্নিধ্য পান। সেখানে সেই সাধক উসমান আমিনুকে বিভিন্নভাবে সান্ত্বনা ও সাহস যোগান। কুরআনে বর্ণিত নূহ ও ইউসুফ (আঃ) নবীর ঘটনা দিয়ে সাধক ধৈর্যের উপদেশ দেন এবং তাকে কুরআনের হাফেজ হতে উৎসাহ দেন। এর পাশাপাশি নাইজেরিয়ায় ইসলামের আগমন ও উপনিবেশবাদীদের অনুপ্রবেশের ইতিহাস শোনান। উপন্যাসের ভাষায়-

وطال بنا المقام في السجن، وقد حرص شيخنا على أن يرغب السجناء في حفظ القرآن الكريم وقراءة تفاسيره، كما دعاهم إلى القراءة المستمرة، وتنقيف أنفسهم، واستغلال بعض الوقت في ممارسة الألعاب الرياضية من جرى ووثب وحفلات للسمر البريء، وكنا نتخلق حوله في الأمسيات وكيف انتشر الإسلام في بلادنا، وكيف تسلك المستعمرون إلى ديارنا، وأحلوها إلى سوق للعبيد.^{৩৯}

“আমরা দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলাম, শাইখ বন্দিদেরকে পবিত্র কুরআন মুখস্থ করতে এবং এর ব্যাখ্যা পড়তে উৎসাহিত করেছেন। তিনি তাদেরকে ক্রমাগত পড়ার, নিজেদেরকে শিক্ষিত করার এবং খেলাধুলায় কিছুটা সময়ের সদ্ব্যবহার করার আহ্বান জানান। আমরা সন্ধ্যায় তার চারপাশে জড়ো হতাম এবং কিভাবে আমাদের দেশে ইসলামের প্রসার ঘটেছিল, সেসব কাহিনী শুনতাম। আর উপনিবেশবাদীরা আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে কীভাবে এটিকে দাসের বাজারে পরিণত করেছিল ... সেসব শুনতাম।”

কারাগার থেকে বের হয়ে উসমান আমিনু দেশের স্বাধীনতা ও ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার্থে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। যেমন উপন্যাসের বর্ণনায় এসেছে,

وفتحت أبواب السجن الكبير . . . وخرجنا إلى الحرية . . . كان شيخنا عبد الله يمضى في المقدمة . . . وما أن خرج إلى الشارع، حتى سجد على الأرض الله شكرا،^{৪০}

“বড় কারাগারের দরজা খুলে গেল। আর আমরা স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের শাইখ আব্দুল্লাহ অগ্রভাগে যাচ্ছিলেন। আর রাস্তায় বের হতেই শুকরিয়া আদায় করে তিনি মাটিতে সিজদা করলেন।”

১৯৭০ এর ১৫ ই জানুয়ারীতে বায়াফ্রা বড় রকমের সংকুচিত হয়ে পড়ে। আর প্রকট খাদ্যাভাব এর কারণে মানুষ না খেয়ে মারা যেতে থাকে। লেঃ কর্ণেল ওজুকু দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান পার্শ্ববর্তী আইভরি কোস্টে। যাওয়ার আগে ওজুকু তার চীফ অব স্টাফ জেনারেল ফিলিপ ইফিয়ঙ্কে ‘officer administering the government’ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে রেখে যান। ১৯৭০ এর ১২ই জানুয়ারি ইফিয়ঙ যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানান এবং এফ-এম-জি’র কাছে আত্মসমর্পন করেন। বায়াফ্রা আবার নাইজেরিয়ার ভূখণ্ডে একীভূত হয়ে যায়।

এই উপন্যাসের নায়িকা জামাকা প্রথম জীবনে খ্রিস্টান মিশনারীদের সাথে কাটিয়েছিল। সে ছিল একজন নার্স। এক সময় মুসলিম যোদ্ধা উসমান আমিনুর সাথে তার পরিচয় হয়। ইসলামের সুমহান আদর্শে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার উপর নেমে আসে স্বজাতি কর্তৃক অকথ্য নির্যাতন। নাইজেরিয়ার মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের বর্বরোচিত হামলা এবং বিদেশী মদদে পরিচালিত নানা দলের নিপীড়নের

দৃশ্য দেখে সে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। যুদ্ধে সে উসমান আমিনুর সাথে যোগ দিয়ে মুসলমানদের পক্ষে সাহসিকতার সাথে খ্রিস্টানদের মুকাবেলা করে। যৌবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় কষ্ট, ত্যাগ ও নিপিড়নের মধ্য দিয়ে পার করার পর জামাকা সুখের সন্ধান পায়। উসমান আমিনু ও জামাকা পরস্পরকে ভালোবাসতো। তাদের দুজনের পবিত্র পরিণয়ের মধ্য দিয়ে এই উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটে। যেমন উসমান আমিনুর বর্ণনায়-

وجلسنا إلى جوارها وهي نائمة أنظر إلى وجهها الملائكي- وبقيت متيقظا حتى الصباح- نحن الدعاة إلى الله- طريقنا الحب الطاهر بكل ألوانه الباهرة- غداؤنا الأمل- وطريقنا يمتد إلى بعيد- لا يقطعه الموت، أو تطمسه العواطف.^{৩৪}

“আমি তার পাশে বসেছিলাম, যখন সে ঘুমাচ্ছিল। তার পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে সকাল পর্যন্ত জেগে ছিলাম। আমরা আল্লাহর পথে আহ্বানকারী। তার উজ্জ্বল রঙে রঙিন পবিত্র প্রেম আমাদের পথ। আমাদের আশাই আমাদের খাদ্য এবং আমাদের পথ বহুদূর প্রসারিত...মৃত্যু এতে বাধা দিতে পারবে না এবং আবেগ তা বিলুপ্ত করতে পারবে না।”

উপসংহার

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নাজীব কিলানী ছিলেন একজন বাস্তববাদী ও সাহসী লেখক। সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিমণ্ডলকে তিনি আপন সাহিত্যের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য কর্মের উঁচুমান এবং শিল্প সৌন্দর্য বোদ্ধা মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি একজন আরব হয়েও অনারব বিশ্বের সমসাময়িক নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যে নাটক-উপন্যাস রচনা করেছেন তাতে যথার্থরূপেই তাঁর বৈশ্বিক ভাবনাগুলো ফুটে উঠেছে। নাজীব কিলানী তাঁর লেখায় বাস্তব বিষয়বস্তু, শক্তিশালী বর্ণনারীতি, ভাষার সাবলীলতা ও কাহিনী বিন্যাসের অনন্যতায় নিজেকে বিশ্ব সাহিত্যক্ষেত্রে আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। তার এ অবদান তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ড. আব্দুল্লাহ ইবন সালিহ আল-উরাইনী, আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কিলানী আল-কাসাসিয়া (রিয়াদ: দারু কুনুয ইশবিলিয়া, ২০০৫), পৃ. ১১।
- ^২ নাজীব আল কিলানী, লামহাত মিন হায়াতি, প্রথম খন্ড(বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), পৃ. ৪০।
- ^৩ আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কিলানী আল-কাসাসিয়া, পৃ. ১২।
- ^৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।
- ^৫ নাজীব আল কিলানী, লামহাত মিন হায়াতি, তৃতীয় খন্ড(বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯), পৃ. ৪৪-৪৫; আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কিলানী আল-কাসাসিয়া, পৃ. ১৫।
- ^৬ কারীমা শাহীন, হিওয়ার মাআ নাজীব আল-কালানী(অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১২।
- ^৭ প্রাগুক্ত; আল-ইত্তিজাহ আল-ইসলামী ফী আ'মালি নাজীব আল-কিলানী আল-কাসাসিয়া, পৃ. ১৫।
- ^৮ কারীমা শাহীন, হিওয়ার মাআ নাজীব আল-কালানী পৃ. ৩৮।
- ^৯ ড. হিলমী মুহাম্মদ আল-কাউদ, আল-ওয়াকিয়াহ আল-ইসলামিয়া ফি রিওয়াতি নাজীব আল-কালানী (মিসর: তাবি), পৃ. ১৯৭।
- ^{১০} ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ, আরবি সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা (রাজশাহী: পরিলেখ, ২০১৭), পৃ. ৭৭।
- ^{১১} নাজীব আল কিলানী, আল ইসলাম ওয়াল মাযাহিব আল আদাবিয়া(বৈরুত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), ভূমিকা; আল-ওয়াকিয়াহ আল-ইসলামিয়া ফি রিওয়াতি নাজীব আল-কালানী, পৃ. ২২০।

- ১২ ড. আব্দুল মাবুদ, “নাজীব আল-কিলানী: জীবন ও কর্ম,” (নতুন কলম, জুন, ২০০২), পৃ. ৮।
- ১৩ আল-ইত্তিহাহ আল-ইসলামী ফী আ-মালি নাজীব আল-কিলানী আল-কাসাসিয়া, পৃ. ১৭।
- ১৪ এ.এন.এম সিরাজুল ইসলাম, ইউরোপে ইসলামের আলো বসনিয়া-হারজেগোবিনা (আশা প্রকাশন, ১৯৯৩), পৃ. ১০৯।
- ১৫ সম্পাদনা পরিষদ, কারেন্ট অ্যাফেয়াস এপ্রিল সংখ্যা (ঢাকা: প্রফেসর’স প্রকাশন, ২০১৬), পৃ. ৬।
- ১৬ ওবেইদ জাগীরদার, বসনিয়া পশ্চিমের বিবেক (ঢাকা: বস্তু প্রকাশন, ১৯৯৫), পৃ. ১৮১।
- ১৭ মূল আব্দুর রাজ্জাক হেকনোভিচ ও খাওলা বেগোভিচ, অনুবাদ শেখ নাইম রেজওয়ান, আওনের কারাগার (ঢাকা: আল খালেদ প্রকাশন, ২০০০), পৃ. ১২৪।
- ১৮ নাজীব আল-কিলানী, সারায়িফু হাবিবাতী (কায়রো: আল-মুহতাদুল ইসলামী, তা.বি.), পৃ. ৬।
- ১৯ প্রাপ্ত, পৃ. ১১।
- ২০ প্রাপ্ত, পৃ. ২৬।
- ২১ প্রাপ্ত, পৃ. ২৮-২৯।
- ২২ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ও ড. আবু নোমান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকা: এম আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স), পৃ. ১৯৮।
- ২৩ মুসা আনছারী, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৩), পৃ. ২০৪।
- ২৪ নাজীব আল-কিলানী, আযরাউ জাকার্তা (কায়রো: কিতাবুল মুখতার, ২০০৫), পৃ. ৮৩।
- ২৫ প্রাপ্ত, পৃ. ১৩৫।
- ২৬ প্রাপ্ত, পৃ. ১৪০।
- ২৭ ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ ও ড. আবু নোমান, সমকালীন বিশ্বে মুসলিম সংখ্যালঘু (ঢাকা: গ্রন্থ কুটির, ২০১৪), পৃ. ১৬০।
- ২৮ নাজীব আল-কিলানী, লায়ালী তুর্কিস্তান (লেবাননের মুআসসাসাতুর রিসালাহ হতে), পৃ. ৬।
- ২৯ প্রাপ্ত, পৃ. ৭।
- ৩০ প্রাপ্ত, পৃ. ১২৩।
- ৩১ নাজীব আল-কিলানী, আমালিকাতুশ শিমাল (কুয়েত: মাকতাবাতুস সাহওয়া, ২০১২), পৃ. ৫।
- ৩২ প্রাপ্ত, পৃ. ১৫০।
- ৩৩ প্রাপ্ত, পৃ. ১৯০।
- ৩৪ প্রাপ্ত, পৃ. ২৪৮।

আল কুরআনে ব্যবহৃত وِئِل (ওয়াইল) শব্দের তাৎপর্য বিশ্লেষণ

ড. মো. আবু বকর*

Abstract: The Qur'an is the best revelation from Allah to the Prophet Muhammad (peace and blessings of Allaah be upon him). Everything of the Qur'an including its letters, words, sentences, periods, commas, semicolons, nuktas and all related to their reading style is protected and unchangeable. The great book Al-Quran, consisting of six thousand six hundred and sixty six verses revealed is one of the major miracles that happened to the Prophet (SM). Regarding this book, Allah says in verse 9 of Surah Hijr, “**I have sent down the Qur'an and I am its guardian**”. Every word and sentence used in Al-Quran is unique and meaningful in language and on literary grounds. The word وِئِل (wail) used in this text carries a special meaning. Allah has mentioned this word 38 times in different Surahs. In general, it is a hell, which Allah has ordained for a special class of disobedient servants. However, وِئِل's horror is not limited to that only; the word has a special meaning. This paper presents a clear and composite picture of وِئِل combining relevant discussions on it.

ভূমিকা

আল কুরআন অসংখ্য শব্দমালায় সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ, যার প্রতিটি শব্দ ও বাক্য ভাষা ও সাহিত্যলংকারে অদ্বিতীয় এবং অর্থে তাৎপর্যপূর্ণ। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ হলো وِئِل (ওয়াইল) যা আল্লাহ পাক বিভিন্ন সূরায় ৩৮ বার উল্লেখ করেছেন। শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে وِئِل সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা একত্রিত করে এর একটি সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

وِئِل (ওয়াইল) শব্দ ও অর্থ বিশ্লেষণ

আরবী অভিধানে وِئِل শব্দটির একাধিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যেমন,

وِئِل শব্দটি ইসম বা বিশেষ্য পদ। অর্থ,

- حلول الشر বা অনিষ্ট সমাগত হওয়া।^১
- عذاب وهلاك وخزي বা শাস্তি, ধ্বংস বা লাঞ্ছনা।^২
- عند نزول المصائب و القبائح বা বিপদ-আপদ ও অমঙ্গল আপতিত হওয়ার কালে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
- الندبة বা বিলাপ করা।^৩
- التحسر (আফসোস, হতাশা, হায়-হায় প্রকাশ করা)। যেমন আল কুরআনে এসেছে,
يَوْنِلْنَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا^৪
- الوعيد الشديد বা প্রচণ্ড ভীতিকর অবস্থা তুলে ধরার ক্ষেত্রে وِئِل ব্যবহৃত হয়। যেমন আল কুরআনে এসেছে,

* প্রফেসর, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^৫

সে দিন মিথ্যারোপকারীদের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হবে।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ^৬

সামনে ও পশ্চাতে পরনিন্দাচর্চাকারীদের জন্য প্রচণ্ড দুর্ভোগ।

- شدة التعجب বা অধিকতর বিস্ময়। যেমন আল কুরআনে এসেছে,

قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا^৭

তিনি বললেন, কি আশ্চর্য! আমি সন্তান জন্ম দিব? অথচ আমি একজন বৃদ্ধা ও আমার স্বামীও বৃদ্ধ।

ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাযী রহ. শব্দটির ভিন্ন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, শব্দটির মূলত وَيْ ছিল অর্থাৎ لِفَان وَيْ অধিক ব্যবহারে উচ্চারণের সুবিধার্থে একসঙ্গে وَيْل হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছেন,

وَيَكُنَّ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَيَكُنَّ لَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ^৮

তবে ইমাম তাবারী রহ. সহ অনেকে وَيْل এর অর্থ করেছেন,

الوادي يسيل من صديد أهل النار وقيحهم^৯

ওয়াইল একটি উপত্যকা যেখানে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হবে।

শব্দটির স্ত্রীলিঙ্গ وَيْلَةٌ বহুবচন وَيْلَاتٌ।

শব্দটি বাবে تفاعل থেকে وَيْلٌ ও বাবে تفعيل থেকে وَيْلٌ। সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বেশী বেশী وَيْلٌ কে আহবান করা এবং পরস্পরে وَيْلٌ কে আহবান করা।

আল কুরআনে وَيْلٌ (ওয়াইল) শব্দের ব্যবহার

আল কুরআনে ৩৮ বার আল্লাহ তা'আলা শব্দটি উল্লেখ করেছেন। শব্দটির ব্যবহারবিধি ও ই'রাব গ্রহণে ভিন্নতা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে শব্দটির প্রয়োগ নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়-

وَيْلٌ শব্দের ব্যবহার

- একক এবং নাকিরা বা অনির্দিষ্ট

মোট তেইশটি আয়াতে^{১০} এরূপ ব্যবহার রয়েছে। যেমন,

• فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^{১১}

• وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ^{১২}

• فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ^{১৩}

- একক এবং মা'রিফা বা নির্দিষ্ট

এরূপ ক্ষেত্রে অত্র শব্দটিই মুবতাদা বা উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য হবে। যেমন আল কুরআনের সূরা আশ্বিয়াতে উল্লেখ রয়েছে-

- بَلْ تُفْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ^{১৪}
- إضافة বা সর্বনামের দিকে সম্পর্কযুক্ত হয়ে। এক্ষেত্রে وَيْل এবং তথা পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গ উভয়ের ব্যবহার রয়েছে। আল কুরআনের এগারটি আয়াতে^{১৫} এরূপ ব্যবহার রয়েছে। যেমন,
 - قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ^{১৬}
 - قَالُوا يَوَيْلَنَا مِنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ^{১৭}
 - وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ^{১৮}
 - قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ^{১৯}
- بالألِف للاستغاثه বা আলিফ ইসতিগাহাহ যুক্ত হয়ে অর্থাৎ মাতম বা বিলাপের সময় সাহায্য প্রার্থনার জন্য এরূপ ব্যবহার হয়। যেমন,
 - فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيْلَنَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ^{২০}
 - قَالَتْ يَوَيْلَنَا أَلِدْتُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا يَعْلى شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ^{২১}
 - يَوَيْلَنَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا^{২২}

শব্দের ই'রাব

শব্দটি দু'ধরনের ই'রাব গ্রহণ করে থাকে।

- فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ^{২৪} যেমন ২৩। বা পেশ যোগে رفع

এ ক্ষেত্রে বাক্যপ্রকরণের দিক থেকে যাই হোক মুবতাদা বা উদ্দেশ্য। যেহেতু এটি الدعاء বা আহবান অর্থে ব্যবহৃত হয় সুতরাং শব্দটি অনির্দিষ্ট হলেও মুবতাদা হওয়া দোষণীয় নয়।

তবে আলিফ-লাম যুক্ত হয়েও এটি ব্যবহৃত হয়। যেমন,

بَلْ تُفْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ^{২৫}

- নসব বা যবর যোগে। যেমন, وَيْلًا لَهُ। তবে যদি إضافة হয়ে ব্যবহৃত হয় তবে সে ক্ষেত্রে অবশ্যই নসব ই'রাব গ্রহণ করবে একটি উহ্য ক্রিয়ার কর্ম হিসেবে।^{২৬} এ প্রসঙ্গে কাযী ছানউল্লাহ পানিপথী রহ. বলেন, وَيْل এমন একটি মাসদার যা থেকে কোন ক্রিয়া নির্গত হয় না।^{২৭} ফলে সমার্থবোধক উপর্যুক্ত অন্য কোন ক্রিয়া উহ্য থেকে মাসদারটিকে নসব প্রদান করবে।^{২৮} যেমন,

الْزَمَكَ اللَّهُ وَيْلًا، أَيُّ يُدْعَى بِهَا عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي هَلَاكِ وَشَرٍّ يَسْتَحِقُّهُ

আল্লাহ তোমার জন্য যে বিপদ অবশ্যজ্ঞাবী করে দিয়েছেন তাকে আহবান করা হচ্ছে।

যেমন,

- قَالُوا يَوَيْلَنَا مِنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ^{২৯}
- وَقَالُوا يَوَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ^{৩০}
- قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ^{৩১}

আলিফ ইসতিগাছাহ যুক্ত হলে আবশ্যিকভাবেই নসব ই'রাব হবে। যেমন,

يُوْنِلُّنَا لِيَتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا^{৩৬}

জাহান্নামের বিভিন্ন উপত্যকা ও (ওয়াইল) এর অবস্থান ও ভয়াবহতা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাফরমান বান্দাদের শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। জাহান্নামের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টি কৌশল, ভয়াবহতা নিরূপণ করা মানব সসীম জ্ঞানে সম্ভব নয়। আল কুরআন ও হাদীছের লোমহর্ষক ভয়াবহ বর্ণনানুযায়ী জাহান্নাম সম্পর্কে যতটুকু ধারণা পাওয়া যায় তা সঠিকভাবে চিন্তা ও উপলব্ধি করলেই যে কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষের হৃদয় আঁতকে উঠে। জাহান্নাম সৃষ্টির অবকাঠামোগত একটি বৈশিষ্ট্য হলো, উহা বিভিন্ন উপত্যকা ও অঞ্চলে বিভক্ত। পাপাচারের রকমভেদে আল্লাহ পাক পাপীদের নির্ধারিত উপত্যকায় নিক্ষেপ করবেন। কুরআন ও হাদীছে এরূপ বেশকিছু উপত্যকার নাম ও প্রকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।^{৩৭} তন্মধ্যে একটি উপত্যকা। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উপত্যকা, বিশেষতঃ ওই এর অবস্থান ও ভয়াবহতা উল্লেখ করা হলো-

وادي غي (গয়ই উপত্যকা)

মুফাসসিরগণের বর্ণনা মতে, গয়ই হলো এমন ভয়াবহ অঞ্চল যেখানে অতল নদী প্রবাহমান এবং উহার পানির স্বাদ খবীছ দুর্গন্ধময়।^{৩৮} এর উত্তাপ এত বেশী যে, উহার কষ্ট লাঘবের জন্য স্বয়ং জাহান্নাম বারংবার আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকে। একাধিক সালাত একসঙ্গে আদায়কারীদের জন্য আল্লাহ পাক এটি সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا^{৩৯}

অতঃপর তাদের পরে এল এমন প্রজন্ম যারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হলো। ফলে তারা অচিরেই গয়ই জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে।

وادي موبق (মূবিক উপত্যকা)

এটি একটি বিধ্বংসী উপত্যকা। জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. বলেন, মূবিক হলো জাহান্নামের সেই উপত্যকা যেখানে মূর্তিপূজকদের তাদের মূর্তিসহ বারংবার বিনাস করে দেয়া হবে।^{৪০} আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا^{৪১}

আর তারা তাদের (যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করত) ডাকবে কিন্তু তারা কোন সারা দিবে না আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দিব মৃত্যু উপত্যকা।

وادي سقر (সাকার উপত্যকা)

সালাত পরিত্যাগকারীদের সাকার উপত্যকায় নিক্ষেপ করে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। এদের হাশর হবে হামান, কারুনদের সাথে। এরা নবী সা. এর সুপারিশ পাবে না। হাউযে কাওছার এর পানি পাবে না। কারণ সর্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য বিষয় হবে সালাত। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ^{৪২}

কে তোমাদের সাকার জাহান্নামে হাঁকিয়ে নিয়ে এলো তারা বলবে আমরা নামায আদায়কারী ছিলাম না।

অন্য আয়াতে বলেন,

وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر^{৮৭}

তোমার কি জানা আছে সাকার উপত্যাকা কি? সাকার এমন দোযখ যার উত্তাপে হাড়-মাংস খুলে-খুলে পড়বে কিন্তু ছাড়বে না। অর্থাৎ পূর্ণরায় ঠিক হয়ে যাবে আবারও খুলে খুলে পড়বে এভাবে প্রতিনিয়ত শাস্তি পোহাতে হবে এ দোযখে।

ইবন আব্বাস রা. বলেন, ^{৮৮} "أُثِرَ أنها الطبقة السادسة من جهنم".

স'আদ উপত্যাকা وادي الصعد

আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا^{৮৯}

যে তার রবের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তাকে তিনি স'উদ জাহান্নামে শাস্তি প্রদান করবেন।

অন্য আয়াতে বলেন,

سَأُزْهِقُهُ صَعُودًا^{৯০}

অচিরেই আমি তাকে (জাহান্নামের) স'উদ পাহাড়ে আরোহণ করব।

নবী সা. এর হাদীছে জাহান্নামের স'উদ উপত্যাকার কিছু ভীতিকর বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويل: واد في جهنم، يهوي فيه الكفار أربعين خريفاً، قبل أن يبلغ قعره، والصعود: جبل من نار، يتصعد فيه سبعين خريفاً، ثم يهوي به كذلك، فيه أبداً"^{৯১}

আবু সাঈদ রা. রাসূলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, ওয়াইল জাহান্নামের একটি উপত্যাকা। কাফিরদের উহার তলদেশে পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ বছর। আর স'উদ হলো একটি পাহাড়, তথায় উঠাতে সময় লাগবে সত্তর বছর এরপর সেখান থেকে চিরদিনের জন্য ওয়াইল এ নিক্ষেপ করা হবে।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে,

وقد روى البزار، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه: من حديث شريك القاضي، عن عمار الذهبي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: صعوداً هو جبل في النار، يكلف الكافر أن يصعده، فإذا وضع يده عليه ذابت، فإذا رفعها عادت، وإذا وضع رجله عليه ذابت، فإذا رفعها عادت.^{৯২}

আবু সাঈদ রা. বলেন, রাসূল সা. স'উদ সম্পর্কে বলেছেন, ইহা একটি পাহাড়। কাফিরকে সেখানে উঠিয়ে শাস্তি দেয়া হবে। কাফির যখন উহার উপর হাত রাখবে সঙ্গে সঙ্গে হাত গলে যাবে। যখন হাত উঠাবে আবার পূর্বের মত হয়ে যাবে। যখন পা রাখবে পা গলে যাবে। যখন পা উঠাবে আবার পূর্বের মত হয়ে যাবে।

কতাদা বলেন, ইবন আব্বাস রা. বলেছেন,

صعود صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه^{৯৩}

স'উদ জাহান্নামের একটি পাথর, যার উপর কাফির এর মুখমণ্ডলকে আঘাত করা হবে।

সুদী বলেন,

صعود صخرة ملساء في جهنم، يكلف الكافر أن يصعدها^{৯৪}

স'উদ জাহান্নামের একটি পিচ্ছিল পাথর, কাফিরকে সেখানে উঠানো হবে আর তৎক্ষণাত সে পিছলে ওয়াইলে নিক্ষিপ্ত হবে।

মুজাহিদ স'উদ এর ব্যাখ্যা করেছেন, ^{৪৬} سأرهقه صعوداً: أي مشقة من العذاب

হাবহাব উপত্যকা وادي هبهب

এ প্রসঙ্গে নবী সা. এর একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন,

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا الأزهر بن سفيان، حدثنا محمد بن واسع، قال: دخلت على بلال بن أبي بردة، فقلت له: يا بلال، إن أباك حدثني، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن في جهنم وادياً يقال له هبهب، حق على الله أن يسكنه كل جبار، فإياك يا فلان أن تكون ممن يسكنه ^{৪৭}

মুহাম্মদ ইবন ওয়াসি' বলেন আমি বিলাল ইবন আবী বুরদাহ এর নিকট গেলাম। আমি বললাম, ওহে বিলাল নিশ্চয় আপনার পিতা তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করে আমাকে বলেছেন, তিনি নবী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সা. বলেছেন, নিশ্চয় জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যার নাম হাবহাব। আল্লাহ প্রত্যেক অত্যাচারী ক্ষমতাস্বত্বের তথায় প্রবেশ করাবেন। সুতরাং সেখানে অবস্থানকারীদের থেকে দূরে থাক।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

وقد رواه الطبراني: من حديث سعيد بن سليمان، عن أزهر بن سنان، عن محمد بن واسع: أنه دخل على بلال بن أبي بردة بن أبي موسى، فقال له: إن أباك حدثني، عن جدك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إن في جهنم وادياً في الوادي بئر يقال لها هبهب، على الله أن يسكنه كل جبار ^{৪৮}

মুহাম্মদ ইবন ওয়াসি' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিলাল ইবন আবী বুরদাহ ইবন আবী মূসা এর নিকট গেলাম। আমি বললাম, ওহে বিলাল নিশ্চয় আপনার পিতা আপনার দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করে আমাকে বলেছেন, তিনি নবী সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সা. বলেছেন, নিশ্চয় জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে, সেখানে একটি কুপ রয়েছে যার নাম হাবহাব। আল্লাহ প্রত্যেক অত্যাচারী ক্ষমতাস্বত্বের তথায় প্রবেশ করাবেন।

লুমলুম উপত্যকা وادي لُمْلُم

এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে নবী সা. বলেছেন,

قال الحسن بن سفيان: حدثنا حبان بن موسى، حدثنا ابن المبارك، حدثنا يحيى بن عبيد الله، سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن في جهنم لوادياً يقال له لُمْلُم، وإن أودية جهنم لتستعيز بالله من حره ^{৪৯}

নিশ্চয় জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যার নাম লুমলুম। জাহান্নামের অন্যান্য উপত্যকা উহার উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।

জাব্বুল হুয়ন উপত্যকা وادي جب الحزن

এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রা. নবী সা. থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করে বলেছেন,

قال علي بن حرب: حدثنا عبد الرحمن بن محمد، حدثنا عمار بن سيف، عن أبي معاذ، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " استعينوا بالله من جب الحزن، قالوا: يا رسول الله: وما جب الحزن. قال: واد في جهنم، تستعين جهنم منه كل يوم أربعمئة مرة، أعد للقراء المرائين بأعمالهم^{৫০}

রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা জাব্বুল হুযন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন, জাব্বুল হুযন কি? নবী সা. বললেন, জাহান্নামের একটি উপত্যকা। জাহান্নাম প্রতিদিন চারশতবার তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। লোকদেখানো ইবাদত কারীদের জন্য তিনি উহা সৃষ্টি করেছেন।

আছাম উপত্যকা وادي اُثام

আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন,

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^{৫১}

আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডাকে না, যারা আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ উপায়ে কাউকে হত্যা করে না তবে সত্য উপায়ে বৈধ, আর যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। যে এসব পাপাচারে লিপ্ত হবে তিনি তাকে আছাম জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

ওয়াইল (ওয়াইল) এর অবস্থান, তাৎপর্য ও ভয়াবহতা

ওয়াইল এর তাৎপর্য ও ভয়াবহতা পৃথক দু'টি দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রথমত ওইল অর্থ ধ্বংস, বিপদ-আপদ, হালাক, সমাগত দুর্যোগ ইত্যাদি। এ অর্থে ওইল এর তাৎপর্য হলো-

আল্লাহর ফিরিস্তা ইসরাফীল (আ.) শেষবারের মত শিংগায় ফুৎকার দেয়ার পর গোটা সৃষ্টিকুল হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। সেদিনের ভয়াবহতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে পাপীরা গগনবিদারী শব্দে চিৎকার করতে থাকবে আর ওইল ওইল ওইল বলে ডাকতে থাকবে। অর্থাৎ বিপদ-বিপদ, ধ্বংস-ধ্বংস, সর্বনাশ-সর্বনাশ, হায় আমাদের এখন কি হবে ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত ওইল জাহান্নামের একটি উপত্যকা। এ অর্থের স্বপক্ষে মুফাসসিরগণের একটি জামা'আত অভিমত ব্যক্ত করে বলেছেন, আল কুরআনে উল্লিখিত ওইল এর তাৎপর্য উহার শাব্দিক অর্থে যথার্থ নয় বরং এর দ্বারা জাহান্নামের একটি উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। তারা এ মর্মে ইমাম আহমাদ, তিরমিযি, ইবন জারীর, ইবন আবী হাতিম, ইবন হিব্বান, হাকিম, বায়হাকী, ইবন আবীদ দুনিয়া, ইনাদ প্রমুখ আবু সাঈদ আল খুদরী রা. থেকে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ-

عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لويل وادٍ في جهنم، يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره^{৫২}

আবু সাঈদ খুদরী রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, ওয়াইল জাহান্নামের একটি উপত্যকা, যার তলদেশে পৌঁছতে একজন কাফির এর সময় লাগবে চল্লিশ বছর।

অনুরূপ সাঈদ ইবন ওয়াক্কাস এবং ইবন মাসউদ রা. এর এ বিষয়ে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। যেমন,

عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في النار حَجَرًا يقال له: ويلٌ، يصعدُ عليه العرفاء⁵³، وينزلون منه⁵⁸

সাইদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি সা. বলেছেন নিশ্চয় জাহান্নামে একটি পাথর রয়েছে যার নাম ওয়াইল। উহার উপরে সমাজপতিদের উঠিয়ে নিচে নিক্ষেপ করা হবে।

عن ابن مسعود قال الويل واد في جهنم يسيل من صديد أهل النار جعل للمكذِبِينَ⁵⁹

ইবন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওয়াইল জাহান্নামের একটি উপত্যকা যেখানে জাহান্নামীদের পুঁজের শ্রোত প্রবাহিত হবে। উহা মিথ্যারোপকারীদের জন্য সৃষ্ট।

এছাড়াও ইবন জারীর এর উছমান ইবন আফফান রা. থেকে বর্ণিত একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে, জাহান্নামের একটি পাহাড়। তিনি বলেন,

أخرج ابن جرير عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الويل جبل في النار⁶⁰

উল্লিখিত হাদীছসমূহের আলোকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াইল জাহান্নামের একটি বিশেষ অংশ, পাহাড়, পর্বত বা উপত্যকার নাম। সেখানকার ভয়াবহতা, নির্মমতা, কষ্ট, যন্ত্রণা জাহান্নামের অন্য যে কোন অংশের চেয়ে অধিক ও মারাত্মক।

ওয়াইল এর অবস্থান ও ভয়ঙ্কর চিত্র অনুমান করার জন্য আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণিত হাদীছটিই যথেষ্ট। ওয়াইল এর অবস্থান জাহান্নামের এত গভীরে যে একজন মানুষকে তথায় নিক্ষেপ করলে উহার তলদেশে পৌঁছতে সময় লাগবে চল্লিশ হাজার বছর।

উপলব্ধি ও শিক্ষণীয় বিষয় হলো, বিচার দিবসে প্রতিটি মানুষের দৈহিক গঠন হবে আদম আ. এর মত তথা ষাট হাত লম্বা। সে দিনের একদিন হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। চন্দ্রবর্ষ হিসেবে ৩৬০ দিনে এক বছর।

এবার চিন্তা করলে লোমহর্ষক যে হিসাবটি আমাদের সামনে আসে তা হলো,

পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান এক একটি দিন × ৩৬০ দিন = ১ বছর

এরূপ চল্লিশ হাজার বছর সময় লাগবে ষাট হাত লম্বা একটি ভারী শরীর কোন গর্তের তলদেশে পৌঁছতে। তাহলে সেই গর্তের গভীরতা কত..... ও কেমন? আর সেই গর্তের নাম হলো জাহান্নামের ওয়াইল।

হতে পারে এটিই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ⁶¹

নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে।

وقال عطاء بن يسار الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت من حره.⁶²

আতা ইবন ইয়াসার বলেন, ওয়াইল জাহান্নামের একটি উপত্যকা যদি তথায় পাহাড়সমূহ প্রবেশ করানো হয় তবে উহার উত্তাপে পাহাড় গলে যাবে।

وَيْلٌ (ওয়াইল) যাদের জন্য সৃষ্ট

আল কুরআনের বর্ণনানুযায়ী নিম্নোক্ত শ্রেণীর পাপীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা وَيْلٌ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

- মিথ্যারোপকারী

আল্লাহ তা'আলা মিথ্যারোপকারীদের وَيْلٌ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সূরা মুরসালাতে নয় বারসহ প্রায় পনের জায়গায় এ দুর্ভোগের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন

• وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^{৫৯}

সে দিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ/وَيْলٌ অবধারিত।

• فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^{৬০}

• وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ^{৬১}

• قَالُوا يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ^{৬২}

তারা বলবে, হায় আমাদের ধ্বংস! কে আমাদের নিদ্রা থেকে জাগ্রত করল, এটা সেই দিন যেই দিন সম্পর্কে দয়াময় আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন।

• وَقَالُوا يَوْمَئِذٍ هَذَا يَوْمُ الَّذِينَ^{৬৩}

তারা বলবে, হায় আমাদের ধ্বংস! এটা তো বিচার দিবস।

উল্লিখিত সবকটি আয়াতের পূর্বাপরে আল্লাহ পাক তাঁর একত্ববাদ, কুদরত, সৃষ্টিজগত, সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টি রহস্য, নি'আমত, নিদর্শনাবলী, তাঁর প্রেরিত রাসূলগণ, আল কুরআন, আখিরাত, হাশর, সেদিনের দূর্বিসহ অবস্থা, হিসাব, প্রতিদান, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন যারা এসব সত্যকে মিথ্যা আখ্যায়িত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ওয়াইল শাস্তি।

- নামাযে উদাসীন বা নামাযের সময় হলেও গাফেল ব্যক্তি

নামাযের ব্যাপারে শৈথিল্য ও অলসতা প্রদর্শনকারীদের জন্য ওয়াইল শাস্তি অণিব্যর্থ। এদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ^{৬৪}

ওয়াইল শাস্তি সেসব নামাযীদের জন্য যারা তাদের নামায সম্পর্কে ভুলে থাকে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবন আব্বাস রা. বলেন,

الذين يؤخرونها عن أوقاتها^{৬৫} যারা নামায যথাসময়ে আদায় না করে বিলম্বে আদায় করে।

মুগীরা ইবন শু'বা ইবরাহীম থেকে এবং সাঈদ আবী ওয়াক্কাস অনুরূপ মতামত বর্ণনা করেছেন।^{৬৬}

ইবন আব্বাস থেকে অপর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো যারা মানুষের সামনে নামায আদায় করে কিন্তু একাকী অবস্থান কালে পরিত্যাগ করে।^{৬৭}

• কাফির

কাফিরদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ওয়াইল নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

• وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ^{৮৮}

কাফিরদের জন্য রয়েছে ওয়াইলের কঠিন শাস্তি।

• فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّسْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ^{৮৯}

কাফিরদের জন্য হাশর দিবসে কঠিন বিপদ অবধারিত।

• فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ^{৯০}

কাফিরদের জন্য জাহান্নামের ওয়াইল উপত্যাকা নির্ধারণ করে রেখেছেন।

• فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ^{৯১}

কাফিরদের আজ তাদের বিষয়ে প্রতিশ্রুত ওয়াইল অণিব্যর্থ।

• মুশরিক বা আল্লাহর সাথে শিরককারী

আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করবেন কিন্তু শিরক এর গুনাহ মাফ করবেন না। সূরা নিসা'র ৪৮ ও ১১৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে শিরক এর পাপ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য সকল গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন। অতএব শিরক অন্য যে কোন পাপের চেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর পাপ। এ কারণে মুশরিকদের শাস্তিও হবে ওয়াইল জাহান্নামে। তিনি বলেন,

• وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ^{৯২}

মুশরিকদের জন্য রয়েছে ওয়াইল জাহান্নাম।

• আল কুরআনকে বিকৃত করার অপচেষ্টাকারী

আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মদ সা. এর প্রতি নাযিলকৃত সন্দেহাতীত সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ পাক সূরা হিজর এর ৯নং আয়াতে বলেন, আমি এটি নাযিল করেছি এবং আমিই এর হিফাজতকারী। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত কোন সৃষ্টি এটিকে পরিবর্তন ও বিকৃত করতে পারবে না। আবার এর অপব্যাখ্যা করা বা এটিকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করাও জঘন্য অপরাধ। যুগে-যুগে এরূপ অপচেষ্টা হলেও তা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হয়েছে। এহেন গর্হিত অপরাধীদের জন্য আল্লাহ পাক ওয়াইল শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ পাক বলেন,

• وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ^{৯৩}

আর তাদের জন্য ধ্বংস যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আমাদের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতঃপর তাদের ধ্বংস স্বহস্তে লেখার কারণে এবং ধ্বংস অন্যায় উপার্জনের কারণে।

• আল্লাহর যিকর শুন্য হৃদয়

একজন মু'মিনের জীবন তথা কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন, চলা-ফেরা, ঘুম-জাগরণ এক কথায় সকল কার্যক্রম যদি ইসলামী বিধান এবং নবীর সা. সুন্য অনুযায়ী হয় তবে বুঝতে হবে তার হৃদয় রবের নূরে আলোকিত। আর যদি তা না হয় তবে অবশ্যই তা পরিচালিত হবে স্বীয় কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ-অনুকরণে। পরিশেষে এরূপ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন ওয়াইল জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ^{৭৪}

আর আল্লাহ যার হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, সে তার রবের নূরের আলোকিত আর যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠোর তাদের জন্য ওয়াইল। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে।

• যালিম

যুলম অর্থ সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া, প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা, সীমা লংঘন করা, ন্যায়ের পরিপন্থী কিছু করা, কোন কিছুকে তার আপন জায়গা থেকে সরিয়ে দেয়া, সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের আনুগত্য করা ইত্যাদি। যুলমের অপরাধে আল্লাহ পাক যালিমকে ওয়াইল দোষখে শাস্তি প্রদান করবেন। যেমন তিনি বলেন,

• فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ^{৭৫}

আর যালিমদের জন্য রয়েছে ওয়াইল এর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

• قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ^{৭৬}

তারা বলবে, হায় আমাদের ধ্বংস, নিঃসন্দেহে আমরা যালিম ছিলাম।

• وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ^{৭৭}

যখন আপনার রবের শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে তখন তারা বলবে, হায় আমাদের সর্বনাশ! নিশ্চয় আমরা যালিম ছিলাম।

• আল্লাহদ্রোহী

আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আরোপকারী, খোদাদ্রোহী পাপিষ্টদের জন্য তিনি ওয়াইল নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেমন আল্লাহ পাক বলেন,

• قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ^{৭৮}

তারা বলবে, হায় আমাদের ধ্বংস, নিঃসন্দেহে আমরা খোদাদ্রোহী ছিলাম।

• قَالُوا يَوْمَئِذٍ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ^{৭৯}

তারা বলবে, হায় আমাদের ধ্বংস, নিঃসন্দেহে আমরা খোদাদ্রোহী ছিলাম।

• قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا^{৮০}

মূসা আ. তাদের বলেছিলেন, তোমাদের ধ্বংস, তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যারোপ কর না।

• এছাড়াও ফাসিক-ফাজির, গীবত-পরনিন্দা চর্চাকারী, ওয়নে কম প্রদানকারী এবং ইলম অনুযায়ী আমল নেই এমন ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ পাক ওয়াইল শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন। যেমন আল কুরআনে এসেছে,

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ^{৮১}

ওয়াইল প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীর জন্য।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ^{৮২}

প্রত্যেক সামনে ও পিছনে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ।

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ^{৮৩}

যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُؤْتُوا ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ^{৮৪}

আর যাদেরজ্ঞান দান করা হয়েছে তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ(ইলম অনুযায়ী আমল না করার কারণে), যারা ঈমান এনে সে অনুযায়ী আমল করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রতিদান অতি উত্তম। কেবল ধৈর্য্যশীলরাই এ প্রতিদান পাবে।

উপসংহার

আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী মুহাম্মাদ সা এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, বাক্য, দাড়ি, কমা, সেমিকোলন, নুকতা, তথা পঠনরীতির সকল বিষয়াদি সুরক্ষিত এবং অপরিবর্তনীয়। নাযিলকৃত ছয় হাজার ছয়শত ষেষটি আয়াতের সমন্বয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সা.এর একটি অন্যতম প্রধান মু'জিয়া। এ গ্রন্থ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা হিজর এর ৯ নং আয়াতে বলেছেন, আমি আল কুরআন নাযিল করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণকারী। এ কিতাবে ব্যবহৃত **وَيْلٌ** শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণভাবে এটি শাস্তি, ধ্বংস, বিনাশ এরূপ অর্থ প্রদান করলেও **وَيْلٌ** এর ভয়াবহতা শুধু এতটুকু অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং শব্দটির বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। সেটি হলো এটি একটি জাহান্নামের বিশেষ উপত্যকা। যা বিশেষ শ্রেণীর নাফরমান বান্দাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখানকার লোমহর্ষক চিত্র জাহান্নামের অন্য যে কোন অবস্থান থেকে সর্বাধিক যন্ত্রণাদায়ক।

তথ্যনির্দেশ

^১ ইবরাহীম আনাস: আল মু'জামুল ওয়াসীত (মাজমাউল লুগাহ আল আরাবিয়াহ: দেওবন্দ, ১৯৯৬), পৃ. ১০৬১।

^২ জালালুদ্দীন সুয়ুতী, তাফসীর জালালাইন, সূরা জাছিয়াহ ৭নং আয়াতের তাফসীর, মাকতাবাহ শামিলা হাদীছাহ (অনলাইন) <https://al-maktaba.org/book/12876/5137>

^৩ মুহাম্মদ ইবন আবী বকর আল রাযী, মুখতারুস সিহহাহ (বৈরুত:মাকতাবাতু লুবনান, ১৯৮৬), পৃ. ৩০৮।

^৪ সূরা আল ফুরকান: ২৮।

^৫ সূরা আল মুরসালাত: ১৯।

^৬ সূরা আল হুমাযাহ: ১।

^৭ সূরা হুদ: ৭২।

^৮ সূরা আল কাসাস: ৮২।

^৯ ইবন জারীর আত তাবারী, জামি'উল বায়ান, পৃ. ৩৭৪। <http://shiaonlinelibrary.com>

^{১০} আয়াতসমূহ নিম্নরূপ-

- **فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيُشْكِرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ** (আল বাকার: ৭৯)
- **وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ** (ইবরাহীম:২)
- **فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ** (মারযাম: ৩৭)
- **وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ** (সদ:২৭)
- **فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مَنِ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفَاسِقِينَ فُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ** (যুমার:২২)
- **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ** (হা-মীম আস সিদ্দাহ:৬)
- **فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ أَلِيمٍ** (যুখরুফ: ৬৫)
- **وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ** (জাসিয়াহ: ৭)

- فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (যারিয়াত: ৬০)
- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৪৯)
- وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (মুতফফিফীন: ১)
- وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (মুতফফিফীন: ১০)
- ১১ সূরা আত তুর: ১১।
- ১২ সূরা আল হুমাযাহ: ১।
- ১৩ সূরা আল মাউন: ৪।
- ১৪ সূরা আল আশিয়া: ১৮।
- ১৫ অবশিষ্ট আয়াতসমূহ নিম্নরূপ-
 - وَلَئِنْ مَسَّهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (আশিয়া: ৪৬)
 - وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوَيْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (আশিয়া: ৯৭)
 - قَالُوا يَوَيْلُنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (মুরসালাত: ১৫)
 - قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَبَلَّغُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجَنُكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ آفَتَزَىٰ (তহা: ৬১)
 - وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ (কাসাস: ৮০)
 - وَالَّذِي قَالَ لِبَوْلَدِهِ أَفَأَنْ تُكَذِّبُنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَيْتَ الْفُرُونَ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَعْثِفَانِ اللَّهَ وَتِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ حَتَّىٰ قِيلُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (আহকাফ: ১৭)
 - وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلُنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يَغَايِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا خَاسِرًا وَلَا يَنْظُرُونَ (কাহাফ: ৪৯)
- ১৬ সূরা আল আশিয়া: ১৪।
- ১৭ সূরা ইয়া-সীন: ৫২।
- ১৮ সূরা আস সফফাত: ২০।
- ১৯ সূরা আল কলাম: ৩১।
- ২০ সূরা আল মায়িদাহ: ৩১।
- ২১ সূরা হূদ:
- ২২ সূরা আল ফুরকান: ২৮।
- ২৩ আশ শাকানী, ফাতহুল কদীর, <https://www.greatafsirs.com>
- ২৪ সূরা আল মাউন: ৪।
- ২৫ সূরা আল আশিয়া: ১৮।
- ২৬ আল মু'জামুল গিনা; আল মু'জাম আল রায়িদ (অফ লাইন অ্যাপস), ওইল শব্দ দ্র.।
- ২৭ কাযী ছানাউল্লাহ পানী পথী, আত তাফসীর আল মাযহারী, ৮ম খণ্ড (পাকিস্তান: মাকতাবাহ রুশদিয়াহ, ১৪১২ হি.), পৃ. ৯০।
- ২৮ আল মু'জামুল গিনা; আল মু'জাম আল রায়িদ (অফ লাইন অ্যাপস), ওইল শব্দ দ্র.।
- ২৯ সূরা ইয়া-সীন: ৫২।
- ৩০ সূরা আস সফফাত: ২০।
- ৩১ সূরা আল কলাম: ৩১।
- ৩২ সূরা আল ফুরকান: ২৮।
- ৩৩ শামসুদ্দীন আস সাফীরী, শারহুল বুখারী, পৃ. ১১। <https://sotor.com>
- ৩৪ সূরা মারয়াম: ৫৯।
- ৩৫ জালালুদ্দীন মাহাল্লী, তাফসীরুল জালালাইন, পৃ. ৩৮৮। <https://sotor.com>
- ৩৬ সূরা আল কাহাফ: ৫২।
- ৩৭ সূরা আল মুদাছির: ৪২।
- ৩৮ তদেব: ২৭।
- ৩৯ <https://www.islamweb.net>
- ৪০ সূরা আল জিন: ১৭।

- ^{৪১} সূরা আল মুদ্দাছির: ১৭।
- ^{৪২} ইবন কাছীর, আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, আল মাওসুআহ শামিলাহ, www.islamport.com।
- ^{৪৩} ইবন কাছীর, আন নিহায়া ফিল ফিতান ওয়াল মালাহিম, আল মাওসুআহ শামিলাহ, www.islamport.com।
- ^{৪৪} তদেব।
- ^{৪৫} তদেব।
- ^{৪৬} তদেব।
- ^{৪৭} তদেব।
- ^{৪৮} তদেব।
- ^{৪৯} তদেব।
- ^{৫০} ইমাম তিরমিযী, আল জামি' আত তিরমিযী, হাদীছ নং-২৩৮৩ (অফ লাইন অ্যাপস)।
- ^{৫১} সূরা ফুরকান: ৬৮।
- ^{৫২} ইমাম তিরমিযী, আল জামি' আত তিরমিযী, হাদীছ নং ৩১৬৪। (অফলাইন হাদীছ অ্যাপস)
- ^{৫৩} العرفاء অর্থ সমাজপতি।
- ^{৫৪} <https://www.altafsir.com/Tafasir.asp>
- ^{৫৫} ইবন রজব, আত তাখবীফ মিনান নার ওয়াত তা'রীফ বি হালি দারিল বাওয়ার (দিমাশক: দারুল বায়ান, ১৩৯৯হি.)
<http://islamport.com>
- ^{৫৬} জালালুদ্দীন সুয়ুতী, তাফসীরুল জালালাইন, খণ্ড-১, পৃ. ৮২; <http://shiaonlinelibrary.com>
- ^{৫৭} সূরা নিসা: ১৪৫।
- ^{৫৮} মুখতারুস সিহাহ, পৃ. ৩০৮।
- ^{৫৯} সূরা মুরসালাত: ১৯, ২৪, ২৮, ৩৪, ৩৭, ৪০, ৪৫, ৪৭, ৪৯।
- ^{৬০} সূরা তূর: ১১।
- ^{৬১} সূরা মুতফফিফীন: ১০।
- ^{৬২} সূরা ইয়াসীন: ৫২।
- ^{৬৩} সূরা ছফফাত: ২০।
- ^{৬৪} সূরা মাউন: ৪, ৫।
- ^{৬৫} <https://surahquran.com/aya-5-sora-107>
- ^{৬৬} তদেব।
- ^{৬৭} তদেব।
- ^{৬৮} সূরা ইবরাহীম: ২।
- ^{৬৯} সূরা মারয়াম: ৩৭।
- ^{৭০} সূরা সদ: ২৭।
- ^{৭১} সূরা আয যারিয়াত: ৬০।
- ^{৭২} সূরা হা-মীম আস সিজদাহ: ৬।
- ^{৭৩} সূরা আল বাকারা: ৭৯।
- ^{৭৪} সূরা আয যুমার: ২২।
- ^{৭৫} সূরা আয যুখরুফ: ৬৫।
- ^{৭৬} সূরা আল আশিয়া: ১৪।
- ^{৭৭} তদেব: ৪৬।
- ^{৭৮} সূরা আল কলাম: ৩১।
- ^{৭৯} সূরা আল মুরসালাত: ১৫।
- ^{৮০} সূরা তহা: ৬১।
- ^{৮১} সূরা আল জাছিয়াহ: ৭।
- ^{৮২} সূরা আল হুমাযাহ: ১।
- ^{৮৩} সূরা আল মুতফফিফীন: ১।
- ^{৮৪} সূরা আল কসাস: ৮০।

ইসলামী সংস্কৃতি : পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

ড. মুহা. বারকুল্লাহ বিন দুর*

Abstract: Islam is a universal philosophy and a progressive system of life. Islam is a religion of peace, good ideals, and refined taste. Therefore, it has its own unique culture resulting from Islamic instructions. The approved and Shariah instructed lifestyle of the Muslim community is known as Islamic culture. The different rules and interdictions followed in various fields of our life according to the fundamental faith of Islam are also termed as Islamic culture. On the other hand, everything that is ugly, obscene, vulgar, indelicate, superstitious, and against Islamic culture is unculture. Islam rejects such unculture. Indeed, Islamic culture springs from 'Iman' cherished in the heart of the Muslims. The Quran and Sunnah are the sources of Islamic culture. The Muslim community must keep that massive culture palace-like unhampered. The Muslim needs to maintain the cultural distinction in all aspects, including language, literature, architecture, art, manner-etiquette, festivals, etc. Each nation and race has its own culture. The culture may flourish depending on the language, occupation, lifestyle, religion even geographical boundaries. For the Muslim nation, we have Islamic culture, which is entirely distinct compared to others. In this article, their resemblance and characteristics of Islamic culture have been discussed.

ভূমিকা

ইসলাম হচ্ছে বিশ্বমানবতার জন্য শাস্ত্রত সুন্দর আদর্শ জীবন পদ্ধতি। এর অনুসারীদেরও রয়েছে একটি আদর্শ সংস্কৃতি। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি উৎসারিত ও লালিত তাই ইসলামী সংস্কৃতি। কোনো জাতির আপন সংস্কৃতির স্বাভাবিকবোধের দ্বারাই নিজেদের জাতীয় সত্তা ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। অপসংস্কৃতি বা বিজাতীয় সংস্কৃতি জাতীয় অস্তিত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ। বিজাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি বা কোনো অপসংস্কৃতির আশ্রাসনে জাতীয় সত্তা, পরিচিতি ও জাতীয় ঐক্য সংহতির ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। সংস্কৃতি একটা শক্তিশালী অস্ত্র। পশ্চাত্য সংস্কৃতির নগ্ন ছোবলে আজ আমাদের সংস্কৃতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। মুসলিম জাতি পশ্চাত্যের কাছে দীর্ঘদিন পরাভূত থেকে নিজেদের সংস্কৃতির স্বাভাবিক ভুলতে বসেছে। তদুপরি নিজেদের নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা মুসলিম সংস্কৃতিক সক্রিয়তা সম্পর্কে সন্দেহান হয়ে পড়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি মূলত ইসলামী বিধি-বিধানের সামগ্রিক ফলিত রূপ যা পরিপূর্ণভাবে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন, অনুসরণ, রূপায়নের অর্থ হলো- বাস্তব জীবনে ইসলামের নীতি ও আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। এ সংস্কৃতির রয়েছে বৈশিষ্ট্যময় স্বরূপ বা প্রকৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়

সংস্কৃতি শব্দটি বাংলা এর আরবী প্রতিশব্দ ছাকফাহ্, তাহযীব (تَهْذِيبُ); ইংরেজি Culture. আবুল মনসুর আহমদ বলেন, “ইংরেজিতে যাকে বলা হয় রিফাইনমেন্ট, আরবীতে বলা হয় তাহযীব, সংস্কৃতি শব্দটি সে অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে।”^১

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের আগে বাংলায় সংস্কৃতির স্থলে কৃষ্টি শব্দটি প্রচলিত ছিল। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃতিকে কৃষ্টির স্থলাভিষিক্ত করেন।^২ সংস্কৃতি শব্দটি ‘সংস্কৃত ভাষার’ শব্দ। ব্যুৎপত্তি দিক থেকে

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সংস্কৃতি (সম+√কৃ+জিন) শব্দের অর্থ হচ্ছে, ‘যে কীর্তি বা কর্ম মানুষ করে এবং যা তার সঙ্গে থাকে’ অর্থাৎ যে কাজটি একজন ব্যক্তির নিকট মার্জিত, রুচিসম্মত, পরিশীলিত ও লালিত হিসেবে পাওয়া যায় তাই সংস্কৃতি।

অভিধানে সংস্কৃতি শব্দের অর্থ অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি, রীতি-নীতি ইত্যাদির উৎকর্ষ, সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ।^৭ সংস্কার অর্থ শুদ্ধি, মার্জন, পরিস্কার, ব্যাকরণবিদদের মতে, শুদ্ধি, ভুল সংশোধন, মেরামত, ব্যুৎপত্তি, কর্ম ও স্মৃতিজ মনোবৃত্তি, স্বভাবসিদ্ধ স্থায়ীভাব।^৮

‘সংস্কৃতি’ শব্দটির আর একটি অর্থ কৃষ্টি, ভূমি কর্ষণ, হালচাষ, কৃষিকর্ম, অনুশীলন, মানবতার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন ইত্যাদি। কিন্তু এ শব্দটিতে কর্ষণ ও কৃষি অর্থ জড়িত তাই অনেকে এর প্রতি বিমুখ।^৯

আবুল ফজল বলেন, ‘কালচার শব্দের ধাতুগত অর্থ কর্ষণ, সোজা কথায় চাষ করা। জমি রীতিমতো কর্ষিত না হলে যত ভালো বীজই বপন করা হোক না কেন তাতে ভালো ফসল কিছুতেই আশা করা যায় না। মন জিনিসটাও প্রায় জমির মতই। মনের ফসল পেতে হলে তারও রীতিমতো কর্ষণের প্রয়োজন।’^{১০}

Culture শব্দটি ল্যাটিন Cultra শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ কর্ষণ (Cultivation)।^১ Oxford Dictionary-তে Culture-এর আরেকটি অর্থ করা হয়েছে, Intellectual development Improvement by (Mental or Physical) training.^২ “(মানসিক বা দৈহিক) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।”^৩ ষোল শতকের শেষার্ধ্বে ফ্রান্সিস বেকন সর্বপ্রথম ইংরেজী সাহিত্যে Culture শব্দটি ব্যবহার করেন।

ثقافة শব্দটি আরবী অভিধানে চতুর, বিচক্ষণ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান এবং সুসভ্য ও শিক্ষা দেয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।^{১০} কুর’আনুল-কারীমে ثقافة শব্দটির ব্যবহার না থাকলেও تَفَهُّف শব্দমূল থেকে ক্রিয়া পদের বহুবচন রূপে দু’টি স্থানে যথাক্রমে تَتَفَهَّمُوا^{১১} ও تَتَفَهَّوْا^{১২} হিসেবে এসেছে। এ দুটি স্থানেই শব্দটির সাধারণ অর্থ পাওয়া, সাক্ষাৎ পাওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সংস্কৃতি শব্দের বিশ্লেষিত অর্থের সঙ্গে কুর’আনে ব্যবহৃত تَفَهُّف শব্দের সাধারণ অর্থের তাৎপর্যগত যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে বস্তু, বিষয়, অভ্যাস, প্রথা বা আচরণ মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় তাই তার সংস্কৃতি।^{১৩} মাহমুদ ইব্ন উমার আয-যামাখশারী (র) বলেন, “ছাকাফাহ্ (تَفَهَّاهُ) শব্দের অর্থ হলো, আদব-কায়দা শেখানো, সুসভ্য করে গড়ে তোলা ইত্যাদি।”^{১৪}

উপর্যুক্ত শব্দগুলোর প্রতিটি (সংস্কৃতি, Culture ও ثقافة) শব্দগত ও পরিভাষাগত পার্থক্য থাকলেও অর্থগত দিক দিয়ে সার্বজন্যপূর্ণ। কেননা অমসৃণ জমিকে যেমন কর্ষণ করে মসৃণ ও ফসল উৎপাদনের উপযোগী করা হয়, তেমনি শিক্ষা ও সাদাচরণের অনুশীলন দ্বারা একজন ব্যক্তি বা জাতি সভ্য, পরিশীলিত ও সংস্কৃতবান হয়।

মনীষীগণ বিভিন্নভাবে সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে তা বর্ণনা করা হলো,

১. আবুল ফজল বলেন, ‘সৌন্দর্য ও মহত্বের সাধনাই সংস্কৃতি। তার জন্য সংস্থান, অবসর ও নিরাপত্তার যেমন দরকার, প্রীতি ও শ্রদ্ধার দরকার আরো বেশি। মনুষ্যত্ব তথা মানব ধর্মের সাধনাই সংস্কৃতি এবং একমাত্র এ সাধনাই জীবনকে করতে পারে সুন্দর ও সুস্থ। প্রচলিত অর্থে যাকে সংস্কৃতি বলা হয় তারও লক্ষ্য মন আর চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য সাধনার ওপর, এক কথায় মনুষ্যত্বের ওপর সে সংস্কৃতির ভিত্তি, একমাত্র যে সংস্কৃতিই মানব জীবনে বিকিরণ করতে পারে আলো। সে আলোর নেই কোনো দেশ, কোনো কাল ও কোনো জাত।’^{১৫}

২. গোপাল হালদার বলেন, ‘সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম, তার জীবনযাত্রার আর্থিক ও সামাজিকরূপ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান, তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর নানা শিল্প সৃষ্টি, সমস্ত চারু ও কারুকলা- এ হলো সংস্কৃতির স্বরূপ।’^{১৬}
৩. বদরুদ্দীন উমর সংস্কৃতির পরিচয় প্রদানে বলেন, ‘জীবন চর্চারই অন্য নাম সংস্কৃতি। মানুষের জীবিকা, তার আহার-বিহার, চলাফেরা, তার শোক-তাপ, আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তি, তার শিক্ষা-সাহিত্য-ভাষা, তার দিন-রাত্রির হাজারো কাজকর্ম, সব কিছুর মধ্যেই তার সংস্কৃতির পরিচয়।’^{১৭}
৪. ওয়াকিল আহমদ সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, ‘জীবন ছাড়া সংস্কৃতি নেই। এ জীবন অচল, অবাক, অক্ষম হলে চলে না- সজীব, সবাক ও সক্ষম হওয়া আবশ্যিক। প্রাণহীন জড় প্রকৃতির সংস্কৃতি নেই। মোটকথা সংস্কৃতি জীবন-সম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন এবং মানসসম্মত।’^{১৮}
৫. ড. আহমদ শরীফ বলেন, ‘কালচার বা সংস্কৃতি একটি পরিশ্রুত জীবন চেতনা। ব্যক্তি চিহ্নেই এর উদ্ভব ও বিকাশ। এটি কখনো সামগ্রিক বা সমবায় সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্য দেশ-কাল-জাতে এর প্রসার আছে কিন্তু বিকাশ নেই। অর্থাৎ এটি জাতীয় কিংবা দেশীয় সম্পদ হতে পারে কিন্তু ফসল হবে ব্যক্তির মনের। কেননা সংস্কৃতি ও কাব্য, চিত্র ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো স্রষ্টার সৃষ্টি। কৃতিত্ব স্রষ্টার বা উদ্ভাবকের। তা অনুকৃত বা অনুশীলিত হয়ে দেশে পরিব্যাপ্ত ও জাতে সংক্রমিত হতে পারে এবং হয়ও। তখন কালচার হয় সাধারণের সম্পদ ও ঐতিহ্য এবং পরিচিত হয় দেশীয় বা জাতীয় সংস্কৃতি নামে। যেমন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে ও বাণীতে যে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটেছে তাই ইসলামী বা মুসলিম সংস্কৃতি বলে পরিচিত।’^{১৯}

৬. রাগিব আল-বৈরুতী আছ-ছাকাফাহ বা ‘সংস্কৃতি’র পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,

الْتَّقَاتُ هِيَ الْإِصْلَاحُ النَّفْسِ الصَّحِيحِ الْكَامِلِ بِحَيْثُ يَكُونُ صَاحِبُهُ كَمْرًا وَهُوَ إِصْلَاحُ الْفَاسِدِ وَتَقْوَمُ الْعُوقُ.^{২০}

“আছ-ছাকাফাহ অর্থ মানসিকতার সঠিক ও পূর্ণ সংশোধন এমনভাবে যে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সন্তা পরিপূর্ণ অধিক গুণ বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে। খারাপীর সংশোধন এবং বক্রভাব সোজা করাই হলো ছাকাফাহ বা সংস্কৃতি।”

৭. ই. বি টেইলরের (E. B Taylor) মতে, Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.^{২১}
৮. Mathew arnold বলেন, ‘সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবনের সামগ্রিক উৎকর্ষতা অনুসরণের নাম। পৃথিবীতে যা কিছু চিন্তা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তার সবকিছুর সাথে সংস্কৃতি আমাদেরকে সম্পৃক্ত করে এবং এ জ্ঞানের মাধ্যমে একটি মুক্ত চিন্তার ঝড় সৃষ্টি করে যা মানুষের স্বভাব ও অভ্যাসকে পুঞ্জীভূত করে এবং যা আমরা এখন অনুসরণ করছি।’^{২২}
৯. ড. আলিয়া আলী ইজ্জাত বেগেভিচ সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, ‘ধর্মাচরণ, নাটক, কবিতা, খেলাধুলা, লোকজ সংস্কার, লোককথা, পুরান গাঁথা, নৈতিক ও নন্দন তত্ত্বীয় ব্যবস্থা, দর্শন, থিয়েটার, গ্যালারি, জাদুঘর, গ্রন্থাগার, রাজনীতি ও বিচারব্যবস্থা, যা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল্য ও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করে। এগুলোই মানব সংস্কৃতির অখণ্ড ধারাচিত্র, যার শুরু স্বর্গে; স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্ট মানুষের মধ্যকার আদি যোগাযোগের সূত্র।’^{২৩}

১০. ইউনেস্কোর ১৯৮২ সালে মেক্সিকো সম্মেলনে সংস্কৃতির পরিচয় দিতে গিয়ে ঘোষণা করা হয়; ব্যাপকতর অর্থে সংস্কৃতি একটি জাতির অথবা সামাজিক গোত্রের বিশিষ্টার্থক আত্মিক, বস্তুগত, বুদ্ধিগত এবং আবেগগত চিন্তা ও কর্মধারার প্রকাশ। শিল্প ও সাহিত্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত একমাত্র বিষয় নয়। মানুষের জীবনধারাও সংস্কৃতির অঙ্গ। মানুষের অধিকার, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং বিশ্বাসও সংস্কৃতির অঙ্গ।^{২৪}

আলোচিত সংজ্ঞাগুলো সামনে রেখে বলা যায় ব্যক্তি ও সামষ্টিক মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের আলোকে যে কাজগুলো হয়ে থাকে তাই সংস্কৃতি।

ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয়

শান্তি, সুন্দর ও মানবতাবাদী আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের রয়েছে স্বাতন্ত্র্য সংস্কৃতি। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতি। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় ইসলামী জীবনদর্শন ও জীবনবিধান অনুশীলনের ফলে মানুষের ব্যবহারিক জীবন ও পরিবেশে যে সংস্কৃতি ফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে এর পরিচয় দান করেছেন। নিম্নে তাঁদের মতামত বর্ণনা করা হলো,

১. প্রফেসর ড. আহমাদ মুহাম্মদ জামাল ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় দিয়ে বলেন,

الثقافة الإسلامية على أساس أنها المفاهيم الصحيحة عن الله و الكون والانسان والحياة.^{২৫}

“ভিত্তিগতভাবে ইসলামী সংস্কৃতি আল্লাহ, জগৎ, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধিকেই বুঝায়।”

২. অধ্যাপক হাসান আইয়ুব বলেন, ‘কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক পরিচালিত মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড, ক্রিয়াকলাপ ও আচরণই ইসলামী সংস্কৃতি।’^{২৬}

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, ‘ইসলামী সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে। যেমন, আল্লাহর একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস।’^{২৭}

৪. এ. জেড সিদ্দীক বলেন, ‘ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থ, এক. তার চিরন্তন দিক। দুই. সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ সংস্থা।’^{২৮}

৫. ফায়জী বলেন, ‘ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এ জীবনব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হলো ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তিনটি বিষয় বুঝায়। এক. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল। দুই. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য। তিন. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম প্রথার বিশেষ সংযোজন।’^{২৯}

৬. আব্দুল মান্নান তালিব ইসলামী সংস্কৃতির পরিচয় প্রদানে বলেন, ‘ইসলামী জীবনচর্চাই ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমানরা যেভাবে তাদের জীবন গড়ে তোলে ইসলামী সংস্কৃতি ঠিক তেমনি রূপ লাভ করে। মুসলমানরা যখন পুরোপুরি ইসলাম তথা ইসলামী বিধান মেনে চলে তখন তারা পূর্ণ ইসলামী জীবন-যাপন করে।’^{৩০}

৭. এ. জেড. এম শামসুল আলম বলেন, ‘মানুষের জৈবিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের পর যে সমস্ত আচার-আচরণ, কাজ-কর্ম, রুচি, চেতনা মানব জীবনকে সুন্দর করে এবং জীবনে আনন্দ অনাবিল সুখ ও

শান্তি সে সমস্ত আচার-আচরণকে ইসলামী সংস্কৃতি বলা যায়, যদি তা ইসলামী মূল্যবোধ ভিত্তিক হয়। ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম লক্ষ্য হলো জীবনকে সুন্দরতর করা, সুখ-শান্তি ও কল্যাণময় করা। ইসলামী সংস্কৃতির সর্বোত্তম প্রতীক হলেন, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। আর তাঁর সুন্যাহ্ই হলো মৌলিক মুসলিম সংস্কৃতি।^{৩১}

ঈমান তথা বিশ্বাসই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির প্রাণ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, *كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ* “পবিত্র কালিমা একটি বৃক্ষের মত যার শেকড় থাকে সুগভীরে প্রতিষ্ঠিত আর তার শাখা-প্রশাখা থাকে দিগন্ত বিস্তৃত।”^{৩২}

ইসলামী সংস্কৃতির বিশালায়তন প্রাসাদকে অক্ষুণ্ণ রাখা মুসলিম জাতির জন্য অপরিহার্য। ভাষা, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা, আচার-আচরণ, উৎসব অনুষ্ঠান সকল ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক স্বাভাবিক বজায় রাখা মুসলমানদের জন্য অতীব জরুরী। প্রত্যেক জাতি বা জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা সংস্কৃতি বা কৃষ্টি রয়েছে। সে সংস্কৃতি ভাষা, পেশা, জীবনযাত্রা, ধর্ম, ভৌগোলিক সীমারেখা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে। হিন্দুদের জন্য হিন্দু সংস্কৃতি, খ্রিস্টানদের জন্য খ্রিস্টান সংস্কৃতি এবং ইয়াহুদীদের জন্য রয়েছে ইয়াহুদী সংস্কৃতি। আবার আরবদের দেশীয় সংস্কৃতি রয়েছে তেমনি রয়েছে পারসিকদের দেশজ সংস্কৃতি। তেমনিভাবে গোটা মুসলিম জাতির জন্য রয়েছে ইসলামী সংস্কৃতি। যা অপরাপর সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি। কেননা, মুসলিম জাতি হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, *كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ* “তোমরা সর্বোত্তম জাতি।”^{৩৩} সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির সংস্কৃতিও সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়াই স্বাভাবিক। রাসূলুল্লাহ (সা) অপরাপর জাতির সংস্কৃতি গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, *خَالِفُوا الْمَشْرِكِينَ وَالْيَهُودَ* “তোমরা ইয়াহুদী ও পৌত্তলিকদের বিপরীত কর।”

বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতিই শ্রেষ্ঠ। এ সংস্কৃতির প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মত প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে। কাজেই অন্য কোন জাতির সংস্কৃতি হতে ধার নেয়ার মত এখানে কিছুই নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জীবন পদ্ধতি। ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য শাস্ত্রত সুন্দর আদর্শ জীবন পদ্ধতি। তাই এর অনুসারীদেরও রয়েছে একটি আদর্শ সংস্কৃতি। অতএব ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি উৎসারিত ও লালিত হয় তাই ইসলামী সংস্কৃতি। এ ইসলামী সংস্কৃতি শাস্ত্রত সার্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী সংস্কৃতির উৎস

ইসলাম একটি জীবন দর্শন ও প্রগতিশীল শাস্ত্রত জীবন পদ্ধতি। ইসলাম শান্তি, সুন্দর আদর্শ ও সুরক্ষিত ধর্ম। তাই স্বভাবতই ইসলামী অনুশাসনের প্রভাবে এর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি রয়েছে। ইসলাম অনুমোদিত ও ইসলামী শরী'আত নির্দেশিত মুসলিম জাতির জীবন পদ্ধতিই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের মূল বিশ্বাসের আলোকে যত নিয়ম-নীতি, বিধি-নিষেধ পালন করতে হয়, তা সবই ইসলামী সংস্কৃতি। আর যা কিছু অসুন্দর, অশ্লীল, অমার্জিত, রুচিহীন, কুসংস্কার ও শরী'আত বিরোধী তা অপসংস্কৃতি ইসলাম তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কাজেই ইসলামী সংস্কৃতি মুসলিম হৃদয়ের মণিকোঠায় লালিত ঈমান থেকেই উৎসারিত। কুরআন, সুন্যাহ, ইজমা ও কিয়াস ইসলামী সংস্কৃতির উৎস। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, *وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا* “রাসূলুল্লাহ (সা) তোমাদের জন্য যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।”^{৩৪}

বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণ ব্যবস্থাপনার মতো। এতে আল্লাহর মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে শুধু একজন উপাস্যের মতো নয়। বরং দুনিয়াবী মত অনুসারে তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। তাঁর অনুগত বান্দা মানুষ তারই খিলাফতের উত্তরাধিকারী। অতএব ইসলামী সংস্কৃতির মূল উৎস হচ্ছে কুরআন সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

ইসলামী সংস্কৃতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানবজাতির জীবনযাপনের যে বিধি বিধান ইসলাম দিয়েছে তার ব্যবহারিক দিক হলো সংস্কৃতি। জীবন যেহেতু গতিশীল তেমনি সংস্কৃতিও গতিশীল। জীবনের শুরু যেখানে সংস্কৃতির সূচনা সেখান থেকেই। মানুষের প্রথম জীবন শুরু হয় আল্লাহর হিদায়াত ও আনুগত্যের মাধ্যমে। মানবের প্রথম জীবন চর্চাই ছিল সংস্কৃতির সূতিকাগার।

সূতরাং এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, প্রথম মানব হযরত আদম (আ)-এর দ্বারাই ইসলামী সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হয়, যুগে যুগে নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে তা বিকাশ লাভ করে এবং শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যুগে এসে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^{৩৫}

‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।’

মানুষের হাজার হাজার বছরের অতীত ইতিহাসই সংস্কৃতির ইতিহাস। মানুষ প্রথম থেকেই সভ্য এবং সুন্দর রুচিশীল সংস্কৃতিক জীবনের অধিকারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,^{৩৬} وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا^{৩৭} ‘তিনি (আল্লাহ) আদমকে সব বস্তুর নামসমূহ শিক্ষা দিলেন।’ অর্থাৎ তিনি সকল জিনিসের তাৎপর্য বা ব্যবহার-বিধি আল্লাহর নিকট থেকে শিখেছেন। যাকে পরিপূর্ণ জ্ঞান বলে, তা তিনি এভাবে আহরণ করেছেন।^{৩৮}

তিনি পার্থিব কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই তাকে জ্ঞান দান করেন, এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আদম (আ) ও হাওয়া (আ) ভুল করে চলে এলেন মাটির পৃথিবীতে স্বাভাবিকভাবে তাদের সাথে চলে এল শয়তান। দ্বন্দ্ব শুরু হলো সত্য-মিথ্যার, হক-বাতিলের, ন্যায় ও অন্যায়ের, একদিকে হিদায়াত অন্য দিকে গোমরাহি। যেখানে ফিরআউন সেখানেই মূসা (আ), যেখানে নমরুদ সেখানেই ইবরাহীম (আ), নমরুদ ছিল ভীষণ শক্তিদর, ইবরাহীম (আ) ছিলেন অসীম সাহসী।

সংস্কৃতির সূচনা বিন্দুতে কোনো ভ্রষ্টতা, জড়তা নেই, আছে প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ও সত্যনিষ্ঠা। মানুষ কোনো সময় অসভ্য বা অমানুষ ছিল না। সে প্রথমে মানুষ, মাঝেও এবং শেষেও মানুষ। স্থান-কাল পাত্রভেদে বুদ্ধির সাথে যুক্ত হয় নিত্য নতুন জ্ঞান। জ্ঞানই মানুষকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। শয়তানের আছে অহংকার, মানুষের আছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের সম্পদ। অহংকারের কারণে শয়তান চির অভিশপ্ত, বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য মানুষ ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ বা সৃষ্টির শেরা। মানুষের দুনিয়ায় আগমনের পিছনে শয়তানের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। আদম (আ) আল্লাহর হুকুম অমান্য করেও নতুন পৃথিবীর সম্রাট। কারণ তার মধ্যে ছিল লজ্জাবোধ, ছিল অনুশোচনা। আদম (আ) আল্লাহর প্রতিনিধি ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে দায়িত্ব ছিল পৃথিবীকে মানুষের বাসোপযোগী করে গড়ে তোলা। এভাবেই হযরত আদম (আ)-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত হলো।

আদম (আ)-এর পৃথিবীতে আগমন হওয়া বাহ্যিক দৃষ্টিতে শান্তি মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে তা শান্তি ছিল না। যদিও শান্তির কথা উল্লেখ আছে। জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণ প্রাথমিক বিবেচনায় শান্তিই মনে হবে, কিন্তু মানুষের পৃথিবীতে আগমনের ফলে সমগ্রবিশ্বে মহান আল্লাহ্র খিলাফতের পূর্ণতা সাধন ঘটল।^{৭৮}

হযরত আদম (আ)-এরপর যে পয়গম্বরের নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন হযরত নূহ (আ)। তিনি আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামী সংস্কৃতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। নূহ (আ)-এর সময় ইসলামের যে সংস্কৃতির প্রচলন ছিল, সেটি ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণরূপ নয়, আদম (আ)-এর চেয়ে একটু অগ্রগতি হয়েছিল। মানুষ তখনও পার্থিব প্রাপ্তিকে একমাত্র কাম্য মনে করত এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের অনুশোচনা ছিলনা। সুতরাং নূহ (আ) তাদের ধ্বংস কামনা করলেন, এখানেই তাঁর অপূর্ণতা।

নূহ (আ)-এরপরে যে পয়গম্বরের নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন হযরত ইবরাহীম (আ)। তিনি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী এবং সত্য সাধক। ইবরাহীম (আ)-কে আমরা জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকি। তাঁর পিতা ছিলেন মূর্তিপূজক এবং তার ব্যবসা ছিল মূর্তি নির্মাণ। শৈশবকাল থেকেই মূর্তিপূজার প্রতি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিরূপ ধারণা ছিল। তিনি কোনো দিন মূর্তিপূজা করেনি। হযরত ইবরাহীম (আ)-এরপরে যে পয়গম্বরের নাম ইতিহাসের ক্রমধারায় উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন হযরত মুসা (আ)। মুসা (আ)-কে ইহুদীরা তাদের আইন প্রণেতা হিসেবে মনে করেন।^{৭৯} তিনি পার্থিব জীবন ব্যবস্থাপনায় এবং রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধন করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন ধীরে ধীরে ইসলামী আইন ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তখন অনেক প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ (সা) হযরত মুসা (আ)-এর আইনকে অনুসরণ করেছিলেন।

ইসলামী সংস্কৃতির পূর্ণতা পায় সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মাধ্যমে। ইসলাম সকল দ্বীনের সারসংক্ষেপ এবং রাসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন সর্বশেষ ঐশী বাণীর বাহক। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে সকল ধর্মের সারনির্যাস নিহিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চরিত্র, সকল নবী ও রাসূলগণের চরিত্রের উর্ধে। তার প্রচারিত দ্বীন যেমন সকল দ্বীনের সারসংক্ষেপ হয়ে বিকাশ লাভ করেছে, তেমনি তাঁর চারিত্রিক জীবনও বিকাশ লাভ করেছে সকল প্রেরিত পুরুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। তাই বলা হয়, তাঁর আদর্শই মানব জাতির জন্য পূর্ণ আদর্শ।^{৮০} আল্লাহ তা‘আলা কুর‘আনুল-কারীমে বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ^{৮১}

“নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূল (সা)-এর জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।”

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,^{৮২} وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا।”

হযরত মুহাম্মাদ (সা) মানবজাতিকে শুধু পারলৌকিক মুক্তির পথ দেখাননি, তিনি সকল মানুষকে ইহজগত থেকে পরজগত পর্যন্ত সুন্দর জীবনের পূর্ণস্বাদ গ্রহণের পথ দেখিয়েছেন। একজন সাংস্কৃতিক মানুষের যে গুণ থাকা দরকার শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে তা বিদ্যমান ছিল। ‘আরবে সে যুগে এটি ছিল দুর্লভ ব্যাপার। শৈশব থেকেই হযরত মুহাম্মাদ (সা) সত্যবাদি ও ন্যায়নিষ্ঠাবান ছিলেন। সকলে তাকে ‘আল-আমিন’ বলে ডাকতেন। তাঁকে কখনও অপসংস্কৃতি গ্রাস করতে পারে নি।

কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর ‘বিশ্বনবী’ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ ও সংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত যত্নসহকারে উপস্থাপন করেছেন। কা‘বাগৃহ সংস্কারকালে কালো পাথর স্থাপন নিয়ে বিরোধ দেখা

দিলে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তা সমাধান করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা) তখন সবেমাত্র তরুণ যুবক। মক্কাবাসীদের কী অগাধ বিশ্বাস তার উপর।^{৪৩}

ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান

ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান চারটি। ১. আকীদা-বিশ্বাস, জীবনবোধ ও জীবনের লক্ষ্য, ২. ইবাদত-বন্দেগী ও স্রষ্টার স্তব-স্তুতি, ৩. আখলাক-চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, ৪. মুয়ামালাত-সামাজিক আচার-আচরণ, লেন-দেন, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ এসব উপাদানের আকীদা-বিশ্বাস তথা জীবন বোধ হচ্ছে প্রথম ও প্রধান নিয়ন্ত্রনকারী উপাদান।

ইসলামী সংস্কৃতির পরিধি

মানুষের জীবন যেমন ব্যাপক। তাদের জীবনের বিধানের পরিসরও বিরাট। তাই সমগ্র জীবন নিয়ে ইসলামী সংস্কৃতির বিষয় ও পরিধি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, “নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছি।” সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদানে তৈরি মানুষের সম্ভাবনাও অপরিসীম। কাজেই তার সংস্কৃতিও অপরিসীম। যা কিছু সুন্দর, চিরন্তন, কল্যাণকর এবং যা তাওহীদ বিশ্বাস সদ্ভাত-ভাবধারায় উচ্চকিত, সবই ইসলামী সংস্কৃতির মধ্যে গণ্য। ইসলামী সংস্কৃতি কোনো জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে- যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বৃকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। এজন্যই বিশ্বের যে কোন অঞ্চলের যে কোনো ভাষায় এবং যে কোন বর্ণের বা যে কোনো ধর্মের লোক ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় আসতে পারে। এ সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী কথন। এ সংস্কৃতি নিজের অনুগামীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির অনুসারী করে তোলে। কাজেই অন্য সংস্কৃতির গ্রহণ কখনও অনুমোদন করে না।

ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শ

ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শ বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনাদর্শ এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসারী খুলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ “নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।”^{৪৪}

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (সা) তোমাদের জন্য যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক।^{৪৫} রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين “তোমরা অনুসরণ কর আমার সূনাহ ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সূনাহ।”^{৪৬}

ইসলামী সংস্কৃতির নির্দেশক হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বাণী তথা আল-কুরআনুল কারীম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, قل إن هدى الله هو الهدى “বলে দিন, আল্লাহর পথ নির্দেশনাই একমাত্র পথের দিশা।”^{৪৭} আল-কুরআন এ সংস্কৃতিকে সিরাতুল মুস্তাকীম বলে অভিহিত করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“নিশ্চয়ই এ হচ্ছে আমার সঠিক সরল সুদৃঢ় পথ। অতএব তোমরা এ পথই অনুসরণ করে চলবে, এ ছাড়া অন্যান্য পথের অনুসরণ তোমরা করবেনা। তা করলে তা তোমাদের এ পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তোমাদের এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা সাবধান হতে পার।”^{৪৮}

ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা। এ হচ্ছে একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা করুনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিক সবকিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত। আর সামগ্রিকভাবে এ সংস্কৃতির অনুসারী হয়ে আল্লাহ তা‘আলার সম্ভ্রুতি অর্জন করাই হল এর মূল লক্ষ্য। কেননা মু‘মিনের জীবনের যাবতীয় তৎপরতা আল্লাহর জন্যই নিবেদিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* “বল আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য।”^{৪৯}

কাজেই যা কিছু বিশ্বাসের বিপরীত, তা সবই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার তথা বিদআত, তা বর্জন করা একান্তই কর্তব্য। কেননা, যে সব শিল্পকলা, পৌত্তলিকতা, অশ্লীলতা ও কদর্যরুচির সাথে জড়িত তা মানবতার জন্যে ধ্বংসাত্মক। ইসলাম তা অনুমোদন করেনা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক করে দিয়েছেন ঘোষণা করেন, *رَدُّ* “যে লোক আমার এই জিনিসে তথা সংস্কৃতিতে এমন কোন জিনিস নতুন শামিল বা উদ্ভাবন বা অনুপ্রবেশ ঘটাবে যা মূলত এ সংস্কৃতিতে অন্তর্ভুক্ত নয়- তা সবই প্রত্যাখ্যাত হবে।”^{৫০}

ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত মানব মনের উৎকর্ষ সাধন পদ্ধতি ও রূপায়ণকে বোঝায়। একটি জাতির আচার-আচরণ, ব্যবহার, ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তার সংস্কৃতি বলা হয়। মুসলিম জাতির জীবন-আচারই ইসলামী সংস্কৃতি। এটি ইসলামী শাস্ত্রত জীবন বিধান থেকে উৎসারিত আর ইসলামী অনুশাসনেরই প্রতিফলিত রূপ।

ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বজনীন, সার্বজনীন ও চিরন্তন। তাই বিশ্বের সকল মুসলিম এক ও অভিন্ন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যেহেতু তারা এক আল্লাহ, এক রাসূল ও এক কিবলাতে বিশ্বাসী, তাই তাদের সকলের জীবনের সংস্কৃতির মধ্যে একই সূর অনুরণিত ও বিরাজমান। ঈমান ও বিশ্বাস তথা মূল্যবোধের কারণে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে যে কর্মতৎপরতা প্রতিফলিত হয়, তাই সংস্কৃতি। মানুষের চাল-চলন, ভাবের আদান-প্রদান ও ব্যবহারিক ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে সংস্কৃতি ফুটে উঠে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সেগুলোর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি এবং কাজকর্ম সমাজে সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। মানুষের মনোজগতের বিকাশ ও ক্রিয়া কলাপে সংস্কৃতির প্রকাশ ঘটে। প্রকাশ ঘটে তার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেও। সাহিত্য, শিল্পকলা, সৌন্দর্যবোধ, দর্শন, কলা, প্রচলিত প্রথা, আচার-আচরণ তথা সব কিছুতে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই এসব কিছু সংস্কৃতির বিষয়বস্তু। তাই একজন মুসলিমের জীবনে দৈনন্দিন জীবন যাত্রার ও কর্মতৎপরতায় যেসব আমল প্রতিফলিত হয়, তাই ইসলামী সংস্কৃতির বিষয়বস্তু। বাস্তব উদাহরণসহ ইসলামী সংস্কৃতির কয়েকটি দিক তুলে ধরছি।

১. ইসলামী সংস্কৃতিতে প্রতিটি সৎ কাজের সূচনায় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, *كل أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو اقطع اوابتر* “প্রত্যেক ভাল কাজের শুরুতে যদি বিসমিল্লাহ বলা না হয়, তা হলে সেটা অসম্পূর্ণ ও নিম্নমানের থেকে যায়।”^{৫১}

২. ইসলামী সংস্কৃতিতে ঘুমাতে যেতে এবং ঘুম থেকে উঠতে হয় আল্লাহর শুকর আদায় করার মাধ্যমে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) শিখিয়েছেন ঘুমাতে যেতে পড়তে হয়-*اللهم باسمك أموت* “হে আল্লাহ! আমি তোমার নামেই মৃত্যুবরণ করি (নিদ্রা যাই) এবং তোমার নামেই জীবিত জাগ্রত হই।”^{৫২} আবার ঘুম থেকে উঠতে উঠতে পড়তে হয়-*الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور* “সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি মৃত্যুর (নিদ্রার) পর আমাদেরকে জীবিত (জাগ্রত) করেছেন এবং তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।”^{৫৩}
৩. ঘুম থেকে উঠে প্রভাতে প্রথমেই সালাতুল ফজর আদায় করে প্রতিটি ঘরে, বাড়িতে কুরআন-হাদীসের তিলাওয়াত ও তালীম করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا* “নিশ্চয়ই সকালের কুরআন তিলাওয়াত গ্রহণীয় সাক্ষী হবে।”^{৫৪}
৪. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে জামাতসহ সালাত আদায় এবং এর আগে সুললিত উচ্চকণ্ঠে আযান ধ্বনি উচ্চারণ ইসলামী সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ।
৫. ইসলামী সংস্কৃতিতে উঠতে, বসতে, চলতে-ফেরতে, খেতে, খাওয়া শেষে ঘুম হতে উঠতে ঘুমাতে যেতে, সুসংবাদ শুনে দুঃসংবাদ পেলে আনন্দ-বেদনায়, বিপদে-আপদে তথা সব সময় মহান আল্লাহর স্মরণ ও যিকরের নির্দেশ রয়েছে। একজন মুসলিম করুণাময় আল্লাহর স্মরণশূন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, *وَلَا تُطْعَمُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا* “যে ব্যক্তির হৃদয় আমার স্মরণশূন্য, তার অনুসরণ করো না।”^{৫৫}
৬. ইসলামী সংস্কৃতিতে ডান হাতে গ্রহণ, ডান পা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ, কোথাও বের হতে ডান পা আগে বাড়তে হয়। তেমনিভাবে বাম হাত ও বাম পায়ের ব্যবহারও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা দিয়ে, পায়খানায় যেতে প্রথমে বাম পা ইত্যাদি সত্যিই তাৎপর্যময় দিক।
৭. আমরা আল্লাহর নামে ডান হাতে খাওয়া শুরু করি এবং তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পর মহান আল্লাহর নি‘আমতের জন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কেননা এ খাদ্যকে আল্লাহর দান হিসেবেই মনে করা হয়; এটা কোন গর্ব অহংকার করার বিষয় নয়। নবী করীম (সা) বলেছেন, *فَاَجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ* “তোমরা একসাথে বসে খাও, আল্লাহর নাম স্মরণ কর, তা হলে আল্লাহ তাতে তোমাদেরকে বরকত দেবেন।”^{৫৬} রাসূলুল্লাহ (সা) শিখিয়েছেন, খাবার শুরু করতে হয়, *بِسْمِ اللَّهِ* আল্লাহর নামে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের আশায় শেষ করে কৃতজ্ঞতার সাথে *الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفَى وَلَا مُؤَدَّع وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا* “আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, পবিত্রতা ও প্রাচুর্য অবিরতভাবে। হে আমাদের রব! আমরা যেন আপনার দেয়া রিযিক থেকে মুখাপেক্ষিহীন না হই।”^{৫৭}
৮. ইসলামী সংস্কৃতিতে এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সাক্ষাৎ হলে প্রথমেই অভিবাদন জানিয়ে সালাম দিতে হয়। তারপর কুশল বিনিময় করতে হয়। পরস্পরে হাতে হাত, বুকে বুক, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুসাফাহা মুআনাকা করাও ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, *أَفْشُوا السَّلَامَ* “তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটান।”^{৫৮} এতে শত্রুতা কমে, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, *أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ*

“ইসলামে কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি (সা) বলেন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দেবে আর পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেবে।”^{৫৯}

৯. কথাবার্তায় ইসলামী আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দ চয়ন করা, ইসলামী শব্দ ব্যবহার, তাওহীদের বিপরীত ভাষা পরিহার করে অত্যন্ত বিনম্র ও মার্জিত ভাষায় মানুষের সাথে কথা বলাও ইসলামী সংস্কৃতির আদর্শ। প্রিয় নবী (সা) বলেছেন, لَا يَنْبَغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ “তোমরা একে অপরের সাথে ভদ্র নম্র ব্যবহার করবে এবং কেউ কারও সাথে অহংকার করবে না।”^{৬০} অপর বিজাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও সাদৃশ্যপূর্ণ ভাষা ও আচরণ করা নিষিদ্ধ। যেমন- কথা বলার সময় মাথা ঝোকানো বা হাত জোড় করে বিনয় প্রকাশ ইসলামে সঙ্গত নয়। মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলতে হয়। প্রিয় নবী (সা) বলেন, تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ “তোমার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে কথাও সদকাস্বরূপ।”^{৬১}
১০. এ মায়া সংসারে মানব শিশুর জন্মলগ্নে কেবল উৎসব করা ঠিক নয়, বরং তাঁর আগমনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় এবং তার কর্ণকুহরে মহান আল্লাহর নামের ধ্বনি আযান ও ইকামতের বাণী পৌঁছে দেয়া কর্তব্য।
১১. এ নশ্বর দুনিয়া হতে মানুষ পরপারে চলে যাওয়ার সংবাদ শুনে- رَاجِعُونَ- “আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তারই কাছে ফিরে যাব” বলতে হয়। তারপর উত্তমভাবে তার গোসল ও দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম বিধান।
১২. সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সন্তানের একটি ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক বাহক ও পরিচায়ক সুন্দর নাম রাখা কর্তব্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدًا فَلْيَحْسِنْ اسْمَهُ “শিশুর জন্ম হলে সুন্দর একটি নাম রাখ।” এটাও ইসলামী সংস্কৃতির একটি অঙ্গ।^{৬২}
১৩. সন্তান জন্মের ৭ম, ১৪তম ও ২১তম দিবসে বা সম্ভব না হলে পরবর্তী সময়ে আকীকা করা সুন্নাত। এটা ইসলামী সংস্কৃতির অঙ্গ।
১৪. ইসলামী সংস্কৃতিতে বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে, আদব শেখাবে আর ছোটরা বড়দের মান্য করবে তাদের সাথে আদব রক্ষা করে চলবে। যেমন রাসূল (সা) এর ঘোষণা: مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ: “যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করেনা, সে আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়।”^{৬৩}
১৫. ইসলামী সংস্কৃতিতে অপবিত্র হলে অযু-গোসলের মাধ্যমে পাক-পবিত্র হওয়ার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে।
১৬. ইসলামী সংস্কৃতিতে হালাল পশু জবাই করার পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করা পশু-পাখিই কেবল খাওয়া বৈধ। গাইরুল্লাহর নামে বা বিজাতীয় পদ্ধতিতে জবাই করা পশুর গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ “যে পশু আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হয়নি, তা ভক্ষণ করো না। কেননা, এটা গুনাহের কাজ।”

১৭. সভা-সমাবেশে মহান আল্লাহর বড়ত্ব, বিরাটত্ব ও সার্বভৌমত্বের ঘোষণা স্বরূপ আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ করা ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَلْتَكْبُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ** “তোমরা আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক তাকবীর বল।”^{৬৪}
১৮. রমযান মাসে সাহরী খেয়ে রোযা শুরু করা এবং ইফতারীর মাধ্যমে রোযা খোলার এক বিশেষ মহড়া ইসলামী বিশ্বের এক অভিন্ন সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়।
১৯. বছরে দুটি ঈদ তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উদ্‌যাপন আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। এ দুটি ঈদকে রাসূলুল্লাহ (সা) শিআরে ইসলাম বা ইসলামের প্রতীক বলে আখ্যায়িত করেছেন।
২০. আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ বা গুণ্ড কাজের উদ্বোধন করি তিলাওয়াতে কালামের মাধ্যমে। রাসূলের (সা) উপর দরুদ প্রেরণের মাধ্যমে। এটাও আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে অন্যতম।
২১. মহান আল্লাহর গুণ কীর্তন, স্তব-স্তুতি ও প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রশস্তির জন্যে সুধাময় ভাষা ও সুললিত কণ্ঠে গেয়ে থাকি হামদ, নাত, গযল, দরুদ শরীফ ইত্যাদি। এগুলোও ইসলামী সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ।
২২. ইসলামী সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান পোশাক-পরিচ্ছদ। মুসলিমদের পোশাক অত্যন্ত মার্জিত, সুরূচি সম্পন্ন। ইজ্জত-আবরু যাতে উত্তমরূপে ঢেকে থাকে তাকওয়ার প্রকাশ ঘটে এরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করার জন্যই ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে। অত্যন্ত স্বাভাবিক অনাড়ম্বর যাতে অহংকার প্রকাশ না পায় এবং সতর দেখা না যায় সেরূপ পোশাক পরিধান করতে বলে। চাকচিক্যময় ও রং-বালমলে বা অরুচিকর পোশাক পরতে বারণ করে। সাধারণত লুঙ্গি-পায়জামা, জামা, পরতে হয়। মাথায় টুপি ও পাগড়ি পরা উত্তম। মুসলিম মহিলারা শাড়ি, সেলোয়ার, কামিজ-কুর্তা মাথায় উড়না- বাইরে বের হতে বোরকা চাদর ইত্যাদি রুচিশীল পোশাক পরিধান করা ইসলামী সংস্কৃতি। যে সব পোশাক শালীনতা বর্জিত সে সব পোশাক না পরার জন্যই ইসলাম বলে থাকে। নবী করীম (সা) বলেন, **إِنَّ الْبِذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ** “নিশ্চয়ই স্বাভাবিক ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ঈমানের অঙ্গ।”^{৬৫} আল্লাহ তা'আলা বলেন, **يَا بَنِي آدَمَ فَذُرُوا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ** “হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্যে পোশাক নাযিল করেছি, যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহ ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্যে দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোশাক হচ্ছে তাকওয়ার পোশাক।”^{৬৬} রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, **إِذَا رَأَىٰ بَطْرًا، بَطْرًا، إِلَىٰ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا، بَطْرًا** “আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে অহংকারবশত তার পাজামা ঝুলিয়ে দেয়।”^{৬৭}

ইসলামী সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষ একে অপরের পোশাক পরিধান করা হারাম। পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হারাম।^{৬৮} এভাবে মুসলিম মিল্লাত জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে, প্রতিটি চলনে বলনে, কখনো চিন্তনে এক মহান আল্লাহর স্মরণ উচ্চকিত করে প্রতিটি কাজ করে থাকেন। এ সবার মধ্যেই ইসলামী সংস্কৃতির রূপ প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত মানব মনের উৎকর্ষ সাধন পদ্ধতি ও রূপায়ণকে বোঝায়। একটি জাতির আচার-আচরণ, ব্যবহার, ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তার সংস্কৃতি বলা হয়। মুসলিম জাতির জীবন-আচারই ইসলামী সংস্কৃতি। এটি ইসলামী শাস্ত্র জীবন বিধান থেকে উৎসারিত। আর ইসলামী অনুশাসনেরই প্রতিফলিত রূপ।

মানব জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব

ইসলামী সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে উৎসারিত। তাই ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব বা পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত যতটুকু মানব জীবনের পরিধি বিস্তৃত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, **أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ** “কালিমায়ে তাইয়েবা (ইসলামী সংস্কৃতি) একটি বিশাল বৃক্ষের মত যার শিকড় থাকে সুদৃঢ়ভাবে মাটির সুগভীরে প্রোথিত এবং তার শাখা-প্রশাখা দিগন্ত বিস্তৃত।”^{৬৯}

এ থেকে বুঝা যায় ইসলামী সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিফলন মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রতিভাত হয়।

১. আধ্যাত্মিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি

মানুষ কোথা থেকে এসেছে? কেন এসেছে? তার গন্তব্য কোথায়? বিশ্বজগতে মানুষের স্থান কি? ইসলামী সংস্কৃতি এর সুস্পষ্ট জবাব দেয়। মানুষের পরিচয় তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন, **لَقَدْ خَلَقْنَا** **الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ** **إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ**। “নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তার কর্মকাণ্ডের দরুন কখনো বা নিম্নতম স্তরে পৌঁছে দেই। তবে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। এ বিধানকে কেউ সন্দেহ করতে পারেনা।”^{৭০} মানুষ পৃথিবীতে শুধুমাত্র দেহ সর্বস্ব জীব নয়। মানুষের রয়েছে পরমসত্তা ও আধ্যাত্মিকতা। একটি মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করবে। লোভ-লালসা নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং আধ্যাত্মিকতাকে পরিচালনা করবে এটাই ইসলামী সংস্কৃতি। মানুষের মধ্যে যারা এরূপ ধর্মভীরু তারাই উত্তম মানুষ।

২. নৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি

মানুষ জন্মগতভাবেই নৈতিক জীব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, **كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ** “প্রত্যেক মানব শিশুই ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে।”^{৭১} পাপ-পঙ্কিলতা থেকে নিজেকে পূত-পবিত্র রাখা, সৎ ও শুভ চর্চাই মানুষের নৈতিক কর্তব্য। পশুত্ব ও মানবত্বের সীমারেখা ইসলামী সংস্কৃতি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। সৃষ্টির যে কোন ক্ষতিকারক কাজ-কর্মই ইসলামে নিষিদ্ধ। যেসব ভোগ-বিলাস-আনন্দ ফূর্তি মানব মনকে অপরাধের দিকে কলুষতার দিকে ধাবিত করে, সেসব বিষয়কে ইসলামী সংস্কৃতি মোটেই প্রশ্রয় দেয় না। এজন্য মাদকাসক্তি, জুয়া, অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ গান-বাজনা, নৃত্য, ভাস্কর্য ও যৌন সুরসুরিমূলক রূপ প্রদর্শনকে ইসলামী সংস্কৃতি নৈতিক বিরোধী বলে মনে করে। এসব কিছু শুধু নৈতিকতা বিরোধী নয়, বরং মানব প্রকৃতি ও বিশ্ব সভ্যতা টিকে রাখারও পরিপন্থী। টেইলর বলেন “মদ্যপান, জুয়া খেলা ও ব্যভিচার এ তিনটি অভিশাপ খ্রিস্ট জাতিকে ধ্বংসের পথে চালিত করেছে, তা একমাত্র ইসলামের নৈতিক শিক্ষাই বিদূরিত করতে পারে।”

৩. বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আর আল্লাহ বিশ্বাসীদের বন্ধু। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানের পথে চালিত করেন। ইসলাম, সংস্কৃতি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাকে উৎসাহিত করে। জ্ঞান অর্জনকে ইসলাম ফরয করেছে। যাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাকে প্রভূত কল্যাণ করা হয়েছে বলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেন। ইসলাম জ্ঞানকেই মর্যাদার চাবিকাঠি বলেছে। জ্ঞানী ব্যক্তিরাই আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানতে পারে। তাই জ্ঞান চর্চার স্থান ও মর্যাদা ইসলামী সংস্কৃতিতে খুবই বেশি। জ্ঞান-বিজ্ঞানকে

ইসলামী সংস্কৃতির আপন সম্পত্তি বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জ্ঞান চর্চাকে নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম বলা হয়েছে। বিশ্বজগতের সৃষ্টিরহস্য এবং বস্তু এবং বস্তু জগতকে আবিষ্কার করে তা মানব কল্যাণে কাজে লাগানোর জন্য ইসলামী সংস্কৃতিতে বারবার তাগিদ ও উৎসাহ দিয়েছে।

৪. সামাজিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি

সামাজিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম দিয়েছে এক বৈপ্লবিক ধারণা। আল্লাহতে বিশ্বাসী সকল মানুষই এক জাতি এক সমাজভুক্ত। তারা এক আদমের সন্তান। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব ইসলামী সমাজের মূল কথা। বর্ণবাদ, জাতিভেদ, শ্রেণী সংগ্রাম, ইসলামী সংস্কৃতিতে অবর্তমান। রক্ত, বংশ, পেশা, ভাষা, অঞ্চল এগুলো মর্যাদার মাপকাঠি নয়। চারিত্রিক সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্মপরায়ণতাই মর্যাদা ও সম্মানের মানদণ্ড। পরম সহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সৎ কাজের প্রচলন, অসৎ কাজের বিতাড়ন সমাজ জীবনে ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা। যাবতীয় কলুষতা, যৌনতা, নরহত্যা, যুলুম, মিথ্যাচার, প্রতারণা, শঠতা, জঘন্যতম অপরাধ ও ইসলামী সংস্কৃতির ঘোরতর পরিপন্থী কাজ। মানবজাতির মুক্তি, পরিবেশের উন্নতি, স্বাধীনতা, প্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য সামাজিক সুনীতি প্রতিষ্ঠার অব্যাহত সংগ্রাম ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান কর্তব্য।

৫. অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি

মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং অর্থনৈতিক জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করার জন্য ইসলাম এক চমৎকার, উন্নত এবং আদর্শ ব্যবস্থা উপস্থাপন করে। অর্থই যত অনর্থের মূল- এদিকটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে ইসলাম অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ ও কলুষমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ইসলামী সংস্কৃতিতে যাবতীয় অর্থ সম্পদের মূল মালিক স্বীকার করা হয়েছে মহান স্রষ্টা আল্লাহকে। মানুষ শুধু এগুলো থেকে প্রয়োজন মত বৈধ উপায়ে ভোগ, ব্যবহারের অধিকার রাখে। ইসলাম অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেয়। সমাজের মানুষের অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সমাজের উপর তথা রাষ্ট্রের উপর। অভাবী অসহায়, দুঃস্থ-পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইসলামী সংস্কৃতিতে যাবতীয় অর্থনৈতিক দুর্নীতি, অসাধুতা, সুদ, ঘুষ, ছিনতাই, চুরি, ডাকাতি, আত্মসাৎ-অপচয় ইত্যাদিকে দূরীভূত করে। এভাবে ইসলামী সংস্কৃতি অর্থনৈতিক জীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও সমৃদ্ধি করতে চায়।

৬. রাজনৈতিক জীবনে ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলামী রাজনীতির মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করা। আল্লাহর আইনের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবে তারই আইন বিধান মানব সমাজে চালু করা। ইসলামী সংস্কৃতিতে আল্লাহই হচ্ছেন বিশ্বের ও রাষ্ট্রের মালিক ও রাজাধিরাজ। মানুষ হলেন তার প্রজা। মানুষের মধ্য থেকে যারা বিশ্বাসী, জ্ঞানী-গুণী, মর্যাদাবান সর্বোত্তম খোদাভীরু তাঁরা মানুষের নেতৃত্ব দেবে। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্র-সরকার পরিচালনা করবে। জোর-জবরদস্তি করে নিজেদের প্রভুত্ব খাটাবে না, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, নাগরিকদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করবে। সুনীতির প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতির উচ্ছেদই ইসলামী রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

৭. বিশ্ব মানবতার উন্নয়নে ইসলামী সংস্কৃতি

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ সভ্যতা। মানবিকতার উজ্জীবন ইসলামী সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য। মানব জীবনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ও লালন ইসলামী সংস্কৃতির উপজীব্য। বিশ্ব মানবতার উন্নয়নে ও মানবিকতার বিকাশ সাধনে ইসলামী সংস্কৃতি নিরন্তর প্রয়াস চালায়। মানুষে মানুষে সংঘাত, দেশে

দেশে দ্বন্দ্ব, জাতিতে জাতিতে ভেদ-বৈষম্য সৃষ্টি করে কৃত্রিমভাবে বিশ্ব মানবতার ধ্বংস ইসলাম চায় না। ইসলামী সংস্কৃতি তাই শান্তিময় আপোষ ফরমুলায় বিশ্বাসী। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইসলাম চিরশান্তির বার্তা নিয়ে হাজির হয় মানবতার প্রতিটি দুয়ারে। এখানেই ইসলামী সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব। যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র মানবতার উৎকর্ষতা ও পরিশুদ্ধকরণ। তাই মানব জাতির সামগ্রিক কর্মকাণ্ড তৎপরতা ও জীবনের বিভিন্ন দিককে ভেতর ও বাহির থেকে পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত দেখতে চায়। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই ইসলামের যাবতীয় কর্মনীতি ও কর্মসূচি প্রণীত। ইসলামের সংস্কৃতি তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত ও সুবিস্তৃত।

৮. ঈমানের রক্ষাকবচ

ইসলামী সংস্কৃতি ঈমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত প্রভৃতি মৌলিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে গঠিত। তাই ইসলামী সংস্কৃতি ইলম- আমলের নিয়ামক ও রক্ষাকবচ। আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ** “হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবীদের পথভ্রষ্ট কোন গ্রুপের অনুসরণ কর, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে সরিয়ে নেবে এবং কুফরীতে (নাস্তিকতায়) ফিরিয়ে নেবে।”^{৭২}

৯. ঈমানের পরিপূর্ণতা

ঈমানের পূর্ণতা অর্জন এবং ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশের জন্যে ইসলামী সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখা একান্ত অপরিহার্য। যেমন আল্লাহর ঘোষণা- **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ** “হে ঈমানদারগণ তোমরা ইসলামে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রবেশ কর। আর তোমরা শয়তানের অনুসরণ কর না।”^{৭৩}

১০. ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা

ইসলামী সংস্কৃতি মূলত ইসলামী বিধি-বিধানের সামগ্রিক ফলিতরূপ যা পরিপূর্ণভাবে জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ইসলামী সংস্কৃতির অনুশীলন, অনুসরণ, রূপায়ন ও বাস্তবায়নের অর্থ হলো- বাস্তবজীবনে ইসলামের নীতি ও আদর্শের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। আল-কুরআনে বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করা হয়েছে- **ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً** “তোমরা ইসলামে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রবেশ কর।”^{৭৪}

১১. ইহ-পরকালীন মুক্তি ও সাফল্য

ইহপরকালীন সাফল্যই মানব জীবনের চরম ও চূড়ান্ত সাফল্য। ইসলামী সংস্কৃতি অনুসরণ ও অনুশীলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের পরকালীন জীবনে মুক্তি, সাফল্য ও আল্লাহ তা'আলার দীদার লাভ। আর আখিরাত জীবনের এই সাফল্য অর্জনের জন্য ইসলামী সংস্কৃতি জীবনে বাস্তবায়নের গুরুত্ব সীমাহীন।

ইসলামী সংস্কৃতি দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। আবার একেবারে দুনিয়াদার হওয়াকেও পছন্দ করে না। ইসলাম সালাত আদায় হয়ে যাওয়ার পর বসে না থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে বেরিয়ে পড়ার আদেশ দেয়। আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, **فُذِّدُوا** “আর যখন সালাত শেষ হয়ে যায়, তখন তোমরা

إِنَّ اللَّهَ يَكْرِهُ أَنْ يَرَىٰ عِيْدَهُ ”মহানবী (সা) বলেন “আল্লাহ তঁার এমন বান্দাহকে অপছন্দ করেন, যে দুনিয়া ও আখিরাতের কর্ম থেকে উদাসীন থাকে।”^{৭৫}

ইসলামী সংস্কৃতিতে শ্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করে। বান্দা ও আল্লাহর মাঝে দূরত্ব কমিয়ে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পথ বাতলে দেয়। ইসলামী সংস্কৃতি মহান শ্রষ্টা আল্লাহর পরেই বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে মানবতার শ্রেষ্ঠত্বের প্রবক্তা। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ “আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।”^{৭৬} অপর আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ “আমি মানুষকে শ্রেষ্ঠ উপাদানে সর্বোত্তমাকারে সৃষ্টি করেছি।”^{৭৭} ইসলামী সংস্কৃতি মানবতাবাদী এবং একে অপরের কল্যাণকামী। বিশ্বনবী (সা) ঘোষণা করেন, الدِّينُ النَّصِيْحَةُ “পারস্পরিক কল্যাণকামীতা ও সদিচ্ছাই হচ্ছে ধর্ম।”

ইসলামী সংস্কৃতি মার্জিত, পরিশীলিত ও উন্নত রুচিসম্মত। এখানে অপরিচ্ছন্ন, কলুষতা ও অশ্লীলতার কোন স্থান নেই। ইসলামী সংস্কৃতি কোন কাজেই বাহুল্য পছন্দ করে না। নির্ধক কাজ ও বিলাস বাসনের স্থান নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, لا يَعبُيه مِنَ حَسَنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُ لا يَعبُيه “কোনো ব্যক্তির ইসলামী জীবনের সৌন্দর্য হচ্ছে- যা তার অপ্রয়োজনীয় তা পরিত্যাগ করে।”^{৭৮}

ইসলামী সংস্কৃতি অত্যন্ত সহজ-সরল অনাড়ম্বর। প্রয়োজনীয় ও দরকারীটুকু গ্রহণ করতে ইসলাম নিষেধ করেনা। তবে অপচয় ও জাকজমককে ইসলাম নিরুৎসাহিত করে। ইসলামী সংস্কৃতি ভোগবাদিতা পছন্দ করে না। অপরের জন্যে ত্যাগ করার জন্যে বলে। ইসলামে কুরবানী, আকীকা, ঈদ, শবে কদর প্রভৃতি অনুষ্ঠান ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর। ইসলামী সংস্কৃতি সর্বতোভাবেই কল্যাণময়। মানবতার কল্যাণের জন্যে এর সকল কর্মতৎপরতা। যেমন আল্লাহ তা’আলা বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ “তোমরাই উত্তম জাতি। মানবতার কল্যাণে তোমাদের উত্থান।”^{৭৯}

ইসলামী সংস্কৃতি চিরন্তন, শাস্ত, প্রগতিশীল ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা থেকে উৎসারিত। ইসলামী জীবন বিধান যেমন চিরস্থায়ী ও জীবন্ত, ইসলামী সংস্কৃতিও তেমন চিরস্থায়ী ও জীবন্ত। উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যাচ্ছে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জীবন পদ্ধতি। আর ইসলাম হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য শাস্ত সুন্দর আদর্শ জীবন পদ্ধতি। তাই এর অনুসারীদেরও রয়েছে একটি আদর্শ সংস্কৃতি। সুতরাং ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি উৎসারিত ও পালিত, তাই ইসলামী সংস্কৃতি। আর এ ইসলামী সংস্কৃতি শাস্ত সার্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ আদর্শের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

উপসংহার

ইসলাম সাধারণ অর্থে একটা ধর্ম নয় এবং নিছক উপাসনা, আরাধনার কতিপয় অনুষ্ঠানের নামও নয়। বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ এবং একটি পরিপূর্ণ সংস্কৃতি। পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়ম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ গড়ে তুলতে চায়। চায় সে সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, বদান্যতা, উদার-দৃষ্টি, আত্মসম্মত, বিনয়-নম্রতা সংসাহস, কর্তব্যবোধ দৃঢ়চিত্ততা, আইনানুবর্তিতা, সুরূচি ইত্যাকার, উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করতে। এজন্য ইসলামী সংস্কৃতি বিশ্বমানবতার একচ্ছত্র সংস্কৃতি। মানবতা ও মানবাত্মার উন্নয়ন উৎকর্ষতার জন্য ইসলামী সংস্কৃতি একমাত্র কাম্য সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির অনিন্দ্য সুন্দর বাস্তবতা তুলে ধরতে পারলে বহু দিনের পিপাসার্ত মানবতা এগিয়ে এসে আবেহায়াতের পেয়ালা মুখে তুলে নেবে। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী বিশ্বাস-ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের রক্ষাকবচ। ঈমানের পূর্ণতা বিধান সহায়ক এবং

মুসলিম জাতিসত্তার জাতীয় ঐতিহ্যের রূপায়ক এবং ধারক ও বাহক। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের বাহন এবং প্রতিফলিতরূপ। ইসলামী সংস্কৃতি নিজ মহিমায় সমুজ্জ্বল। এর রয়েছে বৈশিষ্ট্যময় স্বরূপ বা প্রকৃতি। তার আপন সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের দ্বারাই জাতীয় পরিচিতি ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখতে ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, তা. বি.), পৃ. ২২।
- ^২ ড. রঙ্গলাল সেন, *সমাজ বিজ্ঞান এইচ এস সি প্রোগ্রাম*, ১ম পত্র (গাজীপুর: বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩১৫।
- ^৩ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৬৫৪।
- ^৪ সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা বিশ্বকোষ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২২।
- ^৫ ড. কাজী দীন মুহাম্মাদ, ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশে রাসুল (সা)-এর অবদান’, প্রবন্ধ ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) স্মরণিকা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২০ হি., পৃ. ৫৫।
- ^৬ আহসান ইবন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, পৃ. ২২।
- ^৭ Lesley Brown, *The New shorter Oxford Dictionary*, Vol. 1 (Oxford: University Press, 1993), p. 568.
- ^৮ *The Oxford English Dictionary*, Vol. 1 (Oxford: University Press, 1971), p. 622.
- ^৯ ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ৩৯।
- ^{১০} ইবন মানযুর আল-ইফরীকী, *লিসানুল আরব*, ৯ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা. বি.), পৃ. ১৯১; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মু'জামুল ওয়াজীয* (মিসর: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৮৫।
- ^{১১} মূল আয়াত, *وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجْتُمْ* “আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে তাদেরকে পাও এবং তাদেরকে বের করে দাও যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বের করেছিল।”
দ্র. সূরাহ আল-বাকারা: ২: ১৯১; অপর আয়াতে বর্ণিত আছে,
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا
“এবং হত্যা করবে যেখানেই তাদের নাগাল পাবে। আর ওরাই তারা, যাদের বিরুদ্ধে আমি তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ক্ষমতা দিয়েছি।” দ্র. সূরাহ আন-নিসা: ৪: ৯১।
- ^{১২} মূল আয়াত *ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ* “তারা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের উপর নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে লাঞ্ছনা, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি এবং মানুষের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত থাকলে আলাদা কথা। আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে গণ্যব নিয়ে ফিরে এসেছে।”
দ্র. সূরাহ আল-ইমরান: ৩: ১১২; অপর আয়াতে বর্ণিত আছে, *مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تَقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا*,
“অভিশপ্ত অবস্থায়। তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং সমুচিতভাবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।”
দ্র. সূরাহ আল-আহযাব: : ৩৩: ৬১।
- ^{১৩} ড. এ কে এম নূরুল আলম, *সংস্কৃতির স্বরূপ ও ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য* (কুষ্টিয়া: পেয়ারাতলা, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২০।
- ^{১৪} মাহমুদ ইবন ‘উমার আয-যামাখশারী, *আসাসুল বালাগাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : মাওকা‘উল ওরাক, তা. বি.), পৃ. ৪৭।
- ^{১৫} আহসান ইবন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, পৃ. ২২।
- ^{১৬} আহসান ইবন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, পৃ. ২৫।
- ^{১৭} বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সঙ্কট* (ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২২।

- ^{১৮} আহসান ইবন হাফিজ, *ইসলামী সংস্কৃতি*, পৃ. ২৫।
- ^{১৯} ড. আমহদ শরীফ, *সংস্কৃতি ভাবনা* (ঢাকা : উত্তরণ, তা. বি.), পৃ. ১৪-১৫
- ^{২০} রাগিব আল-বৈরুতী, *আছ-ছাকাফাহ* (বৈরুত : দারুল জীল, তা. বি.), পৃ. ৩৯।
- ^{২১} Edward Brunet Tylor; *Religion in primitive culture* (New York: Harper and Row Publisher, 1958), p. 1.
- ^{২২} G. S. Ghurye, *Culture and Society* (University of Bombay, 1947), Pp. 61-62.
- ^{২৩} Dr. Aliza Ali Ljet Begovice, *Islam between East and West* (New York: American Trust Publication, 3rd Edition, 1993), P. 45.
- ^{২৪} মুহাম্মদ বাসির উদ্দিন আখন্দ, *মরো মুসলিম শিল্প-সংস্কৃতি* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ২।
- ^{২৫} প্রফেসর ড. আহমাদ মুহাম্মদ জামাল, *মুহাদারাতুন ফীছ ছাকাফাতিল-ইসলামিয়াহ* (জেদ্দা: জামি'আতুল মালিক আব্দুল আযীয, তা. বি.), পৃ. ১৪।
- ^{২৬} *ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি*, পৃ. ১৯।
- ^{২৭} *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৭০।
- ^{২৮} আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী সংস্কৃতির রূপায়ন*, পৃ. ৫।
- ^{২৯} Faizee, *Islamic Culture*, P. 6; উদ্ধৃতি : *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, পৃ. ২৭০।
- ^{৩০} আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৯৫।
- ^{৩১} এ. জেড শামসুল আলম, *মুসলিম সংস্কৃতি* (ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১১।
- ^{৩২} আল-কুরআন, ১৪ : ২৪।
- ^{৩৩} আল-কুরআন, ৩ : ১১০।
- ^{৩৪} আল-কুরআন, ৫৯ : ৪৭।
- ^{৩৫} আল-কুরআন, ৫ : ৩।
- ^{৩৬} আল-কুরআন, ২ : ৩১।
- ^{৩৭} আব্দুল মান্নান তালিব, *আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৮৮।
- ^{৩৮} সৈয়দ আলী আহসান, 'ইসলামের আরম্ভ ও ক্রমধারা', অগ্রপথিক, ১০বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১০-১১।
- ^{৩৯} পূর্বোক্ত।
- ^{৪০} ড. কাজী দীন মুহাম্মাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬-৫৭।
- ^{৪১} সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১।
- ^{৪২} সূরা হাশর, ৫৯ : ৭।
- ^{৪৩} গোলাম মোস্তফা, *বিশ্বনবী* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঊনবিংশ মুদ্রণ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৮৬।
- ^{৪৪} আল-কুরআন, ৩৩ : ২১।
- ^{৪৫} আল-কুরআন, ৫৯ : ৪৭।
- ^{৪৬} মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, *জামিউত-তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাস আল-আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৯৭৫ খ্রি.), হাদীস নং ২৬৭৬, পৃ. ৪৪।
- ^{৪৭} আল-কুরআন, ৭ : ৭১।
- ^{৪৮} আল-কুরআন, ৭ : ১৫৩।
- ^{৪৯} আল-কুরআন, ৭ : ১৬২।
- ^{৫০} মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম আল-বুখারী, *সহীহুল বুখারী*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারু তাওকুন নাজাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.), হাদীস নং ২৬৯৭, পৃ. ১৮৪।

- ৫১ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযভীনি, *সুনানু ইব্ন মাজাহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তাবি.), হাদীস নং ১৮৯৪, পৃ. ৬১০; *মুসনাদ আহমাদ*, ১৪শ খণ্ড, হাদীস নং ৮৭১২, হাদীস নং ৩২৯।
- ৫২ পূর্বোক্ত, *সুনান আত-তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৪১৭, পৃ. ৩৮১।
- ৫৩ পূর্বোক্ত, *সুনান আত-তিরমিযী*, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৩৪১৭, পৃ. ৩৮১।
- ৫৪ আল-কুরআন, ১৭ : ৭৮।
- ৫৫ আল-কুরআন, ১৮ : ২৮।
- ৫৬ সুলায়মান ইব্নু আ'শআস আস-সিজিস্তানী, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), হাদীস নং ৩৭৬৪, পৃ. ৩৭৩।
- ৫৭ পূর্বোক্ত, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৩৮৪৯, পৃ. ৩৯৩।
- ৫৮ পূর্বোক্ত, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৫১৯৩, পৃ. ৭৭১।
- ৫৯ *সহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, হাদীস নং ১২, পৃ. ১২।
- ৬০ পূর্বোক্ত, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৮৯৫, পৃ. ৬৯০।
- ৬১ পূর্বোক্ত, *সুনান আত-তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ১৯৫৬, পৃ. ৩৩৯।
- ৬২ মুহাম্মাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আত-তিবরিসী, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫ খৃ.), হাদীস নং ৩১৩৮, পৃ. ২১১।
- ৬৩ পূর্বোক্ত, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৯৪৩, পৃ. ৭০৩।
- ৬৪ আল-কুরআন, ২ : ১৮৫।
- ৬৫ পূর্বোক্ত, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪১৬১, পৃ. ৪৭৪।
- ৬৬ আল-কুরআন, ৭ : ২৬।
- ৬৭ পূর্বোক্ত, হাদীস নং ৫৭৮৮, পৃ. ১৪১১।
- ৬৮ পূর্বোক্ত, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪০৫৭, পৃ. ৪৪৮।
- إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي
- ৬৯ আল-কুরআন, ১৪ : ২৪।
- ৭০ আল-কুরআন, ৯৫ : ৪-৮।
- ৭১ পূর্বোক্ত, *সুনান আবু দাউদ*, ২য় খণ্ড, হাদীস নং ৪৭১৬, পৃ. ৬৪২।
- ৭২ আল-কুরআন, ৩ : ১০০।
- ৭৩ আল-কুরআন, ২ : ২০৮।
- ৭৪ আল-কুরআন, ২ : ২০৮।
- ৭৫ আল-কুরআন, ৬২ : ১০।
- ৭৬ পূর্বোক্ত, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩, হাদীস নং ৫২২।
- ৭৭ আল-কুরআন, ১৭ : ৭০।
- ৭৮ আল-কুরআন, ৯৫ : ৪-৫।
- ৭৯ পূর্বোক্ত, *সুনান আত-তিরমিযী*, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ২৩১৭, পৃ. ৫৫৮।
- ৮০ আল-কুরআন, ৩ : ১১০।

সম্পদ সঞ্চয়: ইসলামী শরী‘আতের দৃষ্টিভঙ্গি

মো. ওবাইদুল্লাহ*

Abstract: This article highlights the importance of saving in human life as it is known and well in the Islamic system. Saving is nowadays, urgently required due to the service economic hardship and scarcity of resources. More importantly, savings have critical impact on the economic, social and developmental aspects of life. To investigate all this, the article has been divided into three major chapters. These chapters firstly focuses on wealth, secondly on savings, and thirdly on the principles of saving.

(Key terms: Wealth, Saving, Principles of saving.)

ভূমিকা

ইসলাম একটি কল্যানমুখী ধর্ম। এ ধর্মে যত বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে সবগুলো মানুষের সুষ্ঠু জীবন পরিচালনায় নিবেদিত। তার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক জীবন ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠু উপার্জন নীতি, ইনসাফপূর্ণ ব্যয়নীতি ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পদের পরিকল্পিত সঞ্চয়নীতি। যাতে অপচয় ও কৃপণতা পরিত্যাগ করত: খরচে মিতব্যয়িতার পথ তথা মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে প্রচলিত অর্থনীতিতে কার্যত পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু সঞ্চয়নীতি না থাকার কারণে পার্থিব ভোগই তার তৃপ্তির একমাত্র লক্ষ্য। এক্ষেত্রে সঞ্চয়কারী কোন হালাল-হারামের মধ্যে পার্থক্য করে না; এমনকি মধ্যমপন্থা অবলম্বনের ব্যাপারেও সচেতন নয়। আবার কেউ কেউ সন্ন্যাসব্রতও পালন করে থাকে। সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে সঞ্চয়িত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করাও একজন পুঁজিবাদী সঞ্চয়কারীর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। আবার সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদ সঞ্চয়ের কোন বিধানেরও সুযোগ নেই। বক্ষমান প্রবন্ধে সম্পদ সঞ্চয় সম্পর্কিত ইসলামী শরী‘আতের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

সম্পদ পরিচিতি

শাব্দিক অর্থে সম্পদ বলতে বুঝায় ধন, প্রাচুর্য, সম্পত্তি, সমৃদ্ধি, টাকাকড়ি ইত্যাদি।^১ ইংরেজীতে সম্পদের প্রতিশব্দ হিসেবে অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: Wealth, Cash, Revenue, Richness, Security, Treasure, Capital,^২ Assets, Resources।^৩ মানুষের দৈনন্দিন লেনদেন ও চাহিদা পূরণের জন্য এসব বস্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং যা দ্বারা চাহিদা পূরণ হয় তা-ই সম্পদ।

পারিভাষিক অর্থে সম্পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ নানাভাবে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. Denis এর মতে-^৪ "anything of value". অর্থাৎ- মূল্যবান প্রত্যেক বস্তুই সম্পদ।
২. investopedia তে উল্লেখিত হয়েছে-^৫ Wealth measures the value of all the assets of worth owned by a person, community, company, or country. অর্থাৎ- সম্পদ ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সংস্থা বা দেশের মালিকানাধীন সমস্ত সম্পত্তির মূল্য পরিমাপ করে।

* পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. The Economist জার্নালে বলা হয়েছে-^৬ wealth is a monetary measure which includes the sum of natural, human, and physical assets. অর্থাৎ- সম্পদ একটি আর্থিক পরিমাপ যা প্রাকৃতিক, মানবিক এবং শারীরিক সম্পদের যোগফলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

মূলত: সম্পদ শব্দটি অর্থনীতিতে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে সম্পদ হলো- যা কিছু মানুষের অভাব পূরণ করে বা চাহিদা মেটায় এবং যার যোগান অপ্রতুল। এ অর্থে সম্পদ মানে যার অবশ্যই বিনিময় মূল্য আছে এবং সম্পদ হলো এমনকিছু যা ব্যবহার করে মানুষ উপকৃত হতে পারে।

সঞ্চয় পরিচিতি

সঞ্চয় বলতে বুঝায় মজুদকরণ, সংরক্ষণ, সংগ্রহ আহরণ, পুঁজি জমিয়ে রাখা, পুঞ্জীভূত করা।^৭ আরবী ভাষায় সঞ্চয়ের প্রতিশব্দ হিসেবে الادخار^৮ এবং ইংরেজীতে Accumulation, Collection, Heap, Store, Stock^৯ Saving, Gathering^{১০} শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক অভিধান কোষে সঞ্চয়ের অর্থ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “ব্যক্তির যে কোন কিছু সংরক্ষণ করা যা প্রয়োজনের সময় তার উপকারে আসে”।^{১১} নিনোর হাদীসটি উপরোক্ত সংজ্ঞাটিকে সত্যায়ন করে-

“রাসূল (স.) তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করতেন”।^{১২} পারিভাষিকভাবে সঞ্চয় হলো, الاحتفاظ بجزء من الدخل للمستقبل، والاحتفاظ بالشيء لوقت الحاجة، অর্থাৎ ‘আয়ের একটি অংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখা, এবং প্রয়োজনের জন্য কিছু সংরক্ষণ করা’।^{১৩} সঞ্চয় দুই প্রকার:

(ক) উৎপাদনশীল সঞ্চয়, যার অর্থ নতুন আয়ের জন্য উপার্জন হতে সংরক্ষণকৃত একটি অংশ বিনিয়োগ করা।

(খ) সংরক্ষণযোগ্য সঞ্চয় বা সংরক্ষণের লক্ষ্যে সঞ্চয়, যার অর্থ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে আয়ের একটি অংশ কেটে নেওয়া বা রাখা।^{১৪} অর্থনীতির ভাষায়, ‘আয়ের যে অংশটুকু বর্তমান ভোগে ব্যয় না করে ভবিষ্যৎ ভোগে ব্যয় করা’^{১৫} ও ‘বিনিয়োগের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আয় বাড়াতে ব্যবহার হয়ে থাকে’।^{১৬}

সঞ্চয় ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে একটি প্রাথমিক অর্থনৈতিক ঘটনা; এবং এটি উপার্জনকৃত আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ। এটি সাধারণত স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বা কোন নিরাপদ স্থানে জমা করা হয়। যা ভবিষ্যতে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয়, যেমন ভ্রমণ, আকস্মিক চিকিৎসা ও শখের গৃহ সামগ্রী কেনা ইত্যাদির কাজে লেগে থাকে। তবে সঞ্চয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো ঐ সম্পদ যা যাকাতযোগ্য পরিমাণে পৌঁছেছে এবং এর মালিক প্রাপ্য ব্যক্তিদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তার হক আদায় করেছে এবং উদ্বৃত্ত অংশ ভবিষ্যতে নতুন আয়ের জন্য বিনিয়োগ করেছে অথবা সংরক্ষণ করে রেখেছে।

ইসলামী শরী‘আতে সম্পদ সঞ্চয়ের বিধি-বিধান

ইসলামী শরী‘আত সম্পদকে কুক্ষিগত বা পুঞ্জীভূত করতে নিষেধ করেছে। তবে ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সঞ্চয় করতে অনুমতি দিয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামী পন্ডিতগণ দু’ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন। (১) সম্পদ সঞ্চয় করা বৈধ (২) সম্পদ সঞ্চয় করা অবৈধ।

(১) সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতা প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ক. সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতা প্রসঙ্গে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের নীতিমালা এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

আল-কুরআন সম্পদ খরচের ব্যাপারে অপচয়ের নিন্দা, নিষেধ ও একই সাথে ঘৃণা করেছে। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন^{১৭} وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا - إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا “আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরকেও; এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না, নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই”। উক্ত আয়াতে لَا تُبَذِّرْ এর ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, ‘আল্লাহ তা'আলা এখানে স্পষ্টভাবে খরচে সক্ষম ব্যক্তিদের অপচয়-অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন’।^{১৮} আর এটা খরচের ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত হওয়া, সুষম হওয়া, মধ্যমপন্থা বা সামঞ্জস্য বিধান ছাড়া সম্ভব না। অর্থাৎ উপার্জনের কিছু অংশ সংরক্ষণ করা।^{১৯} আল-কুরআনের অন্য বিবৃতিতে এসেছে, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْشُورًا “তুমি একেবারে ব্যয়-কুষ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্ত হস্ত হয়ো না”।^{২০} অত্র আয়াত প্রসঙ্গে মুফাসসীরগণ বলেন, فكانت الآية الكريمة شرحاً للقاعدة، والمثالية في الاعتدال والتوازن في الانفاق للأجيال القادمة جميعها

আল্লাহ তা'আলা এখানে সক্ষম ব্যক্তিকে খরচের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করতে এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক আচরণ অনুসরণ করতে বলছেন, যা ব্যক্তির উপার্জিত সমুদয় অর্থ-সম্পদকে খরচ করে উড়িয়ে না দেয়াকে আবশ্যিক করেছে। অর্থাৎ কিছু সম্পদকে সঞ্চয়করণের ইংগিত দিয়েছে।^{২১} আর খরচের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করে থাকে এমন মু'মিন বান্দাদের দৃষ্টান্ত আল-কুরআনে এসেছে এভাবে, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا “এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী”।^{২২} অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন, “এটা আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের বৈশিষ্ট্য, যারা খরচে অপচয় করে না, বরং প্রয়োজনমাপিক খরচ করে থাকে এবং তারা অধিক কৃপণও নয় যে তাদের পরিবারবর্গের অধিকার সঙ্কুচিত করে। বরং সর্বসাকুল্যে তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে থাকে”।^{২৩} তাই ‘অত্র আয়াত সম্পদ বণ্টন এবং খরচের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য একটা উত্তম আচরণের ব্যাখ্যানীতি। যা কিঞ্চিৎ হলেও উপার্জিত সম্পদের কিছু অংশ অবশিষ্ট রাখার দাবী রাখে, যাকে আমরা বর্তমান সময়ে সঞ্চয় বলছি’।^{২৪} বিশেষভাবে সূরা ইউসুফে দূর্ভিক্ষের বছর ও দিনগুলোতে সম্পদ সঞ্চয়ে রেখে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলা করার পদ্ধতির ইতিহাস আমরা ভালভাবেই জানি। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ

“তিনি (ইউসুফ আ.) বললেন, তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীঘ্র সমেত রেখে দিবে এবং এরপরে আসবে দূর্ভিক্ষের সাত বছর। তোমরা এ দিনের জন্য যা রেখেছিলে, তা খেয়ে যাবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে”।^{২৫} ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, “إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ” تَذَخَّرُونَ “যা তোমরা সঞ্চয় রাখবে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, ‘যা তোমরা সংরক্ষণ করবে’।^{২৬} আবু উবায়দাহ^{২৭} ও প্রসিদ্ধ মুফাসসীর কাতাদাহ (রহ.)ও সঞ্চয়ের অর্থ করেছেন।^{২৮} যা প্রয়োজনের সময় ও স্বার্থে খাদ্য-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখাকে বৈধতা প্রমাণ করেছে।^{২৯} এখানে নবী ইউসুফ (আ.) এর কারাগারে বসে বাদশাহ'র দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার ইতিহাস আমাদের সবারই জানা। তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা রাষ্ট্র পরিচালনায় সম্ভাব্য

দূর্ভিক্ষকে সামনে রেখে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি দিয়েছিলেন, যা বিশ্ব অর্থনৈতিক ইতিহাসে আজও বিরল হয়ে আছে।

খ.আল-হাদীস

ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস আল-হাদীস থেকেও সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। যেখানে ভবিষ্যৎ জীবনে সম্ভাব্য দারিদ্রতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তির হালাল উপার্জন ও ব্যয়ের মধ্যে সমতা বিধানের বিশুদ্ধ নির্দেশনা রয়েছে। যেমনভাবে রাসূল (স.) তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চয় করেছিলেন।^{১১} উমার (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ بِمَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ يَحْتَلُّ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً، يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةً سَنَتِهِ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السَّلَاحِ وَالْكَرَاعِ، عُذَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

“উমার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, বনী নাযীর গোত্রের পরিত্যক্ত সম্পদ যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (স.) কে বিনা যুদ্ধে (ফাই হিসেবে) প্রদান করেছিলেন এবং যা অর্জনের জন্যে মুসলিমরা অশ্ব পরিচালনা করেনি বা যুদ্ধও করেনি। অতএব তা রাসূলের (স.) জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। ফলে এর থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনদের এক বছরের ব্যয়ভার প্রদান করতেন এবং অবশিষ্ট অর্থ অস্ত্রশস্ত্র এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্যে ঘোড়া সংগ্রহে ব্যয় করতেন”।^{১২} অত্র হাদীস থেকে পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সংগ্রহে রাখার বৈধতার দলীল গ্রহণ করা হয়েছে। সুতরাং ‘সম্পদ সঞ্চয় করা তাওয়াফুল তথা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়’।^{১৩} মালিক ইবনে আওস (রা.) বলেন, একদিন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) আমার নিকট দূত পাঠালেন। (আমি তার কাছে গেলে) তিনি আমাকে বললেন, তোমার গোত্রের কয়েকঘর লোক সাহায্যপ্রার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছিল... কিন্তু এর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো এই যে তিনি পরিবার-পরিজনের উপর এক বছর তা ‘ফাই’ বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ থেকে খরচ করতেন। আর মা’মার কখনো কখনো বলতেন, তিনি রাসূল (স.) তা থেকে পরিবার-পরিজনের এক বছরের খোরাকী রাখতেন এবং এরপর অবশিষ্ট যা থাকতো তা আল্লাহর মাল, কাজেই তা সাদকা হিসেবে খরচ করতেন”।^{১৪} ইমাম গাযযালী (রহ.) উক্ত হাদীস থেকে এক বছরের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা বৈধতার মতামত দিয়েছেন। কেননা রাসূল (স.) তাঁর পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চয় করে রেখেছিলেন।^{১৫} এভাবেই আলোচিত হাদীসগুলো থেকে সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতার দলীল গ্রহণ করা হয়।

সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহলো সাদ (রা.): বিদায় হজ্জে একটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে রাসূল (স.) তাকে দেখতে আসলেন। এরপর সাদ (রা.) রাসূলের নিকট আরয় করে তার সম্পদের দু’তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক পরিমাণ সম্পদ সাদকা করার অনুমতি চাইলে রাসূল (স.) বললেন, না। এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তুমি সাদকা করতে পার, আর এক তৃতীয়াংশই বেশি। তোমার ওয়ারিসদের অভাবমুক্ত রেখে যাওয়া মানুষের কাছে হাত পাতার চেয়ে উত্তম।^{১৬} উক্ত হাদীস থেকে কিছু বিষয় স্পষ্ট হয় যে, মানুষ যেন পরিবারের উপর খরচ না করা পর্যন্ত সম্পদ ব্যয়ে বাড়াবাড়ি না করে। তেমনিভাবে অন্যের কাছে হাত পেতে চাওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন সম্পদ অবশিষ্ট রেখে যাওয়া যাতে পরবর্তী প্রজন্ম দারিদ্রতার কারণে অন্যের কাছে হাত না পাতে, এবং তাদের যেন জীবন-যাপন যথেষ্ট হয়।^{১৭} উক্ত হাদীসটি দারিদ্র ব্যক্তির উপর ধনী ব্যক্তির প্রাধান্যতার দলীল।^{১৮} এরপর রাসূল (স.) সম্পদ নষ্ট করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি সাদকার কারণেও সম্পদ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। কা’ব (রা.) তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও রাসূলের জন্য সাদকাহ করে দিতে চাইলে রাসূল

(স.) বললেন, তুমি তোমার কিছু সম্পদ রেখে দাও, এটা তোমার জন্য অনেক কল্যাণের হবে।^{৭৯} উক্ত হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, মানুষ কিছু সম্পদ সাদকা করবে, কিছু সম্পদ রেখে দিবে যেন তাতে তার এবং তার পরিবারের যথেষ্ট হয়।^{৮০} তাই মানুষের জন্য উচিত হবে, তার এবং তার পরিবারের উপর খরচের জন্য কিছু সম্পদ রেখে দেওয়া।^{৮১} যাকে বর্তমান সময়ে আমরা সঞ্চয় বলে আখ্যায়িত করছি। রাসূল (স.) বলেন, « خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِيٍّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ » “উত্তম দান তা-ই যা দিয়ে মানুষ অভাবমুক্ত থাকে। যাদের ভোরণ-পোষণ তোমার দায়িত্ব, তাদের থেকে তুমি (খরচ করা) আরম্ভ কর”।^{৮২} উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, উত্তম দান তো তাই যা মানুষ পরিমাণমত টিকিয়ে রাখা বা অবশিষ্ট রাখার পর তার সম্পদ থেকে বের করে।^{৮৩} কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

গ. সাহাবায়ে কিরামের আমল ও উক্তি

উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলো সাহাবায়ে কিরামের জীবনেও বাস্তবায়িত হয়েছিল। তবুও বিষয়টি আরো স্পষ্ট করার জন্য এখানে সাহাবীদের কিছু আমল ও উক্তি উদ্ধৃত করা হলো।

সাহাবীগণের বর্ণিত আসার থেকে প্রমাণিত যে, ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সম্পদ সঞ্চয় করা ইসলামী শরী'আত অনুমোদিত। যেমন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে একটি আসার পাওয়া যায়; যেখানে তিনি মুসলিমদের সম্পদ সঞ্চয়ে নসিহাত করেছেন। তিনি সম্পদ সঞ্চয় ও তা বিনিয়োগের ব্যাপারে মানুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যাতে পরবর্তি প্রজন্ম তার উপর ভর করে বেঁচে থাকতে পারে। তাই তিনি সবসময় মানুষদের কর্ম, দান-অনুদান ও বিনিয়োগের ব্যাপারে আহবান করেছেন। যাতে উম্মতগণ উপকৃত হতে পারে।^{৮৪} উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে আরেকটি আসার পাওয়া যায় তা হলো-

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِصُحْبَتِهِ لَوْلَا ثَلَاثُ حِصَالٍ فِيكَ لَمْ يَكُنْ بِكَ بَأْسٌ. قَالَ وَمَا هُنَّ فَوَاللَّهِ مَا تَرَكَ نَعِيبٌ شَيْئًا. قَالَ اكْتِنَاؤُكَ بِأَيِّ يَخْجَى وَلَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَادْعَاؤُكَ إِلَى التَّمْرِ بْنِ قَاسِطٍ وَأَنْتَ رَجُلٌ أَلْكُنْ وَإِنَّكَ لَا تُمْسِكُ الْمَالَ.

অর্থাৎ- “তিনি সুহায়ব (রা.) কে বললেন, যদি তোমার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য না থাকত তাহলে তোমার কোন সমস্যা হত না। তিনি বললেন, সেগুলো কী? (সুহায়ব বললেন) অল্লাহর কসম! কোন জিনিসকে দোষারোপ করতে আমি তোমাকে দেখিনি। তিনি (ওমর) বললেন, তুমি তো আবু ইয়াহইয়া (ইয়াহইয়ার পিতা) উপাধিতে অভিহিত, অথচ তোমার কোন সন্তান নেই এবং তুমি নিজেকে নামীর বিন ক্বাসেতের সাথে সম্পর্কিত দাবি কর। অথচ তুমি একজন তোটলা, তাছাড়া তুমি তোমার অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখ না”।^{৮৫}

সঞ্চয় একটি প্রাচীন ঘটনা যা মানুষের উপলব্ধি হিসেবে পুরাতন, এবং এর অর্থ হ'ল সঞ্চয়ের সময়ে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু সঞ্চয় করা। সঞ্চয়ের পারিভাষিক সংজ্ঞা (উপার্জনকৃত সম্পদের একটি অংশ ভবিষ্যতের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করার নামই সঞ্চয়) থেকে উপলব্ধি ও প্রমাণিত হয় যে, সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও ফজিলত কতটুকু? আর এ কারণেই ইসলামী শরী'আতে সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্ট, যে ব্যাপারে রাসূল (স.) এর অসংখ্য বাণী রয়েছে।^{৮৬} যেমনভাবে রাসূল (স.) বলেন,

قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : "رحم الله امرأ اكتسب طيباً، وأنفق قصداً، وقدم فضلاً ليوم فقره وحاجته".

‘আল্লাহ যেন তার উপর দয়া করেন, যে সং উপার্জন করল, সুপথে ব্যয় করল এবং প্রয়োজনে ও দারিদ্র মুহর্তের জন্য সঞ্চয় করল’।^{৮৭}

যখন হযরত উমর (রা.) রাসূল (স.) এর নিকট থেকে উপদেশ চাচ্ছিলেন যে, আমি আমার সামাগের^{৪৮} সম্পদ সাদকা করতে চাই, তখন রাসূল (স.) বলেন, তুমি তার মূল মালিকানা রাখ এবং তার ফল বিতরণ কর।^{৪৯} এখানে সম্পদ সঞ্চয় করার ফজিলত ও সম্পদ পঞ্জিভূত করার (যা হারাম) নিন্দনীয়তা স্পষ্ট। কেননা সম্পদ সঞ্চয় ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানোর একটি অন্যতম উপায়। তেমনিভাবে জরুরী মুহুর্তে ও আর্থিক সংকট মোকাবিলার জন্য ব্যাংকগুলোতে নগদ অর্থ রিজার্ভ থাকা প্রয়োজন। পাশাপাশি সম্পদ পঞ্জিভূত করা মানে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ কেড়ে নেওয়া এবং সমাজকে অর্থনৈতিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা। আর অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এটিকে পুনঃউৎপাদন কাজে ব্যাহত করে এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবদানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

মূলত: সম্পদ সঞ্চয়ের ইস্যুতে মনোযোগ দেওয়ার দায়িত্ব পরিবার ও রাষ্ট্রের কাঁধে একসাথে বর্তায়। এমনকি একজন শিশুকে তার ছোটবেলা থেকে সম্পদ সঞ্চয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করানো উচিত। তবেই সে বড় হয়ে সঞ্চিত সম্পদ থেকে প্রয়োজনের মুহুর্তে খরচের অবকাশ পাবে।

(২) সম্পদ সঞ্চয়ের অবৈধতা প্রসঙ্গে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে, প্রয়োজন ব্যতীত সম্পদ সঞ্চয়ে রাখা কোন রাষ্ট্রের জন্য বৈধ নয়। বরং রাষ্ট্র তা সাধারণ জনগণের কল্যাণে বিলিয়ে দিবে। এমন মতামত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রহ.)ও পোষণ করেছেন। তাঁদের দলীল হলো খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্ম। যেমনভাবে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে।^{৫০}

قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَزْمَ: " أَقْسِمُ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، أَقْسِمُ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، أَقْسِمُ بِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً "، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَبْقَيْتَ فِي بَيْتِ الْمَالِ بَقِيَّةَ تَعْدُهَا لِنَائِيَّةٍ أَوْ صَوْتٍ مُسْتَعِثٍ، فَقَالَ عُمَرُ لِلرَّجُلِ الَّذِي كَلَّمَهُ: جَزَى الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِكَ،

“উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) আব্দুল্লাহ বিন আরকাম (রা.) কে বললেন, তুমি মুসলিমদের বায়তুল মালের অর্থ প্রতি মাসে একবার, প্রতি জুমআ'য় একবার এবং প্রতিদিন একবার বিতরণ করো। অতঃপর সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলল, হে আমিরুল মু'মিনিন! যদি বায়তুল মালের কিছু অর্থ অবশিষ্ট রাখতেন তাহলে তা পরবর্তিতে প্রাপ্য প্রতিনিধি অথবা অর্থের কাতরে আর্তনাদকারীকে দিতে পারতেন। অতঃপর উমর (রা.) বললেন, তোমার জিহবায় শয়তান প্রবাহিত হয়েছে।” তেমনভাবে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে-

وَكَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَمَا كَانَ عُمَرُ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى الْعَطَاءَ فِي سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ آتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْبَهَانَ، فَقَالَ: اغْدُوا إِلَى عَطَاءٍ رَابِعٍ، إِنِّي لَسْتُ بِخَازِنٍ

“উমর (রা.) যেমনটা করতেন আলী (রা.)ও তাই করতেন। তিনি প্রাপ্যদের বছরে তিনবার (বায়তুল মাল থেকে) দান-দক্ষিণা দিতেন। এমনকি তাঁর কাছে একবার ইস্পাহান থেকে অর্থ আসলে তিনি বললেন, প্রাপ্যদের চতুর্থবার দ্রুত দিয়ে দাও; কেননা আমি সম্পদ সঞ্চয়কারী নই।”^{৫১}

আবু যর' গিফারী (রা.) এর মতামত হলো, পরিবারের উপর সম্পদ খরচ করার পর উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ে রাখা ইসলামী শরী'আতে হারাম; যদিও তার যাকাত আদায় করা হয়। তিনি এমনই ফাতওয়া দিতেন, জনসাধারণকে উৎসাহ দিতেন এবং তিনি মুআবিয়া বিন আবি সুফিয়ান (রা.) কে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতেন; যখন তিনি শামের গভর্নর ছিলেন। কেননা মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এ আশংকায় তিনি ভয় পেতেন। তাই তিনি মানুষকে এমন প্রচারনা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমনকি তিনি আমীরুলমু'মিনিন উসমান বিন আফফান (রা.) কে অভিযোগ করলে তিনি মদীনাতে আগমন করে রবযাহ

নামক স্থানে পা রাখলেন এবং আল্লাহ তাঁকে মৃত্যু দান করলেন; তখনও তাঁর নিকট কিছু সম্পদ অবশিষ্ট ছিল। আবু যর গিফারী (রা.) এ আয়াত- **وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ** - আলী দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, যারা স্বর্ণ-রৌপ্য পঞ্জিভূত করে রাখবে এবং আল্লাহর পথে খরচ করবে না; তাদের তুমি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও।^{৫২} এরপর দলীল গ্রহণ করেছেন আলী রা. থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস থেকে-

«تُؤْتِي رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَوْجَدُوا فِي شَمْلَيْهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "كَيْتَانِ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ».

“আহলে সুফফার এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তাঁরা (সাহাবীরা) তাঁর চাদরে দুই দিনার পরিমাণ অর্থ পেলেন এবং তাঁরা এ বিষয়ে রাসূল (স.) কে অবহিত করলেন। অতঃপর রাসূল (স.) বললেন, এটাই তাঁর শাস্তির কারণ হতে পারে। অতঃপর তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।^{৫৩} অন্যত্র এসেছে, **مَا مِنْ رَجُلٍ** অর্থাৎ এমন কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে আর তার নিকট যদি কোন অর্থ-সম্পদ থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদের প্রত্যেক কিরাতের বিনিময়ে একটি আগুনের পাতা (তখতা) বানাবে যার দ্বারা তার পা থেকে চিবুক বা থুতনি পর্যন্ত তাপ দেওয়া হবে।^{৫৪}

কেউ কেউ মনে করেন, সঞ্চয়কারী তার সম্পদের যাকাত আদায় করলেও সঞ্চয় করা হারাম; যখন সম্পদের মালিক সম্পদের সকল হক আদায় করে না যেমন অভূক্তদের খাবার, বন্দিকে মুক্তি ও গাযী যোদ্ধাদের আসবাবপত্র ক্রয় ইত্যাদি। আলী (রা.) মনে করেন, কোন ব্যক্তির জন্য চার হাজার বা তার উপরে সম্পদ সঞ্চয় করা বৈধ নয়। যদিও সে যাকাত আদায় করে থাকে। তিনি বলতেন,

أَرْبَعَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ

অর্থাৎ “চার হাজার দিরহাম বা তার কম পরিমাণ সম্পদ খরচের জন্য যথেষ্ট; কিন্তু তার বেশি পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত ধন-ভান্ডার”।^{৫৫} তিনি মনে করতেন, একজন মানুষের ভালভাবে জীবন-যাপনের জন্য চার হাজার দিরহামের বেশি সম্পদ লাগে না। কোন মানুষ যদি নিজের খরচের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করে রাখে, তাহলে সে যেন মানুষের বিশেষত অভাবীদের কল্যাণকে আটকিয়ে রাখলো বা বাধাগ্রস্ত করল।^{৫৬} তাই এ কর্ম ইসলামী শরী'আতে বৈধ নয়। তিনি বলতেন,

"إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يَكْفِي فَقَرَاءَهُمْ، وَإِنْ جَاعُوا وَعَزُوا وَجَهَدُوا فَمَنْعَ الْأَغْنِيَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُخَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ

“আল্লাহ তা'আলা ধনীদের সম্পদে নিঃস্ব-অসহায়দের যথেষ্টতা ও পর্যাণ্ডতা আবশ্যক করেছেন যদি তারা ক্ষুধার্ত এবং বিবস্ত্র থাকে। কিন্তু ধনীরা যদি তাদের না দেওয়ার আপত্তি করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার উপর কিয়ামতের দিন হিসাব গ্রহণ করে তার উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক”।^{৫৭}

অবৈধতা বিষয়ক সম্পদ সঞ্চয়ের দলীলাদির পর্যালোচনা

ইসলামী শরী'আতে সম্পদ সঞ্চয়ের বৈধতা রয়েছে। তবে সঞ্চয় যদি মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে হয়, যা জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে তা ইহতিকার তথা মজুদদারিতার অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন সঞ্চয় ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ হারাম।^{৫৮}

এর কারণ হলো ব্যবসায়ী দু'ভাবে লাভ করে থাকে। এক, অধিক মূল্যে বিক্রির আশায় সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখে। এদিকে মানুষ পণ্য খুঁজবে কিন্তু পাবে না। তখন যার খুবই প্রয়োজন এমন ব্যক্তি পণ্য কেনার জন্য বাজারে আসবে এবং যে মূল্যই তার কাছে চাওয়া হয় তা দিয়েই সে তা ক্রয় করতে বাধ্য হবে। যদিও মূল্য অনেক চড়া হয় এবং সীমা ছাড়িয়ে যায়। দুই, ব্যবসায়ী পণ্য বাজারে নিয়ে আসবে এবং অল্প অল্প মুনাফা নিয়েই তা বিক্রয় করে দিবে। পরে এ মূলধন দিয়ে সে আরো অন্যান্য পণ্য কিনে নিয়ে আসবে। তাতেও সে মুনাফা পাবে। এভাবে তার ব্যবসা চলতে থাকবে ও পণ্যদ্রব্য বেশি কাটতি ও বিক্রয় হওয়ার ফলে অল্প অল্প করে মুনাফা করতে থাকবে। মুনাফা লাভের এই নীতি ও পদ্ধতিই সমাজের জন্য অধিক কল্যাণকর। এতে বরকত বাড়ে এবং এরূপ ব্যবসায়ী রিযিকপ্রাপ্ত হয়।^{৫৯}

অতএব, এখানে সম্পদ সঞ্চয় এবং মজুদদারীর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য সুস্পষ্ট। ‘সম্পদ সঞ্চয়’ শব্দটি মজুদের চেয়ে অধিক ব্যাপক। কেননা সম্পদ সঞ্চয়ে জনসাধারণের ক্ষতি হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পদ মজুদের ক্ষেত্রে জনসাধারণের নিশ্চিত ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে’।

তাই জুমহুর ফুকাহাগণ কোন সময়সীমার শর্তারোপ ব্যতীত সঞ্চয় করা বৈধ বলে ঐক্যমত পোষণ করলেও শাফেয়ী ইমামগণের নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এক বছরের জন্য সঞ্চয় করা অপছন্দনীয়।^{৬০} তাদের দলীল হলো:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَنَتِهِمْ مِنْ (2) هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلُ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتِهِ

উমর (রা.) বলেন, বিনা যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ একমাত্র রাসুলের জন্য নির্ধারিত ছিল। তিনি এমন সম্পদ নিজে ভোগ করেন নি বা কাউকে প্রাধান্যও দেন নি। এমন সম্পদ বিতরণের পর অবশিষ্টাংশ মাল রাসূল (স.) তাঁর পরিবারের সারা বছরের খরচ হিসেবে দিতেন। আর যা উদ্ধৃত থাকত, তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহার্য মালের সাথে ব্যয় করতেন। রাসূল (স.) জীবনভর এমনই করেছেন।^{৬১} অন্যত্র এসেছে- ‘رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَيْتِ النَّضِيرِ وَيُخْسِنُ؛ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ’ ‘রাসূল (স.) বনু নাযীরের খেজুর বিক্রি করে ফেলতেন এবং পরিবারের জন্য এক বছরের খাদ্য সঞ্চয় করে রাখতেন’।^{৬২}

তাই সঞ্চয় সম্পর্কে শরয়ী বিধান হলো- সঞ্চয় দ্বারা যদি খরচ না করে শুধু সম্পদ সংরক্ষণ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে শরয়ী সকল অধিকার (যেমন যাকাত আদায় ও পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানসহ পরিবারের সকলের উপর আবশ্যিক খরচ) আদায় করার শর্তে সঞ্চয় করা ইসলামী শরী‘আতে বৈধ। এক্ষেত্রে আবশ্যিক হবে, কোন সুদী ব্যাংকে সম্পদ সঞ্চয় না করা। কারণ তাতে সুদী কারবারে সহযোগীতা করার নামাস্তর; যা আল্লাহর নিকট কবীরা গুনাহসমূহের একটি। আর এমন সম্পদ থেকে কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করা ইসলামী শরী‘আতে বৈধ নয়। তবে শরী‘আহ মোতাবেক পরিচালিত কোন ব্যাংকে বিনিয়োগের শর্তে সঞ্চয় করাতে দোষের কিছু নেই।

সম্পদ সঞ্চয়ের প্রায়োগিক নীতিমালা

এ নীতিগুলো দু’ভাগে বিভক্ত। যথা:

(১) রাষ্ট্রীয়ভাবে সঞ্চয়ের নীতি দু’টি। যথা:

ক. ভবিষ্যত প্রয়োজনে জরুরী বস্তু সঞ্চয় করা

মুসলিম বিশ্ব যদি দূর্ভিক্ষ, ক্ষুধা-মন্দা বা যুদ্ধ-বিগ্রহে নিপতিত হওয়ার আশংকা করে তাহলে জরুরী অবস্থা মোকাবিলার নিমিত্ত জরুরী কিছু সম্পদ মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে সঞ্চয়ে রাখা বৈধ। দলীল হিসেবে মিশরের বাদশাহর সাথে নবী ইউসুফ (আ.) এর ঘটনা; যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।^{৬০} ইমাম কুরতুবী (রহ.) (আল-কুরআন, ১২: ৪৬-৪৮ নং) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

‘ভবিষ্যত প্রয়োজনে সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা ইসলামী শরী'আতে বৈধ’।^{৬১}

খ. খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু সঞ্চয় করা

খাদ্য ব্যতীত অন্য কিছু সঞ্চয়ে রাখা বৈধ রয়েছে। আর রাষ্ট্রের উপর জরুরী ছাড়াও কিছু জিনিস সঞ্চয়ে রাখা বৈধ রয়েছে। যেমন- ঘোড়া, অস্ত্র-সরঞ্জামাদী ইত্যাদি। মূলত: এগুলো দেশের ভাল পরিস্থিতিতে কোন প্রয়োজন নেই, তবে যুদ্ধের সময় এগুলো প্রয়োজন হয়ে থাকে তাই এগুলো রাষ্ট্র প্রয়োজন মনে করলে সঞ্চয়ে রাখতে পারে।^{৬২}

(২) ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের নীতিমালা

সম্পদ যদি কোন ব্যক্তির হাতে হয়, তাহলে হতে পারে তা নিসাবের কম অথবা বেশি। যদি নিসাবের বেশি থাকে তাহলে হয়তো সে যাকাত আদায় করেছে অথবা করে নি। আর যদি যাকাত আদায় করে থাকে, তাহলে মৌলিক প্রয়োজন ছাড়া অর্থ আরো উদ্ধৃত আছে অথবা নেই। এমতাবস্থায় ব্যক্তির হাতে থাকা সম্পদ যদি নিসাবের কম হয়, তাহলে তার জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা বৈধ আছে। কেননা নিসাব ব্যতীত সম্পদ কম হয়। আর যদি নিসাবের বেশি হয়, তাহলে তার মালিক যদি যাকাত আদায় না করে সঞ্চয় করে তাহলে তার সঞ্চয় হারাম এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেটা সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ।^{৬৩} কেননা উমর (রা.) বলেন, সম্পদের যাকাত আদায় করা হলে সেটা ইকতিনায এর হুকুমে পড়ে না। তথা সেটা সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ হয় না। আর যদি যাকাত আদায় করা না হয়, তাহলে তা ইকতিনায তথা সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ এর হুকুমে পড়বে এবং এর কারণে সম্পদের মালিককে কিয়ামতের দিন সম্পদ পুড়িয়ে তাপ দেওয়া হবে। এমন বর্ণনা ইবনু আব্বাস, জাবের ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকেও মারফু' ও মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত আছে।^{৬৪} আর ইকতিনায এর হুকুম তথা সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ ইসলামে শরী'আতে হারাম। এ বিষয়ে আল-কুরআনের নির্দেশনা বিদ্যমান।^{৬৫}

আর সঞ্চয়কৃত সম্পদ যদি নিসাবের বেশি পরিমাণ হয়, আর এর মালিক যদি যথাযথ যাকাত আদায় করে তাহলে এর উদ্ধৃত বা অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয়ের ব্যাপারে মত ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে। যেমন: জুমহুর ওলামা ও সাহাবীদের অধিকাংশ (উমর (রা.), ইবনু উমর (রা.), ইবনু আব্বাস (রা.) ও জাবের (রা.) প্রমুখ) এমন সম্পদ সঞ্চয়কে বৈধ বলেছেন। তাঁরা সকলেই আয়াতুল মাওয়ারিস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।^{৬৬} কেননা আল্লাহ তা'আলা মৃতের ছেড়ে যাওয়া সম্পদকে উত্তরাধিকারীদের জন্য খুঁটি বা স্তম্ভ করেছেন। আর এটা সম্ভব যখন মৃতরা তাদের সম্পদকে সঞ্চয় করে রেখে যাবে। তারা সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস থেকে আরো একটি দলীল গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন,

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ،

“তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদের মানুষের করণার মুখাপেক্ষি রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের সচ্ছল রেখে যাবে এটাই উত্তম”।^{৬৭} উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মাণ যে, যাকাতসহ অন্যান্য সকল আবশ্যকীয় অর্থনৈতিক অধিকার আদায় সাপেক্ষে উত্তরাধিকারীদের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে রেখে যাওয়া উত্তম।

- পণ্যের সঞ্চয় যেন মজুদদারীতায় রূপ না নেয়, যাতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- সঞ্চয় সম্ভাব্য পণ্যটি যেন এমন শ্রেণির না হয়, যে পণ্যটির জনসাধারণের অতীব প্রয়োজন। এমন পণ্যটি সঞ্চয় করা বৈধ নয়। অর্থাৎ জনসাধারণের অতীব প্রয়োজনীয় শ্রেণির পণ্য কখনো সঞ্চয় করা যাবে না।
- সম্পদ সঞ্চয়ে যেন নিজের অল্পতুষ্টিকে দুর্বল না করে ফেলে। কারণ রিযিক বা সম্পদ আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে এবং সঞ্চয় যেন আগামীকালের জীবিকা নির্বাহের ভয় ও জীবিকা হারানোর ভয় যেন না হয়। এটা মুসলিম বিশ্বাসের জন্য খুবই ক্ষতিকর।
- সঞ্চয়ের লোভ যেন ব্যক্তিকে কৃপণতা ও অভাবের দিকে ঠেলে না দেয়, যার উপর অন্যান্যদের জন্য খরচের আবশ্যকতা রয়েছে। আর সঞ্চয় যেন খরচ থেকে বিরত না করে এবং অন্যান্যদের অধিকার আদায় করতে কুণ্ঠিত না হয়। রাসূল (স.) বলেন- «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَخْسِنَ، عَنَّنْ» «কোন ব্যক্তির পাপী হওয়ার জন্য তার মালিকানায় থাকা খাদ্য-দ্রব্য আটকিয়ে রাখাই যথেষ্ট»।^{৭১}
- যদি মুসলিমদের উপর অর্থের সংকট দেখা না দেয়, তাহলে কয়েকদিনের জন্য অথবা এক মাসের জন্য সম্পদ সংগ্রহ করে রাখার অনুমতি রয়েছে।^{৭২}
- মানুষের ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল সঞ্চয় করা বৈধ।^{৭৩}
- খাদ্য সংকটের মূহুর্তে কেউ যদি বাজার থেকে খাদ্য ক্রয় করে সঞ্চয়ে রাখতে চায়, তাহলে তা বৈধ হবে না। কিন্তু এর দ্বারা যদি মুসলিমদের খাদ্যের সংকট না হয় তাহলে কিছুদিনের জন্য অথবা এক মাসের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করা যেতে পারে।^{৭৪}
- আর যদি মুসলিমদের খাদ্য সংকট না থাকে অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয় তাহলে বিধানমতে এক বছরের জন্য খাদ্য ক্রয় করে সঞ্চয়ে রাখতে পারে।^{৭৫}
- মধু ও তেল সঞ্চয়ের বৈধতা ইসলামী শরী'আতে রয়েছে। তেমনিভাবে গবাদিপশুর শুকনো খাদ্য বা পশুখাদ্য সঞ্চয়ে রাখার অনুমতি রয়েছে। কেননা এ সমস্ত জিনিস জনসাধারণের অতীব প্রয়োজনীয় নয় এবং এগুলো সঞ্চয়ে রাখলে বা মজুদ করলে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। আর মানুষের জীবন ধারণের খাদ্য-খোরাক সঞ্চয়ে যদি জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে তা সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ। তবে রাষ্ট্র নাগরিকের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ করে রাখতে পারবে। তাই অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করলে মানুষের যদি ক্ষতির কারণ না হয় তাহলে বেশি পরিমাণে হলেও সংগ্রহে রেখে সঞ্চয় করা বৈধ। যেমনভাবে আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে- «أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلِ وَأَبُو تَالِهَا سَبْعَةَ أَكْثَرَ خَيْلٍ وَبِغَالٍ» «আনাস (রা.) বলেন, মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবু তালহা সবচেয়ে অধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন»।^{৭৬}

ইসলাম সকল বিষয়ে সবসময়ের জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় খরচের ব্যাপারে কপণতা অবলম্বন যেমন নিষেধ, তেমন প্রাচুর্য্যতায় সম্পদের অপব্যয়-

অপচয়ও নিষেধ। অপচয় এবং কৃপণতা কোনটিই ইসলামী শরী'আতে অনুমোদিত নয়। বরং এ দুই প্রান্তিকতার মাঝখানে মধ্যমপন্থা হিসেবে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে ভবিষ্যতের জন্য সামান্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করে রাখা ইসলামের দর্শন ও শিক্ষা। যারা অপচয় এবং কৃপণতার বৈশিষ্ট্য পরিহার করে মিতব্যয়িতার পথ অবলম্বন করে তারাই আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা এবং এমন বান্দাদের কথাই আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে।^{১৭} সুতরাং, প্রবন্ধের শেষাংশে যা প্রতিভাত হয়-

- সঞ্চয়কে জীবিকা নির্বাহের এবং সম্পদ বাড়ানোর অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।
- সম্পদ সঞ্চয় একটি পূণ্যময় কাজ যা ব্যক্তির মানসে আবশ্যিকীয় দায়িত্ববোধ, দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যবোধকে বাড়িয়ে দেয়।
- সঞ্চয়কারীকে সমাজের একজন সক্রিয় ব্যক্তি হিসেবে নিজের মূল্য ও গুরুত্ব অনুভব করতে শেখায়।
- ব্যক্তির মধ্যে অর্থনৈতিক অংশগ্রহণের আকাংখা বৃদ্ধি করে, যা তার নিজের অর্থনীতি এবং তার দেশের অর্থনীতির মজবুত ভিত গঠনে অবদান রাখতে সহায়তা করে।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ www.bangladiet.com; www.english-bangla.com
- ^২ www.thesaurus.com
- ^৩ Synonymy, online English synonym dictionary
- ^৪ Denis "Authentic Development: Is it Sustainable?", pp. 189-205 in Building Sustainable Societies, Dennis Pirages, ed., M.E. Sharpe, ISBN 1-56324-738-0, 978-1-56324-738-5. (1996)
- ^৫ <https://www.investopedia.com/terms/w/wealth>
- ^৬ The Economist. June 30, 2012. Retrieved July 14, 2012; ihdp.unu.edu. IHDP. July 9, 2012. Retrieved July 14, 2012.
- ^৭ হামেদ সাদেক, মু'জাম্মুল লুগাতিল ফুকাহা (আরবী-ইংরেজী) (বৈরুত: দারুত তা'আরুফ, ১৪০৫ হি.) পৃ.১৫; সা'দী আবু জীব, আল-কামুসুল ফিকহী (দামেশক: দারুল ফিকর, ১৯৮২ খ্রি.) পৃ.১৩৫; ইবন মানযুর, লিসানুল আরাব (বৈরুত: দারুল সাদের, প্রথম সংস্করণ) ۛخر অধ্যায়; ইবরাহীম মোস্তফা ও অন্যান্যগণ, আল-মু'জাম্মুল ওয়াসীত, ۛال অধ্যায়; www.english-bangla.com; www.bangladiet.com
- ^৮ www.almaani.com
- ^৯ www.english-bangla.com
- ^{১০} www.bangladiet.com
- ^{১১} নাযিদ হাম্মাদ, মু'জাম্মুল মুসতালাহাত আল-ইকতিসাদিয়াহ ফি লুগাতিল ফুকাহা (আল-মা'হাদুল আলামী লিল ফিকরিল ইসলামী, তাবি) পৃ.১৭৫
- ^{১২} ইবন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.) খ.১০, পৃ.২৬
- ^{১৩} কাল'আযী মুহাম্মাদ, মু'জাম্মুল লুগাতিল ফুকাহা (লেবানন: দারুল নাফাইস, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ.৫১
- ^{১৪} ইবরাহীম মুসতাফা ও অন্যান্য, আল-মু'জাম্মুল-ওয়াসীত (একাডেমী অব দ্য এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ ইন কায়রো: দার আল-দাওয়াহ, তাবি) খ.১, পৃ.২৭৪; কাল'আযী মুহাম্মাদ, প্রাগুক্ত
- ^{১৫} www.ebookbou.edu.bd/ssc-unit-2.
- ^{১৬} <https://www.investopedia.com/terms/s/savings.asp>
- ^{১৭} আল-কুরআন, ১৭:২৬,২৭

- ১৮ আল-কুরতুবী, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন, তাহক্বীক: আহমাদ বারদুনী ও ইবরাহীম আতফিয়াশ, (কাহেরা: দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪ খ্রি.) খ.১০, পৃ.২৪৭
- ১৯ বেলী ইবরাহীম আল-‘আলীমী, প্রবন্ধ: *استراتيجية تكوين رأس المال الاقتصادي الاسلامي*, কাহেরা বিশ্ববিদ্যালয়, ফারউল খুরতুম, ৭ম বর্ষ, ১৯৮৮ খ্রি. পৃ.৭
- ২০ আল-কুরআন, ১৭:২৯
- ২১ যায়দান ক্বা‘দান, *মানহাজুল ইকতিসাদী ফিল কুরআনিল কারীম* (লিবিয়া: জমঈয়াতুদ দা‘ওয়াতুল ইসলামিয়াহ, ১৯৯০ খ্রি.) পৃ.১২৬
- ২২ বেলী ইবরাহীম আল-‘আলীমী, প্রাণ্ডক্ত
- ২৩ আল-কুরআন, ২৫:৬৭
- ২৪ ইবন কাসীর: আবুল ফিদা’ ইসমাইল বিন উমার, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, তাহক্বীক: সামী বিন মুহাম্মাদ সালামাহ (দারুল তাইয়েবা, ১৯৯৯ খ্রি.) খ.৬, পৃ.১২৪
- ২৫ যায়দান ক্বা‘দান, প্রাণ্ডক্ত, পৃ.৭৫; আল-কুরআন, ৬:১৪১; ইসমাঈল রিয়ায, *আল-ইদখার ফিল মুজতামাআল ইশতিরাকী*, (কাহেরা: আধুনিক লাইব্রেরী, তাবি) পৃ.১০৮
- ২৫ আল-কুরআন, ১২:৪৭-৪৯
- ২৬ আল-কুরআন, ১২:৪৭-৪৮
- ২৭ (مَا فَدَّمْتُمُوهُنَّ) أَيْمَا أَذْخَرْتُمُنَّ لِجَلِهِنَّ، (مِمَّا تُخْصِنُونَ) أَيْمِمَّا تُخْصِنُونَ لِيَزْرَعُوا، (আল-কুরতুবী, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন, প্রাণ্ডক্ত, খ.৯, পৃ.২০৪ দ্র.)
- ২৮ (وَقَالُوا بَلْ يَظُنُّونَ) (প্রাণ্ডক্ত)
- ২৯ (وَقَالَ قَتَادَةُ: "تُخْصِنُونَ" تَذْخِرُونَ، (প্রাণ্ডক্ত)
- ৩০ (وَهُوَ يَذُلُّ عَلَى جَوَازِ اخْتِكَارِ الطَّعَامِ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ) (প্রাণ্ডক্ত)
- ৩১ (وَرَدَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَذْخَرَ قُوتَ أَهْلِهِ سَنَةً " (আল-বাহ্তী: মানসুর বিন ইউনুস বিন সালাহুদ্দিন, *দাক্বায়েকু উলিন নুহা লিশারহিল মুনতাহা* (বিশারহি মুনতাহাল ইরাদাত নামে প্রসিদ্ধ) (আলামুল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.) খ.২, পৃ.২৭; আল-বাহ্তী: কাশফুল কুনা’ আন মাতানিল ইকনা’ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) খ.৩, পৃ.১৮৮
- ৩২ ইমাম বুখারী মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল, আস-সহীহ, তাহক্বীক: মুহাম্মাদ যাহীর বিন নাসের আন-নাসের, (দারুল তুকুন নাজাত, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.) খ.৪, পৃ.৩৮, হা:২৯০৪, ৪৮৮৫
- ৩৩ (وَفِيهِ جَوَازٌ إِدْخَارِ قُوتِ سَنَةٍ إِذَا كَانَ مِنْ غَلَّتِهِ إِذَا اشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ؟ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ: فَأَجَازُهُ قَوْمٌ وَمَنْعَهُ آخَرُونَ إِذَا أُصْرَ بِالنَّاسِ، وَجَوَازٌ ثُمَّ إِذَا تَحَقَّقَتْ حَاجَتُهُ فَلَا يَأْخُذَنَّ مَا لَا كَثِيرًا بَلْ مَا يُمْتَمُّ كِفَايَتَهُ مِنْ وَقْتِ أَخْذِهِ إِلَى سَنَةٍ فَهَذَا أَقْصَى مَا يُرْخَصُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ السَّنَةَ إِذَا تَكَرَّرَتْ أَسْبَابُ الدَّخْلِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدْخَرَ لِعِيَالِهِ قُوتَ سَنَةٍ (আবু হামেদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযযালী আত-তুসী, *ইয়াহইয়া উলুমুদ্দীন* (বৈরুত: দারুল মা‘রেফা, তাবি) খ.১, পৃ.২২৪ দ্র.)
- ৩৪ ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, তাহক্বীক: মুহাম্মাদ ফুয়াদ আদিল বাকী (বৈরুত: দারুল ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তাবি) খ.৩, পৃ.১৩৭৯, হা:১৭৫৭
- ৩৫ ثُمَّ إِذَا تَحَقَّقَتْ حَاجَتُهُ فَلَا يَأْخُذَنَّ مَا لَا كَثِيرًا بَلْ مَا يُمْتَمُّ كِفَايَتَهُ مِنْ وَقْتِ أَخْذِهِ إِلَى سَنَةٍ فَهَذَا أَقْصَى مَا يُرْخَصُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّ السَّنَةَ إِذَا تَكَرَّرَتْ أَسْبَابُ الدَّخْلِ وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدْخَرَ لِعِيَالِهِ قُوتَ سَنَةٍ (আবু হামেদ মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-গাযযালী আত-তুসী, *ইয়াহইয়া উলুমুদ্দীন* (বৈরুত: দারুল মা‘রেফা, তাবি) খ.১, পৃ.২২৪ দ্র.)
- ৩৬ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ اسْتَدَّ بِي فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ بَلَغْتُ بِي مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلَا يَرْتَبِي إِلَّا ابْنَةٌ ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي قَالَ « لَا » . فَقُلْتُ بِالسَّطْرِ فَقَالَ « لَا » ثُمَّ قَالَ « الثَّلْثُ وَالثَّلْثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي امْرَأَتِكَ » (আস-সহীহ লিল বুখারী, প্রাণ্ডক্ত, হা:১২৯৫, ৩৯৩৬, ৪৪০৯, ৫৬৬৮, ৬৩৭৩ দ্র.)

- ৩৭ মাহমুদ বাবলী, *আল-আসাসুল ফিকরিয়্যাহ ওয়াল ইলমিয়্যাহ লিল ইকতিসাদিল ইসলামী* (বৈরত: দারুল রিফা'আ প্রকাশনী, তাবি) পৃ.১২২
- ৩৮ আন-নাবাবী:আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া বিন শারফ, *আল-মিনহাজ শারহ সহীহ মুসলিম* (বৈরত: দারুল ইয়াহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হি.) খ.১১,পৃ.৭৭
- ৩৯ وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ . وَقَالَ كَعْبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَخْلَعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ ، فَهُوَ بَابٌ لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ » . قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي يَخْتَصِرُ . (ظَهَرَ غَنَى)
- ৪০ (আল-আযীম আল-আবাদী: মুহাম্মাদ আশরাফ বিন আমীর বিন আলী বিন হায়দার, *আওনুল মা'বুদ*, ইবনুল কাইয়াম এর টিকা সংযোজিত (বৈরত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.) খ.৯, পৃ.১০৯ দ্র.)
- ৪১ খলিল আস-সাহর নুফুরী, *বায়লুল মাজহুদ ফি হাল্লি আলফাযে আবী দাউদ* (বৈরত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি) খ.১৪,পৃ.২৭১
- ৪২ আস-সহীহ লিল বুখারী, প্রাণ্ডক্ত, অধ্যায়: যাকাত, পরিচ্ছেদ: *بَابُ مَا لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غَنَى*: ১৪২৬; অধ্যায়: নাফকাত, পরিচ্ছেদ: *উজুবুন নাফকাতু আলাল আহলে ওয়াল ইয়ালে*, হা:৫৩৫৬
- ৪৩ وَالْمَعْنَى أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا أَخْرَجَهُ الْإِنْسَانُ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَيْقِنَ مِنْهُ قَدْرَ الْكَفَايَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدَهُ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَقَالَ الْبُغْوِيُّ الْمُرَادُ غَنَى يَسْتَظْهَرُ بِهِ عَلَى التَّوَابِ أَلَيْ تَتَوَبُّ (আল-আসকালানী: আহমাদ বিন আলী বিন হাজার আবুল ফযল, *ফাতহুল বারী* (বৈরত: দারুল মা'রেফা, ১৩৬৯ হি.) খ.৩, পৃ.২৯৬ দ্র.)
- ৪৪ হাশেমী: আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সা'দ, *আত-তবকা'তুল কুবরা*, তাহকীক: মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের আতা (বৈরত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯০ খ্রি.) খ.৩, পৃ.২২৭ দ্র.)
- ৪৫ ইবন হাম্বল: আবু আদিল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ, *মুসনাদে আহমাদ*, অধ্যায়: সুহায়ব বিন সিনান, হাদীস নং: ১৯৪৫৬
- ৪৬ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " بَيْنَا رَجُلٌ بِقَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَبِيقَةَ فَلَانَ، فَتَنَعَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشَّرَاحِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَنَعَّى الْمَاءُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَبِيقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فَلَانٌ - لِاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ - فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَبِيقَةَ فَلَانَ، لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَا إِذْ قُلْتُ " هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَأَكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، وَأُرِثُ فِيهَا ثُلُثُهُ " (আস-সহীহ লি-মুসলিম, প্রাণ্ডক্ত, পরিচ্ছেদ: মিসকিনদের প্রতি সাদাকাহ, হাদীস নং ২৯৮৪ দ্র.)
- ৪৭ আস-সূযুতী: আব্দুর রহমান বিন আবি বাকর জালালুদ্দীন, *আল-ফাতহুল কাবীর ফি যাম্মিয় যিয়াদাতি ইলাল জামেয়িস সগীর*, তাহকীক: ইউসুফ আন-নাবহানী (বৈরত: দারুল ফিকর, ২০০৩ খ্রি.) খ.২, পৃ.১২৬
- ৪৮ সামাগ: ওমার রা. এর মদীনাস্ত বা খায়বারের ওয়াকফকৃত মাল বা ধন-সম্পত্তি | وَكَانَ نُخْلًا وَكَانَ يُقَالُ لَهُ ثَمْعٌ ، (আস-সহীহ লিল বুখারী, হা:২৭৬৪ দ্র: ১)
- ৪৯ আস-সহীহ লিল- বুখারী, প্রাণ্ডক্ত, হা:২৭৬৪
- ৫০ আলাউদ্দীন আলী বিন হিশাম, *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফয়াল*, তাহকীক: বাকরী হায়ানী (মুআসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮১ খ্রি.) খ.৪, পৃ.৫৬২, হাদীস নং ১১৬৫২
- ৫১ *কানযুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফয়াল*, প্রাণ্ডক্ত, খ.৪, পৃ.৫৮৪, হা:১১৭০৩
- ৫২ আল-কুরআন, ৯:৩৪
- ৫৩ আল-হায়শামী: আবুল হাসান নুরুদ্দীন, *মাজমাউয যাওয়ায়েদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়েদ*, তাহকীক: হিশামুদ্দীন কাদসী (কাহেরা: মাকতাবাতুল কাদসী, ১৯৯৪ খ্রি.) খ.১০, পৃ.২৪০, অধ্যায়: আল-ইনফাক ওয়াল ইমসাক, হাদীস নং ১৭৭৬১; মুসনাদে আহমাদ, প্রাণ্ডক্ত, হা:৭৮৮, ৭৯৯, ১১৫৫, ১১৬৫, ১১৬৭, ১১৭৭

- ৫৪ ইবন কাসীর: আবুল ফিদা ইসমাইল, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, তাহকীক: মুহাম্মাদ হুসাইন শামসুদ্দীন (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪১৯ হি.) খ.৯, পৃ.১৫৫
- ৫৫ তাফসীরুল কুরতুবী, তাবারী, আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, আল-কুরআন, ৯:৩৪ নং আয়াত দ্র.
- ৫৬ আল-মওসুআতুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ (কুয়েত: দারুস সালাসিল, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.) খ.২, পৃ.৩৪৯
- ৫৭ কানযুল উম্মাল ফি সুন্নানিল আকওয়াল ওয়াল আফযাল, প্রাণ্ডক্ত, খ.৬, পৃ.৫২৮, হাদীস নং ১৬৮৪০
- ৫৮ ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ২২: ২৫ নং আয়াতের তাফসীর দ্র.: মুহাম্মাদ সাইয়িদ তানতাবী, আত-তাফসীর আল-ওয়াসীত, খ.১, পৃ.২৯৬১; আবু দাউদ, হাদীস নং ২০২০; <http://www.alkhaleej.ae/supplements/> সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ৩৩৬২; আহমাদ: হাদীস নং ১৯৪২৬; ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২১৫৩; মিশকাত: হাদীস নং ২৮৯৩
- ৫৯ আল-হালালু ওয়াল হারামু ফিল ইসলাম, প্রাণ্ডক্ত, পৃ.২২৪-২২৫
- ৬০ আল-মওসুআতুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ (কুয়েত: দারুস সালাসিল, ২য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি.) খ.২, পৃ.৩৪৬
- ৬১ আস-সহীহ লিল বুখারী, প্রাণ্ডক্ত, অধ্যায়: নাফকাত, পরিচ্ছেদ: 'পরিবারের জন্য খরচের উদ্দেশ্যে এক বছর সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা' হাদীস নং ৫৩৫৮
- ৬২ আস-সহীহ লিল বুখারী, প্রাণ্ডক্ত, হাদীস নং ৫৩৫৭
- ৬৩ আল-কুরআন, ১২:৪৬-৪৮
- ৬৪ আল-কুরতুবী: আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ শামসুদ্দীন, আল-জামেউ লি আহকামিল কুরআন, তাহকীক: আহমাদ আল-বারদুনী ও ইবরাহীম আতফিয়াস, (কাহেরা: দারুল কুতুবিল মিসরিয়াহ, ১৯৬৪ খ্রি.) আল-কুরআন, ১২:৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.
- ৬৫ আল-মওসুআতুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ, প্রাণ্ডক্ত, খ.২, পৃ.৩৫১; উদ্ধৃত- হাশিয়াতুল জামাল, খ.৩, পৃ. ৯৩; হাশিয়াতুল ইবন আবদীন, খ.৫, পৃ.২১৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়াহ, খ.৫, পৃ.৩৩৪; আল-মুগনী, খ.৬, পৃ.৪১৫
- ৬৬ তাফসীরুল কুরতুবী, তাবারী, আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস, আল-কুরআন, ৯:৩৪ নং আয়াত দ্র.
- ৬৭ আল-আয়নী: আবু মুহাম্মাদ মাহমুদ বিন আহমাদ বদরুদ্দীন, উমদাতুল কারী (বৈরুত: দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাসিল আরাবী, তাবি) খ.৮, পৃ.২৪৯
- ৬৮ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكَىٰ بِهَا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكَىٰ بِهَا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (আল-কুরআন, ৯:৩৪-৩৫ দ্র.)
- ৬৯ আল-কুরআন, আয়াতুল মাওয়ারিস দ্র.
- ৭০ আস-সহীহ লিল বুখারী, প্রাণ্ডক্ত, হাদীস নং:২৭৪২
- ৭১ আস-সহীহ লি মুসলিম, প্রাণ্ডক্ত, অধ্যায়: আন-নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: ফাযলুন নাফকাতু আলাল ইয়ালে ওয়াল মামলুকে, হাদীস নং:৯৯৬
- ৭২ وَلِهَذَا تُوَفِّي صُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَرَعُهُ مَرْهُونَةٌ عَلَى شَعِيرِ اسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ. وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ ادْخَارِ قُوتِ سَنَةٍ وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ (আস-সান'আনী: মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল, সুবুলুস সালাম (দাবুল হাদীস, তাবি) খ.২, পৃ.৪৯২ দ্র:)
- ৭৩ وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ السُّوقِ وَيَذَرُهَا فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ حَبِطِ الطَّعَامِ لَمْ يَجُزْ بَلْ يَشْتَرِي مَا لَا يَحْصُلُ بِهِ تَصْيِيقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (সুবুলুস সালাম, প্রাণ্ডক্ত, খ.২, পৃ.৪৯২ দ্র:)
- ৭৪ وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ السُّوقِ وَيَذَرُهَا فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ حَبِطِ الطَّعَامِ لَمْ يَجُزْ بَلْ يَشْتَرِي مَا لَا يَحْصُلُ بِهِ تَصْيِيقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (সুবুলুস সালাম, প্রাণ্ডক্ত, খ.২, পৃ.৪৯২ দ্র:)
- ৭৫ وَأَمَّا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ السُّوقِ وَيَذَرُهَا فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتِ حَبِطِ الطَّعَامِ لَمْ يَجُزْ بَلْ يَشْتَرِي مَا لَا يَحْصُلُ بِهِ تَصْيِيقٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (সুবুলুস সালাম, প্রাণ্ডক্ত, খ.২, পৃ.৪৯২ দ্র:)
- ৭৬ আস-সহীহ লিল বুখারী, প্রাণ্ডক্ত, হাদীস নং ১৪৬১
- ৭৭ আল-কুরআন, ২৫:৬৭

রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাবলী : একটি বিশ্লেষণ

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান*

Abstract: Rizal Scripture is a matter of great dignity and a subject of wide influence. The need of this subject is undeniable and final. None of the Hadith scholars stayed away from Rizal Scriptures. This scripture is considered as half of the Hadith. Eventually, Hadith is the coordination of Sanad (certificate) and Matan (discussed topic). The Sanad means the continuity of the narrators of the Hadith. The value of the hadith is determined by Rizal Scripture. The compiled books of Rizal are divided into different types and formatted for various purposes. For example, some texts are especially compiled on the names of the Companions or written about the general Rabi (narrator) of Hadith. Some books are written about the scriptures of the Zaeef Rabi or Hafeez or Mudalis or Fake Hadith narrators. Some books are written on the Zarah-Ta'deel, layout on the Zarah-Ta'deel, and on the layout of both types of words. There are some Rizal Books only on the date of death of the Rabi or the Rizal of specific books or focusing on Rizal in a few special texts. Rizal specialists conducted their writings on these topics and they reached to the vertex or to the final stage of the matter. In this article, We have discussed the identity, importance, requirements and significant number of related books of Rizal in a pertinent way.

১. ভূমিকা

হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় রিজাল শাস্ত্র বলতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্তকে বুঝায়। যেহেতু এ শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনাকারীগণের নাম, পরিচয় ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়, তাই এর নামকরণ করা হয়েছে ইলমুর রিজাল। ইলমুল হাদীছের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইলমুর রিজাল। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক বর্ণনাকারীর নাম, বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্ম-মৃত্যুর তারিখ ও সন, তাঁর নৈতিক ও মানসিক অবস্থা, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান, স্মৃতিশক্তি, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, আচার-আচরণ, আকীদাহ, তিনি কার থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর থেকে কারা হাদীছ শ্রবণ করেছেন, তাঁর সম্পর্কে সমসাময়িক লোকদের মতামত, তাঁর সফর ও প্রস্থান, আমানতদারী ও আল্লাহ্‌ভীরুতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। গ্রন্থগুলো দ্বারা ছাত্র, শিক্ষক ও হাদীছ বিষয়ক পাঠকগণ প্রভূত উপকার লাভ করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রিজাল শাস্ত্রের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও এ বিষয়ক গ্রন্থসমূহের বিশ্লেষণ করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

২. রিজাল শাস্ত্রের পরিচয়

আর্-রিজাল (الرِّجَال) শব্দটি رَجُل শব্দমূল থেকে উৎকলিত। এটি বহুবচন, একবচনে رَجُل। এর অর্থ হলো লোক, পুরুষ, ব্যক্তিসমষ্টি ইত্যাদি। আল-ফীরুযাবাদী (র) বলেন,

الرَّجُلُ، بضم الجيم وسكونه: م، وإنما هو إذا اختلفَ وشبَّ.¹

“الرَّجُلُ” শব্দটির জীম (جيم) বর্ণে পেশ এবং সুকুন যোগে এটি মাসদার। এর দ্বারা বুঝায়, যখন ব্যক্তিটি বালগ ও যুবক হয়।”

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী (র) বলেন,

الدَّكْرُ مِنْ بَنِي آدَمَ جَاوَزَ حَدَّ الصَّغَرِ بِالْبُلُوغِ.^৮

“বনী আদমের মধ্য থেকে এমন পুরুষ যে বাল্যকাল থেকে সাবালকত্বে পদার্পণ করেছে।”

الموسوعة الفقهية الكويتية গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الرَّجُلُ فِي اللَّغَةِ خِلَافُ الْمَرْأَةِ وَهُوَ الدَّكْرُ مِنْ نَوْعِ الْإِنْسَانِ.^৯

“শাব্দিক অর্থে الرَّجُل হলো নারীর বিপরীত। এটি হলো মানুষ থেকে পুরুষ শ্রেণি।”

الرَّجُل শব্দটি الرَّاجِل বা হেটে চলা ব্যক্তি (الْمَاشِي) অর্থেও ব্যবহৃত হয়।^{১০} যেমন আল-কুর’আনে এসেছে,

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا.^{১১}

“যদি তোমরা আশঙ্কা করো, তবে হেঁটে অথবা আরোহণ করে (যেতে পারো)।”

এখানে আর-রিজাল (الرَّجَال) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,

الرُّوَاةُ لِلْأَخْبَارِ وَالْأَثَارِ الشَّرْعِيَّةِ سِوَاءَ كَانَ الرَّاوي ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً.^{১২}

“শার’ঈ খবর ও আছার বর্ণনাকারী রাবীগণ। রাবী নারী-পুরুষ উভয় হতে পারে।”

الرَّجَال-কে পুরুষ অর্থে رجال নামে নামকরণ করা হয়েছে প্রাধান্যতার ভিত্তিতে। যেহেতু পুরুষ বর্ণনাকারীদের থেকে নারীদের সংখ্যা অনেক কম। তাই এ নাম দেয়া হয়েছে।^{১৩}

الرَّجَال আরো কয়েকটি নামে পরিচিত। তা হলো, ইলমুল জারহ, ইলমুল জারহ ওয়াত-তাদীল, ইলমুর রিজালুল হাদীছ ইত্যাদি।

পরিভাষায় যে সব রাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখনিঃসৃত বাণী সূত্র পরম্পরায় ধারণ ও বর্ণনা করেছেন তাদের সততা ও বিশ্বস্ততাকে কপ্তি পাথরে যাচাই করে নেয়ার জন্য রাবীদের জীবন চরিত সম্পর্কিত যে শাস্ত্র নির্মিত হয় তাকেই রিজাল শাস্ত্র বলা হয়।

মনীষীগণ রিজাল শাস্ত্রের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে যে সব মন্তব্য করেছেন নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো,

১. মুহাম্মাদ ইবন জাফর আল-কাত্তানী (র) বলেন,

وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ رُوَاةُ الْحَدِيثِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ رُوَاةٌ لِلْحَدِيثِ.^{১৪}

“যে শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনাকারী হিসাবে বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়, তাকে ইলমু রিজালিল হাদীছ বলা হয়।”

২. أبعاد العلوم গ্রন্থে বলা হয়েছে,

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ جَرِّحِ الرُّوَاةِ وَتَعْدِيلِهِمْ بِالْفَاطِ مُخْصُوصَةً وَعَنْ مَرَاتِبِ تِلْكَ الْأَلْفَافِ.^{১৫}

“এটি এমন একটি জ্ঞান, যেখানে রাবীদের ক্রটি ও তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা নির্দিষ্ট শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়। সে সাথে এসব শব্দের স্তরও উল্লেখ করা হয়।”

৩. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁন ভূপালী (র) (মৃত ১৩০৭ হি.) বলেন,

عِلْمُ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ أَيْ رِجَالِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَتَابِعِيهِمْ وَالرُّوَاةِ فَإِنَّ الْعِلْمَ بِهَا نِصْفُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّ الْحَدِيثَ سَنَدٌ وَمَتْنٌ وَالسَّنَدُ عِبَارَةٌ عَنِ الرُّوَاةِ فَمَعْرِفَةُ أَحْوَالِهَا نِصْفُ الْعِلْمِ.^{১০}

“ইলমু আসমা’ইর রিজাল হচ্ছে হাদীছের সনদে উল্লিখিত সাহাবী, তাবি’ঈ তথা সকল বর্ণনাকারীগণের সম্পর্কিত জ্ঞান। হাদীছের দুটি অংশ রয়েছে সনদ ও মতন। আর সনদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনাকারীদের সার্বিক অবস্থা জানা যায়। এ জন্যই একে জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে।”

৪. ড. তাকী উদ্দীন নদভীর মতে,

وَالَّذِينَ وَهَبُوا حَيَاتِهِمْ مُنْذُ الْعَصْرِ النَّبَوِيِّ عَلَى حِفْظِ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَايَةِ أَحَادِيثِهِ وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِحَيَاتِهِ أَذْوَها أَلَّتِي ضَبَطُوهَا بَعْدَهُمْ وَكَتَبُوهَا يُسَمُّونَ رِجَالُ الْحَدِيثِ.^{১১}

“যাঁরা নবী করীম (সা)-এর যুগে তাঁর সমুদয় বাণী, তাঁর জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে সংরক্ষণ এবং বর্ণনায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন মুহাদ্দিছগণ তাঁদেরকে রিজালুল হাদীছ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।”

৫. শায়খ আয-যাহরানী বলেন,

عِلْمٌ يَتَعَلَّقُ بِبَيَانِ مَرَاتِبِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ تَضَعِفُهُمْ أَوْ تُؤَيِّقُهُمْ بِتَعَايِيرِ فَنِيَّةٍ مُتَعَارِفٍ عَلَيْهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ وَهِيَ دَقِيقَةُ الصِّيَاغَةِ وَمُحَدَّدَةٌ الدَّلَالَةِ مِمَّا لَهُ أَهْمِيَّةٌ فِي نَقْدِ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ.^{১২}

“এটি এমন একটি জ্ঞান, যা দুর্বলতা ও দৃঢ়তার ভিত্তিতে রাবীদের স্তরের বর্ণনার সাথে সম্পৃক্ত যা মুহাদ্দিছগণের নিকট বিশ্লেষণমূলক শাস্ত্র। আর এটি সূক্ষ্ম বিন্যাস ও নির্ধারিত প্রমাণ সমৃদ্ধ, হাদীছের সনদের সমালোচনার ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব রয়েছে।”

৬. ড. মুহাম্মাদ আস-সাব্বাগ লিখেছেন,

هُوَ عِلْمٌ يُنْحَتُ عَنْ رِوَاةِ الْحَدِيثِ وَتَارِيخِهِمْ وَكُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِشُؤْنِهِمْ وَنَشَأَتِهِمْ وَرِحَالَتِهِمْ وَمَنْ اجْتَمَعُوا بِهِ أَوْ مَنْ لَمْ يَجْتَمِعُوا بِهِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِمْ وَمَرَكَزِهِمْ الْعِلْمِيِّ فِي عَصْرِهِمْ وَعَادَاتِهِمْ وَطَبَائِعِهِمْ وَأَخْلَاقِهِمْ وَشَهَادَةِ عَارِفِيهِمْ لَهُمْ أَوْعَالِيهِمْ وَسَائِرِ مَالِهِ بِتَكْوِينِ الثَّقَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِمْ جَزْأً وَتَعْدِيلاً.^{১৩}

“যে অভিজ্ঞান হাদীছ বর্ণনাকারীগণের জীবনেতিহাস তথা তাদের জন্ম-মৃত্যু, তাঁদের শিক্ষক, ছাত্র, বিদ্যা অর্জনের জন্য ভ্রমণ, তাঁদের সমসাময়িক যুগের বিদ্যা চর্চা কেন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে ইলমুর রিজালিল হাদীছ বলা হয়।”

৭. ড. মুহাম্মাদ উযায় আল-খতীব বলেন,

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَعْرِيفُ بِرُوَاةِ الْحَدِيثِ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِرَوَايَتِهِمْ لِلْحَدِيثِ.

“এটি এমন একটি জ্ঞান, যা ঐ সকল রাবীদের পরিচয় করিয়ে দেয় যারা হাদীছের রিওয়ায়াতের সাথে সম্পৃক্ত।”

৮. ড. নাহাদ আব্দুল হালীম বলেন,

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَحْوَالِ الرِّجَالِ وَعَنْ أَوْطَانِهِمْ وَرِحَالِهِمْ وَطَبَقَاتِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَمَوَالِيدِهِمْ وَوَفَايَتِهِمْ وَمَا وَرَدَ فِيهِمْ مِنْ جَرَحٍ أَوْ تَعْدِيلٍ.

“এটি এমন একটি জ্ঞান যাতে রাবীদের অবস্থা এবং তাদের জন্মস্থান, ভ্রমণ, স্তর, মর্যাদা, জন্ম, মৃত্যু তারিখ এবং তাদের সম্পর্কে ত্রুটি ও ন্যায্যপারায়নতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচিত হয়।”

৯. marefa.org নামক ওয়েব সাইটে বলা হয়েছে,

هُوَ ظُهُورُ وَصْفٍ فِي الرِّوَايَةِ يَتْلَمُ عَدَالَتَهُ أَوْ يَخْلُ بِحِفْظِهِ وَضَبْطِهِ، مِمَّا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ سَقُوطُ رَوَايَتِهِ أَوْ ضَعْفُهَا وَرَدُّهَا. وَالتَّجْرِيعُ وَصْفُ الرِّوَايَةِ بِصِفَاتٍ تَقْتَضِي تَضَعِيفُ رَوَايَتِهِ أَوْ عَدَمَ قَبُولِهَا.^{১৪}

“রাবীর এমন গুণ প্রকাশ করা, যা তার ন্যায্যপারায়নতাকে নষ্ট করে অথবা তার মুখস্ত ও সংরক্ষণকে দুর্বল করে এবং এর উপর ভিত্তি করে তার বর্ণনা রহিত হওয়া, দুর্বল হওয়া ও প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ধারা নির্ভর করে। আর তাখরীজ হচ্ছে রাবীকে এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্যে অভিযুক্ত করা, যার মাধ্যমে তার বর্ণনাকে দুর্বল করা হয় অথবা অগ্রহণযোগ্য করা হয়।”

যুগ পরিক্রমায় সহস্র মনীষী হাদীছ বর্ণনাকারীগণের পরিচয় লাভ এবং তাদের মানগত স্থান নিরূপণের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, এতদউদ্দেশ্যে তাঁরা বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শহর থেকে শহরান্তে কখনও পদব্রজে আবার কখনও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে হাদীছ বর্ণনাকারীগণের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে সর্বপ্রকার তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর যারা তাদের সমকালীন ছিলেন না, তাদের সম্পর্কে সমসাময়িক অথবা তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আর এভাবে ইলমুল হাদীছের গৌরবান্বিত এ শাখাটির অস্তিত্ব গোড়া পত্তন হয়। পরিভাষায় এটি ‘রিজাল শাস্ত্র’ নামে অভিহিত।^{১৫}

৩. রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদীছে রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটি মহান মর্যাদার অধিকারী এবং বিরাট প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি বিষয়। এ বিষয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা চূড়ান্ত। হাদীছ শাস্ত্রের কোনো মহান ব্যক্তিই এ শাস্ত্র থেকে দূরে অবস্থানকারী ছিলেন না অথবা এতে তাঁর দক্ষতাও কম ছিল না।

হাদীছের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এ শাখাটির প্রতি হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ অধিকতর গুরুত্বারোপ ও মনোযোগ প্রদান করেছেন। এ জন্য এ ক্ষেত্রে যত বেশিসংখ্যক গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে, অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা কল্পনাও করা যায় না। কেননা এটি হাদীছের অর্ধেক ইলম বা জ্ঞান। আলী ইবনুল মাদীনী (র) বলেন,

معرفة الرجال نصف العلم^{১৬}

“রাবীদের পরিচয় জানা জ্ঞানের অর্ধেক।”

এ জ্ঞান ব্যতীত হাদীছ বিশুদ্ধতা বা দুর্বলতা প্রমাণ করা যায় না। কোনো বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি গ্রহণযোগ্য কিনা, তা নির্ধারণের জন্য প্রথমত হাদীছের সনদ (বর্ণনা সূত্র) যাচাই করতে হয়। সনদ ব্যতীত হাদীছ কল্পনাভীত। সনদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুফইয়ান আছ-ছাওরী (র) বলেন,

السَّانِدُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ السَّلَاحُ، فَبَأْيَ شَيْءٍ يِقَاتِلُ.

“সনদ সম্পর্কিত জ্ঞান মু’মিনের হাতিয়ার স্বরূপ। তার নিকট যদি হাতিয়ারই না থাকে, তবে সে ব্যক্তি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে কী দিয়ে?”

ইমাম মুহাম্মাদ আশ্-শাফি‘ঈ (র) বলেছেন,

مثل الذي يطلب الحديث بلا اسناد، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة الحطب، فيها افعى تلدغه، وهو لا يدري.

“সনদ সূত্র ব্যতীত যে ব্যক্তি হাদীছ গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ঠিক রাতের অন্ধকারে কাষ্ঠ আহরণকারীদের অনুরূপ। এ ব্যক্তি কাষ্ঠের বোঝা বহন করে চলছে, অথচ এর মধ্যে বিষধর সর্প থাকতে পারে, যা তাকে দংশন করতে পারে, কিন্তু অসর্কতার কারণে সে ব্যক্তিটি তা টেরই পায় না।”

মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয আল-কাওলী বলেন, ‘হাদীছ হলো সনদ ও মতন-এর সমন্বয়। আর সনদ বলতে বুঝায় হাদীছের রাবীগণকে। কাজেই তাঁদের অবস্থার অবগতি নিঃসন্দেহে হাদীছ শাস্ত্রের অর্ধেক জ্ঞান।’^{১৭}

রিজাল শাস্ত্র ব্যতীত হাদীছের বিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কেননা হাদীছের বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য সর্বপ্রথম হাদীছের সনদ তথা বর্ণনা সূত্র যাচাই করতে হয়। আর সনদ যাচাই করার অর্থই হলো, এর রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া, বর্ণনাকারীদের স্মরণশক্তি, বিশ্বস্ততা, স্বভাব-চরিত্র, নাম, উপাধি, খোদাভীরতা, জন্মস্থান এক কথায় তাদের বিস্তারিত জীবন চরিত সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এরূপ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাঁদের বর্ণিত হাদীছের মান যাচাই করা সম্ভব। জাল হাদীছ থেকে সহীহ হাদীছ বাছাই করার জন্য মুহাদ্দিছগণ আল-কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীকে উল্লেখ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ^{১৮}

“হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মে জন্যে অনুতপ্ত না হও।”

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ^{১৯}

“তোমরা পুরুষদের মধ্য থেকে দুজন সাক্ষী নির্ধারণ করো। আর যদি দুজন পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষ ও দুজন নারী, তোমাদের পছন্দমত সাক্ষীদের থেকে।”

হাদীছ সংকলনের যুগ থেকেই এ শাস্ত্রের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুহাদ্দিছগণ এ অভিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হিসেবে যেমন আল-কুরআন থেকে আয়াত পেশ করেছেন তেমনি তারা হাদীছ থেকেও এর গুরুত্ব প্রমাণের জন্য হাদীছ উল্লেখ করেছেন।

এ সব নির্দেশের কারণেই সাহাবীগণ হাদীছ গ্রহণে কড়াকড়ি ও এ ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। অকাট্য সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত তাঁরা কারো বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করতেন না। ইলমুল হাদীছের ক্ষেত্রে এ সতর্কতাই পরবর্তীকালে রিজাল শাস্ত্র ও ‘হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞান’ ইত্যাদি জ্ঞানশাখার উৎপত্তির ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। হাদীছ বর্ণনাকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সমালোচনা ও তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান সম্পর্কে মন্তব্য করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবি‘ঈর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়। তাঁদের পরবর্তী সময়েও হাদীছ সমালোচনার এ কাজটি যথারীতি অব্যাহত ছিল। তাঁরা সকলেই এ কাজকে মিথ্যাভাবে অভিযুক্ত করে হয়ে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয় বরং ইসলামী শরীআতকে অসত্য ও জালিয়াতি থেকে রক্ষার, উদ্দেশ্যে তাঁরা এটিকে বৈধ বলেছেন। লোকদেরকে নিছক আঘাতদান বা দোষী প্রমাণের উদ্দেশ্যে নয়।^{২০} এ সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইব্ন শীরীন (র) (মৃত ৬৫৪ হি.) বলেন,

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.^{২১}

“নিশ্চয় এ ইলম দীনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কার নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করছ, তা ভাল করে দেখ।”

হাদীছ সমালোচনা বিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.^{২২}

“এমন এক সময় ছিল, যখন লোকেরা সনদ-সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো না। কিন্তু পরে যখন তাদের মধ্যে দলাদলী দেখা দিল, তখন লোকেরা হাদীছ বর্ণনাকারীদের বলত, তোমরা কোন্ ব্যক্তির নিকট থেকে তোমাদের বর্ণিত এসব হাদীছ গ্রহণ করেছ। আমাদের নিকট তাঁদের নাম-পরিচয় বর্ণনা কর। তাতে দেখা যায়, তাঁরা আহলুস-সুন্নাহ কিনা? যদি তারা এ জামা‘আতের অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হয়। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ‘আতী, তবে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হয় না।”

উছমান ইবন ‘আফফান (রা) ও আলী ইবন আবী তালিব (রা)-এর শাসনামলে ইসলামের বিভিন্ন দল-উপদলের উদ্ভব হয় এবং হাদীছের নামে মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকে। তখন থেকেই হাদীছ বর্ণনা ক্ষেত্রে সনদ বর্ণনাও অপরিহার্য করা হয়। হাদীছ সংকলনের পরিপূর্ণতার যুগে এসে হাদীছ বর্ণনা করা বিষয়টি মতন বর্ণনার ন্যায় অবিচ্ছেদ্য বিষয়ে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সনদ বিষয়ক এ জ্ঞান শাখাটি একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান শাস্ত্র হিসেবে রূপ লাভ করে। আর এ ‘রিজাল শাস্ত্র’টির মাধ্যমে ‘হাদীছ সমালোচনা অভিজ্ঞানের’ সনদ পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হয়। অর্থাৎ এ শাস্ত্রটির মাধ্যমে হাদীছের সনদে উল্লিখিত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনাতিহাস ও তাঁদের চরিত্র পুংখানুপুংখরূপে যাচাই-বাছাই করা হয়। অতএব, হাদীছ বর্ণনাকারীর নির্ভরযোগ্যতা ও তার বর্ণিত হাদীছের বিশ্বস্ততা নিরূপণের ক্ষেত্রে রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।^{২৩}

রিজাল শাস্ত্র মুসলিম জাতির এক বিস্ময়কর গর্বের বিষয়। এ শাস্ত্রের অবদানে শুধু হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর হাদীছ সমগ্রই সংরক্ষিত হয়নি, বরং হাদীছ বর্ণনাকারীগণের জীবনাতিহাস পরিচিত লাভসহ তাঁদের মান ও অবস্থানগণ বিষয়টি সম্পর্কে জানা যায়। এতে করে হাদীছের প্রামাণিকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ শাস্ত্রটির এসব গুরুত্বের কারণে যুগ-যুগান্তরে কত সংখ্যক মহামনীষী যে তাঁদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করেছেন, তা সত্যিই মানবেতিহাসের একটি বিরল ঘটনা। তাঁরা হাদীছ বর্ণনাকারীগণের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান সমূহ জানার জন্য তৎকালীন হাদীছ সমৃদ্ধ স্থানসমূহে শিক্ষাসফরের মাধ্যমে যাতায়াত করতেন। এরূপ কষ্ট-পরিশ্রমের ফলে কয়েক লক্ষ হাদীছ বর্ণনাকারীর জীবনাতিহাস ও তাঁদের জীবনচরিত্র সংরক্ষিত হয়েছে। মুসলিম জাতি ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে এর নূন্যতম কোনো নজীর নেই। এমনকি কোনো ধর্ম বা জাতি তাঁদের এত সংখ্যক ধর্মীয় জ্ঞানের জীবনেতিহাস সংরক্ষণের ব্যাপারটি কল্পনাও করতে পারে না।^{২৪} এ সম্পর্কে আলী ইবন আহমাদ ইবন হায্ম (র) বলেন, “হাদীছের সনদ মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ অনুগ্রহ; যা তিনি শুধু মুসলিম জাতিকেই দান করেছেন।”^{২৫}

হাদীছ সংরক্ষণে রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য:

আব্দুল্লাহ ইবন হাকিম (র)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি ১টি হাদীছ বর্ণনা করলে তিনি বলেন, “এ হাদীছটি তুমি কার নিকট থেকে কখন শ্রবণ করেছিলে?” জবাবে তিনি বললেন, ‘আমি ‘আব্দ হুমাইদ (র)-এর নিকট থেকে অমুক সনে এ হাদীছটি শ্রবণ করেছিলাম।’ তখন আব্দুল্লাহ ইবন হাকিম (র) তাঁর সামনে সমবেত ছাত্রদের লক্ষ্য করে বললেন, ‘দেখ! এ লোকটির মতে, ‘আব্দ ইবন হুমাইদ (র) তাঁর মৃত্যুর ৭ বছর পর এর নিকট

হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। কেননা, এ ব্যক্তিটি ‘আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র)-এর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণের যে সনদটির কথা উল্লেখ করেছেন, সে সনদটির ৭ বছর পূর্বেই ‘আব্দ ইব্ন হুমাইদ (র) ইস্তিকাল করেছেন।’ অতএব এ ব্যক্তি কর্তৃক ইব্ন হুমাইদ (রা)-এর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণের দাবিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ জন্য তার বর্ণিত হাদীছটি অসত্য ও অগ্রহণযোগ্য।^{২৬}

এ ঘটনাটি রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কিত একটিমাত্র উদাহরণ। এভাবেই মুহাদ্দিছগণের প্রতিটি হাদীছ সমালোচনা ও যাচাই-বাছাইয়ে কষ্ট পাথরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। আর একমাত্র রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমেই এ জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কার্যটি সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল। সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তীকালের মুহাদ্দিছগণ এ মানদণ্ডের সাহায্যেই সহীহ, যঈফ, মুনকার মধ্যকার পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন। সর্বকালেই রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সমভাবে প্রযোজ্য ও অনস্বীকার্য।

রিজাল শাস্ত্র বা জীবন চরিত অভিধান রচনায় পৃথিবীতে মুসলিমগণ শীর্ষস্থানে রয়েছেন। এ জ্ঞান সম্পর্কে প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও দার্শনিক ড. স্পেন্সার বলেন, “পৃথিবীতে আর এমন কোনো জাতি আবির্ভাব হয়নি, বর্তমানকালেও নেই, যারা মুসলমানদের চরিত-অভিধানের (আসমাউর রিজাল) মতো উঁচু মানের শাস্ত্র আবিস্কার করেছে। এ জ্ঞানের বদৌলতে আজ পাঁচ লক্ষ মুসলমানের জীবনচরিত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।”^{২৭}

ড. স্পেন্সার যে সময়ে এ মন্তব্যটি করেছিলেন, তখন পর্যন্ত হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র)-এর ‘তাকরীবুত তাহযীব’ ও ‘রাফ’উল ইসর’, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র)-এর ‘মীযানুল ‘ইতিদাল’ এবং মুহাম্মদ ইব্ন সাদ (র)-এর ‘আত-তাবাকাতুল কুবরা’র মত রিজাল গ্রন্থ মুদ্রিত হয়নি। যদি তার হাতে এ সমস্ত মূল্যবান গ্রন্থ পৌঁছত তাহলে তিনি এ শাস্ত্রের গুরুত্ব আরও উপলব্ধি করতে পারতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এ বিষয়ে আরেকটি বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন। তিনি তার এ মন্তব্যে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,

It is therefore no wonder that the Muhammadans have in this particular surpassed all other nation.^{২৮}

“এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, মুসলমানদের এ রিজাল অভিজ্ঞান পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে হার মানিয়েছে।”

এ সম্পর্কে শিবলী নূ‘মানী যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা এ শাস্ত্রের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকাংশে। তিনি বলেন, ‘কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের এ গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না। তাঁরা নিজেদের নবী (সা)-এর জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর এক-একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তির জীবনেতিহাস বিশুদ্ধ পন্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও করার সম্ভাবনা নেই।’^{২৯}

রিজাল শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীছের সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও এর বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করার কারণে হাদীছ শাস্ত্র কাল্পনিক কাহিনী ও মিথ্যাচারিতা থেকে যেমন মুক্তি পায় তেমনি কালের গহবরে বিলীন হওয়া থেকেও তা রক্ষা পায়। এ প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদ স্মিথের উদ্ধৃতি দিয়ে ইসলামী বিশ্বকোষে উল্লিখিত হয়েছে যে, ‘এখানে পূর্ণদিনের আলো বিরাজমান। যা প্রতিটি বস্তুর উপর পতিত হয়েছে এবং প্রত্যেক মানুষের নিকট পৌঁছতেও সক্ষম হয়েছে। এতে শুধু ইসলাম ও ইসলামের প্রবর্তকের অবস্থাই ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেনি; বরং এতে এমন ব্যক্তিবর্গের বিষয়াদি সংরক্ষিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে যাদের কোন না কোন সম্পর্ক

ছিল। তাই নির্দিষ্টায় বলা যায় যে, অন্য কোন জাতির বর্ণনাপঞ্জীতে বা ইতিহাস ভাণ্ডারে এ শাস্ত্রের (রিজাল শাস্ত্র) ন্যায় এক দশমাংশও খুঁজে পাওয়া যাবে না।”^{৩০}

হাদীছের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য রিজাল অভিজ্ঞানের গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা নিম্নোক্ত দু একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। যেমন, ‘উফায়র ইব্ন মা’দান আল-কাল’আবী বর্ণনা করেন, একদা উমার ইব্ন মুসা আগমন করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে একটি মসজিদে মিলিত হলাম। তিনি সেখানে বলতে লাগলেন, حدثنا شيخكم الصالح “আমাদের নিকট তোমাদের শায়খ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।” এ কথা যখন তিনি পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, তখন আমি তাকে বললাম, ‘আমাদের মধ্যে সালিহ নামক শায়খ কে?’ আপনি তার নাম বলুন, ‘যাতে আমরা তাকে চিনতে পারি।’ তিনি বললেন, ‘উক্ত শায়খের নাম হলো খালিদ ইব্ন মা’দান।’ আমি তাঁকে বললাম, ‘আপনি কোন বছরে তার সাথে দেখা করেছেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ১০৮ হিজরীতে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়।’ আমি বললাম, ‘তার সঙ্গে আপনার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?’ তিনি বললেন, ‘আর্মেনিয়ার যুদ্ধে।’ আমি বললাম, ‘হে শায়খ! আল্লাহকে ভয় করুন, মিথ্যা বলবেন না। খালিদ ইব্ন মা’দান ১০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। আর কীভাবে তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে আপনি তার সঙ্গে দেখা করলেন?’^{৩১}

মুহাদ্দিছগণ রিজাল শাস্ত্রের বাস্তব কার্যকারিতা বুঝাতে গিয়ে ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার ইয়াহুদীরা একটি পত্র প্রকাশ করে। তাতে লেখা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বারের ইয়াহুদীদের জিযিয়া মওকুফ করেছেন। এতে আলী (রা), মু’আবিয়া (রা), সা’আদ ইব্ন মু’আয (রা)সহ কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত ছিল। পত্রটি মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট নিয়ে যাওয়া হলে তারা বিভ্রান্তের মধ্যে পতিত হন। অতঃপর বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক আবু বকর আল-খতীব-এর সমীপে পত্রটি পেশ করা হলে তিনি এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বললেন, পত্রে সাক্ষী হিসেবে যে মু’আবিয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে এটি সঠিক নয়। কেননা সপ্তম হিজরীতে যখন খায়বার বিজিত হয় তখন পর্যন্ত তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। আর সা’আদ ইব্ন মু’আযের সাক্ষী দেয়ার যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটিও মিথ্যা। কেননা তিনি খায়বার যুদ্ধের দুবছর পূর্বে ইন্তিকাল করেন। আবু বকর আল-খতীবের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে ইয়াহুদীদের এই পত্রের সত্যতা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়।^{৩২}

ইমাম হাকিম আন-নায়শাপুরী (মৃত ৩৫৯ হি.) লিখেছেন যে, একবার মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম আল-কিসসী আমাদের মাঝে আগমন করলেন এবং ‘আবদ ইব্ন হুমায়দ-এর সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন। আমি তাঁকে উক্ত বর্ণনাকারীর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আবদইব্ন হুমায়দ ২০৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর আমি আমার সঙ্গীদের বললাম এই শায়খ আবদ ইব্ন হুমায়দ থেকে তার মৃত্যুর তের বছর পর হাদীছ শ্রবণ করেছেন। সুতরাং আবদ ইব্ন হুমায়দ থেকে তার হাদীছ শোনার বিষয়টি মিথ্যা।^{৩৩}

ইমাম মুহাম্মাদ আস-সাখাতী (র) الرِّجَالُ بِالتَّوْبِيخِ لِمَنْ دَمَّ النَّارُ নামক স্বীয় গ্রন্থে এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্তের অবতারণা করে বলেন, এ সমস্ত ঘটনা রিজাল শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে।^{৩৪} এ জন্যই যুগে যুগে মুহাদ্দিছগণ হাদীছের সনদে বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি জ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। তাঁরা সব সময়ই হাদীছ বর্ণনাকারীদের জন্ম, মৃত্যু, জন্মস্থান এবং কখন-কে-কীভাবে-কর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। তাদের নিরলস প্রচেষ্টায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে রিজাল অভিজ্ঞান। প্রণীত হয়েছে এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বর্ণনাকারীদের জীবন বৃত্তান্ত এবং তাদের রিওয়ায়াতকৃত হাদীছ সংখ্যা। এ

অভিজ্ঞানের গোড়াপত্তনের পেছনে যে মূল উদ্দেশ্য কাজ করেছে সেটি হলো, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহর লালন এবং যথার্থভাবে এর বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপণ ও মিথ্যাচারিতার হাত থেকে একে রক্ষা করা।^{৩৫}

রিজাল শাস্ত্র বিষয়ে সংকলিত গ্রন্থমালা বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিন্যস্ত। যেমন, কিছু কিছু গ্রন্থ বিশেষভাবে সহাবীগণের নামের ওপর সংকলিত অথবা হাদীছের সাধারণ রাবীগণ সম্পর্কে রচিত। আবার কিছু কিছু বিশেষভাবে সংকলিত হয়েছে ছিকাহ্ রাবীগণ সম্পর্কে বা য'ঈফ রাবীগণের ওপর অথবা হাফিয় অথবা মুদাল্লিস অথবা জাল হাদীছ রচনাকারী সম্পর্কে। কোনো কোনোটি জারহ্-তাদীল, জারহ্-তাদীল নির্ণয়ক শব্দমালা অথবা এ উভয় ধরনের শব্দসমূহের স্তর বিন্যাসের ওপর রচিত। আবার কোনো কোনোটি রচিত হয়েছে মু'তালিফ-মুখতালিফ এবং মুত্তাফিক ও মুফতারিক নাম ও বংশকে কেন্দ্র করে। কোনো কোনো রিজাল গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে শুধু রাবীগণের মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে অথবা নির্দিষ্ট গ্রন্থের রিজাল-এর ওপর অথবা বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থের রিজালকে কেন্দ্র করে। এসব বিষয়েই আলিমগণ তাঁদের লিখনি পরিচালনা করেছেন এবং এ বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে তাঁরা উত্তম স্তরে উপনীত হয়েছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছেন।^{৩৬}

উপর্যুক্ত বিষয়াবলী সম্পর্কিত রিজাল শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নিম্নে বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

৪. রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী

রিজাল শাস্ত্রের সূচনালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ শাস্ত্রে বর্ণনা সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বর্ণনাকারীদের অবস্থান, জন্ম, মৃত্যু, জন্মভূমি, শিক্ষা, উস্তাদগণের পরিচয়, হাদীছ শিক্ষা, হাদীছ সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি বিষয়গুলো এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। রাবীগণের বর্ণিত হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের প্রয়োজনেই এই তৎপরতা অনুসৃত হয়েছিল। এই শাস্ত্রের সাহায্যে হাদীছ জালকারীদের সামগ্রিক চরিত্র উন্মোচিত হয়। সুফয়ান আছ-ছাওরী (র) (মৃত ১৬১ হি.) বলেন,

“বর্ণনাকারীরা মিথ্যার আশ্রয় নিলে আমরা তা লিপিবদ্ধ করে রাখতাম।”

হাদীছ বিশারদগণ রাবীদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র কর্ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে অনুসন্ধান করে সংরক্ষণে তৎপর ছিলেন। তারা বর্ণনাকারীদের প্রতি কিরূপ সজাগ ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখতেন তা রিজাল শাস্ত্র থেকে অবহিত হওয়া যায়।

মুহাদ্দিছগণ এ সমস্ত গ্রন্থকে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেছেন:

এক. সাহাবাগণের জীবন সংক্রান্ত রচিত গ্রন্থাবলী। এ শাস্ত্রটি হাদীছ বেত্তাদের প্রগাঢ় মনোযোগ ও আন্তরিকতা থাকার ফলে রাবীগণের জীবনতিহাস সম্পর্কিত এক বিশাল তথ্য ভাণ্ডার মুসলমানদের নিকট সম্ভব হয়। তারা রাবীগণের জীবনী সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাহাবাগণের জীবন, ইতিহাস, তাদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিস্তারিতভাবে এ প্রকার গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এভাবে তাবি'ঈ, তাবে-তাবি'ঈ ও পরবর্তী পর্যায়ের রাবীগণ সম্পর্কেও গ্রন্থ প্রণীত হয়।

দুই. রাবীগণের নাম বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী। এর মধ্যে তাবাকাত একটি বিশেষ শ্রেণির গ্রন্থ। রাবীগণের স্তর বা সমসাময়িক রাবীগণকে চিহ্নিত করে তাদের জীবনালেখ্য তাবাকাত শ্রেণি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিছু কিছু বর্ণনাকারীগণের বিশেষ বিশেষ দিককে কেন্দ্র করে 'তাবাকাত' রচনা করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবন সাদ (মৃত ২৩০ হি.) ‘তাবাকাতুল কুবরা’ শিরোনামের গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে এ বিষয়ক রচনার পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন।

তিন. ছিকাহ রাবীগণ সম্পর্কিত রচিত গ্রন্থাবলী। কিছু গ্রন্থ শুধুমাত্র ছিকাহ রাবীগণকে নিয়ে রচিত হয়েছে।

চার. ছিকাহ ও য’ঈফ রাবীগণের জীবন অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাবলী।

পাঁচ. রাবীগণের নাম, উপনাম, উপাধি এবং বিশেষ বিশেষ হাদীছ গ্রন্থের বর্ণনাকারীদের নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। একই ধরনের নাম, উপনাম, রাবীদের চিহ্নিত করার জন্য মিশ্র নামের রাবীদের উপরও গ্রন্থ রচিত হয়। এভাবে রাবীগণের জীবনের সামগ্রিক বিষয় রিজালশাস্ত্রের সংগৃহীত হয়। শুধু রাবীগণের লকব বা উপাধি নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়। এভাবে রাবীগণের নাম, উপনাম, উপাধি, গোত্র, বংশ, জন্ম-মৃত্যু, শিক্ষা, শিক্ষকের নাম, পরিচয় ইত্যাদি সামগ্রিক জীবন-ইতিহাস তন্ন তন্মভাবে সংগৃহীত হয়ে পাঠক-গবেষকদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়।

ছয়. সাধারণ গ্রন্থাবলী: এতে সাহাবী, তাবি’ঈ, তাবি তাবি’ঈ সকল শ্রেণীর বর্ণনাকারীর জীবন চরিত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে এ বিষয় সমূহ অবলম্বনে রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা উপস্থাপিত হলো:

এক. সাহাবাগণের জীবন সংক্রান্ত রচিত গ্রন্থাবলী

এ জাতীয় গ্রন্থসমূহে শুধু সাহাবাগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁদের কে, কবে, কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং কতদিন নবী করীম (সা)-এর সাহচর্য লাভ করেছেন অতঃপর কবে কোথায় ইন্তিকাল করেছেন এবং তাদের নিকট থেকে কে কোথায় হাদীছ শিক্ষা করেছেন এ সব বিষয়গুলো উপস্থাপিত হয়েছে। এ সব তথ্য জানা না থাকলে বর্ণিত হাদীছের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অনেকেই সাহাবাগণের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী নিম্নরূপ,

৪.১ উসদুল গাবাহ্ ফী মারিফতিস্ সাহাবাহ্ (أُسْدُ الْغَابَةِ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ): এটি ইযুদ্দীন ইবনুল আছীর (মৃত ৬৩০ হি.) গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। তিনি এতে পূর্ববর্তী অনেক গ্রন্থের বিষয়বস্তু একত্রিত করেন। তবে তিনি তাঁর পূর্বসূরীগণের অনুসরণ করতে গিয়ে এতে কিছু কিছু আসহাবীর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন এবং তাদের গ্রন্থে সংঘটিত অনেক ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কে অসতর্ক থেকে যান। এ গ্রন্থে ইবনুল আছীর (র) ৭,৫০০ সাহাবীর জীবন চরিত আলোচনা করেছেন। আর মহিলা সাহাবাগণের জীবনালেখ্যের বিবরণ এসেছে স্বতন্ত্র ভাবে।^{৩৭} এ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে অনেকেই এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) ‘তাজরীদু আসমাঈস-সাহাবা’ নামে ‘উসদুল-গাবাহ্’র সংক্ষিপ্ত সংকলন করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ইবনুল আছীর (র) প্রণীত গ্রন্থটি সাহাবীদের জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ। মুহাম্মদ ইবন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া আল-কুদসী আল-হানাফী (র) ‘দুরারুল-আছার ওয়াল গারাবিল আখবার’ এবং মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফায়রী (মৃত ৭০৯ হি.) রচিত সংকলনটি ‘উসদুল-গাবাহ্ ফী মারিফতিস্-সাহাবাহ্’-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।^{৩৮}

৪.২ আল-ইসতী’আব ফী আসমাইল-আসহাব (الإِسْتِيعَابُ فِي أَسْمَاءِ الْأَصْحَابِ)^{৩৯}: এ গ্রন্থটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবাগণের বর্ণনাক্রমিক জীবন চরিত বিষয়ক। ‘আল-ইসতী’আব’ গ্রন্থটির গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। এ গ্রন্থটির সমকক্ষ অন্য কোনো গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া দুস্কর। শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন,^{৪০} كِتَابُ الإِسْتِيعَابِ فِي الصَّحَابَةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِثْلُهُ ‘কিতাবুল-ইসতী’আব ফিস-

সাহাবাহ্' গ্রন্থের ন্যায় অন্য কারও গ্রন্থ নেই।" ইবনুল ইমাদ 'আল-ইসতী'আব' গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,^{৪১} وَجَمَعَ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ كِتَابًا جَلِيلًا مُفِيدًا سَمَّاهُ الْإِسْتِيعَابَ. 'তিনি সাহাবাগণের নাম সম্পর্কিত একটি উপকারি মহাগ্রন্থ রচনা করেন এবং 'আল-ইসতী'আব' নামে নামকরণ করেন'। কার্ল ব্র্যাক্যালম্যান বলেন,^{৪২} كِتَابُ الْإِسْتِيعَابِ فِي مَعْرِفَةِ الْأَصْحَابِ، مُرْتَّبٌ تَرْتِيبًا أَبْجَدِيًّا. 'কিতাবুল ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল-আসহাব গ্রন্থটি আরবী বর্ণমালাক্রম অনুসারে বিন্যস্ত একটি গ্রন্থ'। ইবন আদিল বার (র)-এর 'আল-ইসতী'আব' গ্রন্থটি সাহাবাহ্ চরিত বিষয়ক প্রসিদ্ধ ও মৌলিক গ্রন্থ হওয়ায় এ গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন লেখক-এর 'মুখতাসার' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আল-ইসতিআব (الْإِسْتِيعَابُ) গ্রন্থটি রচনা করেন ইবন আদিল বার আল-কুরতুবী (মৃত ৪৬৩ হি./ ১০৭১ খ্রি.)। আবুল ওয়ালীদ আল-বাযী তাকে পাশ্চাত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ 'হাফিয়ে হাদীছ' বলে আখ্যায়িত করেন। এ গ্রন্থে সকল সাহাবীর নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে অনেক সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে। এ গ্রন্থে তিনহাজার পাঁচশ সাহাবীর জীবনী আলোচিত হয়েছে। ইমাম নববী (র) এ গ্রন্থটিকে একটি ফলপ্রসূ গ্রন্থ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন,

لو لامشاه من ذكر كثير مما شجرين الصغابة وحكايته عن الاخباريين والغالب عليهم الاكثار و التخليط^{৪৩}

ইবন আদিল বার এ গ্রন্থ প্রণয়নে মুসা ইবন উকবা মুহাম্মদ ইবন ইসহাক এবং মুহাম্মদ ইবন উমার আল-ওয়াকিদী থেকে বর্ণিত বিভিন্ন রিওয়ায়াতের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন। এছাড়া ইবন আবী খায়সুমার 'কিতাবুত-তারীখ', ইমাম বুখারীর 'আত-তারীখুল কাবীর', আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম আস-সিরাজ এর 'কিতাবুত তারীখ', ইমাম তাবারীর 'যাইলুল মুয়ায়্যাল', ইমাম দূলাবীর 'কিতাবুল মাওলুদ ওয়াল ওয়াফাত', আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ আল-জারুদী কিতাবুল আহাদ এবং আবু জাফর আল-উকাইলী, ইবন আবী হাতিম আর-রাযী ও ইমাম বাগভীর সাহাবাগণের জীবনী সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন।^{৪৪} ইবন আদিল বার এ গ্রন্থে শুধুমাত্র এমন সাহাবীর জীবনী লেখা থেকে খ্যাত হননি। যার সাহচর্য ও সংসর্গ বিগত প্রমাণিত হয়েছে। বরং যে সমস্ত ব্যক্তি মহানবীর একবার মাত্র সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাদেরও জীবনী তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৩১৮ হিজরীতে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩৫৮ হিজরীতে 'আল-ইসাবা' গ্রন্থের পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়ে মিশর থেকে চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়। কোন কোন মনিষীর দৃষ্টিতে এ গ্রন্থে সকল সাহাবীর জীবনী সন্নিবেশিত না হওয়ায় অনেকেই এ গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। তাদের মধ্যে ইবন ফাতুল্ল (মৃত ৫১৭ হি.) আল-আন্দালুসী আবুল হাজ্জাজ ইউসূফ ইবন মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ (মৃত ৫৫৮ হি.) উল্লেখযোগ্য। জালাল উদ্দীন আস-সুয়ূতী গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে আইনুল ইসাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবাহ্ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।^{৪৫}

আমরা যে সংস্করণটি হাতে পেয়েছি তা 'আল-ইসাবাহ্'-এর পাদটীকায় মুদ্রিত হয়েছে দারুল-ফিকর থেকে তারিখ বিহীন অবস্থায়, যা চার খণ্ডে সমাপ্ত। এটি হায়দারাবাদ থেকে ১৩১৮-১৩১৯ এবং ১৩৩৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। ইবন হাজার-এর 'আল-ইসাবাহ্' পাদটীকায় কায়রো থেকে ১৩২৩-১৩২৭ হিজরীতে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরিশেষে আলী মুহাম্মদ আল-বাজাবীল সম্পাদনায় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কায়রো হতে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৪.৩ তাজরীদু আসমাইস সাহাবাহ (تَجْرِيدُ أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ) : এটি হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হি.) রচনা করেন। এটি মূলত উসদুল গাবাহ গ্রন্থের সার সংক্ষেপ। তিনি এতে উসদুল গাবাহ গ্রন্থের ত্রুটিগুলো দূরীভূত করে কিছু অতিরিক্ত নাম সংযোজন করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম ১৩১০ হিজরীতে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।^{৪৬}

৪.৪ মারিফাতু মান-নাযালাহ মিনাস-সাহাবাতি সায়িরাল বুলদা (مَعْرِفَةُ مَنْ نَزَلَ مِنَ الصَّحَابَةِ سَائِرَ الْبُلْدَانِ) : এটি আলী ইব্ন আদিল্লাহ আল-মাদানী (মৃত ২৩৪ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি চার খণ্ডে সমাপ্ত।^{৪৭}

৪.৫ মারিফাতুস-সাহাবাহ (مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ) : এটি হাফিয ইব্ন মান্দাহ আল-ইস্পাহানী (মৃত ৩৯৫ হি.) রচনা করেন। কথিত আছে যে, তাঁর এ গ্রন্থটি ৪০ খণ্ডেরও উর্ধ্বে তবে ৩৭ ও ৪২ খণ্ড ছাড়া অন্যান্য খণ্ডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ৩৭শ খণ্ডে যে সমস্ত সাহাবী উপনামে পরিচিত কেবলমাত্র তাদেরই জীবনী নামের ক্রমধারানুযায়ী সুবিন্যাস্ত হয়েছে। গ্রন্থকার এ খণ্ডে সাহাবীর নাম ও যিনি তাঁর থেকে রিওয়ায়েত করেছেন তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পাশা-পাশি বর্ণিত রিওয়ায়েতেরও বিশ্লেষণ করেছেন। আবার গ্রন্থকার কোন কোন সময়ে যে সাহাবী যে শহরে অবতরণ করেছেন অথবা কোন সমরভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন তিনি তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি উল্লেখিত সাহাবীর বংশপরিক্রমা সম্পর্কে আলোকপাত করেন নি, একারণেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্নুল আছীর এ গ্রন্থের কঠোর সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন।^{৪৮} আর ৪২ খণ্ডে গ্রন্থকার কেবলমাত্র মহিলা সাহাবীর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।^{৪৯}

৪.৬ মারিফাতুস সাহাবাহ (مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ) : এটি আবু নুআয়ম আল-ইস্পাহানী (মৃত ৪৩০ হি.) রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবাগণের জীবনচরিত আলোচনা করেছেন। ইব্নুল আছীর এ গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, গ্রন্থকার এতে হাদীছ বেশী উল্লেখ করেছেন এবং উল্লেখিত হাদীছের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবীর বংশ পরিচিতি এবং তা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও সংবাদ পরিবেশন দীর্ঘায়িত করেননি।^{৫০}

৪.৭ আল-ইসাবাহ ফী তাম'ঈযিস সাহাবাহ (الإصابة في تمييز الصحابة) : এ গ্রন্থটি হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (মৃত ৮৫২ খ্রি.) রচনা করেন। এটি সাহাবা চরিত বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। আল-ইসতি'আব ও উসদুল গাবাহ গ্রন্থে যেসকল সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এ গ্রন্থটিতে সেগুলোও সন্নিবেশিত হয়েছে। এ জীবনীর সংখ্যা হলো ১২,২৬৭। গ্রন্থটি সাহাবাগণের নামের অক্ষর অনুযায়ী ধারাবাহিকতার সাথে সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে।^{৫১} ইমাম আস-সুয়ুতী (র) (মৃত ১৫০৫ খ্রি./ ৯১১ হি.) 'আইনুল ইসাবাহ' নামে এর সংক্ষেপ করেছেন। এছাড়া ইব্ন সা'দ (র) রচিত 'আত-তাবাকাত' গ্রন্থেও সাহাবাগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটির আরেক নাম 'তাবাকাতুস সাহাবাহ ওয়াত্ তাবি'ঈন'।^{৫২}

এ গ্রন্থটি বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা থেকে ১৮৫৬-৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বৈরুতের 'দারুল-ফিকর' থেকে তারিখ বিহীন অবস্থায় 'আল-ইসতি'আব'-এর হাশিয়াসহ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বৈরুতের 'দারুল-ফিকর' থেকে ১৪২১ হিজরী/২০০১ খ্রিস্টাব্দে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

৪.৮ আর-রিজালুল মুসতাতবাতু ফী জুমলাতিন মান রুবিয়া ফীস সহীহাইন মিনাস-সাহাবাহ (الرِّجَالُ فِي جُمْلَةٍ مِنْ رُؤْيَى فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ) : গ্রন্থটি শায়খ ইয়াহইয়া ইব্ন আবু বকর আল-আমিরী আল-আইনী (মৃত ৮৯৩ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি বর্ণনাকারীর নামের আধ্যক্ষর অনুযায়ী সাজানো। গ্রন্থকার কেবলমাত্র সহীহ বুখারী ও মুসলিমে সনদে বর্ণিত বর্ণনাকারীগণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এরপর ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীছে যে সমস্ত সনদে মুত্তাফিক হয়েছেন সে সনদে অন্তর্ভুক্ত রাবীদের স্বতন্ত্রভাবে জীবনী আলোচনা করেছেন। এরপর উভয় ইমাম যে হাদীছের সনদে মুত্তাফিক তথা ঐক্যমত্য করেননি সে সমস্ত বর্ণনাকারীদের জীবনী আলাদাভাবে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠার সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৯৩। এটি সর্ব প্রথম ১৩০৩ হিজরীতে ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।^{৫৩}

৪.৯ হায়াতুস সাহাবাহ (حَيَاةُ الصَّحَابَةِ) : এটি ভারতের বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্দালুভী (মৃত ১৩৮৩ হি.) প্রণয়ন করেন। রিজাল বিষয়ে এটি একটি অনন্য গ্রন্থ। গ্রন্থকার এতে বিভিন্ন সিরাহ ইতিহাস ও তবাকাত গ্রন্থরাজীতে যে সমস্ত সাহাবীদের জীবন কথা ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী উৎকলিত হয়েছে সেগুলো সুবিন্যস্তভাবে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে এতে সাহাবাগণের দাওয়াত, তরবিয়াত ও বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ঘটনা মর্মস্পর্শী ভাষায় আলোচিত হয়েছে। ফলে এটি ইসলামী দাওয়াত দানকারীদের জন্য এক আদর্শ গ্রন্থ হিসাবে স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সর্বপ্রথম ভারত থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩৮৮ হিজরীতে শায়খ নাইফ আব্বাস ও মুহাম্মদ আরীদৌলাহ সম্পাদনায় দামিস্ক থেকে পুনঃমুদ্রিত হয়।^{৫৪}

৪.১০ দুররুস সাহাবাহ ফী জুমলাতিম মান দাখলা মিসরা মিনাস সাহাবাহ (دُرَرُ الصَّحَابَةِ فِي جُمْلَةٍ مِنْ دُخُلِ مِصْرَ) : এটি শায়খ হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হি.) প্রণয়ন করেন। যে সমস্ত সাহাবী মিশরে পদার্পণ করেন কেবলমাত্র তাদেরই জীবন চরিত আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। কলেবরের দিক থেকে গ্রন্থটি ছোট প্রকৃতির। ১৩২৭ হিজরীতে এটি মিশর থেকে হুসনুল মুহাদ্দারা গ্রন্থের পাদটীকায় সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হয়।^{৫৫}

৪.১১ আসমাউ রিজালিস সহীহিলো বুখারী (أَسْمَاءُ رِجَالِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ) : এটি আবু নাসর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কালাবাজী (মৃত ১০০১ হি.) রচনা করেন। এ গ্রন্থে সহীহ বুখারীর সনদে বর্ণিত রাগীগণের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

৪.২ দুই. রাবীগণের নাম বিষয়ক রচিত গ্রন্থাবলী

হাদীছের সনদের বলিষ্ঠতা ও মতনের বস্তুনিষ্ঠতা নিরূপনের লক্ষ্যে যুগে যুগে হাদীছ বিশারদগণ বর্ণনাকারীদের নাম নিয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন এই গ্রন্থগুলোকে হাদীছের মূলনীতি অভিজ্ঞানের পরিভাষায় আল-মুতালিফ (المُؤْتَلَفُ) এবং আল-মুখতালিফ (المُخْتَلَفُ) বলা হয়।^{৫৬} এর অর্থ হলো লিখন পদ্ধতিতে বর্ণনাকারীদের নামের বানান একই কিন্তু উচ্চারণ বা পঠন পদ্ধতিতে এটি দ্বিবিধ। যেমন: সালাম ও سلام এ দুটি নামের মধ্যে একটির লাম-এ তাখফীফ করে পড়তে হবে এবং দ্বিতীয়টি সালাম অর্থাৎ একটি পঠিত হবে ‘সাল্লাম’ ও অপরটি ‘সালাম’। বর্ণনাকারীর নামে সন্দেহ ও সংশয় দূরীভূত করার জন্যই এ বিষয়ে হাদীছ বিশারদগণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এছাড়া বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ্ম। হাদীছের হাফিয ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই সূক্ষ্ম বিষয় সাধারণের জন্য অনুধাবনযোগ্য নয়। নামের দ্বিবিধ এই উচ্চারণ অনুমানের ভিত্তিতে এর সঠিকতা নির্ণয় করা দুষ্কর বরং স্মৃতিশক্তির বলিষ্ঠতা ও হাদীছ বিষয়ের

পারঙ্গমতার মাধ্যমে এর সঠিকতা নিরূপন করা যেতে পারে। নামের এই জটিলতার কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য যুগ পরম্পরায় হাদীছ বিজ্ঞানীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থরাজী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।^{৫৭}

৪.২.১ কিতাবুল মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ (كِتَابُ الْمُؤْتَلَفِ وَالْمُخْتَلَفِ): এটি ইমাম হাফিয আদ-দারাকুতনী (মৃত ৩৮৫ হি.) রচনা করেন। এটি একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ। আত-তাইমুরিয়াহ লাইব্রেরীতে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে।^{৫৮}

৪.২.২ আল-মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ ফী আসমাই নাকালাতিল হাদীছ (الْمُؤْتَلَفُ وَالْمُخْتَلَفُ فِي أَسْمَاءِ نَقْلِهِ): এটি হাফিয ও কুলজয়ীবেত্তা আব্দুল গণী ইব্ন সাঈদ (মৃত ৪০৯ হি.) রচনা করেন। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬। সর্বপ্রথম ১৩২৬ হিজরীতে এটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়।^{৫৯}

৪.২.৩ তাক'ঈদুল মুহমাল ওয়া তামইয়ুল মুশাক্কাল (تَقْيِيدُ الْمُهِمَلِ وَتَمْيِيزُ الْمُشْكَلِ): এটি শায়খ হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ আল-গাসসানা (মৃত ৪৯৮ হি.) রচনা করেন। ভারতের বিহার প্রদেশে পাটনার খোদাবখশ ওয়ারিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরীতে এর একটি পাণ্ডুলিপি সুরক্ষিত রয়েছে।^{৬০}

৪.২.৪ আল-মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ মিনাল আসমা (الْمُؤْتَلَفُ وَالْمُخْتَلَفُ مِنَ الْأَسْمَاءِ): এটি হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদিসী (মৃত ৫০৭ হি.) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি লায়ডেন থেকে আল-আনসাবুল মুত্তাফাকাহ নামে প্রকাশিত হয়।^{৬১}

৪.২.৫ আল-ইকমাল ফী রফঈল ইরতিয়াব আনীল মুতালাফ ওয়াল মুখতালাফ মিনাল আসমায়ে ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব (الْإِكْمَالُ فِي رَفْعِ الرِّيَاسِ عَنْ الْمُؤْتَلَفِ وَالْمُخْتَلَفِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَنْسَابِ): এটি হাফিয আবুন নসর আলী ইব্ন হিবাতুল্লাহ আল-বাগদাদী (মৃত ৪৮৬ হি.) রচনা করেন। ভারতের হায়দারাবাদের দায়িরাতুল মাআরিফ থেকে আট খণ্ডে প্রকাশিত হয়।^{৬২}

৪.২.৬ আল-মুশতাবাহ ফী আসমাইর রিজাল (الْمُشْتَبِهَةُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ): এটি হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রচিত একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। গ্রন্থটি শামসুদ্দীন আয-যাহাবীর পূর্বসূরী রিজাল শাস্ত্রবিদদের গবেষণার নির্যাস। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সর্বসাকুল্যে ৬১৬। এটি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতের লাইডেন থেকে প্রকাশিত হয়। এর পর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এটি কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়।^{৬৩}

৪.৩ তিন. সিকাহ রাবীগণ সম্পর্কিত রচিত গ্রন্থাবলী

মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অনেকেই শুধু সিকাহ রাবীগণের জীবনী নিয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৪.৩.১ আস-ছিকাত (الْحَقَائِدُ): এটি রচনা করেন আহমাদ ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-ইজলী (র) (মৃত ২৬১ হি./ ৮৭৫ খ্রি.)। আল-কাত্তানী (র) এ গ্রন্থটির নাম 'কিতাবুল জারহ্ ওয়াত-তাদীল' বলে উল্লেখ করেন। ইমাম আয-যাহাবী (র) বলেন, 'এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ।'^{৬৪}

৪.৩.২ কিতাবুস ছিকাত (كِتَابُ الْحَقَائِدِ): এ গ্রন্থটি রচনা করেন, আবু-হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হিব্বান আল-বুস্তী (র) (মৃত ৩৫৪ হি./ ৯৬৫ খ্রি.)। এ গ্রন্থে ঐ সকল রাবীগণের আলোচনা করা হয়েছে যারা 'জারহ্'-এর সাথে পরিচিত নয়। যদিও তারা মাজহুল বা অপরিচিত হয় তাদের অবস্থা জানা না

যায়। তবে উচিত হলো এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া। শুধুমাত্র তার এ গ্রন্থে উল্লেখের দ্বারা কোনো রাবীকে তাঁর তাওহীক (تَوْحِيدُ) করার দ্বারা একথা বুঝা যায় যে, ‘সে রাবী কোনো না কোনো পর্যায়ে একজন সিকাহ’।”^{৬৫}

৪.৩.৩ কিতাবুস ছিকাত (كِتَابُ النَّفَاتِ): হাফিয নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী (র) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি তার এ গ্রন্থেটি তাঁর ওস্তাদ রফীক যায়নুদ্দীন ‘ইরাকী ও তদ্বীযপুত্র আবু যুর’আ-এর পরামর্শক্রমে বিন্যস্ত করেন।

৪.৩.৪ কিতাবুস ছিকাত (كِتَابُ النَّفَاتِ): এটি রচনা করেন শায়খ যায়নুদ্দীন কাসিম ইব্ন কাতলুবুগা আল-হানাতী (মৃত ৮৭৯ হি.) রচনা করেন। তিনি এতে এমন রাবীগণের আলোচনা করেছেন, যাঁদের বর্ণনা সিহাহ সিভাহ্ গ্রন্থে নেই। এটি একটি বড় গ্রন্থ। যা চার খণ্ডে বিভাজ্য।^{৬৬}

৪.৩.৫ কিতাবুস ছিকাত (كِتَابُ النَّفَاتِ): এটি আব্দুর রহমান ইব্ন আবী হাতিম আর-রাযী কর্তৃক রচিত। এটি বৃহদাকারের গ্রন্থ। এর খণ্ড সংখ্যা ছয়টি। তিনি এ গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র)-এর অনুসরণ করেছেন এবং সুন্দরভাবে বিন্যাস করেছেন।^{৬৭}

৪.৩.৬ কিতাবুস ছিকাত (كِتَابُ النَّفَاتِ): এটি রচনা করেন আবু ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব ইব্ন ইসহাক আস-সাদী আল-জুরজানী (র) (মৃত ২৫৯ হি.)।^{৬৮}

৪.৩.৭ আছ-ছিকাহ ও আদ-দুআফা (الضعفاء، النفات): মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত ১৯৪ হি.) ও ইব্ন আবী খায়ছামাহ (র) সর্বপ্রথম (الضعفاء) দুর্বল ও (النفات) ছিকাহ রাবীদের একত্রিত করে গ্রন্থ রচনা করেন। এ দুটি গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান।

এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত আরো কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেগুলোতে হাফিযগণের তাব্বকা বা স্তর বর্ণনা করা হয়েছে। একদল আলিম এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৭ হি.), ইবনুদ-দাব্বাগ (মৃত ৫৪৬ হি.), ইবনুল মুফাদ্দাল এবং ইবন হাজার আল-আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.)। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র)-এর গ্রন্থের উপর একটি সম্পূরক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন জালালুদ্দীন আস-সুয়ুতী (র)। মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-হাশিমী (মৃত ৮৯০ হি.) তাঁর এ গ্রন্থের উপর একটি সম্পূরক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।^{৬৯}

৪.৩.৮ তাব্বাকাতুল হুফফায (طَبَقَاتُ الْخَفَاطِ): এ গ্রন্থের প্রণেতা হলেন, ইব্ন দাব্বাগ (মৃত ৫৪৬ হি.)।

৪.৩.৯ তায়কিরাতুল হুফফায (تَذَكُّرَةُ الْخَفَاطِ): এর রচয়িতা হলেন, শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হি./ ১৩৪৮ খ্রি.)।

৪.৩.১০ তাব্বাকাতুল হুফফায (طَبَقَاتُ الْخَفَاطِ): এ গ্রন্থটির রচয়িতা ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (মৃত ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খ্রি.)।

৪.৪ চার. য’ঈফ রাবীগণ সম্পর্কে সংকলিত গ্রন্থ

কেউ কেউ স্বতন্ত্রভাবে য’ঈফ রাবীগণের ওপর অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ বিষয়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো:

৪.৪.১ কিতাবুয যু'আফা (كِتَابُ الضُّعْفَاءِ): এ গ্রন্থটি রচনা করেন মুহাম্মাদ ইব্ন ইসামঈল আল-বুখারী (র) (মৃত ২৫৬ হি.)।

৪.৪.২ কিতাবুয যু'আফা (كِتَابُ الضُّعْفَاءِ): এ গ্রন্থটির রচয়িতা ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব আস-সাদী আল-জাওয়ানী (র) (মৃত ২৫৯ হি./ ৮৭৩ খ্রি.)।

৪.৪.৩ আয-যু'আফা ওয়াল-মাতরুকীন (الضُّعْفَاءُ وَالْمُتْرُكُونَ): এ গ্রন্থটি রচনা করেন আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) (মৃত ৩০২ হি./ ৯১৪ খ্রি.)।

৪.৪.৪ আয-যু'আফা ওয়াল-মাতরুকীন (الضُّعْفَاءُ وَالْمُتْرُكُونَ): এ গ্রন্থের প্রণেতা আবু উছমান সা'ঈদ ইব্ন আমর আল-আযদী আল-বায়যাঈ (র) (মৃত ২৯২ হি./ ৯০৫ খ্রি.)।

৪.৪.৫ কিতাবুয-যু'আফা (كِتَابُ الضُّعْفَاءِ): এর প্রণেতা আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইব্ন আমর ইব্ন মূসা আল-উকাইলী (র) (মৃত ৩২২ হি./ ৯৩৪ খ্রি.)। এটি অত্যন্ত কল্যাণকর গ্রন্থ।

৪.৪.৬ কিতাবুল কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল (كِتَابُ الْكَامِلِ فِي ضُّعْفَاءِ الرِّجَالِ): এ গ্রন্থটির রচয়িতা আবু আহমাদ আব্দুল্লাহ ইব্ন আদী ইব্ন আব্দিল্লাহ (র) (মৃত ৩৬৫ হি./ ৯৭৫ খ্রি.)। তিনি ইব্ন আদী নামে প্রসিদ্ধ। এটা খুবই নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এর উপরই অধিকতর নির্ভর করেছেন।

৪.৪.৭ কিতাবুয-যু'আফাই ওয়াল-মাতরুকীন (كِتَابُ الضُّعْفَاءِ وَالْمُتْرُكِينَ): এটি রচনা করেন আবুল ফারাজ আব্দির রহমান ইব্ন আলী ইবনুল জাওয়ী (র) (মৃত ৫৯৭ হি.)। গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) এটিকে সংক্ষিপ্ত করণ করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আয-যু'আফা'। হাফিয আলাউদ্দীন মুগলতাই (মৃত ৭৬২ হি.) এর একটি সম্পূরক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।^{৭০} আয-যিরাকলী 'আসমাইয-যু'আফা ওয়াল ওয়ায্ঈদীন' বলে উল্লেখ করেছেন। এর পাণ্ডুরিপি ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

৪.৪.৮ আয-যু'আফা ওয়াল মাতরুকীন (الضُّعْفَاءُ وَالْمُتْرُكِينَ): এর প্রণেতা আলী ইব্ন উছমান ইব্ন ইবরাহীম (র) (মৃত ৬৮৩ হি./ ১২৮৪ খ্রি.)। তিনি ইব্ন তুরকমান নামে পরিচিত।^{৭১}

৪.৪.৯ মীযানুল ইতিদাল (مِيزَانُ الْإِيتِدَالِ): এ গ্রন্থটি শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) (মৃত ৭৭৪ হি.) রচনা করেন। এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এটি সুবিস্তৃত। হাফিয য়ানুদ্দীন আল-ইরাকী (র) দুখণ্ডে এর একটি সম্পূরক গ্রন্থ রচনা করেন। হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র) 'তাহযীবুল-কামাল' এ যে সব রাবীর বর্ণনা পাননি সেগুলো এ গ্রন্থ থেকে চয়ন করেন এবং যে সব রাবীর বর্ণনা যাহাবীর নিকট থেকে বাদ পড়েছে তাদের আলোচনা এবং আরও পূর্ণাঙ্গ জীবনী সমূহ তিনি তাঁর 'লিনাসুল মিয়ান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এ বিষয়ে আরও দুটি গ্রন্থ রয়েছে। একটি تَفْوِيْمُ النَّحْرِ وَالْمِيزَانِ এবং দ্বিতীয়টি تَحْرِيرُ الْمِيزَانِ। উল্লিখিত গ্রন্থগুলো ছাড়াও য'ঈফ রাবীগণ সম্পর্কে রচিত আরও বহুগ্রন্থ রয়েছে।^{৭২}

কিতাবটি সাত খণ্ডে হাযাদারাবাদের 'দাইরাতুল মা'আরিফিন্ নিযামিয়াহ্' ১৩২৯-১৩৩১ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। তারপর বৈরুতের 'মু'আস্সাসাতুল আ'লামী লিল মাতবু'আত' থেকে ১৪০৬

হিজরীতে ছাপানো হয়। এরপর বৈরুতের ‘দারুল ফিকর’ থেকে তারিখ বিহীন অবস্থায় ছাপানো হয় এবং দারুল সাদির থেকেও ছাপানো হয়। তারপর ‘দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্’ থেকে ছাপানো হয় সাত খণ্ডে। এভাবে আরও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

৪.৪.১০ লিসানুল মীযান (لسان الميزان): হাফিযে হাদীছগণ সমালোচিত রাবীগণের নাম সম্পর্কে বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে ইব্ন হাজার আল-আসকালানী মৃত ৮৫২ হি./ ১৪৪৮ খ্রি.) (র) রচিত ‘লিসানুল মীযান’ একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি মূলত হাফিয আয-যাহাবী মীযানুল ই‘তিদাল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। এতে ইলমুল জারহ ওয়াত তাদীল তথা হাদীছের সমালোচিত রাবীগণ সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। এ কিতাবটি হাদীছ বর্ণনাকারীদের থেকে ত্রুটিযুক্ত রাবীদেরকে আলাদা করেছে। এ কিতাবের মূল উৎস হলো হাফিয যাহাবীর প্রসিদ্ধ কিতাব ‘মীযানুল ই‘তিদাল ফী নাকদির রিজাল’ গ্রন্থটি এবং একই সজ্জায়নে ইব্ন হাজার আল-আসকালানী কিতাবটিকে সাজিয়েছেন, সে সাথে আরো কিছু সংযোজন করেছেন। ইমাম ইব্ন হাজার এটিকে বর্ণনাক্রমে সাজিয়েছেন। এতে ত্রুটিযুক্ত রাবীদের নাম, বংশ এবং তাঁদের সম্পর্কে বিদ্বানদের অভিমত উল্লেখপূর্বক জীবনী বর্ণনা করেছেন। একই সাথে হাদীছ বর্ণনাকারী হিসেবে সম্পৃক্ত করে কারী, মুফাস্সির, ফকীহ, উসূলবিদ, ভাষাবিদ, সূফী এবং ইতিহাসবিদদেরকেও উল্লেখ করেছেন।^{৭৩}

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় হলো ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র)-এর লেখার প্রতিবিধান করা, পিছু অনুসরণ করা এবং সংযোজনপূর্বক দুর্বল শ্রেণির রাবীদের জীবনী পেশ করা। গ্রন্থকার কিতাবের সূচনা করেছেন একটি ভূমিকার মাধ্যমে, যাতে তিনি এ কিতাবে যে সংখ্যক রাবীর জীবনী বৃদ্ধি করেছেন তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তারপর গ্রন্থের মূল আলোচনায় প্রবেশ করেছেন। কিছু বিষয় সংযুক্ত করেছেন যা ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র)-এর উল্লেখ করেছেন। যেমন صح و

مجهول শব্দের পরিচয়ে ইমাম যাহাবীর পরিভাষা। আর এটি রচনার সমালোচনা হলো, রাবীদের জীবনী বর্ণনা করে তাদের ত্রুটি উল্লেখ করা হয়েছে আর তাদের ন্যায়পরায়ণতার বিষয়টিতে নিরব থাকা হয়েছে, আরো বলা হয়েছে বিদ‘আত হলো দুই ধরনের, বিদ‘আতী রাবীর সাধারণ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে এবং রাফিযীদের বিশেষ হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর ভূমিকাটি দশটি অধ্যায়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক পণ্ডিত ইব্রাহীম ইব্ন সাইয়েদ আব্বাস হায়দারাবাদী ‘লিসানুল-মীযান’ গ্রন্থের প্রশংসায় বলেন,

وقد صُنّف في هذا الفن كتب كثيرة، ولكن ما جاء الزمان بمثل “لسان الميزان”، الذي ينبيء عن معرفة الرجال بصحة الإتيان، كما لا يخفي على ذوي العرفان بهذا الفن أولي البصائر والإتقان، فإنه كتاب يجلّ عن أن يصفه الواصفون.

“এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হলেও ‘লিসানুল-মীযান’-এর অনুরূপ গ্রন্থ এ যুগে রচিত হয়নি। এটি বিশুদ্ধ ও নৈপুণ্যতার সাথে রিজালে পরিচিতি উপস্থাপন করেছেন, যা এ বিষয়ে সুদক্ষ বিদ্বান পণ্ডিতবর্গের নিকট অস্পষ্ট নয়। এ গ্রন্থটি প্রশংসাকারীর বর্ণনার উর্ধ্বে।”^{৭৪}

গ্রন্থটি সাত খণ্ডে হায়দারাবাদের ‘দাইরাতুল মা‘আরিফিন্ নিযামিয়াহ্’ ১৩২৯-১৩৩১ হিজরীতে প্রকাশিত হয়। বৈরুতের ‘মু‘আসসাসাতুল আ‘লামী লিল মাতব্ব‘আত’ থেকে ১৪০৬ হিজরীতে ছাপানো হয়। এরপর বৈরুতের ‘দারুল ফিকর’ থেকে তারিখ বিহীন অবস্থায় ছাপানো হয় এবং

দারুস্ সাদির থেকেও ছাপানো হয়। তারপর ‘দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্’ থেকে ছাপানো হয় সাত খণ্ডে। এভাবে আরও বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে।

৪.৪.১১ তাকবীমুল লিসান ফি-যু‘আফা (تَقْوِيمُ اللِّسَانِ فِي الضُّعْفَاءِ): গ্রন্থটির রচয়িতা কাসিম ইব্ন কুতলুবগা (র) (মৃত ৮৮৯ হি./ ১৪৮৪ খ্রি.)।

৪.৪.১২ ফুযুলুল লিসান (فُضْلُ اللِّسَانِ): এ গ্রন্থের প্রণেতাও হলেন কাসিম ইব্ন কুতলুবগা (র)।^{৭৫}

৫. (পাঁচ) রাবীগণের নাম, উপনাম ও উপাধি সম্পর্কীয় গ্রন্থাবলী

কোনো কোনো হাদীছ বর্ণনাকারী উপনামে বা উপাধিতে প্রসিদ্ধ না হয়ে তাঁর স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ হন অথবা নামে প্রসিদ্ধ না হয়ে উপনামে বা উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকেন। যে সকল রাবী তাদের উপনামে প্রসিদ্ধ আলিমগণ তাঁদের নামের সাথে তাঁদের কুনিয়াত বা উপনাম উল্লেখ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে যারা নামে প্রসিদ্ধ তাঁদের নামের সাথে উপাধি উল্লেখ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। যাতে একজন রাবী অপর রাবীর সাথে সংমিশ্রিত না হয় এবং এক ব্যক্তির উপাধি অথবা কুনিয়াতকে অপর জনের নাম বলে ধারণা করা না হয়। এতে সিকাহ্ রাবী য‘ঈফ রাবী হিসেবে অথবা সত্যবাদী রাবী বলে মিথ্যাবাদী রাবী হিসেবে গণ্য হবে অথবা এর উল্টোটা হবে।^{৭৬} এ বিষয়ে রচিত উল্লেখযোগ্য গুলো নিম্নরূপ:

৫.১ আল-আসমা ওয়াল কুনা (الْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى): এ গ্রন্থটি আলী ইব্ন আব্দিল্লাহ আল-মাদানী (মৃত ২৩৪ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত।^{৭৭}

৫.২ আল-আসমা ওয়াল কুনা (الْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى): এটি বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হাকিম নায়শাপুরী (মৃত ৩৮৭ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৪ খণ্ডে বিভক্ত। এতে সাহাবাগণের নাম ও কুনিয়াত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হাফিয আয্-যাহাবী গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ত করে সাহাবাগণের নামের অধ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজিয়েছেন এবং এর নাম দিয়েছেন ‘আল-মুকতানা ফী সারদিল উনা’।^{৭৮}

৫.৩ কিতাবুল আসমা ওয়াল আলকাব (كِتَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ): এটি ইবনুল জাওয়াযী (মৃত ৫৯৭ হি.) রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ‘কাশফুন নিকাব আনীল আসমাঈ ওয়াল আলকাব’ নামেও পরিচিত। কিতাবুল কুনা ওয়াল আলকাব (كِتَابُ الْكُنَى وَالْأَلْقَابِ): এটি আবু বকর আহমাদ ইব্ন আব্দির রহমান আল-ফারিসী (মৃত ৪১১ হি.) প্রণয়ন করেন। এটি ১ খণ্ডে সমাপ্ত। তবে এটি তথ্যবহুল ও ফলপ্রদ হওয়ার কারণে বেশ প্রশংসার দাবী রাখে। কোনো কোনো মুহাদ্দিছ মনে করেন যে ইব্ন হাজার আল-আসকালানীর পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে এটি এককভাবে এক অনন্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত ছিল।^{৭৯}

৫.৪ নুযহাতুল আলবাব ফীল আলকাব (نُزْهَةُ الْأَبَابِ فِي الْأَلْقَابِ): এটি হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (মৃত ৮৫২ হি.) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আল-সাকাবী-এর পরিশিষ্ট লেখেন। উত্তরকালে এটি সতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়।^{৮০}

৫.৫ কাশফুন নিকাব আনীল আলকাব (كَشْفُ النَّقَابِ عَنِ الْأَلْقَابِ): গ্রন্থটি হাফিয জালালুদ্দীন আস্-সুয়ুতী (মৃত ৯১১ হি.) রচনা করেন। এটি ফলপ্রদ গ্রন্থ। যে সমস্ত সাহাবীর লকব নিয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে এ গ্রন্থে সে সকল মতাদ্বৈততা ও সংশয়ে নিরসণ করা হয়েছে।^{৮১}

৬ (ছয়) সাধারণ গ্রন্থাবলী

৬.১ তারীখুর রুওয়াত (تَارِيخُ الرُّوَاةِ): এটি ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (মৃত ২৩৩ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থকার এতে হাদীছ বর্ণনাকারীদের জীবনী তাদের নামের ক্রমধারা অনুযায়ী সাজিয়েছেন।^{৮২} ড. আহমদ মুহাম্মাদ নূর সাইফ এ গ্রন্থের নাম তারীখুর রুওয়াতের পরিবর্তে শুধু তারীখ বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থটি ১৩৯৯ হি./১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কাহ উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর সম্পাদনায় চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।^{৮৩}

৬.২ আত্-তাবাকাতুল কুবরা (الطَّبَقَاتُ الْكُبْرَى): এটি মুহাম্মদ ইবন সাদ (মৃত ২৩০ হি.) রচনা করেন। গ্রন্থটি তাবাকাতুল ইবন সাদ নামে প্রসিদ্ধ। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে রচয়িতার সময়কাল পর্যন্ত যারা হাদীছ রচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের জীবন আলোচিত হয়েছে এ গ্রন্থে। ইবন সাদ এ গ্রন্থে ছয়শত জন মহিলাসহ চার হাজার দুইশত পঞ্চাশ জনের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁর পূর্ববর্তী হাদীছবেত্তাদের গ্রন্থাবলী থেকে বিশেষত আল-ওয়াকিদী এবং ইবনুল কালবীর গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। ইবন সা'দ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনী আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থটি সূচনা করেছেন। এর পর স্তরভিত্তিক জীবনী আলোচনা করেছেন। এগুলোতে তিনি আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেন। প্রতিটি অংশে জীবনীগুলোকে সময়ানুক্রম অনুসারে, কখনও কখনও বংশানুক্রমে সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে সাহাবাগণের জীবনী সম্পর্কিত নিবন্ধ গুলো প্রায়ই দীর্ঘতর কিন্তু অন্যান্যদের জীবনী খুবই সংক্ষিপ্ত। এমনকি কোথাও কোথাও শুধুমাত্র নাম লিখা হয়েছে। গ্রন্থটি নয় খণ্ডে বৈরুতের দারুল ফিকহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।^{৮৪}

৬.৩ আত্-তারীখুল কাবীর (التَّارِيخُ الْكَبِيرُ): এটি ইমাম বুখারী (মৃত ২৫৬ হি.) রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে সাহাবাগণের যুগ থেকে শুরু করে তাঁর নিজ যুগ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীছ বর্ণনাকারীর জীবনী আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি 'আত্-তারীখুল আওসাত' এবং 'আত্-তারীখুস সাগীর' নামে আরো দুটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনুল কাসিম 'আস্-সিলাহ' নামে ইমাম বুখারীর 'আত্-তারীখুল কাবীরের' একটি পরিশিষ্ট প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু আস্-সাখাভী ইবন হাজারের এই উদ্ধৃতিতে অস্বীকার করে মন্তব্য করেন যে, 'আস্-সিলাহ' গ্রন্থটি ইবনুল কাসিমের নিজস্ব একটি গ্রন্থ যা তিনি 'কিতাবু-যাহিরের' পরিশিষ্ট হিসেবে লিখেছিলেন। ইমাম আদ-দারাকুতনী এবং ইবন মুহিবুদ্দীন ইমাম বুখারীর 'আত্-তারীখ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট লিখেছেন। এ ছাড়া ইবন আবী হাতিম (মৃত ৩২৭ হি.) ও আল বুখারীর 'আত্-তারীখ' গ্রন্থের উপর আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন।^{৮৫}

৬.৪ তাহযীবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল (تَهْذِيبُ الْكَمَالِ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ): হাফিয আল-মিয্বী (মৃত ৭৪২ হি.) (র) রিজাল শাস্ত্রে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর রচিত 'তাহযীবুল কামাল ফী আসমাইর রিজাল' গ্রন্থটি রিজাল শাস্ত্রে এক মাইল ফলক ও সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক একটি গ্রন্থ। যা পরবর্তী রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে স্থান লাভ করে রয়েছে। এ গ্রন্থটি রচনার কারণেই তিনি রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছেন। এ পর্যন্ত রিজাল শাস্ত্র বিষয়ক যতগুলো গ্রন্থ রচিত হয়েছে তন্মধ্যে এটি বৃহৎ ও তথ্যবহুল গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি রচিত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ের উপর এর চেয়ে উত্তম, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি।^{৮৬} বিশেষত তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) ও আহমাদ ইবন হাজার আল-আসকালানী (র) তাঁরই প্রথ নির্দেশক। তাঁর অনুকরণ, অনুসরণ ও গ্রন্থটি দ্বারা রিজাল শাস্ত্রে গ্রন্থ প্রণয়নে এগিয়ে আসেন। ইবন হাজার আল-আসকালানী (র) 'তাহযীবুল-তাহযীব' গ্রন্থটি মূলত আল-মিয্বী (র)-এর 'তাহযীবুল

কামাল ফী আসমাইর রিজাল' গ্রন্থের সংক্ষিপ্তরূপ। পরবর্তিতে 'তাহযীবুত-তাহযীব' গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত করে 'তাকরীবুত-তাহযীব' নামে আরো একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেন। সফী উদ্দীন আহমাদ ইব্ন আব্দুল্লাহ আল-খায়রাজী (র) (মৃত ৯২৩ হি.) 'খুলাসাতুত-তাহযীবিল কামাল' নামে একটি সুন্দর সংস্করণ রচনা করেছেন।

হাফিয আল-মিযযী (র) রচিত 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থটি বিভিন্ন সংস্থা থেকে বহুবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি লক্ষ্মী হাজার প্রেস থেকে ৪৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত ১২৭২ খ্রিস্টাব্দে দুখণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। দিল্লী থেকে ১৩০৮-১৩২০ খ্রিস্টাব্দে ২৯৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। 'আল-মুগনী' নামে পাটদীকাসহ 'তাকরীবুত-তাহযীব' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন মুহাম্মাদ ইব্ন তাহির আল-বাতনী। দিল্লীর 'হাজার' লাইব্রেরী ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪৮ ছিল। দিল্লী থেকে ১৩২০ হিজরী সালে প্রকাশিত অপর নুসখার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৮। যা ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'আল-মুগনী' 'তাকরীবুত-তাহযীব'-এর অনুকরণে পুনঃপ্রকাশিত হয়। বৈরুতের 'দারুল ফিকর' থেকে ১৪২৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়।

শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) রচিত 'তারীখুল ইসলাম' গ্রন্থটি বিশ (২০) খণ্ডে বিভক্ত।^{৮৭} এ সম্পর্কে ইব্ন হাজার আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হি.) ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান আল-কুনুজী (র) বলেন,

وَجَمَعَ تَارِيخَ الْإِسْلَامِ فَأَرَبَى فِيهِ عَلَى مَنْ تَقَدَّمَهُ بِتَخْرِيرِ أَخْبَارِ الْمُحَدِّثِينَ خُصُوصًا، وَلَعَلَّ «تَارِيخَ الْإِسْلَامِ» فِي زِيَادَةٍ عَلَى عِشْرِينَ مُجَلَّدًا، وَقَفَّتْ مِنْهُ عَلَى أَجْزَاءٍ.^{৮৮}

“তিনি ‘তারীখুল-ইসলাম’ সংকলন করেছেন। বিশেষত তিনি এতে তার পূর্ববর্তী ইতিহাস লেখকদের তুলনায় মুহাদ্দিছগণের আলোচনা অধিক পরিমাণে করেছেন। ‘তারীখুল-ইসলাম’ গ্রন্থটি সম্ভবত বিশ খণ্ডের ওপরে। তন্মধ্যে কয়েকটি খণ্ড সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি।”

হাজী খলীফাহ (র) বলেন,

هو الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد المصري [الدمشقي] المتوفي سنة ست وأربعين وسبعمائة وهو تاريخ كبير في إثني عشر مجلدًا يقال له تاريخ الإسلام على ترتيب السنوات جمع فيه بين الحوادث والوفيات وانتهى إلى الآخر سنة إحدى وأربعين وسبعمائة وقد اصر قبل موته بمدة ثم اختصر منه مختصرات منها العبر وسير النبلاء وطبقات الحفاظ وطبقات القراء وغير ذلك.⁸⁹

“ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-মিসরী [আদ-দিমশকী] মৃত ৭৪৬ হিজরী। তিনি বার (১২) খণ্ডে বিশাল একটি ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম ‘তারীখুল-ইসলাম’। এটি সাল অনুসারে সজ্জিত। এতে ৭৪১ হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন ব্যক্তির মৃত্যু সন ও তারিখ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা তিনি তার মৃত্যুর বেশ কিছু দিন পূর্বে সমাপ্ত করেন। অতঃপর এ গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যেমন, ‘আল-ইবার’, ‘সিয়ারু আ‘লামিন-নুবালা’ ‘তাবাকাতুল-হুফায’, ‘তাবাকাতুল-কুবরা’ ইত্যাদি।”

৬.৫ তারীখুল ইসলাম (تَارِيخُ الْإِسْلَامِ): এটি ইমাম শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র)-এর রচিত বিখ্যাত রিজাল বিষয়ক গ্রন্থ। এটি ১৩৬৭ হিজরী মোতাবেক ১৯৪৬-১৯৪৭ সাল হতে পরবর্তী সময়ে কায়রোতে তাঁর তাবাকাতুল-মাহাশীরের সাথে মুদ্রিত ‘তারীখুল-ইসলাম’ (ইসলামের ইতিহাস)। এ গ্রন্থে নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বংশ-বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে ৭০০ হিজরী মোতাবেক

১৩০০-১৩০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলামের একটি বিস্তারিত ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থখানা সাধারণ বর্ণনা সংঘটিত ঘটনাবলী (আল-হাওয়াদিসুল-কাইনা) এবং বিভিন্ন বছরে মৃত ব্যক্তিদের মৃত্যু সংক্রান্ত বর্ণনায় ইবনুল-জাওয়াযী বিরচিত ‘কিতাবুল-মুনতায়াম’-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। সমগ্র গ্রন্থখানা প্রতি দশক অনুসারে (তাবাকাত) বিভক্ত করে একে মোট ৭০টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি দশকের প্রথমে কতিপয় বছরে বিভক্ত সাধারণ বর্ণনা রয়েছে এবং যে সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব নয় তাঁদের মৃত্যু সংবাদ প্রদান করে সমাপ্ত হয়েছে। সাধারণ বর্ণনার সাথে মৃত্যু সংক্রান্ত বিবরণের বিস্তৃতির অনুপাত গড়ে ১ অনুপাত ৬ বা ৭।

৬.৬ তাবাকাতুল হুফফায়/তায়কিরাতুল হুফফায় (طَبَقَاتُ الْخُفَّاءِ/تَذَكُّرَةُ الْخُفَّاءِ): এটি হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হি.) প্রণয়ন করেন। তিনি এ গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবী, তাবি‘ঈ, তাবি‘তাবি‘ঈ এবং তাদের যুগ থেকে নিজ যুগ পর্যন্ত প্রায় ২১ স্তর পর্যন্ত রাবীগণের জীবনচরিত আলোচনা করেছেন।^{৯০} ইমাম আয-যাহাবী এ গ্রন্থের ভূমিকায় এ গ্রন্থ প্রণয়নে অনুসৃত নীতিমালা উল্লেখ করে বলেন যে,

هذه تذكرة بأسماء معدلي جملة العلم النبوي ومن يرجع الى اجتهادهم في التوثيق والتصحيح والتزييف^{৯১}

“এটি ইলমুন নববীর ধারক ব্যক্তিবর্গের নামের স্মরণিকা এবং এতে ঐ সমস্ত মনীষীদের নাম উল্লিখিত হয়েছে যাঁরা বিশুদ্ধতা ও বিশুদ্ধতা নিরূপণের ক্ষেত্রে সাহাবাগণের ইজতিহাদের প্রতি ধাবিত হয়েছেন।”

এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে তার এ নীতির প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি যে সমস্ত বর্ণনাকারী হাদীছের হাফিযগণ কোন স্তরের পর্যায়ভুক্ত হননি তাদের শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করেছেন কোন জীবনী উল্লেখ করেননি।^{৯২}

এ গ্রন্থটি ১৩৩২-৩৩ হিজরী/১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে হায়দারাবাদ থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এটি একাধিকবার প্রকাশিত হয়। বৈরুতের ‘দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়াহ্’ থেকে তারিখ বিহীন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দে Gottingen-এ F. Wustenfeld কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং সংক্ষিপ্তাকারে ধারাবাহিক খণ্ডটির সংক্ষিপ্তাকারে আস্-সুযুতী (র) কর্তৃক ‘তাবাকাতুল-হুফফায়’ শিরোনামে প্রণীত হয়। আস্-সুযুতীর গ্রন্থটি ১৩৪৭ হিজরী/১৯২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে দিমাশ্ক থেকে প্রকাশিত হয়।^{৯৩} এ গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। যা দুভলিয়মে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।

৬.৭ সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা (سِيرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ): এটিও হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী রচনা করেন। এটি তার রিজাল শাস্ত্রের ওপর একটি অনবদ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি বর্তমান সংস্করণে সর্বমোট ২৮ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনীমূলক। এরপরের খণ্ডটি খুলাফাউর রাশিদুন-এর ওপর রচিত। এরপরের খণ্ডগুলো সাহাবা-ই-কিরাম থেকে শুরু করে তাঁর পূর্ব সময় পর্যন্ত বিশেষ করে রাবী, মুহাদ্দিছ, মুফাস্‌সির, ফকীহ, ঐতিহাসিক, গ্রন্থকার ও মনীষীগণের জীবনালেখ্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটির নামের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কিছুটা মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সালাহ উদ্দীন আস্-সাফাদী এবং দকমান গ্রন্থটিকে ‘তারীখুন নুবালা’ বলে উল্লেখ করেছেন।^{৯৪} তাজজুদ্দীন আস্-সুবকী ‘কিতাবুন নুবালা’, ইবন নাসিরুদ্দীন, ইবন হাজার আল-আসকালানী এবং সাখাবী ‘সিয়ারুন নুবালা’ বলে উল্লেখ করেন।^{৯৫} আবার কেউ কেউ একে ‘আইয়ানুন নুবালা’ বলে উল্লেখ করেছেন।^{৯৬} তবে

তৃতীয় সুলতান আহমাদ-এর লাইব্রেরীতে গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা যে কপিটি (যার নং-২৯১০/অ) সংরক্ষিত ছিল তাতে ‘সিয়ারু আ’লামিন নুবালা’ লেখা ছিল।^{৯৭} সুতরাং ঐতিহাসিকদের নিকট এ নামটিই যথার্থ বলে বিবেচিত হয়েছে।^{৯৮}

আয-যাহাবী গ্রন্থটি তাঁর ‘তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াইতুল মাশাহির ওয়াল আলাম’ গ্রন্থের পর রচনা করেন। দীর্ঘ সাত বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে গ্রন্থকার এর রচনাকর্ম সমাপ্ত করেন। তিনি এ গ্রন্থকে তাবাকাত-এর ধারানুযায়ী সাজিয়েছেন।^{৯৯} তিনি গোটা গ্রন্থকে ৪০টি তাবাকায় বিভক্ত করেন। পরবর্তীকালে মুসলিম লেখকগণ জীবনী গ্রন্থ রচনায় তাঁর এই বিন্যাস পদ্ধতি অনুসরণ করেন।^{১০০}

৬.৮ কিতাবুল ওয়াফী বিল-ওয়াফাইয়াত (كِتَابُ الْوَأْفَى بِالْوَفَايَاتِ): এটি সালাহ উদ্দীন আল-সাফাদী (মৃত ৭৯৩ হি.) প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি রিজাল বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। গ্রন্থকার আস-সাফাদী নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী সাজিয়েছেন যা ত্রিশ খণ্ডে সমাপ্ত। এর সব খণ্ড দুস্তপ্রাপ্য তবে এর কিছু কিছু খণ্ড বিশ্বের পুরাতন লাইব্রেরী গুলোতে পাওয়া যায়। আস-সাফাদী তার সমসাময়িক যুগের রিজাল শাস্ত্রবিদগণের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে ‘আওয়ানুন নুসর ওয়া আয়ানুল ‘আসর’ নামে স্বতন্ত্র আরেকটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।^{১০১}

৬.৯ তাবাকাতুল হুফায (طَبَقَاتُ الْهُفَاظِ): এটি জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হি.) প্রণয়ন করেন। তিনি গ্রন্থটি শামসুদ্দীন আয-যাহাবী ‘তাবাকাত’ গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্ত করে প্রণয়ন করেন। এ ছাড়া আয-যাহাবী পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট রিজাল শাস্ত্রবিদদের জীবনী সংযুক্ত করেন।^{১০২} এ গ্রন্থটি হাদীসের হাফিযগণের জীবন সম্পর্কিত। এ গ্রন্থে স্তর ভিত্তিক হাদীসের হাফিযগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। এতে ২৪টি স্তরে মোট ১১৯০ জন মুহাদ্দিসের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। বিখ্যাত মুহাদ্দিছ ইবন হাজার আল-আসকালানীর (মৃত ৮৫২ হি.) জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শেষ তাবাকাতটি সম্পন্ন হয়েছে। এটি সর্বপ্রথম মুহাম্মদ উমার (মৃত ১৩৯৩ হি.)-এর সম্পাদনায় কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে ১৪১৪ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে বৈরুতের দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

৭. উপসংহার

রিজাল শাস্ত্র হাদীছের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপনে এ শাস্ত্রটির প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিকীয়। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে হাদীছের রাবী কোন স্তরের, তাদের গ্রহণযোগ্যতা, সমালোচনা, ত্রুটি-বিচ্যুতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে রাবীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু সে সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা লাভ করা যায়। বিভিন্ন যুগের মনীষীগণ এ সম্পর্কিত বহু সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন। যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, রিজাল শাস্ত্র হাদীছ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যার মাধ্যমে হাদীছ বর্ণনাকারীর জীবন চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে হাদীছকে ত্রুটিমুক্ত ও জালিয়াতি থেকে রক্ষা করার জন্যই এ শাস্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছিল।

তথ্য নির্দেশ

^১ মাজদুদ্দীন আল-ফীরুযাবাদী, *আল-কামুসুল মুহীত* (বৈরুত: মু’আসাসাতুর রিসালাহ, ৮ম সংস্করণ, ১৪২৬ হি./২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১০০৩।

^২ আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-জুরজানী, *আত-তা’রীফাত* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৪০৩ হি.), পৃ. ১০৯।

- ৩ সম্পাদিত, *আল-মাউসু'আতুল ফিকহিয়াতুল কুয়তিয়্যাহ*, ২২শ খণ্ড (কুয়েত: ওয়ারাতুল আওকাফি ওয়াশ শুয়ুনিল ইসলামিয়াহ, ১৪০৪ হি./১৪২৭ হি.), পৃ. ১১৬।
- ৪ তদেব।
- ৫ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৩৯।
- ৬ আব্দুল হাদী আল-ফাদলী, *উসুলু ইলমির রিজাল* (বৈরুত: মারকাযুল ফারিদ, ২য় সংস্করণ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ১৯।
- ৭ পূর্বোক্ত।
- ৮ মুহাম্মদ ইবন জাফর আল-কাশানী, *আর-রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ* (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ২য় সং., ১৪০০ হি.), পৃ. ৬৯; আব্দুল আযীম আয-যারকানী, *আল-মানহালুল হাদীছ ফী উলুমিল হাদীছ*, পৃ. ১০-১১; ড. সুবহী সালিহ, *উলুমুল-হাদীছ ওয়া মুসতালাহুহ* (বৈরুত: দারুলইলম লিল-মালাইন, ১৫শ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১১০।
- ৯ মুহাম্মাদ সিদ্দীক খান আল-বুখারী, *আবজাদুল উলুম*, ১ম খণ্ড (প্রকাশনার স্থান উল্লেখ নেই: দারুল ইবন হাজ্জম, ১ম সংস্করণ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৩৫৭।
- ১০ নওয়াব সিদ্দীক হাসান আল-কুনুজী, *আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ সিভাহ* (বৈরুত: দারুল-কুতুবিলইলমিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৮৬।
- ১১ তাকিয়ুদ্দিন আন-নদভী, *ইলমু রিজালিল-হাদীছ* (লৌক: মাকতাবাতুল-ফিরদাউস, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৭।
- ১২ মুহাম্মাদ ইবন মাতার আয-যাহরানী, *ইলমুর রিজাল নাশআতুহ ওয়া তাতাউয়ুরুহ* (প্রকাশনার স্থান উল্লেখ নেই: দারুল খুদাইরী, তা.বি.), পৃ. ৫৫।
- ১৩ ড. মুহাম্মাদ আস-সাব্বাগ, *আল-হাদীছুন নববী, মুজালাহুহ, বালাগাতুহ, কুতুবুহ* (আল-মাকতাবুল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৯০।
- ১৪ <https://www.marefa.org>
- ১৫ ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিবৃত্ত* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খ্রি. পৃ. ২৮৪।
- ১৬ ড. আকরাম যিয়া আল-উমরী, *বুহস ফী তারীখিস-সুনাহ আল-মুশাররাফাহ*, আল-মাদীনাতিল-মুনাওয়ারাহ: মাকতাবাতুল উলুম, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হি./১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭।
- ১৭ ড. মুহাম্মাদ শফিকুজ্জাহ, *হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত* (রাজশাহী: মাকতাবাতুশ-শাফিয়া, ১৪২২ হি./২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৩৪।
- ১৮ সূর আল-হুজুরাত: ৪৯: ০৬।
- ১৯ সূরা আল-বাকারাহ: ২: ২৮২।
- ২০ ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৮৮।
- ২১ মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড (মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, বৈরুত: দারুল ইবন হায্ম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৩ হি./২০০২ খ্রি.), বাবু ফী আল্লাল ইসনাদা মিনাদ-দীন, হাদীছ নং ৫, পৃ. ১৪।
- ২২ ইয়াহুইয়া ইবন শারফুদ্দীন আন-নাবাবী, *শারহ সহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড (লাহোর: গোলাম আলী এণ্ড সন্স, ১৩৭৬ হি.), পৃ. ৮৪।
- ২৩ ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দিন, *রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ২৮৯।
- ২৪ আ.ন.ম ইকবাল হোসাইন, “ইলমুর-রিজাল: একটি পর্যালোচনা”, *ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ (পার্ট-এ)*, কুষ্টিয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩ খণ্ড, ২য় সংখ্যা, জুন-২০০৭ খ্রি., পৃ. ২১০।
- ২৫ মুস্তফা আল-আ'যমী, *দিরাসুতুন ফী হাদীছিন নববী* (বৈরুত: তা. বি.) পৃ. ৮২।
- ২৬ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীছ সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৫৭১-৫৭২।
- ২৭ মূল ভাষ্য: There is no nation, nor has there been any which like them has during twelve centuries recorded the life of every man of letters. It the bigographical records of

musalman were collected. We should probably have accounts of the lives of half a million of distinguished persons.

দ্র. আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, *আল-ইসাবাহ্* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, ১৪১৫ হি./১৯৯৫ খ্রি.), আল ইসাবা গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদকের ভূমিকা।

২৮ পূর্বোক্ত।

২৯ শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন নবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

৩০ সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৩০।

৩১ আল-খতীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ* (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪০৬ হি./১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ১১৯; মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুর রহমান আস-সাখাতী, *ফাতহুল মুগীছ*, ৩য় খণ্ড (প্রকাশনা স্থান উল্লেখ বিহীন, দারুল ইমাম আত-তাবারী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি./১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ২৮২-২৮৩।

৩২ *নায়মুল ইকয়ান*, পৃ. ৬।

৩৩ *ফাতহুল মুগীছ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৩।

৩৪ মুহাম্মাদ আস-সাখাতী, *আল-ইলান বিত তাওবীখ লিমান যাম্মাত তারীখ* (দিমাশক: আল-মাকতাবাতুল আছরিয়াহ্, ১৩৪৯ হি.), পৃ. ১৬।

৩৫ *ইলমু রিজালিল হাদীছ*, পৃ. ২৯।

৩৬ *হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৩৪।

৩৭ খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলী, *আল-আলাম*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইলম লিল মালাইন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৩১৩; হাজী খলীফা, *কাশফুয় যুনুন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০২ হি./১৯৮২ খ্রি.), ৮২।

৩৮ *কাশফুয় যুনুন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২; হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি, পৃ. ৮০।

৩৯ এ নামটি ইব্ন হাজার আসকালানীর 'আল-ইসাবাহ্ ফী তামইয়িস-সাহাবাহ্' গ্রন্থে হাশিয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্র. *আল-ইসতি'আব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১; এ নামটি হাজী খলীফাহ্ তাঁর 'কাশফুয়-যুনুন' গ্রন্থেও উল্লেখ করেন।

দ্র. *কাশফুয়-যুনুন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (র) 'সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা' গ্রন্থে *الإِسْتِغَابَ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ* বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আলামিন-নুবালা*, ১৮শ খণ্ড বৈরুত: মুআসাসাতুর রিসালাহ্, ১২শ সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৫৮; তিনি 'তায়কিরাতুল-হুফফায' গ্রন্থে *كِتَابُ الإِسْتِغَابَ فِي الصَّحَابَةِ* বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্র. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তায়কিরাতুল-হুফফায*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ্, তা.বি.), পৃ. ১১২৯; আল-ইয়াফি'ঈ *كِتَابُ الإِسْتِغَابَ فِي أَسْمَاءِ الصَّحَابَةِ* বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্র. আল-ইয়াফি'ঈ, *মির'আতুল-জিনান*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়াহ্, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৬৮; কার্ল ব্রুক্যালম্যান *كِتَابُ الإِسْتِغَابَ فِي مَعْرِفَةِ الْأَصْحَابِ* বলে উল্লেখ করেছেন।

দ্র. কার্ল ব্রুক্যালম্যান, *তারীখুল-আদাবিল আরাবী*, আরবী অনুবাদ: ড. আব্দুল-হালীম আন-নাজ্জার, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরুত: দারুল-মা'আরিফ, ৫ম সংস্করণ, তা. বি.), পৃ. ২৬০।

৪০ *তায়কিরাতুল-হুফফায*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১২৯।

৪১ ইবনুল ইমাদ, *শাযারাতুয-যাহাব*, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল ইহুইয়াইত-তুরাখিল-আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৩১৫।

৪২ *তারীখুল আদাবিল আরাবী*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

৪৩ *আল-ইলান বিত-তাওবীখ*, পৃ. ৬৪।

৪৪ ইবন আব্দিল বার, *আল-ইসতি'আয ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ২০-২৪।

৪৫ *ইলমু রিজালিল হাদীছ*, পৃ. ৬২; ইউসুফ সারকিস, *মুজাম্মুল মাতুআত আল-আবাবিয়াহ ওয়াল-মুওয়াররাবাহ*, ১ম খণ্ড (কুম: মানছুরাত মাকতাবাত আয়াতিলাহ্, তা.বি.), পৃ. ১৫৯।

- ৪৬ ড. মুহাম্মদ জামালুদ্দীন, রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৪৬; ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৬৩।
- ৪৭ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৫৯।
- ৪৮ উসদুল গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।
- ৪৯ বুহসুন ফী তারিখিল সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ, পৃ. ৫০; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৮১-৮২।
- ৫০ ক্রকালম্যান, তারীখুল আদাবিল আরাবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬০।
- ৫১ ইবন হাজার আল-আসকালানী, আল-ইসাবাহ, ১ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ৪।
- ৫২ রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৪৬।
- ৫৩ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৬৫।
- ৫৪ পূর্বোক্ত।
- ৫৫ পূর্বোক্ত।
- ৫৬ আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-খতীব আল-কুসতাল্লানী (র) বলেন,
 الْمُؤْتَلَفُ وَالْمُخْتَلَفُ: هُوَ تَنَفَّقَ صُورَتُهُ خَطًّا وَتَخْتَلَفُ صِفَتُهُ لَفْظًا. وَهُوَ مِمَّا يُفْجَحُ جَهْلُهُ بِأَهْلِ الْحَدِيثِ. وَمِنْهُ فِي الْبَخَارِيِّ الْأَخْنَفُ بِالْخَاءِ الْمَهْمَلَةِ وَالْثَوْنِ وَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَةِ وَالْمُتَنَاءِ التَّحِيَّةِ.
- ড. ইরশাদুস-সারী, আল-মুকাদ্দামাহ্ (বৈরুত: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ২৪।
- ৫৭ হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি, পৃ. ৮৪।
- ৫৮ আল-ইলান বিত-তাওবীখ, পৃ. ১৬১।
- ৫৯ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৮৯।
- ৬০ পূর্বোক্ত।
- ৬১ পূর্বোক্ত।
- ৬২ পূর্বোক্ত।
- ৬৩ পূর্বোক্ত।
- ৬৪ মুহাম্মদ ইবন জাফর আল-কাতানী, আর-রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ (বৈরুত: দারুল-ফিকর, ২য় সং., ১৪০০ হি.), পৃ. ১২১।
- ৬৫ পূর্বোক্ত।
- ৬৬ আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা, পৃ. ১২১; হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৪৫।
- ৬৭ আর-রিসালাতুল মুস্তাতরাফা, পৃ. ১২১।
- ৬৮ পূর্বোক্ত।
- ৬৯ হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৪৫।
- ৭০ পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬।
- ৭১ রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীছের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৪৪৪-৪৪৯।
- ৭২ হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৪৬।
- ৭৩ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৯৬।
- ৭৪ আল-হাফিয ইবন হাজার আল-আসকালানী, পৃ. ৪৪৬।
- ৭৫ হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি, পৃ. ৮৬-৮৭।
- ৭৬ হাদীছ শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৫১।
- ৭৭ আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ, পৃ. ১০১।

-
- ৭৮ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৯৬।
- ৭৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।
- ৮০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।
- ৮১ কাশফুয যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি, পৃ. ৮৭-৮৮।
- ৮২ আর-রিসালাতুল মুসতাতরাফাহ, পৃ. ১০৭।
- ৮৩ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৮৫; হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি, পৃ. ৭৬।
- ৮৪ পূর্বোক্ত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৬।
- ৮৫ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩১।
- ৮৬ মুকাদ্দামাহ তাহযীবিল কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬; ইব্ন শাকির কুতবী, ফাওয়াতুল ওয়াফইয়াত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।
- ৮৭ আল-বাদরুত-তালি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮; মুজাম্মল-মাতবু'আত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১০।
- ৮৮ আদ-দুরারুল-কামিনাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনুজী, আত-তাজ আল-মুকাম্মাল (রিয়াদ: মাকতাবাহ দারুস-সালাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫), পৃ. ৪২০।
- ৮৯ কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪-২৯৫।
- ৯০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬।
- ৯১ তায়কিরাতুল হুফফায়, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।
- ৯২ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৮৬-৮৭।
- ৯৩ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১শ খণ্ড, পৃ. ৫৮৮-৫৮৯।
- ৯৪ আল-ওয়াফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩; তরজুমানুয যামান, পৃ. ৯৮।
- ৯৫ সিয়্যারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।
- ৯৬ আদ-দুরারুল কামিনাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৬; আল-ইলান বিত তাওবীখ, পৃ. ৬৭৪।
- ৯৭ সিয়্যারু আ'লামিন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯১।
- ৯৮ পূর্বোক্ত।
- ৯৯ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।
- ১০০ পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।
- ১০১ ইলমু রিজালিল হাদীছ, পৃ. ৮৮; হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ: প্রকৃতি ও পদ্ধতি, পৃ. ৭৮।
- ১০২ তাবাকাতুল হুফফায়, পৃ. ২।

বিবাদ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা: প্রচলিত ও ইসলামী বিধান

ড. মো. মাসুদ আলম*

Abstract: Dispute settlement is a common and fundamental issue in human society. It is known to all. Every dispute has its own solution. The difference only is the way or method to settle the dispute. Sulh (Mediation) is one of the best and effective methods of dispute resolution. It is a mutual agreement between the conflicting parties so that the dispute is solved amicably. Its purpose is to end conflict among disputants and to establish peaceful relation in society. It has been practiced long time in previous societies as a method of dispute resolution. Therefore, sulh is not a new concept which was introduced in the last century. But it is an ancient idea which is still relevant to our current needs. Lately it is becoming an alternative problem solver in many cases like civil and criminal cases. The strength of sulh is its flexibility and its process of negotiation, mediation or reconciliation. The encouragement to conduct sulh in disputes is evidently clear in Conventional and Islamic laws. This article intends to discuss the concept of sulh, its legality, significance, classification, rules and regulations. By applying descriptive and analytical methods, this research argues that alternative dispute resolution (ADR) is not alien to Islamic Law rather the modern ADR is an inherent part of Islamic ADR.

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধভাবে জীবন যাপন মানব প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। নিজেদের প্রয়োজনেই নানা শ্রেণি পেশার মানুষ আবহমানকাল থেকে সমাজে মিলে মিশে একত্রে বসবাস করে আসছে। সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে এই বিরোধ আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান না হয়ে চলমান থাকলে সমাজে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন ধরনের নিন্দনীয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। ফলে অবনতি ঘটে মানুষের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক সম্পর্কের, বিনষ্ট হয় সামাজিক ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা। এমতাবস্থায় সমাজে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে এগিয়ে আসা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। মানুষের স্বভাবধর্ম ও শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম পারস্পরিক বিরোধ সমাধানে আপোস-মীমাংসাকে আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছে এবং কল্যাণকর ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তেমনিভাবে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাস্তবতার নিরিখে বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি থেকে পরিত্রাণ লাভে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির অন্যতম কার্যকর পন্থা হিসেবে আপোস-মীমাংসার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে আপোস-মীমাংসা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়েছে।

আপোস-মীমাংসা পরিচিতি

আপোস-মীমাংসা একটি বাংলা পরিভাষা। অভিধানে এটির অর্থ বলা হয়েছে বিরোধ, সমস্যা ইত্যাদির সমাধান; জটিলতা, সন্দেহ-সংশয়, অনৈক্য প্রভৃতি দূরীকরণ।^১ আপোস-মীমাংসার ‘আরবী প্রতিশব্দ আস-সুলহ (الصُلْح) যা ইসম বা বিশেষরূপে ব্যবহৃত। এর অর্থ হলো নিরাপত্তা, সংশোধন, সংস্কার, সন্ধি, শান্তি, মিল সাধন, আপোস-মীমাংসা ও বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।^২ ইংরেজিতে আস-সুলহ শব্দের প্রতিশব্দ

* প্রফেসর, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হিসেবে Mediation, Negotiation, Reconciliation, Settlement ইত্যাদির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।^১ আল-কুরআনে আস-সুলহ (الصُّلْحُ) ও সুলহা (صُلْحًا) শব্দ একবার উল্লিখিত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন: যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচারণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন আপোস-মীমাংসা করে নিলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আপোস-মীমাংসাই উত্তম।^২ এছাড়াও আসলাহা (اصْلَحَ) শব্দটি ২৮ বার আল-কুরআনে এসেছে।^৩ তন্মধ্যে একটি হলো সূরাহ আল-হজুরাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন: 'মুমিনদের দু'টি দল পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে আপোস মীমাংসা করে দাও।'^৪ অনুরূপভাবে আল-হাদীসে আস-সুলহ (الصُّلْحُ) শব্দ এবং তা থেকে উদ্ভূত শব্দ দ্বারা অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসের অধিকাংশই আপোস-মীমাংসার বিভিন্ন প্রকার ও বিধানের আলোচনা স্থান পেয়েছে। অতএব শাস্তিক অর্থে কোন বিবাদের নিষ্পত্তিকে আস-সুলহ বা আপোস-মীমাংসা বলে। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, وَالصُّلْحُ يَخْتَصُّ بِإِزَالَةِ النَّفَارِ بَيْنَ النَّاسِ. 'আস-সুলহ শব্দটি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ঝগড়া-বিবাদ অপসারণের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত।'^৫ আপোস-মীমাংসার পরিচয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদানের প্রয়াস লক্ষণীয়। বিভিন্নজন এটিকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তবে সহজভাবে বলতে গেলে আপোস-মীমাংসা এমন একটি চুক্তিকে বুঝায় যা বাদী-বিবাদীর বিবাদের অবসান ঘটায়। বিখ্যাত আইন বিশ্বকোষ আল-মাউসু'আতুল ফিকহিয়াহ আল-ইসলামিয়াহতে আপোস-মীমাংসার পরিচয়ে বলা হয়েছে, وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَعْقَدَةٍ يَرْتَفِعُ بِهَا النِّزَاعُ بَيْنَ الْخُصُومِ ، وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْمَوَافَقَةِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ. 'বিবাদমান ব্যক্তিদের বিরোধ নিরসন করে তাদের মধ্যে মিল সাধন ও শান্তি স্থাপনে পারস্পরিক সম্পাদিত চুক্তিকে বলা হয় আপোস-মীমাংসা।'^৬

Encyclopaedia of Islam-এ সুলহ বা আপোস-মীমাংসার পরিচয়ে বলা হয়েছে- In Islamic Law Sulh is a form of contract that is legally binding on both the individual and community levels. 'ইসলামী আইনে সুলহ এমন এক ধরনের চুক্তি, যা ব্যক্তি ও সামষ্টিক পর্যায়ে প্রতিপালন করা আইনগতভাবে অপরিহার্য।'^৭ সুলহ বা আপোস-মীমাংসার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- Sulh is an agreement to settle a dispute with consent of the disputants, which will be concluded as a contract with offer and acceptance. 'সুলহ হলো বিবাদমান পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য চুক্তি যা প্রস্তাব ও গ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত হবে।'^৮

আপোস-মীমাংসার আইনগত ভিত্তি

বিরোধ বা দ্বন্দ্ব মানবিক ও সামাজিক সম্পর্কের একটি স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজে বসবাসরত মানুষদের মধ্যকার পারস্পরিক বিরোধ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও শত্রুতাকে মিত্রতায় রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে এবং বাদী-বিবাদীর বিদ্বেষ ও আক্রোশের অবসান ঘটিয়ে তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আপোস-মীমাংসা করা বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত আইনে এবং ইসলামী আইনে বৈধ ও আইনসিদ্ধ। আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘকাল থেকে আপোস-মীমাংসার বিধান রয়েছে। সালিশ, গ্রাম আদালত ও মুসলিম পারিবারিক আইনে পূর্বেই এই বিধানের প্রচলন ছিল। ১৯৪০ সালে আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬৯ সালে শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রথম এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এরপর মধ্যস্থতা ও সালিশের মাধ্যমে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধনী) আইনে ৮৯(ক) ও ৮৯(খ) দু'টি ধারা সংযোজিত হওয়ায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।^৯ আইনি প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক ব্যয় ও মানসিক চাপ কমানোর ক্ষেত্রে আপোস-মীমাংসা ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এটি দৃশ্যমান যে আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে এবং আদালতের প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ না করেও সন্তুষ্টিসহ সমাধান

সম্ভব। এ কারণে আপোস-মীমাংসা বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে আপোস-মীমাংসার জন্য বিভিন্ন আইনে প্রণীত বিধানগুলোর বর্ণনা নিম্নের সারণীতে প্রদত্ত হলো-^{১২}

ক্রমিক নং	প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহ	ধারা	নিষ্পত্তিকারী ব্যক্তি
১.	কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর (সংশোধন) আইন-১৯০৮	ধারা-৮৯ক, ৮৯খ, ৮৯গ	আদালত স্বয়ং অথবা মিডিয়েটর দ্বারা
২.	অর্থস্বর্ণ আদালত আইন-২০০৩	ধারা-২২, ২৩, ২৪, ২৫	আদালত স্বয়ং অথবা মিডিয়েটর দ্বারা
৩.	পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫	ধারা-১০(৩), ১০(৪), ১৩	আদালতের মাধ্যমে
৪.	গ্রাম আদালত আইন ২০০৬	ধারা-৬ (খ)	স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি এবং উভয় পক্ষের নিযুক্ত প্রতিনিধি দ্বারা
৫.	কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর ১৮৯৮	ধারা-৩৪৫	চার্টে উল্লিখিত আপোসযোগ্য অপরাধসমূহ
৬.	সালিশি আইন, ২০০১	ধারা-২২	চার্টে উল্লিখিত আপোসযোগ্য অপরাধসমূহ

ইসলামী আইনের প্রধান উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা^{১৩} দ্বারা আপোস-মীমাংসার বৈধতা প্রমাণিত। আল-কুরআনুল কারীমে আপোস-মীমাংসাকে শুধু বৈধই বলা হয়নি; বরং কল্যাণকর কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.

‘যদি কোন নারী স্বীয় স্বামীর পক্ষ থেকে অসদাচরণ কিংবা উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন আপোস-মীমাংসা করে নিলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আপোস-মীমাংসাই উত্তম।’^{১৪} অন্য একটি আয়াতে মহান আল্লাহ বিবাদমান দুই দলের মধ্যে আপোস-মীমাংসার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِنَاوَا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

‘মুমিনদের দু’টি দল পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দাও, অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে আপোস-মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।’^{১৫} মহান আল্লাহ আরো বলেন:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.

‘তাদের অধিকাংশ পরামর্শে কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান সাদাকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে অচিরেই আমরা তাকে মহা পুরস্কার প্রদান করবো।’^{১৫}

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যে তিনটি কল্যাণকর কাজের কথা বলেছেন তন্মধ্যে একটি হলো আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার অনুমোদিত পন্থায় দু’জন শত্রু কিংবা বিবাদমান দু’জন ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করে, যাতে তারা উভয়ে পরস্পর বন্ধুত্ব ও একতার প্রতি ফিরে আসে। আল্লাহ তা‘আলাও তাই নির্দেশ করেছেন। তারপর যে এ কাজ করবে তার জন্য আল্লাহ তা‘আলা মহা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।^{১৬} উপর্যুক্ত আয়াত ব্যতীত আরো অনেক আয়াতে পারস্পরিক আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।^{১৭}

এছাড়া বহুসংখ্যক হাদীসে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ আল-জামি‘ আস-সহীহতে কিতাবুস সুল্হ নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ১৪টি অনুচ্ছেদে মোট ৩১টি হাদীস মারফু‘ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।^{১৮} এতদ্ব্যতীত সিহাহ সিভাহর অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ যেমন সহীহ মুসলিম, সুনানুত তিরমিযী, সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু ইবন মাজাহসহ ইমাম আহমদ এর মুসনাদ গ্রন্থে আপোস-মীমাংসা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো ‘আমর ইবন ‘আওফ (রা.) তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا أَوْ أَهْلًا حَرَامًا.

‘একমাত্র যে আপোস হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালালে পরিণত করে, তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে সম্পাদিত সকল প্রকার আপোস-মীমাংসা বৈধ।’^{১৯}

উপর্যুক্ত হাদীসটি আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকেও ভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে।^{২০} বিধায় হাদীসটি বিভিন্ন রিওয়াযাতে বর্ণিত হওয়ায় তা হাসান অথবা আস-সহীহ লি গায়রিহি মর্যাদায় ভূষিত। ইমাম তিরমিযী (রহ.) হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন এবং নাসিরুদ্দীন আলবানী আস-সহীহ লি গায়রিহি বলে অভিহিত করেছেন।^{২১} উদ্ধৃত হাদীসটির বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে লোকদেরকে তাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) কখনও কলহ-বিবাদের খবর অবগত হলে নিজে তা আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করতেন এবং অন্যদেরকেও আপোস-মীমাংসার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। একবার কুবার অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই খবর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট পৌঁছলে তিনি সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়ে তা মীমাংসা করে দেন। এ প্রসঙ্গে সাহল ইবন সা‘দ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْجِجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحْ بَيْنَهُمْ.

‘কুবার অধিবাসীরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এমনকি তারা পরস্পর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকল। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে খবর দেয়া হলে তিনি বললেন: চলো যাই, আমরা তাদের মধ্যে আপোস-

মীমাংসা করে দেই।^{২২} অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার উৎসাহ প্রদান করেছেন। হাদীসটি হলো-

عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ : أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى تِجَارَةٍ قَالَ : بَلَى قَالَ : تَسْعَى فِي صَلَاحِ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.

‘আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু আইয়ুব (রা.)-কে বললেন: আমি কি তোমাকে একটি ব্যবসার কথা বলে দিব না? তিনি (আবু আইয়ুব রা.) বললেন হ্যাঁ আপনি বলে দিন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: লোকেরা যখন বিবাদে লিপ্ত হবে তখন তুমি তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেয়ার চেষ্টা করবে, যখন তারা পরস্পর এক অন্যের থেকে দূরে সরে যাবে তখন তুমি তাদেরকে একত্রিত করে দিবে।^{২৩} আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مَنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنْ فَسَدَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

‘আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করবো না? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন, পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হলো দীন বিনাশ হওয়া।’ আবু ‘ঈসা বলেন, এই হাদীসটি সহীহ। নাবী (সা.) হতে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: এটা মুগুন করে দেয়। আমি বলছি না যে তা মাথা মুড়িয়ে দেয়, বরং তা দীনকে মুগুন করে দেয় (বিনাশ করে)।^{২৪}

আপোস-মীমাংসার আইনগত বৈধতার স্বপক্ষে ‘উমার (রা.) এর থেকে বর্ণিত একটি আছারকে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ‘উমার (রা.) বলেন: رُتُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا فَإِنْ فَضَّلَ الْقَضَاءُ يُورَثُ ‘তোমরা বাদী-বিবাদীকে ফিরিয়ে দাও, যাতে তারা নিজেরাই আপোস-মীমাংসা করতে পারে। কেননা বিচারকের মীমাংসা তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম দেয়।^{২৫}

বিবাদ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত পোষণ করেছেন। যদিও এর কিছু কিছু দিকের বৈধতার ব্যাপারে আইনবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।^{২৬} আপোস-মীমাংসার যৌক্তিকতা: দ্বন্দ্ব-সংঘাত মানব জীবনে ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করে। অনেক সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরস্পর যে বিরোধ দেখা দেয় তা দ্রুত মীমাংসা না করলে মারাত্মক রূপ লাভের সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও বিচারকের ফয়সালা বাদী-বিবাদীর মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের জন্ম দেয়। এজন্যই ইসলাম দ্বন্দ্ব-সংঘাত রোধ ও বিবাদমান ব্যক্তিদের মধ্যে মিল সাধনের মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে আপোস-মীমাংসাকে বিধিবদ্ধ করেছে।^{২৭}

আপোস-মীমাংসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

বিবাদ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রচলিত ও ইসলামী আইনে আপোস-মীমাংসার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনে সাধারণ অপরাধ আপোস-মীমাংসা করার বিধান রয়েছে। তারপরও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, মামলার জট কমানো ও ব্যয়ভার লাঘব করার নিমিত্তে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির পরিসর বৃদ্ধির জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করে সরকার সেসব বিষয় যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। যার ফলে আপোস-মীমাংসার গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার দেয়া পরিসংখ্যানকে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের দেয়া তথ্যানুযায়ী ৫ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা লিগ্যাল এইড অফিসে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩৪ হাজার ৩৭৩ জন। এর মধ্যে ১ জানুয়ারী ২০২০

থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এ সংস্থা ৯১৬৬টি আপোস-মীমাংসার মধ্যস্থতা করেছে।^{২৮} সুবিদাভোগীর এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমানভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি সাফল্যের বিষয়।

ইসলামে আপোস-মীমাংসা একটি কল্যাণকর পন্থা ও স্বতন্ত্র ‘ইবাদাত হিসেবে স্বীকৃত। মহান আল্লাহ এটিকে উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন।^{২৯} বিবাদে লিপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে যারা আপোস-মীমাংসা করে দিবে তাদের জন্য আল-কুরআন ও হাদীসে ঘোষিত হয়েছে উচ্চ মর্যাদা, আল্লাহর রহমত ও পুরস্কার লাভের ঘোষণা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন: তাদের অধিকাংশ পরামর্শে কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান সাদাকাহ, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের; আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে আমরা অবশ্যই তাকে মহা পুরস্কার প্রদান করবো।^{৩০} অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ আরো বলেন: নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।^{৩১}

এই আয়াতে দু’জন মুমিন বিবাদে লিপ্ত হলে অন্যদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়ার নির্দেশ প্রদানের সাথে আল্লাহকে ভয় করার এবং রহমত প্রাপ্তির কথা বলা হয়েছে। এখান থেকে আপোস-মীমাংসার অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধির পাশাপাশি আরো অনুধাবন করা যায় যে, পারস্পরিক বিবাদ আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরণের আঘাত। পক্ষান্তরে মীমাংসা হলো রহমত, যার প্রতিশ্রুতি আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবাদ মীমাংসাকারীদের জন্য উত্তম মর্যাদা ঘোষণা করে বলেন: ‘আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সাদাকার চেয়ে উত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করবো না? তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন হ্যাঁ বলুন। তিনি বললেন: পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার অর্থ হলো দীন বিনাশ হওয়া।^{৩২} সমাজে বসবাসরত ব্যক্তিদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা না করে নিজেদের মধ্যে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ লালন করে সম্পর্কের অবনতি ঘটানো একজন প্রকৃত মুমিনের কাজ নয়। এই প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: প্রত্যেক সপ্তাহে দু’বার সোম ও বৃহস্পতিবার সব মানুষের ‘আমল আল্লাহ তা‘আলার দরবারে পেশ করা হয়। তখন সকল মুমিন ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়; তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যে তার কোন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা বজায় রাখে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, যাতে তারা আপোস-মীমাংসা করে নিতে পারে, সেজন্য তাদের সুযোগ দেয়া হয়।^{৩৩}

অপর একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বিবাদ নিরসনের লক্ষ্যে পারস্পরিক আপোস-মীমাংসার সময় প্রয়োজনে যৎসামান্য এদিক সেদিক করে কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। উম্মে কুলসুম বিনতে ‘উকবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন: মানুষের মধ্যে আপোস-মীমাংসার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ভাল কথা বলে বা এদিক সেদিকে করে কথা বলে সে মিথ্যাবাদী নয়।^{৩৪} একটা সাধারণ তর্ক-বিতর্ক যখন ঝগড়া-বিবাদে রূপ নেয় তখন যেকোন একজনের উচিত নিজের থেকে সংযত হওয়া এবং ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে স্বীয় দাবি থেকে কিছুটা সরে আসা। ন্যায়বাদী হয়েও কেউ বিবাদ পরিহার করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে বিবাদ পরিহারকারীকে সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর থাকা সত্ত্বেও বিবাদ পরিহার করে, তার জন্য জান্নাতের মাঝে একটি ঘর তৈরি করা হবে।^{৩৫} অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার এবং তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করার গুরুত্ব সম্পর্কিত একটি হাদীস আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: মানুষের হাতের প্রতিটি জোড়ার জন্য তার ওপর সাদাকা রয়েছে। সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিদিন (প্রত্যহ) মানুষের মধ্যে সুবিচার করাও সাদাকা।^{৩৬}

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে বিবাদমান ব্যক্তিদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেয়া সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এছাড়াও বিবাদ মীমাংসাকারীদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াব ও পুরস্কার অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ।

আপোস-মীমাংসার প্রকার ও বিধান

জীবন চলার পথে দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিবাদ ও বিরোধের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সৃষ্ট বিরোধ নিরসনের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও কার্যকর পন্থা হলো আপোস-মীমাংসা। ইসলাম ও প্রচলিত আইনের বিধানুযায়ী কোন বিষয়ে আপোস-মীমাংসা সম্পন্ন হলে বাদী-বিবাদী উভয়ের জন্য তা মেনে নেয়া অপরিহার্য কর্তব্য। যেসব বিষয় আপোস-মীমাংসা করা যেতে পারে এবং তার বিধান ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো। কল্যাণকর জীবন ব্যবস্থা ইসলামে সাধারণত সকল প্রকার বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসার সুযোগ রয়েছে। তবে যে আপোস-মীমাংসা হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালালে পরিণত করে তা অবৈধ। ইসলামী আইনের গ্রন্থসমূহে আপোস-মীমাংসার প্রকার ও তার বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেখানে থেকে আপোস-মীমাংসার পাঁচটি প্রকার বা ক্ষেত্রকে নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন ১. দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা, ২. ন্যায়পন্থি ও বিদ্রোহীদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা, ৩. মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা, ৪. আর্থিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা, ৫. আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা।^{৭৭} নিম্নে সেগুলো দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো-

১. দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা (الصلح بين الزوجين عند خوف الشقاق):

দাম্পত্য জীবন মানবপ্রকৃতির এক স্বভাবসম্মত চিরন্তন ও শাস্থত বিধান। নারী-পুরুষের বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমেই এর সূচনা। সুখী, সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ দাম্পত্য জীবন সকলেরই কাম্য। স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক দাম্পত্য জীবনকে পরিণত করে অনাবিল সুখ ও শান্তির নীড়ে। তেমনি দুজনের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-কলহ, পারস্পরিক মনোমালিন্য ও সাংসারিক তিক্ততায় সুখী জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ ও অশান্তির দাবানলে দগ্ধ। এই জটিল পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধান যথাসময়ে না হলে পারিবারিক বিবাদ থেকে গোত্র ও বংশগত বিবাদ ও হানাহানিতে রূপ লাভ করতে পারে। এজন্য ইসলাম নর-নারীর যাবতীয় অনুভূতি ও প্রেরণার প্রতি লক্ষ্য রেখে উভয় পক্ষকে আপোস-মীমাংসার ন্যায় কার্যকর ও বাস্তবসম্মত পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে, যার অনুসরণে পারস্পরিক মান-অভিমান ও বিবাদ-বিসম্বাদ রূপান্তরিত হয় ভালবাসায় ও প্রশান্তিতে এবং পারিবারিক জীবন হয় সুখী ও সমৃদ্ধ। দাম্পত্য বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ উপেক্ষার আশংকা করে, তবে পরস্পর কোন আপোস-মীমাংসা করে নিলে তাদের কোন অপরাধ নেই। আপোস-মীমাংসাই উত্তম।^{৭৮}

উপর্যুক্ত আয়াতের নাযিল সম্পর্কে 'আয়িশা (রা.) বলেন, এই আয়াতের লক্ষ্য হলো যে কেউ তার স্ত্রীর মধ্যে বার্ষক্য বা অপসন্দনীয় কিছু দেখতে পেয়ে তাকে ত্যাগ করতে মনস্থ করে আর স্ত্রী এই বলে অনুরোধ করে যে, তুমি আমাকে তোমার নিকট রাখ এবং তোমার যতটুকু ইচ্ছা আমার প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ কর। 'আয়িশা (রা.) বলেন, উভয়ে সম্মত হয়ে আপোস-মীমাংসা করলে এতে দোষের কিছু নেই।^{৭৯}

ইবন 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন সাওদা বিনতে যামআ' (রা.) যখন খুবই বৃদ্ধা হয়ে যান এবং আশংকা করলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে তালাক দিবেন। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন

আপনি আমাকে তালাক না দিয়ে আপনার বিবাহ বন্ধনে স্থির রাখুন। আমার জন্য নির্ধারিত দিনটি আপনি ‘আয়িশার (রা.)’ নিকটই থাকুন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাই করলেন। এই প্রসঙ্গেই অবতীর্ণ হয় তবে তারা (স্বামী-স্ত্রী) পরস্পর কোন আপোস-মীমাংসা করতে চাইলে তাদের উভয়ের কোন অপরাধ নেই এবং আপোস-মীমাংসাই উত্তম। (আন-নিসা:১২৮) ইবন ‘আব্বাস (রা.) বলেন স্বামী-স্ত্রী কোন বিষয়ের ওপর আপোস করলে তা বৈধ।^{৪০} অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا।

‘তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।’^{৪১}

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন মনোমালিন্য বা বিবাদ-বিসমাদ দেখা দিলে তা আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা বৈধ ও শারী‘আহ সম্মত।

২. ন্যায়পন্থি ও বিদ্রোহীদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা (الصلح بين أهل العدل وأهل البغي)

মানব জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা হলো ইসলাম। সমাজের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও নিবিড় বন্ধন তৈরিতে ইসলাম অত্যন্ত তৎপর। এটি এমন এক ঈমানী সম্পর্ক যা রক্ত, বর্ণ, ভাষা, দেশ ও অন্যান্য মানবিক সম্পর্কের চাইতে অধিক শক্তিশালী। এই সম্পর্কের দাবি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ়, অবিচ্ছিন্ন ও অকৃত্রিম বন্ধনে আবদ্ধ করা। মুসলমানদের এই ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় সম্পর্ককে দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এমন যে কোন অপতৎপরতা ইসলামে নিষিদ্ধ। এরপরও মুমিনগণ পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে অনতিবিলম্বে বিবাদমান পক্ষের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেয়া দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের অপরিহার্য কর্তব্য ও ঈমানী দায়িত্ব। যদি একপক্ষ অপর পক্ষের ওপর বাড়াবাড়ি করে এবং মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণের পরও তাতে সাড়া না দেয় তাহলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যতক্ষণ না তারা ন্যায়ের পথে এবং সামাজিক শৃংখলার মধ্যে ফিরে আসে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفَاتِنَا إِلَىٰ تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

‘মুমিনদের দু’টি দল পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দাও, অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে আপোস-মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন।’^{৪২}

এই আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন একবার রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ‘আব্দুল্লাহ ইবন উবাই এর নিকট যেতে অনুরোধ করা হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) গাধার পিঠে আরোহণ করে বেরিয়ে পড়লেন। মুসলমানগণ তাঁর সাথে হেটে চললো। আর সে পথ ছিল কংকরময়। অতঃপর যখন নাবী করীম (সা.) তার নিকট পৌঁছলো সে বললো, সরো আমার সামনে থেকে। তোমার গাধার দুর্গন্ধ আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তাঁদের মধ্য থেকে একজন আনসারী বললো আল্লাহর কসম রাসূলুল্লাহ (সা.) এর গাধা সুগন্ধে তোমার চেয়ে উত্তম। ‘আব্দুল্লাহ ইবন উবাই এর গোত্রের এক ব্যক্তি রেগে উঠল এবং উভয়ে একে অপরকে গালাগালি করলো। এভাবে উভয় পক্ষের সঙ্গী-

সাথীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এবং উভয় দলের সাথে খেজুর ডাল, হাতাহাতি ও জুতা মারামারি হলো। আমাদের জানানো হয়েছে যে, এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াতটি নাযিল হলো মুমিনদের দু'দল সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দিবে।^{৪০} ইমাম বাগাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) তা পাঠ করে শুনালেন। সাথে সাথে মুসলমানরা তাদের পরস্পরিক বিরোধ আপোস-মীমাংসা করে নিল এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই থেকে বিরত হলো।^{৪১}

মুমিনদের বিবাদমান দু'দলের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার দৃষ্টান্ত হিসেবে হাসান ইবন 'আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ঘটনাকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যা ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর হাদীস গ্রন্থে সংকলন করেছেন। হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন আল্লাহর কসম হাসান ইবন 'আলী (রা.) পর্বত সদৃশ সেনাদল নিয়ে মু'আবিয়া (রা.) এর মুখোমুখি হলেন। 'আমর ইবন 'আস (রা.) বললেন আমি এমন সেনাদল দেখতে পাচ্ছি যারা প্রতিপক্ষকে হত্যা না করে ফিরে যাবে না। মু'আবিয়া (রা.) তখন বললেন, আল্লাহর কসম! উভয়ের মধ্যে মু'আবিয়া (রা.) ছিলেন উত্তম ব্যক্তি। হে 'আমর! এরা ওদের এবং ওরা এদের হত্যা করলে আমি কাকে দিয়ে লোকের সমস্যার সমাধান করব? তাদের নারীদের কে তত্ত্বাবধান করবে? তাদের দুর্বল ও শিশুদের কে রক্ষণাবেক্ষণ করবে? তারপর তিনি কুরাইশদের বানু 'আবদে শামস শাখার দু'জন 'আব্দুর রহমান ইবন সামুরাহ ও 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) কে হাসান (রা.) এর নিকট পাঠালেন। তিনি তাদের বললেন তোমরা উভয়ে এই লোকটির কাছে যাও এবং তাঁর কাছে আপোস-মীমাংসার প্রস্তাব পেশ কর, তাঁর সঙ্গে আলোচনার পর তাঁর মতামত জানার চেষ্টা করবে। তারা তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁর সাথে কথা বললেন, আলাপ-আলোচনা করলেন এবং তাঁর মতামত জানলেন। হাসান ইবন 'আলী (রা.) তাদের বললেন, আমরা 'আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, এই সম্পদ (বায়তুল মালের) আমরা পেয়েছি। আর এরা রক্তপাতে লিপ্ত হয়েছে। তারা উভয়ে বললেন মু'আবিয়া (রা.) আপনার কাছে এরূপ বক্তব্য পেশ করেছেন এবং আপনার বক্তব্যও জানতে চেয়েছেন ও আপোস-মীমাংসা কামনা করেছেন। তিনি বললেন এর দায়িত্ব কে নিবে? তারা বললেন আমরা আপনার জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি। এরপর তিনি তাদের কাছে যেসব প্রশ্ন করলেন তারা তার জবাবে বললেন আমরা এ দায়িত্ব নিচ্ছি। তারপর তিনি তার সাথে সন্ধি স্থাপন করলেন। হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন, অবশ্যই আমি আবু বাকরাহ (রা.)-কে এই কথা বলতে শুনেছি যে, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিস্বারে খুৎবা প্রদান করতে দেখলাম এবং তাঁর পাশে ছিলেন হাসান ইবন 'আলী (রা.)। রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার সমবেত লোকদের দিকে তাকাচ্ছেন আর একবার তাঁর দিকে তাকাচ্ছেন এবং বললেন আমার এই ছেলে সে নেতা হবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন।^{৪২}

৩. মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা (الصلح بين المسلمين والكفار)

ইসলাম শান্তি ও কল্যাণকর জীবন বিধান। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামের কাম্য। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপোস-মীমাংসার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলাম ও মুসলমানের উপকার সাধনে কিংবা অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাথে আপোস ও সমঝোতায় উপনীত হওয়া বা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। এমনকি যুদ্ধাবস্থায় আপোস-মীমাংসার প্রস্তাব আসলে তা প্রতিপালনের নির্দেশ আল-কুরআনে এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে ও আল্লাহর প্রতি ভরসা করবে। তিনিই সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'^{৪৩}

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও আল-খুলাফাউর রাশিদুন বিভিন্ন সময় অমুসলিম জাতি-সম্প্রদায়ের সাথে আপোস-মীমাংসার ভিত্তিতে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যেমন ৬ষ্ঠ হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ (সা.) হুদায়বিয়ায় মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি চুক্তি করেছিলেন এবং দশ বছরের জন্য তাদের সাথে যুদ্ধবিরতি ও সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন। সে চুক্তিটি রক্তপাত বন্ধে ও শান্তির অন্বেষণে সম্পাদিত হয়েছিল। বারা ইবন ‘আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী করীম (সা.) হুদায়বিয়ার দিন মুশরিকদের সঙ্গে তিনটি বিষয়ে সন্ধি করেছিলেন।^{৪৭}

৪. আর্থিক বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা (الصلح بين المتخاصمين في غير مال)

আর্থিক বিষয় বহির্ভূত বিরোধ বলতে ফৌজদারি অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন মানুষের জীবন, সম্পদ, বিবেক-বুদ্ধি, মান-সম্মান, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সংঘটিত পারস্পরিক বিরোধ। প্রচলিত আইনে ব্যক্তি অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার ব্যতীত যেকোন অপরাধ ফৌজদারি মামলার অন্তর্ভুক্ত। অন্য দিকে ইসলামী আইনে ফৌজদারি অপরাধ হৃদ, কিসাস ও তা‘যীর এই তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। এর মধ্যে হৃদ ও কিসাস পর্যায়ে অপরাধের শাস্তি আল-কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। হৃদ ও কিসাস বহির্ভূত সকল অপরাধই তা‘যীরের অন্তর্ভুক্ত। তা‘যীরী অপরাধের শাস্তি ইসলামী শারী‘আহ নির্ধারণ না করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করেছে। ইসলামী আইনে হৃদ, কিসাস, দিয়াত ও তা‘যীর পর্যায়ে নির্দিষ্ট কিছু অপরাধে বিশেষ করে ব্যক্তি অধিকার লংঘনজনিত অপরাধে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তির সুযোগ রয়েছে। ফৌজদারী সংক্রান্ত বিবাদ সমাধানে আপোস-মীমাংসার অনুশীলন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময়কালে লক্ষ্য করা যায় এবং এর বৈধতার প্রমাণ রয়েছে আল-কুরআনে। যেমন মহান আল্লাহ বিবাদমান দুই দলের মধ্যে আপোস-মীমাংসার নির্দেশ দিয়ে বলেন:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

‘মুমিনদের দু’টি দল পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দাও, অতঃপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে তবে তাদের মধ্যে ন্যায়ের ভিত্তিতে আপোস-মীমাংসা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে।’^{৪৮}

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) ফৌজদারি অপরাধে লিপ্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেয়ার অনেক প্রমাণ রয়েছে। যেমন সাহল ইবন সা‘দ (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে,

أَنَّ أَهْلَ قُبَاءٍ اقْتَتَلُوا حَتَّىٰ تَرَامُوا بِالْجَارَةِ فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ أَذْهَبُوا بِنَا نَصْلِحْ بَيْنَهُمْ .

‘কুবার অধিবাসীরা পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। এমনকি তারা পরস্পর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকল। এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)কে খবর দেয়া হলে তিনি বললেন: চলো যাই, আমরা তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দেই।’^{৪৯}

অপর একটি হাদীসে চুরির ন্যায় ফৌজদারি অপরাধেও আপোস-মীমাংসা করা যে বৈধ, তার নির্দেশনা পাওয়া যায়। সাফওয়ান ইবন উমাইয়্যা (রা.) বলেন: আমি মসজিদে আমার একটি চাদর বিছিয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম। সেই চাদর চুরি হয়ে গেলো। আমরা চোরকে ধরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বললাম মাত্র ত্রিশ দিরহাম মূল্যের একটা চাদরের জন্য আপনি তার হাত কাটবেন? ওটা আমি তাকে দান করলাম বা তার নিকট বিক্রয় করলাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তুমি এই কাজটি ওকে আমার কাছে নিয়ে আসার আগে করলে না কেন? ^{৫০}

উপর্যুক্ত হাদীসটি ইঙ্গিত করে যে, অভিযোগকারী অভিযুক্ত চোরকে বিচারকের নিকট নিয়ে আসার পূর্বে উভয়ে পারস্পরিক মীমাংসা করে নিতে পারত। অতএব এই হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, বিশেষ কিছু ফৌজদারী অপরাধে আপোস-মীমাংসা হতে পারে। তবে ইসলামী আইনবিদগণ হুদুদ পর্যায়ের অপরাধে বাদী-বিবাদীর মধ্যে আপোস-মীমাংসা করার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। তাদের মতবিরোধের মূল কারণ হলো আল্লাহর অধিকার ও মানুষের অধিকার জনিত বিষয়কে কেন্দ্র করে।

৫. আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপোস-মীমাংসা (الصلح بين المتخاصمين في الأموال)

জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি ও সহায় সম্পদ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হয় তাকে আর্থিক বিরোধ বলে। আর আইনের পরিভাষায় তা দেওয়ানী অপরাধ হিসেবে অভিহিত। দেওয়ানী মামলায় আপোস-মীমাংসা বহুল প্রচলিত। ইসলামী আইনের গ্রন্থসমূহে কিতাবুস সুলহ এর অধীনে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে আর্থিক বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আপোস-মীমাংসাকে স্বীকারোক্তি, অস্বীকৃতি ও মৌনতার ভিত্তিতে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করে পৃথক পৃথক বিধান উপস্থাপিত হয়েছে। ^{৫১}

স্বীকারোক্তি ভিত্তিক মীমাংসা: কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট তার দেয়া ঋণ বা অন্য কোন পাওনা দাবি করলো। যার কাছে দাবি করলো সে তা মেনে নিলো। এরপর উভয়ে পাওনা আংশিক পরিশোধের ভিত্তিতে আপোস করলো। এই ধরনের আপোস-মীমাংসাকে সকল আইনবিদ বৈধ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ^{৫২} এর সমর্থনে তারা কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। কা'ব (রা.) মসজিদে নাব্বীতে ইবন আবী হাদরাদের নিকট তার পাওনা দাবি করলেন। এই নিয়ে উভয়ের মধ্যে উচ্চস্বরে কথা কাটাকাটি হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের ঘরে বসে তা শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে বের হয়ে তাদের নিকট এগিয়ে ডেকে বললেন: হে কা'ব! উত্তরে কা'ব বললেন আল্লাহর রাসূল আমি হাজির। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তোমার ঋণের অর্ধেক মওকুফ করো। কা'ব বললেন আল্লাহর রাসূল আমি মওকুফ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আবী হাদরাদকে বললেন: ওঠ, পরিশোধ করো। ^{৫৩}

এই হাদীসটি স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আপোস-মীমাংসা বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

অস্বীকৃতি ভিত্তিক মীমাংসা: কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কোন পাওনা দাবি করলে সে দাবিকৃত জিনিস অস্বীকার করবে, এরপর উভয়ে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধের সমাধান করবে।

মৌনতা জনিত মীমাংসা: মৌনতা জনিত আপোস হলো এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কোন পাওনা দাবি করলে বিবাদী চুপ থাকবে, স্বীকারও করবে না আবার অস্বীকারও করবে না।

অস্বীকৃতি ও মৌনতা ভিত্তিক আপোস-মীমাংসাকে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলীসহ অধিকাংশ আইনবিদ বৈধ বলে মত দিয়েছেন। ^{৫৪} তবে ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) এর মতানুযায়ী কেবলমাত্র স্বীকারোক্তি ভিত্তিক আপোস ব্যতীত অন্য কোন প্রকার আপোস বৈধ নয়। ^{৫৫} কেননা আপোসের দাবি হলো একটি প্রতিষ্ঠিত হক বিদ্যমান

থাকা। অথচ অস্বীকৃতি ও মৌনতার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। যেখানে বিবাদী দাবি অস্বীকার করে সেখানে হক প্রতিষ্ঠিতই হয় না। কেননা হক প্রতিষ্ঠিত হয় দাবি দ্বারা। অথচ অস্বীকৃতি দাবিকে খণ্ডন করে। দাবি খণ্ডনের কারণে হক প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে মৌনতা জনিত আপোস বৈধ নয় এজন্য যে, নীরবতা অবলম্বনকারীকে কার্যত অস্বীকারকারী বিবেচনা করা হয়, যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবাদের দাবির জন্য যে কোন পক্ষের অর্থ ব্যয় অবৈধ। কেননা দাবি বাতিল। তাই এখানে অর্থ ব্যয় ঘুষের সমার্থক।^{৫৬} وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ। ‘তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না।’^{৫৭}

আর যারা অস্বীকৃতি ও মৌনতা ভিত্তিক আপোস-মীমাংসাকে বৈধ বলে মত দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের মতের স্বপক্ষে আল-কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস ও যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করে উক্ত বৈধতাকে সাব্যস্তকরণের প্রয়াস চালিয়েছেন। আল-কুরআন থেকে তাঁদের দলীল হলো: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: ‘আপোস-মীমাংসাই উত্তম।’^{৫৮} অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ সকল প্রকার আপোস-মীমাংসাকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। আর এটা জানা কথা যে, বাতিলকে কখনো উত্তম বলে অভিহিত করা যায় না। সুতরাং আয়াতের বাহ্যিক দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, প্রত্যেক প্রকার আপোস-মীমাংসা বৈধ। তবে যা কোন দলীল দ্বারা বিশেষভাবে অবৈধ ঘোষিত হয়েছে সেটি ভিন্ন বিষয়।^{৫৯} অধিকাংশ আইনবিদদের ২য় দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا। ‘একমাত্র যে আপোস হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালালে পরিণত করে, তা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে সম্পাদিত সকল প্রকার আপোস-মীমাংসা বৈধ।’^{৬০} উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাপকতা অস্বীকৃতি ও মৌনতা ভিত্তিক আপোস-মীমাংসা বৈধতার সুস্পষ্ট প্রমাণ নির্দেশ করে।

অস্বীকৃতি ও মৌনতা ভিত্তিক আপোস-মীমাংসাকে যারা বৈধ বলে মত দিয়েছেন তাদের যৌক্তিক প্রমাণ হলো আপোস-মীমাংসা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পারস্পরিক বিবাদ ও দ্বন্দের অবসান ঘটানোর নিমিত্তে। আর কেউ কোন কিছু অস্বীকার করলেই তা আপোসের প্রয়োজনীয়তা অরো বেশি দেখা দেয়। এছাড়াও এটা বাদীর পক্ষ থেকে তার নায্য পাওনা মেটানোর ব্যবস্থা। অন্যদিকে বিবাদীর পক্ষ থেকে তার কসম খাওয়ার বদলা ও বিবাদ নিষ্পত্তির পদক্ষেপ হিসেবে যৌক্তিকভাবে তা বৈধতার দাবি রাখে।^{৬১} অস্বীকৃতি ও মৌনতা ভিত্তিক আপোস-মীমাংসার বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারে উভয় পক্ষের মতামতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বলা হয়ে থাকে যে, বাদী যদি সুনিশ্চিতভাবে জানে প্রতিপক্ষের নিকট তার নায্য পাওনা রয়েছে। তাহলে যে জিনিসের ওপর আপোস-মীমাংসা হয়েছে তা গ্রহণ করা তার জন্য বৈধ, যদিও তার প্রতিপক্ষ তা অস্বীকার করে। আর যদি সে অন্যায় দাবি করে তাহলে দাবি পেশ করা এবং যে জিনিসের ওপর আপোস-মীমাংসা হয়েছে তা হস্তগত করা তার জন্য অবৈধ। পক্ষান্তরে বিবাদীর নিকট যদি তার নিশ্চিতভাবে জানা হক থেকে থাকে, অথচ সে কোন স্বার্থের কারণে বা অসৎ উদ্দেশ্যে তা অস্বীকার করে থাকে, তাহলে মীমাংসিত জিনিস হস্তান্তর করা তার কর্তব্য। আর যদি সে জানে তার কাছে কারো কোন হক পাওনা নেই, তাহলে তার দাবীদারের সাথে তার দ্বন্দ্ব ও ক্ষতিকর অনিশ্চিন্তা থেকে বাঁচার জন্য তার অর্থ-সম্পদের একাংশ তাকে প্রদান করা বৈধ। তবে তার দাবিদারের পক্ষে তা গ্রহণ করা অবৈধ।^{৬২}

আদালতের আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব সমাধানের গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে আপোস-মীমাংসা বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মামলার জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারকল্পে দেশের আইন ও বিচার বিভাগ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধিমালা প্রণয়ন করে তা

দেশের প্রচলিত আইনগুলোর মধ্যে সংযুক্ত করেছে। সেসব প্রাসঙ্গিক বিধান, ধারা ও নিষ্পত্তিকারী ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১. কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর, ১৯০৮

কোড অফ সিভিল প্রসিডিউর (ঈডুফব ডুড পরারষ ঢুডুপবফৎব), ১৯০৮-এর ধারা ৮৯ক, ৮৯খ, ৮৯গ আপোস নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধানাবলি ২০০৩ সালের সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে। লিখিত জবাব দাখিলের পরে আদালত শুনানি মূলতবি রেখে আপোসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্তে স্বয়ং সচেষ্ট হবে অথবা বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য পক্ষদের নিযুক্তিয় আইনজীবীদের নিকট প্রেরণ করবে অথবা জেলা জজ কর্তৃক আপোস-মীমাংসার (গবফরধঃরডুহ) আদেশের দশ দিনের মধ্যে পক্ষগণ লিখিতভাবে মিডিয়েশন পদ্ধতির অগ্রগতি সম্পর্কে আদালতকে অবহিত করবে এবং ষাট দিনের মধ্যে আপোস-মীমাংসার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। যদি উক্ত কার্যক্রম ষাট দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত ত্রিশ দিন বর্ধিত করা যাবে। আপোসে বিরোধটি নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হলে মিডিয়েটর উভয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত শর্তাবলি উল্লেখপূর্বক একটি চুক্তি প্রস্তুত করবেন এবং পক্ষগণ, তাদের নিযুক্তিয় আইনজীবীগণ ও মিডিয়েটর উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন এবং উক্ত চুক্তি আদালতে দাখিল করবেন এবং আদালত সাত দিনের মধ্যে উক্ত চুক্তির আলোকে ডিক্রি প্রদান করবে। বিচারক নিজে আপোস-মীমাংসা করে থাকলেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। আপোস-মীমাংসা প্রক্রিয়া কোন কারণে ব্যর্থ হলে মামলার কার্যক্রম পরবর্তী ধাপ হতে চলমান থাকবে। কোন মামলার আপিল চলাকালীন ৮৯গ ধারার অধীনে আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি সম্ভব।^{৬৩}

২. অর্থস্বর্ণ আদালত আইন, ২০০৩

আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণ পুনরুদ্ধারের জন্য এবং দেনা ও পাওনাদারের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশে অর্থস্বর্ণ আদালত আইন, ২০০৩ এর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আগে স্বর্ণ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত মামলাগুলো দেওয়ানি আদালতের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। সম্প্রতি অর্থস্বর্ণ আদালত আইন ২০০৩, ১৬ নং আইন দ্বারা সংশোধন করা হয়েছে, যা অর্থস্বর্ণ আদালত (সংশোধন) আইন ২০১০ নামে পরিচিত। সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তি সম্পর্কিত ধারাগুলো হলো যথাক্রমে-২২, ২৩ ও ২৫। এতে বলা হয়েছে যে, লিখিত জবাব দাখিলের পর আদালত বিরোধীয় বিষয়টি পক্ষদ্বয়ের নিকট অথবা তাদের নিযুক্তিয় আইনজীবীদের নিকট আপোস-মীমাংসার জন্য প্রেরণ করবে। আপোস-মীমাংসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার পর উভয় পক্ষ ও তাদের নিযুক্তিয় আইনজীবী এবং মিডিয়েটর কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করতে হবে। বিরোধটি আপোসে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে প্রতিবেদনের শর্তাবলি একটি লিখিত চুক্তির আকারে আদালতে দাখিল করলে আদালত উক্ত চুক্তির আলোকে ডিক্রি প্রদান করবে।^{৬৪}

৩. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

এটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যের আইনগত সমস্যার বিচার নিষ্পত্তি সম্পর্কিত অধ্যাদেশ। ১৯৮৫ সালে এই অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এই আইন বলে দেশের সকল মুসলিম আদালত পারিবারিক আদালত হিসেবে গণ্য হবে এবং মুসলিমগণ এ আদালতের বিচারক হবেন। পারিবারিক আদালত মূলত বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য সম্পর্ক পুনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণপোষণ ও অভিভাবকত্ব এই পাঁচটি বিষয়ে বিচারকার্য সম্পন্ন করে থাকে। এই অধ্যাদেশের ধারা-১০ এ পারিবারিক আদালতে প্রথমে বিচার শুরু হওয়ার আগে একবার এবং রায় ঘোষণার পূর্বে দ্বিতীয়বার আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। লিখিত জবাব দাখিলের পর পারিবারিক আদালত মামলার পূর্ব শুনানীর জন্য দিন ধার্য করবে। পূর্ব শুনানীর জন্য

ধার্য দিনে আদালত উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধটি আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তির চেষ্টা করবে এতে উভয়পক্ষ সম্মত থাকলে কার্ট্রিজ কাগজে নিষ্পত্তির বিষয়ে বিভিন্ন শর্ত লিখে তাদের আইনজীবীরা স্বাক্ষর দিয়ে আদালতে জমা দিবেন। আদালতে জমা দেওয়ার পর নিজেরা আদালতে জবানবন্দি দিয়ে বলেন যে তারা আপোস করে নিয়েছেন। আদালত তখন এ আপোসনামাকে রায়ের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন। একবার আদালতে আপোসের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে তার বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না।^{৬৫}

৪. গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬

গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ মূলত বাংলাদেশের গ্রাম এলাকার বিরোধ এবং বেআইনী কার্যক্রম সমাধানের জন্য প্রণীত। এই আইন ২০০৬ সাল থেকেই উপযুক্তভাবে কার্যরত রয়েছে এবং বাংলাদেশের বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যে কোন প্রকার দেওয়ানি বা অপরাধমূলক বিরোধ যদি এই আইনের আওতায় আসে, তবে তা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে। গ্রাম আদালতটি পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট হতে হবে, যাদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান হবেন, যিনি গ্রাম আদালতের সভাপতিত্ব করবেন এবং প্রতিটি দল দুজন সদস্য নির্বাচন করবে, যাদের মধ্য থেকে একজন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হবেন। গ্রাম আদালত গঠিত হবার পর উভয় পক্ষকে শুনানী অন্তে আদালত উভয় পক্ষের মধ্যকার বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করে তাদের মধ্যকার বিরোধ আপোস-মীমাংসার চেষ্টা করবে। আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হলে তা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করে উভয় পক্ষ এবং তাদের মনোনীত সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে। অতঃপর গ্রাম আদালত তদানুযায়ী ডিক্রি বা আদেশ প্রদান করবে।^{৬৬}

৫. কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮

কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিউর (ঈডুফব ড়ত পত্ৰসরহধষ ঢ়ড়পবফঁৎব), ১৮৯৮ তে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কোন বিধান নেই। তবে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৫৪ ধারায় সীমিত আকারে আপোস-মীমাংসার বিধান রাখা হয়েছে। উক্ত ধারা অনুসারে মারাত্মক নয় এমন অপরাধ দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করা যাবে। এই অপরাধগুলো অত্যন্ত তুচ্ছ প্রকৃতির যেমন মারামারি, বাসগৃহে চুরি, মানহানি ইত্যাদি। এ আইনে সাজা কম হতে পারে এমন ৬৪টি ধারার কথা উল্লেখ রয়েছে। তবে বাংলাদেশের বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে সরকার আপোস-মীমাংসার বিধান রেখে নতুন করে ফৌজদারি আইনের আরো ২০টি ধারা এবং অন্য সাতটি আইনের বিভিন্ন ধারা যুক্ত করার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধনীর খসড়া প্রণয়ন করেছে।^{৬৭}

৬. সালিশ আইন, ২০০১

সালিশ আইন, ২০০১ এর ২২ ধারায় আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ প্রদান করেছে। উক্ত আইন অনুযায়ী আপোসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্তে মামলার যে কোন পর্যায়ে উভয় পক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে বিরোধটি মধ্যস্থতার জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। বিরোধ চলমান থাকাকালে উভয় পক্ষ বিরোধটি নিষ্পত্তি করলে এবং ট্রাইব্যুনালকে উক্ত বিষয় অবহিত করলে উক্ত সম্মতি রেকর্ডপূর্বক আদেশ প্রদান করবে।^{৬৮}

উপসংহার

আপোস-মীমাংসা বিবাদ নিষ্পত্তির একটি সহজতর ও কল্যাণকর প্রক্রিয়া হিসেবে প্রচলিত ও ইসলামী আইনে স্বীকৃত। যা বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত। আপোস-মীমাংসা আমাদের সমাজে নতুন কোন বিষয় নয়। আদালতের পাশাপাশি বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন সমাজ ও সভ্যতায় চলমান। এটি মামলারত ব্যক্তিদের

মধ্যে ব্যাপক প্রতাশা ও আশার সঞ্চর করেছে। কেননা আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে একটি বিরোধ দ্রুততম সময়ে, কম খরচে ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে আপোস-মীমাংসার অন্তর্ভুক্তকরণ সকলের জন্য বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মোচন করেছে নব দিগন্তের। শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা ইসলাম বিরোধ অবসানে আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে আপোস-মীমাংসা করার নির্দেশনার পাশাপাশি ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করেছে। কেননা প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় আদালতের রায়ের পরও বিরোধ থেকে যায় এবং সুযোগ পেলেই একে অন্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। অথচ আপোসে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে আজীবনের জন্য নিষ্পত্তি হয়ে যায়। আমাদের উচিত মামলা-মোকদ্দমার বামেলা পরিহার করে বিবাদের সূচনাতাই যে কোন ধরনের বিরোধ আপোস-মীমাংসার মাধ্যমে সমাধান করা এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করা। এটি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকলের জন্যই কল্যাণকর।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ডক্টর এনামুল হক, *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৪ খ্রি.), পৃ.১১০; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০০০ খ্রি.), পৃ.৭৩-৫৮০।
- ^২ ইবন মানযূর, *লিসানুল 'আরব*, ৫ম খণ্ড (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০০৩ খ্রি.), পৃ.৩৭৪; ড. ইবরাহীম মাদকুর্ ও অন্যান্য, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত* (দেওবন্দ: কুতুবখানা হুসাইনিয়াহ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ.৫২০; আল-ফায়ূমী, *আল-মিসবাহ আল-মুনীর*, ১ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ.১৮০; সাদী আবু জীব, *আল-কামুসুল ফিকহী* (করাচী: ইদারাতুল কুরআন ওয়াল 'উলূমিল ইসলামিয়াহ, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২১৫; আবুল ফযল 'আব্দুল হাফিয বালয়াবী, *মিসবাহুল লুগাত*, অনুবাদ: মাওলানা আহমদ করিম সিদ্দীক (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৫২১।
- ^৩ J. Milton Cowan, *A Dictionary of Modern written Arabic* (New York: Spoken Language Services Inc., 1976), p. 522.
- ^৪ আল-কুরআন, সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১২৮।
- ^৫ মুহাম্মাদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকী, *আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম* (কায়রো: দারুল হাদীস ১৪২২ হি./ ২০০১ খ্রি.), পৃ.৫০৮।
- ^৬ আল-কুরআন, সূরাহ আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯।
- ^৭ ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী, *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*, (কায়রো: আল-মাকতাবাতুশ তাওফিকিয়াহ, তা.বি.), পৃ.২৮৯।
- ^৮ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড (কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুনিল ইসলামী, ১৪০৪-১৪২৭ হি.), পৃ. ৩২৩।
- ^৯ <https://reference.works.brillonline.com>.
- ^{১০} <https://www.umlawreview.com>.
- ^{১১} Sk Golam Mahabub, *Alternative Dispute Resolution in Commercial Disputes: The UK and Bangladesh perspectives* (Dhaka: Sk Golam Mahbub, 2005), p-16.
- ^{১২} <http://bdlaws.minlaw.gov.bd>; <http://www.judiciary.org.bd/en/mediation-corner>.
- ^{১৩} আল-কুরআন, সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১২৮।
- ^{১৪} আল-কুরআন, সূরাহ আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯-১০।
- ^{১৫} আল-কুরআন, সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১১৪।
- ^{১৬} আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী, *জামি'উল বায়ান ফি তা'বীলিল কুরআন*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪২০ হি./ ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ.২৭৫-২৭৬।
- ^{১৭} আল-কুরআন, সূরাহ আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮২; সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ৩৫; সূরাহ আল-আনফাল, আয়াত: ৮; সূরাহ আল-হুজুরাত, আয়াত: ১০।

- ৩৬ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সুলহ, বাব-ফাদলুল ইসলাম বাইনান নাস ওয়াল 'আদলু বাইনাহুম, হা-২৭০৭, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০০।
- ৩৭ ইবন হাজার, *ফাতহুল বারী*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪১০ হি.), পৃ. ৩৭৩; আশ-শারবীনী, *মুগনীউল মুহতাজ ইলা মা'রিফাতি আলফাযিল মিনহাজ*, ৮ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৮; আল-বাহুতী, *শারহ মুনতাহাল ইরাদা*, ৫ম খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৩১৪; আস-সানা'আনী, *সুবুলুস সালাম ফি বুলুগিল মারাম*, ৩য় খণ্ড (মাকতাবাতু মুত্তাফা আল-বাব আল-হালাবী, ১৩৭৯ হি./ ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৫৯; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩২৬;
- ৩৮ আল-কুরআন, সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১২৮।
- ৩৯ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সুলহ, বাব-কওলুল্লাহি তা'আলা : আই ইয়াসসালাহা বাইনাহুমা সুলহান ওয়াস সুলহু খায়রুন (আন-নিসা-১২৮), হা-২৬৯৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৭।
- ৪০ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, কিতাব তাফসীরুল কুরআন 'আন রাসূলিল্লাহ, বাব- ওয়া মিন সূরাতিন নিসা, হা-৩০৪০, পৃ. ৫৪৮; ইবন কাসীর, *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩২।
- ৪১ আল-কুরআন, সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ৩৫।
- ৪২ আল-কুরআন, সূরাহ আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯।
- ৪৩ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সুলহ, বাব-মা জাআ ফিল ইসলাম বাইনান নাস ইয়া তাফাসাদু, হা-২৬৯১, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৬।
- ৪৪ আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবন মাস'উদ আল-বাগাবী, *মা'আলিমুত তানযীল ফী তাফসীরিল কুরআন*, ৫ম খণ্ড (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪২২ হি./ ২০০২ খ্রি.), পৃ. ১২৪।
- ৪৫ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সুলহ, বাব-কওলুন নাবী লিল হাসান ইবন 'আলী (রা.), হা-২৭০৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৯।
- ৪৬ আল-কুরআন, সূরাহ আল-আনফাল, আয়াত: ৬১।
- ৪৭ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সুলহ, বাব-আস-সুলহু মা'আল মুশরিকীন, হা-২৭০০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৮।
- ৪৮ আল-কুরআন, সূরাহ আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯-১০।
- ৪৯ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সুলহ, বাব-কওলুল ইমাম লি আসহাবিহি ইজহাবু বিনা নুসলিহ, হা-২৬৯৩, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯৭।
- ৫০ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বাব-মুসনাদু সাফওয়ান ইবন উমাইয়া, হা-২৬৩৬০, ৩০শ খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৩২৩।
- ৫১ আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (করাচী: আদব মনযিল, ১৩২৮ হি.), পৃ. ৪০; সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩২৮; মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনা*, ২য় খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ১৮৬; ড. ওয়াহাবাভুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিদ্বাতুহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (দামিশক: দারুল ফিকর, তা.বি.), পৃ. ১৭০।
- ৫২ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত*, ২০শ খণ্ড (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৪১৪ হি.), পৃ. ১৩৯; আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৪০; ইবন রুশদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ*, ২য় খণ্ড (ইরান: মানশূরাতির রাযী, ১৩৮৬ হি.), পৃ. ২৯০; সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩২৮; মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ড. ওয়াহাবাভুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিদ্বাতুহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ১৭০।
- ৫৩ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সুলহ, বাব-আস-সুলহু বিদায়নে ওয়াল 'আয়নে, হা-২৭১০, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০১।

- ৫৪ আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ৪০; সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৪ ; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৮; মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ১৭০।
- ৫৫ আশ-শারবীনী, *মুগনীউল মুহতাজ ইলা মা'রিফতি আলফাযিল মিনহাজ*, ৮ম খণ্ড পৃ. ৭৮; সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫ ; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৮; মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ১৭১-১৭৩।
- ৫৬ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫ ; সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৮; মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ১৭১-১৭৩।
- ৫৭ আল-কুরআন, সূরাহ আল-বাকারা, আয়াত: ১৮৮।
- ৫৮ আল-কুরআন, সূরাহ আন-নিসা, আয়াত: ১২৮।
- ৫৯ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ১৭০।
- ৬০ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, কিতাবুল আহকাম, বাব-মা যুকিরা 'আন-রাসূলুল্লাহ ফিস সুলহি বাইনান নাস, হা-১৩৫২ (কায়রো: দারু ইবনিল জাওযী, ১৪৩২ হি./ ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৫৮; ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, কিতাবুল আহকাম, বাব-আস-সুলহ, হা-২৩৫৩, ৩য় খণ্ড (বৈরুত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪১৯ হি./ ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ১২৪ ; আল-হাকিম আন-নাইশাপুরী, *আল-মুসতাদরা'ক*, কিতাবুল আহকাম, বাব-আস-সুলহ জায়িয়ুন, হা-৭১৫৯, ১৬শ খণ্ড (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ, ২য় সংস্করণ), পৃ. ৩৮১।
- ৬১ সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসুআ'তুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ*, ২৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৩৬; মুহাম্মাদ আশ-শানকিতী, *শারহু যাদিল মুসতাকনা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৬; ড. ওয়াহাবাতুয যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিব্বাতুহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ১৭২।
- ৬২ সায়্যিদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫।
- ৬৩ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd;https://www.lawernjurists.com/article/14442;http://www.judiciary.org.bd/en/mediation-corner>.
- ৬৪ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd; https://www.lawernjurists.com/article/14442;http://www.judiciary.org.bd/en/mediation-corner>.
- ৬৫ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd;aclawresearch.blogspot.com/2013/01/historical-development-of-adr-in-html>
- ৬৬ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd;www.lawernjurists.com/article/14442;http://www.judiciary.org.bd/en/mediation-corner>.
- ৬৭ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd; aclawresearch.blogspot.com/2013/01/historical-development-of-adr-in-html>
- ৬৮ <http://bdlaws.minlaw.gov.bd;www.lawernjurists.com/article/14442;http://www.judiciary.org.bd/en/mediation-corner>.

আল-কুরআনের অলৌকিক মর্যাদা : একটি পর্যালোচনা

আব্দুল্লাহ*

Abstract: Al-Quranul Karim is surely Allah's words and it was sent down and instilled in the heart of Muhammad (sm) as the guidance for human beings. It is the greatest miracle sent to the greatest prophet (sm). This Holy Book contains detailed description of everything which is necessary for people including advice, history and the code of Islamic shariah. The glorious Quran which is consistent and recurrently recited is filled with the brightest light and the best messages. Every letter, every word, every verse and every Surah are full of barakat and rahmat. The belief (iman) of a Mumin is increased, virtue is gained, eyes shed tears, heart is shaken, the skin of the body is thrilled and even the body and mind become humble when it is recited. In addition to that, life becomes happy if it is followed accordingly.

ভূমিকা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। যা তিনি ওহী করেছেন শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর। নবী (সা.) এবং সাহাবীগণ সেই ওহীকে মুখস্থ, কণ্ঠস্থ এবং লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে সংরক্ষণ ও সংকলন করে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। এ কুরআন মানব জীবনের চূড়ান্ত সংবিধান। যে ব্যক্তি এই কুরআনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর যে কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করবে। কেননা এ কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ করে।

আল-কুরআনের পরিচয়

আভিধানিক অর্থে কুরআন (القرآن) কুরয়ুন (قُرِئَ) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। (إِسْمٌ مَفْعُول) ইসমে মাফউল হিসেবে এর অর্থ পঠিত, যা পড়া হয়।^১ আর (قُرْءَان) ফা'লুন এর ওয়নে (قُرْءَان) কুরনুন মূলধাতু থেকে উৎকলিত হলে অর্থ হয় সন্নিবেশিত, মিলিত।^২ 'আলিমগণ কুরআন শব্দের বিশ্লেষণ নিয়ে কয়েকটি মত প্রদান করেছেন। যেমন, ১. ইমাম শাফি'ঈ (রহ.) বলেছেন, 'কুরআন একটি নাম, এটা مهموز (মাহমূয) নয়। এটাকে قُرْءَانُ শব্দ থেকেও গ্রহণ করা হয়নি। যদি قُرْءَانُ শব্দ থেকে গ্রহণ করা হত তাহলে যা কিছু পড়া হয় তাই কুরআন হত। বরং এটা তাওরাত ও ইনজীলের মত আল্লাহর একটি কিতাবের নাম। قُرْءَانُ শব্দটি হামযায়ুক্ত। আর কুরআন হামযায়ুক্ত নয়'।^৩ ২. আল-ফাররা (রহ.) বলেছেন, 'কুরআন শব্দটি القرائن থেকে উৎপত্তি। একবচন হল قُرْءَانُ। অর্থ অনুরূপ। যেহেতু কুরআনের একটি আয়াত অপর আয়াতকে সত্য প্রতিপন্ন করে এবং এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে তাকে কুরআন বলা হয়'।^৪ ৩. আশ'আরী (রহ.) ও তাঁর অনুসারীরা বলেছেন, 'কুরআন শব্দটি قرْن الشيء بالشيء থেকে উৎপত্তি। এর অর্থ একটি বস্তু অপর বস্তুর সাথে সংযোজিত হয়েছে। কুরআনের সূরাসমূহ ও আয়াতসমূহ পরস্পরের সাথে সংযোজিত বলে তাকে কুরআন বলে'।^৫ ৪. আয-যুজায় (রহ.) বলেছেন, 'কুরআন শব্দটি مهموز (মাহমূয)। فعْلان এর ওয়নে গঠিত এবং قُرْءَانُ ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ জমা করা। কুরআনে পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারবস্তু

* পিএইচ. ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জমা করা হয়েছে বলে তাকে কুরআন বলা হয়।^৫ ৫. আল-লিহইয়ানী (রহ.) বলেছেন, ‘কুরআন শব্দটি মাসদার ও মাহমুয। غفران এর ওয়নে গঠিত এবং فَرَأَ ধাতু থেকে উৎপন্ন। অর্থ পড়া। এখানে مقروء তথা পঠিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে।^৬

কুরআনের শাব্দিক অর্থ হল, পাঠ করা। মূলত এ গ্রন্থ অবতীর্ণই হয়েছে পাঠ করার জন্য। তাইতো এর সর্বপ্রথম শব্দই হল ‘পাঠ কর’।^৭ নিত্য পঠনীয়, বারবার পঠনীয় এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। তাই এর নাম হয়েছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْجِلَ بِهِ - إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَهُ - فَإِذَا فَرَأَاهُ فَاتَّبِعْ فُورَانَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

‘তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহ্বা ওর সাথে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয় তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি তা (জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে) পাঠ করি আপনিও তখন সেই পাঠের অনুসরণ করুন। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই’।^৮

কুরআনের আরেকটি অর্থ একত্রিত করা।^৯ যেহেতু কুরআনে শরী‘আতের বিধান, পূর্ববর্তী উম্মতের ইতিহাস ও আদম সন্তানদের জন্য উপদেশ একত্রিত হয়েছে। মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছু এতে জমা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থের সারবস্তু জমা করা হয়েছে, তাই এর নাম কুরআন হয়েছে।^{১০} মহান আল্লাহ বলেন, مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, ‘আমরা এই কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ছাড়িনি’।^{১১} মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ, ‘আমরা আপনার নিকট প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ কিতাব অবতীর্ণ করেছি’।^{১২}

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে আল-কুরআনের পরিচয়

কুরআন হল সেই অলৌকিক বাণীসমষ্টির কিতাব ও গ্রন্থের নাম, যা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে প্রেরিত অদ্রাস্ত সত্যের একমাত্র চূড়ান্ত উৎস। এটা এমন একটি কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই।^{১৩} এটা উজ্জ্বল জ্যোতি, সমুজ্জ্বল গ্রন্থ^{১৪}, উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব, যা সুসামঞ্জস্য ও যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়।^{১৫} এটা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত।^{১৬} এটা বিধানসমূহের বিশদ ব্যাখ্যা^{১৭} এবং এক মহাউপদেশ ও প্রকাশ্য কুরআন।^{১৮} যা তিনি মুমিনদের জন্য হেদায়াত, সুসংবাদ এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী হিসেবে ‘আরবী ভাষায় জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে মুহাম্মাদ (সা.)-এর হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّهُ لَنَزْلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ - نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ - عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ - بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.

‘নিশ্চয় ওটা (আল-কুরআন) জগৎসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ। জিবরীল (আ.) এটা নিয়ে অবতরণ করেছেন। আপনার হৃদয়ে, যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। যা অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়’।^{১৯}

সুন্নাহর আলোকে আল-কুরআনের পরিচয়

কুরআন হল আল্লাহর রজ্জু, সর্বোত্তম বাণী এবং প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, كِتَابُ اللَّهِ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ ‘আল্লাহর কিতাব, তা আল্লাহর রজ্জু। এটি আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রসারিত’।^{২০} রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, ‘নিশ্চয় সর্বোত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব’।^{২১} রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ, ‘কুরআন তোমার পক্ষের অথবা

বিপক্ষের প্রমাণ’।^{২৩} অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, *فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا*, ‘নিশ্চয় এই কুরআন এমন একটি রজ্জু, যার এক দিক আল্লাহর হাতে আর অন্য দিক তোমাদের হাতে। অতএব তোমরা এটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা কুরআনকে আঁকড়ে ধরার পর তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না, ধ্বংসও হবে না’।^{২৪} রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো বলেছেন,

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْذِبُهُ اللَّهُ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْذِيهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ خَبْلُ اللَّهِ وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَالشَّفَاءُ النَّافِعُ.

‘নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর মেহমানখানা। কাজেই তোমরা তাঁর মেহমানখানায় সাধ্যানুযায়ী শিক্ষা অর্জন কর। নিশ্চয় এ কুরআন আল্লাহর রজ্জু, স্পষ্ট আলো এবং উপকারী আরোগ্য’।^{২৫}

‘উসূলবিদ, ফক্বীহ ও ‘আলিমগণের দৃষ্টিতে আল-কুরআনের পরিচয়

উসূলবিদ, ফক্বীহ এবং ‘আলিমগণ কুরআনের পরিচয় প্রদান করে বলেন,

هو الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته.

‘কুরআন মহান আল্লাহর অলৌকিক কালাম। নবী করীম (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ। এটি মাসহাফে লিপিবদ্ধ। নবী করীম (সা.)-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির ভাবে বর্ণিত। এর তেলাওয়াত করা ইবাদত’।^{২৬}

অতএব আল-কুরআন হল, আল্লাহর চিরন্তন বাণী, যা নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে, মাছহাফে যা লিপিবদ্ধ, যার তেলাওয়াত ‘ইবাদত এবং বর্ণনা মুতাওয়াতির পর্যায়ে, যা বর্ণনাকৃত এবং যার গুরু সূরা আল-ফাতিহা ও শেষ সূরা আন-নাস দ্বারা।

সূরাহ্ ও আয়াত পরিচিতি

আল-কুরআনের মোট সূরাহ্ ১১৪টি, পাড়া ৩০টি। কুরআন মাজীদের কিছু সূরাহ্ ও আয়াত মাক্কী এবং কিছু মাদানী। মাক্কী সূরাহ্ হল মদীনায় হিজরতের পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে। সেটা মক্কায় হোক বা অন্য কোন স্থানে অবতীর্ণ হোক না কেন।^{২৭} মাদানী সূরাহ্ হল মদীনায় হিজরতের পর যা অবতীর্ণ হয়েছে। সেটা মদীনায় হোক, কোন সফরে বা যুদ্ধে হোক বা অন্য কোন স্থানে অবতীর্ণ হোক না কেন। অথবা মক্কায় বিজয়ের দিনে হোক।^{২৮} মাক্কী সূরাহ্ ৮৬টি এবং মাদানী সূরা ২৮টি। তবে ক্বাতাদাহ (রহ.) থেকে ২৬টি মাদানী সূরাহ্র কথা উল্লেখ আছে।^{২৯} কুরআনে বর্তমানে ৬২৩৬টি আয়াত রয়েছে। তবে কুরআন বিশেষজ্ঞদের মাঝে আয়াত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।^{৩০}

আল-কুরআনের শব্দ ও অক্ষর সংখ্যা

‘আতা ইবন ইয়াসার (রহ.) বলেন, ‘আল-কুরআনে মোট শব্দ সংখ্যা (সাতাত্তর হাজার চারশ’ উনচল্লিশ) ৭৭,৪,৩৯টি। অক্ষরের সংখ্যা সম্পর্কে মুজাহিদ (রহ.) বলেন, ‘কুরআনে মোট অক্ষর সংখ্যা (তিন লক্ষ একুশ হাজার একশ’ আশি) ৩,২১,১৮০টি। ‘আতা ইবন ইয়াসার (রহ.) বলেন, ‘মোট অক্ষর হল (তিন লক্ষ তেইশ হাজার পনের) ৩,২৩,০১৫টি। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ স্বীয় শাসনামলে ক্বারী, হাফিয ও লেখকদের একত্রিত করে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন কুরআনুল হাকীমের অক্ষরগুলো গণনা করে তাকে অবহিত করেন। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হিসাব করে বলেন যে, কুরআনে মোট অক্ষর রয়েছে (তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশ’ চল্লিশ) ৩,৪০,৭৪০টি।^{৩১}

‘সূরাহ্’ ও ‘আয়াত’ শব্দের অর্থ

সূরাহ্ (سُورَةُ) শব্দটি একবচন। বহুবচন হল سُورٌ।^{১২} আল-কুরআনে শব্দটি বহু জায়গায় এসেছে।^{১৩} সূরাহ্ শব্দের কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ১. দেয়াল বা প্রাচীর।^{১৪} মহান আল্লাহ বলেন, فَضْرَبَ بِيْنَهُمْ بِسُورٍ ‘এরপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর’।^{১৫} ২. খণ্ড বা ভাগ। আবু হায়ছাম (রহ.) বলেন, কুরআনের সূরাহ্ বলতে বুঝায়, কুরআনের একটি খণ্ড বা ভাগ। যেমন অনেকগুলো ঘরের মধ্যে অগ্রবর্তী কোন একটি ঘর। মহান আল্লাহ কুরআনকে একের পর এক অবতীর্ণ করেছেন, তাকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। প্রত্যেক সূরাহ্কে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন এবং অন্যান্য সূরাহ্ থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র করেছেন।^{১৬} মহান আল্লাহ বলেন, سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا ‘(এটি) একটি সূরাহ্, যা আমি অবতীর্ণ করেছি’।^{১৭} হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرِفُ فَضْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ‘রাসূলুল্লাহ (সা.) সূরাহ্ সমূহের মধ্যে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারতেন না, যতক্ষণ না ‘বিসমিল্লা-হির রহমান-নির রহীম’ নাযিল হত’।^{১৮} ৩. পৃথকীকরণ, উচ্চতা, মর্যাদা উঁচু হওয়া।^{১৯} জাহেলী যুগের প্রখ্যাত কবি নাবিগার কবিতায় সূরাহ্ শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।^{২০} তবে কুরআনের সূরাহ্ সমূহের সঙ্গে এই অর্থের সম্পর্ক এভাবে হবে যে, যেন কুরআনের পাঠক এক সূরাহ্ বা উচ্চ মর্যাদা হতে আরও উচ্চতম মর্যাদার দিকে পৃথক পৃথকভাবে যেতে পারে বা আরোহণ করতে পারে।^{২১} ৪. অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেহেতু সূরাহ্ পবিত্র কুরআনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই একে সূরাহ্ নামে অভিহিত করা হয়েছে।^{২২} ৫. সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা। দূর্গ যেমন প্রাসাদকে ঘিরে থাকে ও একত্রিত করে থাকে ঠিক তেমনি সূরাহ্ ও আয়াতসমূহকে জমা করে থাকে।^{২৩} ৬. ইবনুল ‘আরাবী (রহ.) বলেন, সূরা অর্থ মর্যাদা, সম্মান বা মহত্ত্ব। আর কুরআনের মর্যাদা ও সম্মানের কারণে সূরাহ্ বলা হয়।^{২৪}

আয়াত (آيَاتٍ) শব্দটি একবচন। বহুবচন হল, آيَاتٍ, آيَاتٍ এবং آيَاتٍ।^{২৫} শাব্দিক অর্থ হল চিহ্ন, নিদর্শন^{২৬}, একত্রিত করা^{২৭}, উপদেশ বা দৃষ্টান্ত।^{২৮} মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ ‘তাঁর (তালূত-এর) বাদশাহ হওয়ার চিহ্ন’।^{২৯} মহান আল্লাহ বলেন, سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَنْفَاءِ ‘আমি তাদেরকে অতিসত্ত্বর আমার নিদর্শনাবলী দেখাবো’।^{৩০} অথবা আয়াত অর্থ কুরআনের বাক্য।^{৩১} যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ‘আমি যখন কোন এক আয়াত পরিবর্তন করে তার স্থলে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি’।^{৩২} আয়াতকে আয়াত বলার কারণ হল, যেহেতু আয়াতের উপর বাক্য শেষ হয় এবং পূর্ববর্তী বাক্যটি পরবর্তী বাক্য হতে পৃথক হয়, সেজন্য তাকে আয়াত বলা হয়।^{৩৩} অথবা কুরআনের আয়াত যেহেতু এক বাক্য হতে অন্য বাক্য শেষ হওয়ার নিদর্শন, এ কারণে তাকে আয়াত বলা হয়। আবার আয়াতকে আয়াত বলার কারণ হল, আয়াত হল আল-কুরআনের অক্ষরসমূহের জামা‘আত বা দল।^{৩৪} কুরআনে আয়াত শব্দটি কুরআনী বাক্য^{৩৫}, প্রমাণ, হুজ্জত, দলীল^{৩৬}, মু‘জিয়া^{৩৭}, উপদেশ^{৩৮}, শার‘ঈ বিধান^{৩৯}, ‘আলামত বা নিদর্শন^{৪০} ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।^{৪১}

আল-কুরআনের অলৌকিক মর্যাদা

মানব জীবনের চূড়ান্ত সংবিধান, সকল দিক ও বিভাগের স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, মুক্তি এবং নিরাপত্তার মানদণ্ড হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল-কুরআন। এটি মহানবী (সা.)-এর একটি চিরন্তন মু‘জিয়া। এ কিতাব তার শব্দ চয়ন, বাক্যবিন্যাস, পদগঠন, রচনামূল্য, প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তু, বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এবং বহুবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাহার ইত্যাদির দিক থেকে নযীরবিহীন। এ কিতাব সকল জ্ঞানের ঝর্ণাধারা, হেদায়াতের সমষ্টি, রহমত এবং বরকতের ভাণ্ডার, এমন নূর যা দ্বারা

পথভ্রষ্টতার সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়। সর্বশ্রেষ্ঠ পথ নির্দেশ, প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, দয়া ও সুসংবাদ, স্পষ্ট বিবরণ এবং উপদেশ দিয়ে পরিপূর্ণ। এগুলোই হচ্ছে আল-কুরআনের অলৌকিকত্ব বা চিরন্তন মু'জিয়া। আর আল-কুরআনের এ চিরন্তনতা বিভিন্নমুখী। যেমন,

১. আল্লাহ তা'আলার কালাম

কুরআনের অন্যতম মাহাত্ম্য হল যে, কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَذَكَرَ كَانَ قُرْآنٌ ۚ وَإِنْ أَحَدٌ ۖ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ۖ 'অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে'।^{১২} আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিন; যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়'।^{১৩} আল্লাহ তা'আলার কালাম ন্যায়সঙ্গত। সত্যতা, ন্যায়, সমতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পূর্ণাঙ্গ।^{১৪} তাঁর কথার কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই।^{১৫} কেননা কুরআনের বাণী কোন ফেরেশতা^{১৬}, শয়তান, যাদুকর, কবি বা গণকের বাণী নয়।^{১৭} তাছাড়া এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কল্পনাপ্রসূত রচনা নয়।^{১৮} তাঁর বাণী চিরন্তন সত্য। তাঁর বাণীতে কোন অবাস্তব, অসত্য কথা নেই। তিনি হলেন অধিক সত্যবাদী এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিও সত্য। আল-কুরআনে বিবৃত সকল বিবরণ, আদেশ-নিষেধ এবং বিধি-বিধান সত্য।^{১৯} তাঁর কথা অতুলনীয়, অপ্রতিদ্বন্দী, সবচেয়ে সুন্দর এবং সর্বোত্তম।^{২০} রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ ۖ 'সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কথা'।^{২১}

২. সন্দেহমুক্ত কিতাব

কুরআনের অন্যতম মর্যাদা হল- এটা সন্দেহমুক্ত কিতাব। এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া, আল্লাহর ওহী, তাঁর কথা এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ওহী অবতরণ করেছেন, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই'।^{২২} মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ 'এটা (আল-কুরআন) সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই'।^{২৩} কাফিররা কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন কুরআনের মত অনুরূপ কুরআন^{২৪}, দশটি সূরাহ^{২৫} বা একটি সূরাহ^{২৬} তৈরি করার। তারা অক্ষম ছিল। আর মানুষের পক্ষে তা তৈরি করা অসম্ভব। কেননা কুরআনের বিশুদ্ধতা, নির্ভেজাল, বাগিতা, সুন্দর বাচনভঙ্গি, শব্দ ও বাক্যের ত্রুটিমুক্তি, ভাষার অলঙ্কার, বাহুল্যবর্জিত, মূল্যবান, বিরল, সম্মানিত ও বলিষ্ঠ অর্থের অন্তর্ভুক্তি, যা দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণকর ও উপকারী; রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া অসম্ভব।

৩. হিদায়াত

কুরআনের অন্যতম বিশেষত্ব হল এটা মুমিন^{২৭}, সৎকর্মপরায়ণ^{২৮} এবং মানুষের জন্য হিদায়াত বা পথনির্দেশক।^{২৯} আর হিদায়াত হল এমন আলো^{৩০}, যার মাধ্যমে সত্য পথে পরিচালিত হওয়া যায়^{৩১} এবং দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করা যায়।^{৩২} মহান আল্লাহ বলেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۖ 'এটা মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক'।^{৩৩} মহান আল্লাহ বলেন, هُدًى لِّلنَّاسِ ۖ 'এটা মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক'।^{৩৪}

৪. আল-ফুরকান

কুরআনের অন্যতম বিশেষত্ব হল, এটা আল-ফুরকান। এটা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।^{৩৫} আল-কুরআনকে ফুরকান এজন্য নাম দেয়া হয়েছে যে, 'তা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে'।^{৩৬} কুরআন ফুরকান এ কারণেই যে, এটা সুপথ ও কুপথের মধ্যে, সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের মধ্যে, বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে,

ভাল ও মন্দের মধ্যে, ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যে, গ্রহণীয় ও বর্জনীয়ের মধ্যে, আলো ও অন্ধকার এবং দলীল ও সন্দেহের মধ্যে পার্থক্যকারী।^{৮৭} আল্লাহ তা'আলা বলেন, *شَهِدُ رَضَائِ الدِّيْنِ* 'রামাযান মাস, যার মধ্যে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শক এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন ও (হক ও বাতিলের) প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে'।^{৮৮}

৫. পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী

কুরআনের অন্যতম বিশেষত্ব হল, এটি পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যায়নকারী। এটা মহান প্রতিপালকের নিকট হতে আসা সর্বশেষ ওহী ও সর্বশেষ গ্রন্থ। তার পূর্বে যত আসমানী গ্রন্থ এসেছে, কুরআন তার সত্যায়ন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *يَذِيْهُنَ يَدِيْهِ مِمَّا يَدِيْهِ مُصَدِّقًا لِّمَا يَدِيْهِ* 'তিনি হক্কে সহ আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা প্রতিপাদনকারী'।^{৮৯}

৬. মুহাইমিন

আল-কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এটা মুহাইমিন অর্থাৎ পূর্ববর্তী কিতাবের তদারককারী, সংরক্ষক, আমানতদার^{৯০} এবং সাক্ষ্য।^{৯১} আল্লাহ তা'আলা বলেন, *وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا يَدِيْهِ مِنَ الْكِتَابِ* 'আর আমি এ কিতাব (কুরআন)-কে আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যা হকের সাথে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতা প্রমাণকারী এবং এসব কিতাবের সংরক্ষকও'।^{৯২}

৭. সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন

কুরআনের অন্যতম মর্যাদা হল, এটা সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বান্দাদেরকে অন্ধকার, মূর্খতা, কুফরী থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। এর দ্বারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তি। যালিম, হঠকারী এবং ফাসিক ছাড়া এ স্পষ্ট প্রমাণ কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এটা মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওতের প্রকাশ্য দলীল। যা শুনে প্রত্যেক জীবিত অন্তর মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওতের সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য।^{৯৩} তাছাড়া এটা হালাল, হারাম, দণ্ডদেশ এবং বিধানের বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বিবরণ।^{৯৪} এ কারণে কুরআন হল সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল নিদর্শন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, *وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ* 'এভাবেই আমরা সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে ওটা অবতীর্ণ করেছি'।^{৯৫}

৮. সত্য কিতাব

আল-কুরআনের অন্যতম মর্যাদা হল এটা সত্য কিতাব^{৯৬} ও সত্য দলীল।^{৯৭} যা সত্যকে মিথ্যা থেকে এবং হিদায়াতকে ভ্রষ্টতা থেকে প্রকাশ ও স্পষ্ট করে।^{৯৮} আল্লাহ তা'আলা এটাকে অবতীর্ণ করে সত্যকে প্রকাশ করেছেন এবং অসত্যকে দূর করেছেন।^{৯৯} কুরআন এমনি এক হক্কে ও মহাসত্য কিতাব, যাতে কোন বক্রতা নেই। বাতিল, অসত্য কথা নেই।^{১০০} না কেউ তাতে বাতিল প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু এটা প্রজ্ঞাময়, হিকমতময়, প্রশংসিত ও সম্মানিত আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। এ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে বিকৃতি হয়নি এবং ক্রিয়ামত পর্যন্ত কেউ বিকৃত করতেও পারবে না। এটাতে কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্তন, সংযোজন বা বিয়োজন করার পথ নেই। যেহেতু তার শব্দ ও অর্থ মহান প্রতিপালক কর্তৃক সুরক্ষিত।^{১০১} আল-কুরআনে বিবৃত সকল বিবরণ চির সত্য, চিরন্তন সত্য এবং এর সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান সম্পূর্ণভাবে ন্যায্যপারায়ণ। এর চাইতে সত্য এবং এর চাইতে ন্যায্যপারায়ণ অন্য কোন বাণী হতে পারে না।^{১০২} মহান আল্লাহ বলেন, *وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ* 'আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহই তা অবতীর্ণ হয়েছে'।^{১০৩}

৯. সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা

কুরআনের অন্যতম বিশেষত্ব হল এটা মুসলিম, মুমিন এবং মুহসিনদের জন্য সুসংবাদ।^{১০৪} এই সুসংবাদ হল জান্নাতের সুসংবাদ।^{১০৫} আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 'আর আমরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ মুসলিমদের জন্য'।^{১০৬} আল-কুরআন যেমন সুসংবাদ, তেমনি এটা সতর্কবার্তা। যারা তার বিরোধী তাদেরকে হুঁশিয়ার করে যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি এবং চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 'এই সমর্থক গ্রন্থ আরবী ভাষায়, যাতে এটা সীমালংঘনকারীদেরকে সতর্ক করে'।^{১০৭}

১০. জীবন-ব্যবস্থা

কুরআনের অন্যতম মর্যাদা হল, এটা মানুষ ও জিন জাতির জীবন-ব্যবস্থা ও চূড়ান্ত সংবিধান। এ বিধান সকল মানুষের জন্য ন্যায় ও ইনসাফে পরিপূর্ণ। সকল স্থান ও কালের জন্য চিরন্তন সত্য। যা মান্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। মানুষের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন অর্থাৎ পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক এবং মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিধান, নীতি ও আইন মওজুদ রয়েছে এ কুরআনে; যা লংঘন করা মহা অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

'সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে প্রেরণ করেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন যাতে মানুষেরা যে বিষয়ে মতভেদ করত সেসবের মীমাংসা করতে পারেন'।^{১০৮}

১১. বিস্তারিত বিবরণী গ্রন্থ

কুরআন হল দ্বীনের সকল কিছু বিস্তারিত প্রকাশকারী ও বিশদ বিবরণী গ্রন্থ। এর মধ্যে কোন গোপনীয়তা, অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, রহস্য, অনিশ্চয়তা, ত্রুটি ও খুঁত নেই।^{১০৯} হালাল-হারাম, শরী'আতের আহকাম, দ্বীনের উসূল এবং শাখার স্পষ্ট ও পরিষ্কার বিবরণী রয়েছে। কুরআনের চেয়ে স্পষ্ট বর্ণনা, দলীল, বিধান আর কোন কিছু নেই। কেননা কুরআনের বিধান হিকমাহ এবং রহমতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ।^{১১০} আল্লাহ তা'আলা কুরআনের মাধ্যমে প্রত্যেক সত্যের প্রমাণ ও নিদর্শনের বিশদ বর্ণনা পেশ করেছেন। বাতিল থেকে সত্যকে এবং দুর্বল থেকে সঠিক ও সহীহ জিনিসের বিস্তারিত বিবরণী তুলে ধরেছেন।^{১১১} আল্লাহ তা'আলা বলেন, (বলুন) তবে কি আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ফায়সালাকারী হিসাবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের প্রতি বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন!।^{১১২}

১২. সকল কিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা গ্রন্থ

আল-কুরআন মানব জাতির জন্য সবকিছুর জ্ঞান বর্ণনা করেছে এবং সবকিছু জানিয়েছে। এটা হল মানুষের প্রয়োজনীয় দ্বীন-দুনিয়া, আখিরাত, আদেশ, নিষেধ, হালাল, হারাম, নেকি, শাস্তি, দণ্ডবিধি এবং শরী'আতের আহকাম ইত্যাদির স্পষ্ট ব্যাখ্যা গ্রন্থ।^{১১৩} আল্লাহ তা'আলা কুরআনে দ্বীনের মূলনীতি এবং তার শাখা-প্রশাখা, শার'ঈ আহকাম এবং বান্দার প্রয়োজনীয় সকল কিছুর স্পষ্ট বর্ণনা^{১১৪}, সবকিছুর জ্ঞান জানিয়েছেন।^{১১৫} প্রত্যেক হালাল ও হারাম^{১১৬}, আদেশ ও নিষেধের স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন।^{১১৭} আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَرَزَّلْنَا

عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَتْلُوهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
ব্যাখ্যাস্বরূপ’।^{১১৮}

১৩. বরকত ও রহমতে পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ কুরআন

আল-কুরআন মহান আল্লাহর কথা। এ কারণে এর প্রতিটি অক্ষর, শব্দ, আয়াত এবং সূরাহ রহমত ও বরকত দিয়ে পরিপূর্ণ। যা তিলাওয়াত করলে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায়, চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর প্রকম্পিত হয়। গায়ের চামড়া রোমাঞ্চিত হয় এবং দেহমন বিনম্র হয়।^{১১৯} মহান আল্লাহ এ চিরন্তন মুজিব পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ‘আর কুরআন পাঠ কর ধীরে ধীরে (সুন্দরভাবে)’।^{১২০} কেননা এ মহাত্ম্যপূর্ণ আল-কুরআন তিলাওয়াতের রয়েছে বরকত, রহমত, প্রশান্তি ও অত্যধিক মর্যাদা। যেমন,

১. যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, প্রত্যেক হরফের বিনিময়ে দশ নেকী দেয়া হবে।^{১২১} ২. আল-কুরআন তার পাঠকদের জন্য ক্রিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।^{১২২} ৩. কুরআন তিলাওয়াতকারীর উপর প্রশান্তি এবং ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়।^{১২৩} রহমত তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফিরিশতাগণ তাকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নিকটবর্তীদের (ফিরিশতাগণের) মধ্যে তার কথা আলোচনা করেন।^{১২৪} ৪. সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।^{১২৫} ৫. যে অন্তর কুরআন মুখস্থ করেছে, আল্লাহ তাকে শান্তি দিবেন না।^{১২৬} ক্রিয়ামতের দিন তাকে অলংকার, মর্যাদার মুকুট ও মর্যাদার পোশাক পরানো হবে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।^{১২৭} তার ডান হাতে মালিকানা দেয়া হবে আর বাম হাতে দেয়া হবে স্থায়ী নি‘আমত। তার মাতা-পিতাকে এমন দুই জোড়া কাপড় পরানো হবে, দুনিয়াবাসীর কোন কিছুই তার সমপরিমাণ হবে না।^{১২৮} সে হল আল্লাহর পরিবার-পরিজন।^{১২৯} এবং তাকে সম্মান করা হল আল্লাহকে সম্মান করা।^{১৩০} তারা পাঠক লিপিকার সম্মানিত ফিরিশতার মত।^{১৩১} তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে।^{১৩২} এবং জান্নাতে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হবে।^{১৩৩} ৬. যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না।^{১৩৪} ৭. কেউ যদি রাতে ঘুমানোর পূর্বে সূরাহ আল-বাক্বারাহর শেষ দু’টি আয়াত পাঠ করে, ঐ রাতে শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না এবং মর্যাদা ও সাওয়াব অর্জনে তার জন্য তা যথেষ্ট হবে।^{১৩৫} যে ঘরে তিন রাত এ দু’টি আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সে ঘরের নিকট আসতে পারে না।^{১৩৬} ৮. যে ব্যক্তি সূরাহ কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদে রাখা হবে।^{১৩৭} ৯. সূরাহ মুল্ক যারা নিয়মিত তিলাওয়াত করবে, এ সূরাহ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার সুপারিশ করবে।^{১৩৮} তাকে কবরের শান্তি থেকে রক্ষা করা হবে।^{১৩৯} এবং এমনকি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।^{১৪০} ১০. সূরাহ আল-কাফিরুন একবার তিলাওয়াত (নেকির দিক থেকে কুরআনের) এক চতুর্থাংশের সমান।^{১৪১} ১১. সকালে ও সন্ধ্যায় সূরাহ আল-ইখলাস (৩ বার), আল-ফালাক (৩ বার) এবং আন-নাস (৩ বার) তিলাওয়াত করলে তা সকল প্রকার বিপদাপদ ও অনিষ্ট থেকে হিফায়ত করে।^{১৪২} ১২. সূরাহ আল-ইখলাস একবার তিলাওয়াত করা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।^{১৪৩} যে ব্যক্তি ভালোবেসে এ সূরাহ তিলাওয়াত করে, এ সূরাহ তার জন্য জান্নাতকে অবধারিত করে এবং তাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবে।^{১৪৪} যে ব্যক্তি এ সূরাহ শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক প্রাসাদ বা মহল নির্মাণ করবেন।^{১৪৫}

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, আল-কুরআন বিশ্বমানবতার জন্য স্থায়ী ও চূড়ান্ত সংবিধান। আল-কুরআন যেমন সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, তেমনি সর্বাধিক সম্মানী ও মর্যাদাপূর্ণ কিতাব। যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বশেষ ওহী। কুরআনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরার মধ্যেই রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সফলতা।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ ইবনু মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল 'আরব*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল সদর), পৃ. ১২৮।
- ^২ প্রাপ্ত।
- ^৩ আবু 'আদিল্লাহ আল-হাকিম মুহাম্মাদ ইবন 'আদিল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আন-নাইসাপুরী, *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪১১ হি.), পৃ. ২৫০, হাদীস নং- ২৯০৫; আহমাদ ইবন হুসাইন ইবন 'আলী ইবন মুসা আল-বায়হাকী, *আল-আসমাউ ওয়াস সিফাত*, ২য় খণ্ড (জিদ্দা : মাকতাবাতুস সাওয়াদী, ১৪১৩ হি.), পৃ. ২৭, হাদীস নং- ৫৯৮; আবু 'আদিল্লাহ বদরুদ্দীন যারকাশী, *আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, ১৩৭৬ হি.), পৃ. ২৭৮; সুবহী সালিহ, *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন* (প্রকাশনা স্থান বিহীন : দারুল 'ইলম, ২০০০ খৃ.), পৃ. ১৮।
- ^৪ *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন*, পৃ. ১৮; মুহাম্মাদ 'আব্দুল 'আযীম যারকানী, *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (কায়রো : মাতবা'আতু 'ঈসা আল-হালাবী, তা.বি.), পৃ. ১৪; ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, *'উলূমুল কুরআন* (রাজশাহী : আল-মাকতাবাতুশ শাফিয়া, মার্চ ২০০৮ খৃ.), পৃ. ৯।
- ^৫ *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন*, পৃ. ১৮; *'উলূমুল কুরআন*, পৃ. ৯।
- ^৬ প্রাপ্ত।
- ^৭ প্রাপ্ত।
- ^৮ সূরাহ্ আল-'আলাক, ৯৬ : ১।
- ^৯ সূরাহ্ আল-ক্বিয়ামাহ, ৭৫ : ১৬-১৯।
- ^{১০} মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন 'আদিল রায়যাক আল-হুসাইনী, *তাজুল 'উরুস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান বিহীন : দারুল হিদায়াহ, তা.বি.), পৃ. ৩৭১; *লিসানুল 'আরব*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮।
- ^{১১} প্রাপ্ত।
- ^{১২} সূরাহ্ আল-আন'আম, ৬ : ৩৮।
- ^{১৩} সূরাহ্ আন-নাহল, ১৬ : ৮৯।
- ^{১৪} সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ, ২ : ২।
- ^{১৫} সূরাহ্ আল-মায়িদাহ, ৫ : ১৫-১৬।
- ^{১৬} সূরাহ্ আয-যুমার, ৩৯ : ২৩।
- ^{১৭} সূরাহ্ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৮২।
- ^{১৮} সূরাহ্ ইউনুস, ১০ : ৩৭।
- ^{১৯} সূরাহ্ ইয়াসীন, ৩৬ : ৬৯-৭০।
- ^{২০} সূরাহ্ আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৯২-১৯৫।
- ^{২১} মুহাম্মাদ ইবন 'ঈসা ইবন সাওরাতা ইবন মুসা আত-তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (মিশর : মাকতাবাতু মুহত্তফা আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৫ হি.), পৃ. ১৩৩, হাদীস নং- ৩৭৮৮।
- ^{২২} মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আবুল হাসান আন-নাইসাপুরী, *আস-সহীহ*, ২য় খণ্ড (বৈরুত : দারুল ইহইয়াউত তুরাখিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ৫৯২, হাদীস নং- ৮৬৭।
- ^{২৩} ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ২২৩।
- ^{২৪} মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ ইবন হিব্বান, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড (বৈরুত : মুওয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ৩২৯, হাদীস নং- ১২২।
- ^{২৫} *আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪১, হাদীস নং- ২০৪০।
- ^{২৬} *মাবাহিস ফী 'উলূমিল কুরআন*, পৃ. ২১; *মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলূমিল কুরআন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯; মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ আবু শুবাহ, *আল-মাদখাল লি দিরাসাতিল কুরআনিল কারীম* (কায়রো : মাকতাবাতুস সুন্নাহ, ১৪২৩ হি.), পৃ. ২১;

- মুহাম্মাদ ইসমাঈল, দিরাসাতু ফী 'উলুমিল কুরআন (দারুল মান্নার, ১৪১৯ হি.), পৃ. ১০; হাসান মুহাম্মাদ আইয়ুব, আল-হাদীসু ফী 'উলুমিল কুরআন ওয়াল হাদীস (আলেকজান্দ্রিয়া : দারুস সালাম, ১৪২৫ হি.), পৃ. ৭।
- ^{২৭} আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর, ফাযায়েলে কুরআন (মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়াহ, ১৪১৬ হি.), পৃ. ৩৭; মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।
- ^{২৮} ফাযায়েলে কুরআন, পৃ. ৩৭; মানাহিলুল 'ইরফান ফী 'উলুমিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।
- ^{২৯} আবু 'আদিল্লাহ শামসুদ্দীন আল-কুরতুবী, আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১ম খণ্ড (রিয়াদ : দারু 'আলিমিল কুতুব, ১৪২৩ হি.), পৃ. ৬২; আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড (দারুল ত্বায়েবা, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৯৮।
- ^{৩০} আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৮।
- ^{৩১} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।
- ^{৩২} ইবরাহীম মুহুত্ফা ও তার সাথীবন্দ, আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান বিহীন : দারুল দাওয়াত, তা.বি.), পৃ. ৪৬২; লিসানুল 'আরব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।
- ^{৩৩} সূরাহ আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ২৩; সূরাহ আত-তওবাহ, আয়াত : ৬৪, ৮৬, ১২৪, ১২৭; সূরাহ ইউনুস, আয়াত : ৩৮; সূরাহ আল-হাদীদ, আয়াত : ১৩; সূরাহ হূদ, আয়াত : ১৩; সূরাহ আন-নূর, আয়াত : ১; সূরাহ মুহাম্মাদ, আয়াত : ২০।
- ^{৩৪} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; তাজুল 'উরুস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১০১।
- ^{৩৫} সূরাহ আল-হাদীদ, ৫৭ : ১৩।
- ^{৩৬} তাজুল 'উরুস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১০১।
- ^{৩৭} সূরাহ আন-নূর, ২৪ : ১।
- ^{৩৮} আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস-সিজিস্তানী, আস-সুনান, ১ম খণ্ড (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ২০৯, হাদীস নং- ৭৮৮।
- ^{৩৯} আল-মু'জামুল ওয়াসীত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬২; লিসানুল 'আরব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৯; ইমাম জারীর আত-তাবারী, জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান বিহীন : মুওয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ১০৫; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; তাজুল 'উরুস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১০১।
- ^{৪০} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯; জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৫।
- ^{৪১} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।
- ^{৪২} প্রাপ্ত।
- ^{৪৩} প্রাপ্ত।
- ^{৪৪} তাজুল 'উরুস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১০১।
- ^{৪৫} লিসানুল 'আরব, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৬১; তাজুল 'উরুস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস, ৩৭তম খণ্ড, পৃ. ১২৩; আবুল হাসান 'আলী ইবন ইসমাঈল, আল-মুহকামু ওয়াল মুহীতুল আ'যাম, ১০ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৫৯৩; যাইনুদ্দীন আবু 'আদিল্লাহ আর-রাযী, মুখতারুস সিহাহ (বৈরুত : আল-মাকতাবাতুল 'আসরিয়াহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ২৭।
- ^{৪৬} আবু আব্দুর রহমান আল-বাসরী, কিতাবুল 'আইন, ৮ম খণ্ড (মাকতাবাতুল হিলাল, তা.বি.), পৃ. ৪৪১।
- ^{৪৭} মুখতারুস সিহাহ, পৃ. ২৭।
- ^{৪৮} তাজুল 'উরুস মিন জাওয়াহিরিল ক্বামূস, ৩৭তম খণ্ড, পৃ. ১২৪।
- ^{৪৯} সূরাহ আল-বাক্বারাহ, ২ : ২৪৮।
- ^{৫০} সূরাহ হা-মীম-আস-সাজদাহ, ৪১ : ৫৩।
- ^{৫১} ড. আহমাদ মুখতার, মু'জামুল লুগাহতিল 'আরাবিয়া আল-মা'আসিরাহ, ১ম খণ্ড (কায়েরো : 'আলিমুল কুতুব, ১৪২৯ হি.), পৃ. ১৪৬।
- ^{৫২} সূরাহ আন-নাহল, ১৬ : ১০১।
- ^{৫৩} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০।
- ^{৫৪} লিসানুল 'আরব, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৬২।
- ^{৫৫} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫।
- ^{৫৬} প্রাপ্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩০৮।
- ^{৫৭} প্রাপ্ত, পৃ. ২৩৭।
- ^{৫৮} প্রাপ্ত, পৃ. ১১১।

- ৫৯ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫; আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৮৩।
- ৬০ তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২০।
- ৬১ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ২০তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫; আল-জামি'উ লি আহকামিল কুরআন, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ২৮৩; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫, ৫২০।
- ৬২ সূরাহ আল-বাকুরাহ, ২ : ৭৫।
- ৬৩ সূরাহ আত-তাওবাহ, ৯ : ৬।
- ৬৪ সূরাহ আল-আন'আম, ৬ : ১১৫।
- ৬৫ সূরাহ আল-ফাতহ, ৪৮ : ১৫; সূরাহ আল-কাহফ, ১৮ : ২৭।
- ৬৬ সূরাহ আশ-শু'আরা, ২৬ : ১৯২-১৯৫।
- ৬৭ সূরাহ আত-তাকভীর, ৮১ : ২৫; সূরাহ আল-হাক্কাহ, ৬৯ : ৪১-৪২।
- ৬৮ সূরাহ ইউনুস, ১০ : ৩৭।
- ৬৯ সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১২২; সূরাহ আলি 'ইমরান, ৩ : ৯৫।
- ৭০ সূরাহ আয-যুমার, ৩৯ : ২৩।
- ৭১ আবু আব্দির রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব ইবন 'আলী আন-নাসাঈ, আস-সুনান, ৩য় খণ্ড (মিশর : মাকতাবু হালাব, ১৪০৬ হি.), পৃ. ৫৮, হাদীস নং- ১৩১১।
- ৭২ জাবির ইবন মুসা ইবন 'আদিল কুদির ইবন জাবির আবু বকর আল-জাযাইরী, আইসারুত তাফসীর লি-কালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর, ১ম খণ্ড (মদীনা : মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হাকাম, ১৪২৪ হি.), পৃ. ১৯।
- ৭৩ সূরাহ আল-বাকুরাহ, ২ : ২।
- ৭৪ সূরাহ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৮৮।
- ৭৫ সূরাহ হূদ, ১১ : ১৩।
- ৭৬ সূরাহ ইউনুস, ১০ : ৩৭-৩৮।
- ৭৭ সূরাহ আন-নামল, ২৭ : ১-২।
- ৭৮ সূরাহ লুকম্যান, ৩১ : ২-৩।
- ৭৯ সূরাহ আল-বাকুরাহ, ২ : ১৮৫।
- ৮০ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩।
- ৮১ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩; 'আব্দুর রহমান ইবন নাছির আস-সা'আদী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান (বৈরুত : মুওয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪০।
- ৮২ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ১৫-১৬।
- ৮৩ সূরাহ আল-বাকুরাহ, ২ : ২।
- ৮৪ সূরাহ আল-বাকুরাহ, ২ : ১৮৫।
- ৮৫ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।
- ৮৬ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আবু 'আদিল্লাহ আল-বুখারী, আস-সহীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড (দারু তুওক্বিন নাজাহ, ১৪২২ হি.), পৃ. ৯৯।
- ৮৭ আল-জামি'উ লি-আহকামিল কুরআন, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯২; তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃ. ৮২; মুহাম্মাদ রাশীদ ইবনু 'আলী রিয়া, তাফসীরুল মানার, ৯ম খণ্ড (আল-হাইআতুল মিছরিয়্যাতুল 'আম্মাতুল লিল কিতাব, ১৯৯০ হি.), পৃ. ৫৩৮।
- ৮৮ সূরাহ আল-বাকুরাহ, ২ : ১৮৫।
- ৮৯ সূরাহ আলি 'ইমরান, ৩ : ৩।
- ৯০ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৪৮৮; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭।
- ৯১ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।
- ৯২ সূরাহ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৮।
- ৯৩ জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৪; তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৪।
- ৯৪ মুহীউস সুন্নাহ ইবন মাসউদ আল-বাগাভী, মা'আলিমুত তানযীল, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান বিহীন : দারুত তায়্যিব, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৭ হি.) পৃ. ১২৬।
- ৯৫ সূরাহ আল-হাজ্জ, ২২ : ১৬।

- ^{৯৬} সূরাহ্ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১০৫; সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ, ২ : ১৭৬; সূরাহ্ আলি 'ইমরান, ৩ : ৩; সূরাহ্ আন-নিসা, ৪ : ১০৫; সূরাহ্ আল-মায়িদাহ, ৫ : ৪৮।
- ^{৯৭} আল-জামি'উলি-আহকামিল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৭।
- ^{৯৮} তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃ. ৮২।
- ^{৯৯} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৪।
- ^{১০০} সূরাহ্ হা-মীম আস-সাজদাহ, ৪১ : ৪১-৪২।
- ^{১০১} সূরাহ্ আল-হিজর, ১৫ : ৯।
- ^{১০২} সূরাহ্ আলি 'ইমরান, ৩ : ৯৫।
- ^{১০৩} সূরাহ্ বানী ইসরাঈল, ১৭ : ১০৫।
- ^{১০৪} সূরাহ্ আন-নাহল, ১৬ : ৮৯, ১০২; সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ, ২ : ৯৭; সূরাহ্ আন-নামল, ২৭ : ১-২; সূরাহ্ আল-আহক্বাফ, ৪৬ : ১২।
- ^{১০৫} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪২।
- ^{১০৬} সূরাহ্ আন-নাহল, ১৬ : ৮৯।
- ^{১০৭} সূরাহ্ আল-আহক্বাফ, ৪৬ : ১২।
- ^{১০৮} সূরাহ্ আল-বাক্বারাহ, ২ : ২১৩।
- ^{১০৯} আইসারুত তাফসীর লি-কালামিল 'আলিয়্যিল কাবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭।
- ^{১১০} তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃ. ২৭০।
- ^{১১১} জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।
- ^{১১২} সূরাহ্ আল-আন'আম, ৬ : ১১৪।
- ^{১১৩} জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩১৩; মা'আলিমুত তানযীল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৮।
- ^{১১৪} তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, পৃ. ৪৪৬।
- ^{১১৫} তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।
- ^{১১৬} প্রাপ্ত।
- ^{১১৭} জামি'উল বায়ান ফী তা'বীলিল কুরআন, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৩১৩।
- ^{১১৮} সূরাহ্ আন-নাহল, ১৬ : ৮৯।
- ^{১১৯} সূরাহ্ আল-আনফাল, ৮ : ২।
- ^{১২০} সূরাহ্ আল-মুযাম্মিল, ৭৩ : ৪।
- ^{১২১} আল-মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫৫, হাদীস নং- ২০৮০; ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৭৫, হাদীস নং- ২৯১০।
- ^{১২২} ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৩, হাদীস নং- ৮০৪।
- ^{১২৩} ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৮, হাদীস নং- ৫০১১।
- ^{১২৪} ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২০৭৪, হাদীস নং- ২৬৯৯।
- ^{১২৫} ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৯২, হাদীস নং- ৫০২৭।
- ^{১২৬} আবু মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আদ্রির রহমান আদ-দারিমী, আস-সুনান, ৪র্থ খণ্ড (সউদী 'আরব : দারুল মুগনী, ১৪১২ হি.), পৃ. ২০৯২, হাদীস নং- ৩৩১৯।
- ^{১২৭} ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮, হাদীস নং- ২৯১৫।
- ^{১২৮} ইমাম দারিমী, আস-সুনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৩৫, হাদীস নং- ৩৪৩৪।
- ^{১২৯} ইবন মাজাহ আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ আল-ক্বাযবীনী, আস-সুনান, ১ম খণ্ড (মিশর : দারুল ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৭৮, হাদীস নং- ২১৫।
- ^{১৩০} ইমাম আবু দাউদ, আস-সুনান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬১, হাদীস নং- ৪৮৪৩।
- ^{১৩১} ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং- ৪৯৩৭।
- ^{১৩২} সুলাইমান ইবন আহমাদ আত-ত্বাবারাগী, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৭তম খণ্ড (রিয়াদ : দারুস সামী'ঈ, ১৪১৫ হি.), পৃ. ১৮৬, হাদীস নং- ৪৯৮।
- ^{১৩৩} ইবনু তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, ১ম খণ্ড (প্রকাশনা স্থান বিহীন : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়াহ, ১৪০৮ হি.), পৃ. ১২৬।

-
- ^{১৩৪} আবু 'আদ্রির রহমান আহমাদ ইবন শু'আইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, ৯ম খণ্ড (বৈরুত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৪৪, হাদীস নং- ৯৮৪৮।
- ^{১৩৫} *ফাযাইলুল আ'মাল*, পৃ. ২৮১।
- ^{১৩৬} আবু 'আদ্রিহা আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, ৩০তম খণ্ড (বৈরুত : মুওয়াস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৩৬৩, হাদীস নং- ১৮৪১৪; *আল-মুসনাদ* 'আলাস সহীহাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫০, হাদীস নং- ২০৬৫।
- ^{১৩৭} ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫, হাদীস নং- ৮০৯।
- ^{১৩৮} ইমাম আবু দাউদ, *আস-সুনান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৭, হাদীস নং- ১৪০০; *আল-মুসনাদ* 'আলাস সহীহাইন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫৩, হাদীস নং- ২০৭৫।
- ^{১৩৯} ইমাম নাসাঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২৬২, হাদীস নং- ১০৪৭৯; *আল-মুসনাদ* 'আলাস সহীহাইন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪০, হাদীস নং- ৩৮৩৯।
- ^{১৪০} সুলাইমান ইবনু আহমাদ আত-ত্বাবারাগী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, ৪র্থ খণ্ড (কায়রো : দারুল হারামাইন, তা.বি.), পৃ. ৭৬, হাদীস নং- ৩৬৫৪।
- ^{১৪১} ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬, হাদীস নং- ২৮৯৪।
- ^{১৪২} *প্রাণ্ডজ*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৭, হাদীস নং- ৩৫৭৫।
- ^{১৪৩} ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৮৯, হাদীস নং- ৫০১৩।
- ^{১৪৪} ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭ ও ১৬৯, হাদীস নং- ২৮৯৭, ২৯০১।
- ^{১৪৫} ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, ২৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৭৬, হাদীস নং- ১৫৬১০।

বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চা : বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার

ড. এস. এম. ফারুক হোসাইন*

Abstract: Over the long twenty years (1982-2002) of Bangladesh Gram Theater, more than two hundred unit organizations or affiliates have been formed. The theatre activities of the organization have been conducted mainly through the staging of the plays written by the organization's own playwrights. However, considering the evolution of time, expansion of the organization, perspectives of industrial thought, socio-economic and political situations, the Gram theatre staging the foreign plays by translation and adaptation have also been completed by the units or affiliates of Gram theaters in Bangladesh. Discussion on the content and construction style of eleven theatre productions of six affiliates of Bangladesh Gram Theater has been covered in the present research work. The article seeks to uncover the context of the modern artistic mindset in the selection of the content of the notable productions of the selected theater troupes and in the genre of theatre production. That is to say, the process of making theatre productions of the theater troupes included in the research is as much developed and unique as the modern drama theory agrees, an exploration with this process is the main intention of this essay.

বাংলাদেশের নগর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক নাট্যচর্চার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের। বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যময় সাংস্কৃতিক ধারার সাথে আধুনিক শিল্প ভাবনার যৌথ সম্মিলনে জাতীয় নাট্য-আঙ্গিক বিনির্মাণের মুখ্য অভিপ্রায়ে সংগঠনটির পথ চলা। জানা যায়, *কিন্তুনাখোলা* মঞ্চায়নকালে ঢাকা থিয়েটারের দুই প্রাণপুরুষের যুগল ভাবনায় অঙ্কুরিত হয় *গ্রাম থিয়েটার* ধারণা।^১ আহ্বান আসে গ্রামে চলো-গ্রামে চলো। অনুসন্ধান চলে আধুনিক থিয়েটার ভাবনাকে সাধারণ মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ করার কার্যকরী পন্থার। কারণ ঢাকা থিয়েটার বিশ্বাস করতো আধুনিক থিয়েটারকে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন-ঘনিষ্ঠ করতে পারলেই দূর হবে আমাদের সাংস্কৃতিক বন্ধাত্ব।^২ অনুসন্ধানের নানান পথ পরিক্রমায় ১৯৮১ সালে তালুক নগরের প্রখ্যাত শিল্পী আজহার বয়াতির মেলা-কে উপলক্ষ করে শুরু হয় গ্রাম থিয়েটারের সূচনা কার্যক্রম। *বোধন* (কুষ্টিয়া), *সংলাপ* (ফেনী), *পাবনা থিয়েটার* (পাবনা) এবং *বগুড়া থিয়েটার* (বগুড়া) নিজেদের সম্পৃক্ত করে গ্রাম থিয়েটার কার্যক্রমের সাথে। ১৯৮২ সালের জানুয়ারি মাসে আজহার বয়াতির মেলায় ঢাকা থিয়েটার *সয়ফুল মুলকের দইরা* যাত্রা নাটকটি মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে গঠন করে দেশের প্রথম গ্রাম থিয়েটার ইউনিট *তালুকনগর থিয়েটার*।^৩ গ্রাম থিয়েটারের রূপকার, তত্ত্বনির্মাতা সেলিম আল দীন গ্রাম থিয়েটার কথাটির অর্থ প্রকাশ করেন এভাবে- *গ্রাম থিয়েটার কথাটির অর্থ হলো বাংলাদেশের জনপদের গ্রামীণ অংশে আধুনিক কালের শিল্প মনস্কতার নাট্যচর্চা*।^৪

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি সেলিম আল দীনের উল্লিখিত অভিমতের প্রেক্ষিত ও তার যথার্থতা নির্ণয়ের অভিপ্রায়েই রচিত। অর্থাৎ বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চায় বাংলাদেশের গ্রাম থিয়েটারের ভূমিকা নির্ণয়ের প্রয়াস নেওয়া হবে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা *সয়ফুল মুলকের দইরা যাত্রা* (১৯৮২) থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সময়ে গ্রাম থিয়েটারের বিভিন্ন ইউনিট বা অঙ্গসংগঠন কর্তৃক উপস্থাপিত উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাসমূহের বিষয়বস্তু ও নির্মাণরীতি প্রবন্ধের মূখ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত। আলোচনার শুরুতে বাংলাদেশের গ্রাম থিয়েটারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তার কার্যক্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান আবশ্যিক বলে মনে হয়। কারণ বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের মধ্যে

* প্রফেসর, নাট্যকলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আধুনিক নাট্যচর্চার বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনাটি কতোখানি প্রযুক্ত তা উন্মোচন গবেষণা কর্মের প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে বিবেচ্য।

উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার মনে করে, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন বরাবরই অনুপস্থিত। শিল্প-সাহিত্য এবং রাজনীতি কখনোই সম্পৃক্ত হতে পারেনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে। উভয়কে সাধারণ মানুষের জীবনসম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যগুলো নির্ণীত হয়েছে-

ক) জাতীয় নাট্য-আঙ্গিকের বিকাশ।

খ) ঐতিহ্যনির্ভর লোক-নাট্যকাঠামো ও শিল্পীরীতির উদ্ধার, সংরক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে আধুনিক নাটকের সাথে সমন্বয় সাধন।

গ) আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টিশীল বিকাশ।

ঘ) মেলাপত্তনের মাধ্যমে চেতনার উন্মেষ।

ঙ) লোকজ অভিনয়রীতির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।

চ) লোকজ সংস্কৃতিকে সমগ্রজাতির জীবনঘনিষ্ঠ করা।

ছ) জাতীয় নাট্য-আঙ্গিকের প্রচার ও প্রসার।

জ) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিকাশ।^৮

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের কার্যক্রম : শিল্প সৃষ্টির মহৎ অঙ্গীকারে গ্রাম থিয়েটারের জন্ম দেশের অস্থির ও অনাকাঙ্ক্ষিত এক রাজনৈতিক পরিবেশে।^৯ রাজনৈতিকভাবে দ্বিধা-বিভক্তি, সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মৌলবাদের অপতৎপরতা থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ঐতিহ্যনির্ভর সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে আত্মসচেতন এবং একত্রিতকরণের অভিপ্রায়ে গ্রাম থিয়েটার নিম্নলিখিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করে:

ক) গ্রামে মেলাপত্তন করা

খ) গ্রামে নাটক করা

গ) নাট্যপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

ঘ) লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা

ঙ) পাঠাগার স্থাপন করা।^{১০}

সাধারণত মেলাগুলো আয়োজিত হয় উপজেলা পর্যায়ের একটি বা দুটি স্থানে। মেলার স্থান নির্বাচনে গুরুত্ব পেয়ে থাকে প্রখ্যাত কোনো রাজনৈতিক নেতা, সমাজ-সেবক, বয়াতির জন্মস্থান বা সমাধিস্থল, ঐতিহাসিকভাবে বা বিশেষ কোনো শিল্পকর্মের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান অথবা নদীর পাড়-সংলগ্ন কোনো বটতলা।^{১১} স্থানীয় বিভিন্ন সংগীত-শিল্পী, বয়াতি, পটুয়া, চিত্রকর, সমাজসেবকদের সমন্বয়ে সচরাচর অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ অথবা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে কয়েকদিনব্যাপী মেলার আয়োজন হয়ে থাকে।^{১২} গ্রাম থিয়েটার কর্তৃক আয়োজিত কয়েকটি মেলা হচ্ছে- আজাহার বয়াতির মাঘীমেলা, শেখ দারোগ আলী বয়াতির পৌষ মেলা প্রভৃতি। গ্রাম থিয়েটার নাটক মঞ্চায়নের উৎকৃষ্ট স্থান হিসেবে বিবেচনা করে মেলার নির্দিষ্ট কোনো স্থানকে। স্থানীয় সার্বজনীন সমস্যার সমন্বয়ে স্থানীয় নাট্যকার কর্তৃক লিখিত নাটক এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। গ্রাম থিয়েটার মনে করে, দক্ষ নাট্যকর্মী হিসেবে গড়ে উঠতে হলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অত্যাव্যশ্যক। এ কারণে সংগঠনটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। নাট্যকার প্রশিক্ষণ, অভিনেতা প্রশিক্ষণ এবং নির্দেশক প্রশিক্ষণ প্রধানত এই তিন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সংগঠনটি। এতদ্ব্যতীত এদেশে প্রথম মহিলা নাট্যকর্মী প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার।^{১৩} সর্বজনমাত্রই স্বীকার্য যে, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক-সংস্কৃতির অনেক ধারাই আজ বিলুপ্ত প্রায়। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার আমাদের এই বিলুপ্ত প্রায় লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে গ্রাম থিয়েটার বিভিন্ন লোকনাট্য, অন্যান্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যেমন, বিভিন্ন ধরনের তৈজসপত্র, আসবাবপত্র সংরক্ষণ এবং কৃতি সাধক, শিল্পীদের পুনর্বাসনে ব্যবস্থা করে থাকে। পাঠচর্চা বা অধ্যয়নের নিমিত্তে প্রতিটি সংগঠনে একটি করে পাঠাগার তৈরির উদ্যোগ নিতে পারে। গ্রাম থিয়েটারের উপর্যুক্ত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের অঙ্গসংগঠনগুলো, যা প্রথম অবস্থায় গ্রাম থিয়েটার ইউনিট নামে পরিচিত ছিলো। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের কেন্দ্রীয় পরিষদ এক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনাসহ প্রত্যক্ষ নানা সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়াও গ্রাম থিয়েটার বৈরী রাজনৈতিক পরিবেশে যেমন,

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, তেমনি প্রাকৃতিক নানা দুর্যোগে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়েছে সর্বাত্মে।^{১১} গ্রাম থিয়েটার তার সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে নিজেদের কষ্টার্জিত অর্থায়নের মাধ্যমে। তবে সমর্থনযোগ্য ইস্যু হিসেবে ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় স্বাস্থ্য আমার অধিকার প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিলো ১৯৮৯ সালের ২৯ জুন জাতীয় পর্যায়ের প্রথম অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। উক্ত প্রকল্পের মূল লক্ষ ছিলো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য, বাসস্থান এবং বস্ত্র, মানুষের এই পাঁচটি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা। গ্রাম থিয়েটারের এ উদ্যোগ ছিলো একটি নিরীক্ষামূলক প্রয়াস।^{১২} প্রকল্পটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর গ্রাম থিয়েটার সরকারি বা বেসরকারি অর্থায়নে আর কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করে নি।

নাট্য-সংগঠন তৈরি : বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার তার কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে গ্রাম পর্যায়ে আগ্রহী সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নাট্যদল বা সংগঠন তৈরি করে থাকে। প্রথম দিকে এসকল সংগঠন অভিহিত হতো গ্রাম সংগঠন নামে। বর্তমানে গ্রাম-সংগঠনগুলো নিজেদের থিয়েটার হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। গ্রাম থিয়েটারের সংগঠনগুলো তৈরি হয় দু-ভাবে। প্রথমত, গ্রাম থিয়েটারের আদর্শ-উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত দলগুলো অন্তর্ভুক্ত হয় গ্রাম থিয়েটার নাট্যদল হিসেবে। দ্বিতীয়ত, গ্রাম থিয়েটারের কর্মীদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ স্থাপনপূর্বক নতুন নাট্যদল গঠনের মাধ্যমে। গ্রাম থিয়েটার নাট্যদলে সকল শ্রেণির আদর্শবান ব্যক্তির সদস্য হিসেবে মনোনীত হতে পারেন। তবে স্বাধীনতা-বিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত। গ্রাম থিয়েটারের অঙ্গসংগঠনগুলোর নামকরণ করা হয় সাধারণত সংগঠনটির অঞ্চল, নদী, প্রখ্যাত কোনো ব্যক্তি বা সে অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কোনো ব্যক্তির নামের সাথে থিয়েটার শব্দটি যোগ করে। যেমন, তালুকনগরের নাম অনুসারে তালুকনগর থিয়েটার, বংশাই নদীর নামে বংশাই থিয়েটার (ধামরাই), মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সমর-এর নামে শহীদ সমর থিয়েটার (জামালপুর)। তবে এর ব্যতিক্রমও হয় যেমন: অমৃত থিয়েটার (জামালপুর), রংধনু থিয়েটার (ফেনী), ইংগিত থিয়েটার (গাজীপুর), প্রগতি থিয়েটার (রাজবাড়ী) প্রভৃতি। সদস্য অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। দলের প্রয়োজনে দলগুলোই নির্ধারণ করে সদস্য সংখ্যা। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার সংগঠনের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন মেয়াদের স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করে থাকে।

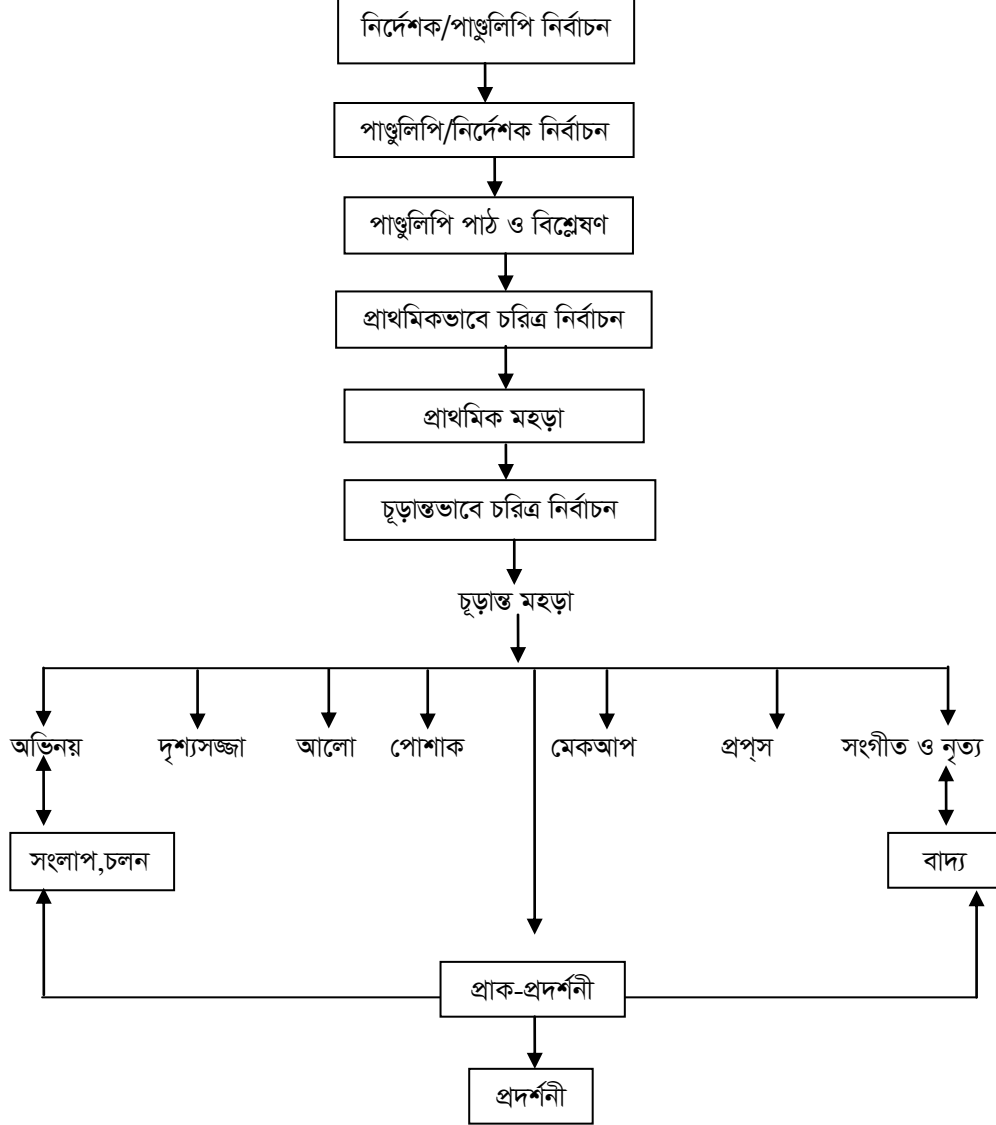
কর্মএলাকা : গ্রাম থিয়েটার বাংলাদেশভিত্তিক সংগঠন হিসেবে বিবেচিত বিধায় সমগ্র বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের কর্মএলাকা।^{১৩} এই বৃহৎ পরিসরে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষে কেন্দ্রীয় পর্যদ সমগ্রদেশকে ত্রিশটি অঞ্চলে বিভাজিত করেছে। মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, বিখ্যাত ব্যক্তি ও ঐতিহাসিক স্থানের নাম অনুকরণে উক্ত অঞ্চলগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, শহীদ রফিক অঞ্চল, মুক্তিযোদ্ধা খালিদ মোশাররফ অঞ্চল, জয়নুল আবেদীন অঞ্চল এবং ভাওয়াল অঞ্চল। দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক সমন্বয়কারীগণ ঐ অঞ্চলের সার্বিক কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করে থাকেন। যেহেতু বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার তাদের কার্যক্রমকে সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে মনে করে, তাই আন্দোলনের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানটি দেশের বাইরেও শাখা সংগঠন তৈরিতে আগ্রহী।^{১৪}

বিষয় নির্বাচন : বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার নির্দিষ্ট কোনো ইস্যুকে অবলম্বনপূর্বক নাট্যকর্মে আগ্রহী নয়। গ্রাম থিয়েটার এদেশের দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের অনুপ্রেরণা দিতে চায় তার কর্মক্রমের মধ্য দিয়ে। একারণে সংগঠনগুলোর নাট্যকাহিনির বিষয়বস্তু হিসেবে নির্বাচিত হয় সমসাময়িক নানা সমস্যা, অত্যাচার-অনাচার, মানুষের সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় এবং জীবন-মৃত্যুর কথা।^{১৫} আধুনিক বা বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তায় নির্মিত কাহিনি ও চরিত্রগুলোর ব্যবচ্ছেদ করা হয় উপস্থিত দর্শকের সামনে। গ্রাম থিয়েটার বিশ্বাস করে, নাটকের বিষয়বস্তু এরূপ হবে, যা দেখে কৃষক-শ্রমিকরা সমাজে তাদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সক্ষম হয়। অনুভব করতে পারবে তাদের উপর বিভিন্ন শোষণ প্রক্রিয়ার প্রকৃত স্বরূপ। অর্থাৎ ঠিক যেন আয়নায় নিজেই নিজের মুখ দেখার মতো।

নাট্যনির্মাণ : বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের নাট্যচর্চা আধুনিক কালের শিল্প সৃষ্টির মহৎ অঙ্গীকার থেকে। তাই ঢাকা থিয়েটার-এর সাথে তার যুগপৎ লক্ষ দেশের জাতীয় নাট্য-আঙ্গিক নির্মাণ, যাতে সংযুক্ত হবে বিশ্বের সার্বিক নাট্যরীতি, আধুনিক নাট্য-বিজ্ঞান এবং বাঙালির নিজস্ব নাট্যচর্চার যৌথ সম্মিলন।^{১৬} উল্লিখিত অভিপ্রায় থেকে

গ্রাম থিয়েটার তার নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে আধুনিক থিয়েটার তত্ত্বের অনুশাসনে। অর্থাৎ আধুনিক থিয়েটারের সকল ধারণাকে অত্মস্থ করার মধ্য দিয়েই গ্রাম থিয়েটারের নাটকগুলো নির্মিত হয়।

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়াটির তথ্যভিত্তিক রেখাচিত্র নিম্নরূপ



নাট্যনির্মাণ ক্ষেত্রে গ্রাম থিয়েটার দলগুলো কখনও নির্দেশক নির্বাচন করে। প্রথমেই নির্বাচিত নির্দেশক দলীয় কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে থাকেন। আবার কখনও দলীয়ভাবে পাণ্ডুলিপি নির্বাচনপূর্বক দলীয় কোনো সদস্য মনোনীত হন নির্দেশক হিসেবে। সাধারণত কোনো কোনো দলের বিজ্ঞ, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই নির্দেশনার কার্যটি সম্পন্ন করে থাকেন। কার্যক্রম শুরুর দিকে পাণ্ডুলিপি নির্বাচন প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হতো গ্রাম থিয়েটারের কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে। তবে এক্ষেত্রে দলীয় বা

স্থানীয় কোনো নাট্যকারকে প্রাধান্য দেয়া হয়। নিজস্ব নাট্যকারের অভাবে দলগুলো কেন্দ্র থেকে পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে থাকে।

শিল্পসম্মত অভিনয়রীতি নির্মাণে যাত্রার অভিনয়-রীতি অনেকাংশে বর্জনীয়।^{১৭} এক্ষেত্রে নাট্য-আঙ্গিক আনুষারী নির্ণীত হয় অভিনয়রীতি। সংগীতে লোকজ বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার দলগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সচরাচর সন্ধ্যাপরবর্তী সময়ে নাট্যমহড়া অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের নিজস্ব ঘরে অথবা কোনো স্কুল ঘর, ইউনিয়ন পরিষদ বা বাজারের অন্য কোনো স্থানে। প্রতিটি নাটক নির্মাণে দলগুলো সময় নেয় ১ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত বা তারও অধিক।

প্রদর্শনী : গ্রাম থিয়েটার তার নাটকগুলো মঞ্চায়নের জন্য ব্যবহার করে নিজস্ব উদ্ভাবিত মঞ্চ। মাটি বা অন্য কোনো কিছু দিয়ে নির্মিত মঞ্চগুলোর পরিমাপ ১৬ × ১৬ (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ) ফুট এবং ৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট।^{১৮} মঞ্চের চারপাশে অথবা দুই পাশে তৈরি হয় অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থান রাস্তা। মঞ্চগুলো নির্মিত হয় কোনো স্কুল মাঠ বা অব্যবহৃত কোনো ফাঁকাস্থানে। প্রচারণা শেষে নির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হয় প্রদর্শনী। সন্ধ্যাপরবর্তী যে কোনো সুবিধাজনক সময়ে নাট্যপ্রদর্শনী শুরু হয়ে থাকে। তবে কখনও কখনও বিকেলবেলাতেও প্রদর্শনী হয়ে থাকে। প্রতিটি প্রদর্শনীর ব্যাপ্তিকাল ৩০ মিনিট থেকে প্রায় ২ ঘন্টার মধ্যে। ২০০২ সালের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বাংলাদেশের গ্রাম থিয়েটার কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত গ্রাম থিয়েটার ইউনিটের বা অঙ্গসংগঠনের সংখ্যা ছিল ২০১টি।^{১৯} গ্রাম থিয়েটার প্রত্যাশা করে বিশ্বনাট্যমঞ্চে আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে বাংলাদেশের জাতীয় নাট্য-আঙ্গিক এবং নিজস্ব অভিনয়রীতি।^{২০}

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের পরবর্তী আলোচনা গ্রাম থিয়েটারের অঙ্গসংগঠনগুলো বা অনুমোদিত ইউনিটগুলোর নাট্য নির্মাণের বিষয় ও আধুনিক শিল্পভাবনা সম্পর্কিত আলোচনা। আলোচনাটি বিন্যস্ত হয়েছে ১৯৮২ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রাম থিয়েটারের অঙ্গসংগঠনগুলো কর্তৃক নির্মিত উল্লেখযোগ্য নাট্য প্রযোজনাসমূহের নির্মাণরীতি ও বিষয়বস্তুর আশ্রয়ে।

১৯৮২ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে আধুনিক নাট্যচর্চার অভিপ্রায়ে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের ২০১টি অঙ্গসংগঠন মঞ্চস্থ করেছে প্রায় সহস্রাধিক নাট্য প্রযোজনা। উক্ত পরিসংখ্যানের নির্বাচিত অঙ্গসংগঠনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাট্য প্রযোজনা বক্ষ্যমাণ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত। গ্রাম থিয়েটার অঙ্গসংগঠনগুলোর গবেষণা অন্তর্ভুক্ত নাট্য প্রযোজনাসমূহ হচ্ছে : *সয়ফুল মুলকের দইরা যাত্রা* (১৯৮২, নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ, তালুকনগর থিয়েটার, মানিকগঞ্জ); *মানুষ অমানুষ* (১৯৮৩, রচনা ও নির্দেশনা, আসাদুল্লাহ ফারাজী, শহীদ সমর থিয়েটার, মেলান্দহ, জামালপুর); *জাহেন আলীরে ধর* (১৯৮৪, নির্দেশনা আসাদুল্লাহ ফারাজী, শহীদ সমর থিয়েটার, মেলান্দহ, জামালপুর); *সেনেরখিলের তালুকদার* (১৯৮৫, নির্দেশনা হারুন অর রশীদ, লোক থিয়েটার, জা. বি.); *শকুন্তলা* (১৯৮৮, নির্দেশনা- আফসার আহমদ, লোক থিয়েটার জা. বি.); *বীরঙ্গনা বিমলারা* (১৯৮৯, নির্দেশনা- আসাদুল্লাহ ফারাজী, শহীদ সমর থিয়েটার, মেলান্দহ, জামালপুর); *সংবাদ কার্টুন* (১৯৯৭, নির্দেশনা- এস. এম ফারুক হোসাইন, শহীদ সমর থিয়েটার, মেলান্দহ, জামালপুর); *কোর্ট মার্শাল* (১৯৯৯, নির্দেশনা- তৌফিক হাসান ময়না, বগুড়া থিয়েটার); *কিনুনখোলা* (২০০০, নির্দেশনা- ইউসুফ খসরু, নবাবগঞ্জ থিয়েটার); *দেওয়ান গাজীর কিসসা* (২০০১, নির্দেশনা- মুক্তা আহমেদ, অমৃত থিয়েটার, জামালপুর); *প্রাচ্য* (২০০২, নির্দেশনা- নাসির উদ্দিন ইউসুফ, ঢাকা থিয়েটার, ঢাকা)।

সমস্ত সংস্কারের প্রাচীর পেরিয়ে জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে যে আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল তাকে আশ্রয় পূর্বক রচিত হয়েছে নাটক *সয়ফুল মুলকের দইরা যাত্রা*। রাজপুত্র সয়ফুলের জন্ম হয় সংস্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে। আঠারো বছরের আগ পর্যন্ত তাকে মানুষ হতে হবে অন্ধকার গৃহে। পৃথিবীর

আলো-বাতাস নিষিদ্ধ তার জন্য। এর ব্যতিক্রম হলে সুস্থ অবস্থায় বাঁচানো সম্ভব নয় সয়ফুলকে। একদিন স্বপ্ন যোগে পরীকন্যা জামালের সাথে সাক্ষাৎ হয় সয়ফুলের। পরীকন্যার রূপে পাগল সয়ফুল সংস্কারের সকল প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসে অন্ধকার গৃহ থেকে। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, সকল বাঁধা অতিক্রম করে সয়ফুল মিলিত হয় জামালের সাথে। এ নাটকে মানুষের কর্মক্ষমতাকে বড় করে দেখানো হয়েছে ভাগ্য অপেক্ষা। অর্থাৎ মানুষ তার আপন কর্মগুণে বা ক্ষমতা বলে অদৃষ্টকেও জয় করতে পারে।^{২১}

প্রাপ্ত তথ্য মতে জানা যায় এ নাটকে কোনো সংগীতের ব্যবহার হয়নি। নাটকের অভিনয়রীতি প্রবর্তিত হয়েছে যাত্রাভিনয়ের আদলে। পোশাক ও মেকআপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এ নাটকের মঞ্চব্যবস্থাও নির্ধারিত ছিলো যাত্রা মঞ্চের অনুষঙ্গে। অর্থাৎ মঞ্চ বেঁধে চৌকোণ খোলা নিরাভরণ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে এ নাটকটি। মঞ্চের তিন পাশ নির্ধারিত ছিলো দর্শকাসন।^{২২}

জনৈক মাতব্বর কর্তৃক গ্রামে সৃষ্ট নানা অপকর্ম এবং শিক্ষার অভাবে পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে রচিত নাটক *মানুষ অমানুষ*। আলিমুদ্দিন মাতব্বর গ্রামের একজন প্রভাবশালী জোতদার। তার ঘরে তিন স্ত্রী। অর্থ লিন্সা এবং কর্তৃত্ব বিস্তারের লোভ তার স্বভাবগত। ফলে গ্রামের মানুষকে আলিমুদ্দিন নিয়ন্ত্রণে রাখে প্রভাব বিস্তারের নিমিত্তে। এ ক্ষেত্রে সে আশ্রয় নেয় নানা কৌশল এবং নির্যাতনের। গ্রামের ভাড়াটে অপরাধীরা গ্রামবাসী প্রসারিত করে আলিমুদ্দিনের শোষণ ও নির্যাতনের নির্মম হাতকে। দিনমজুর কালু শেখ তার নির্যাতন ও শোষণের শিকার। মিথ্যে দেনার দায়ে মাতব্বর তার বাড়িতে উঠায় কালু শেখের এক মাত্র সম্বল দুধের গাভী। মাস্টারের প্রতিবাদে কালু ফিরে পায় গাভী কিন্তু আলিমুদ্দিন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় মাস্টারের বিরুদ্ধে। নাট্যকাহিনির অন্য অংশে তুলে ধরা হয়েছে পিতা-পুত্রের অশোভন এবং অনভিপ্রেত আচরণ। মাস্টার এসে বোঝান তাদের এই পারিবারিক কলহের মূল কারণ শিক্ষার অভাব। কাহিনির শেষভাগে আলিমুদ্দিন ষড়যন্ত্রে খুন হয় মাস্টার। মাস্টারের ছেলে রাজার নেতৃত্বে গ্রামবাসী সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলে মাতব্বরের বিরুদ্ধে।^{২৩}

নির্দেশকের মন্তব্য থেকে জানা যায়, এ নাটকের অভিনয়-ক্রিয়া নির্মিত হয়েছে পাশ্চাত্য আধুনিক অভিনয়রীতি ও লোকজ অভিনয়ের যৌথ সমন্বয়ে। ফলে চরিত্রাভিনয়ের সমান্তরালে লোকসংগীতের ব্যবহার লক্ষ করা যায় প্রযোজনাটিতে। এ ছাড়া নিরাভরণ চৌকোণা খোলা-মঞ্চ, সীমিত আলোর ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যধর্মী নাট্যরীতির বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে, তেমনি চরিত্রানুগ পোশাক, মেকআপ ও অভিনয়ে লক্ষণীয় পাশ্চাত্যের আধুনিক অভিনয়রীতির প্রভাব।^{২৪}

সমাজে প্রতিষ্ঠার লক্ষে জনৈক রাজাকারের নানা প্রতারণামূলক ঘটনাগুলোর সমন্বয়ে রচিত হয়েছে নাটক *জাহেন আলীরে ধর*। জাহেন আলী একজন যুদ্ধ অপরাধী রাজাকার। যুদ্ধের অব্যবহিত সময়ে সে আত্মগোপন করে আত্মরক্ষার নিমিত্তে। দেশের পরিস্থিতি অনুকূলে এলে জাহেন আলী আবির্ভূত হয় নতুন পেশায়। গৌরাসী গ্রামে এক কল্পিত মাজারকে কেন্দ্র করে শুরু হয় জাহেন আলীর নতুন জীবন। তার এই ধর্মব্যবসার সহযোগী হিসেবে জোড়ে যায় এক সময়ের পকেট মার কাজিমুদ্দিন। অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রতারণা প্রকাশ পেলে গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে উভয়েই পালিয়ে আসে ঢাকা শহরে। শুরু করে হজ্জে গমন উদ্দেশ্যে সাহায্য তোলার ব্যবসা। সন্তাসীদের উৎপাত এবং অধিক টাকা উপার্জনের প্রত্যাশায় আবারও তার পেশা পরিবর্তন। আরেক রাজাকার বাতেন এম.পি'র সহযোগিতায় জাহেন মেতে ওঠে আদম ব্যবসার নামে লোক ঠকানোর খেলায়। বিদেশ গমন-ইচ্ছুক কয়েকজন সাধারণ মানুষের সর্বস্ব হাতিয়ে পালিয়ে আসে জাহেন ফুলহারা গ্রামে রাজাকার কুদুমোল্লার আশ্রয়ে। জাহেন এবার এতিমখানার পরিচালক। নামমাত্র কয়েকজন এতিম রেখে শুরু হয় তার আরেক নতুন ব্যবসা। জাহেন এ গ্রামে ভিটে মাটি গড়ে বসতির নিমিত্তে। কুদুমোল্লার মাতৃহারা মেয়ে ফাতেমাকে বিয়ে করে নতুন সংসারের স্বপ্ন দেখে জাহেন।

কিন্তু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় মুক্তি যোদ্ধা কার্তিক ও ইমান। জাহেন কর্তৃক প্রতারণিত কাজিমুদ্দিনও এসে যোগ দেয় উভয়ের সাথে। তাদের উদ্যোগে গ্রামবাসীর সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে আবারও সভাস্থল থেকে পালাতে সক্ষম হয় জাহেন আলী, কুদুমোল্লা এবং বাতেন এমপি।^{২৫}

নির্দেশকের মতে জাহেন আলীকে ধর নাটকের অভিনয়রীতি ছিলো বাঙলা লোকজ অভিনয় এবং চরিত্রাভিনয়ের সংমিশ্রণে নির্মিত। এ নাট্যে ব্রহ্মাচারী অভিনয়রীতির প্রভাবও লক্ষণীয়। কারণ জাহেনের পেশা পরিবর্তনের পূর্বে জোকারের সাহায্যে পোস্টার প্রদর্শিত হয়েছে তার পুরাতন ব্যবসার ফলাফল এবং নতুন ব্যবসা সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করার জন্য। অভিনয়ে জোকার কর্তৃক প্রদর্শিত পোস্টারের ভূমিকা সূত্রধরের ভূমিকার অনুরূপ বলে মনে হয়। লোকজ একটি সুরের মাধ্যমে নির্দেশক শুরু করেছেন নাট্যাভিনয়। এ অংশে জাহেন আলীর পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে হাট কবিতার সুর। কার্তিকের বাড়িতেও লক্ষ করা যায়, অনুরূপ কবিতা পাঠের আসর। লোকজ নৃত্য সহযোগে এই কবিতাগুলো পরিবেশিত হয়েছে একক এবং সমবেতভাবে। নাট্যের চরিত্র নির্মাণ, পোশাক ও মেকআপের ক্ষেত্রে নির্দেশক অনুসরণ করেছেন চরিত্রাভিনয় রীতির।^{২৬}

সেনেরখিলের তালুকদার নাটকের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে গ্রামীণ শোষণ, ফতুয়া নির্যাতন এবং পাপ পুণ্যের বিরোধ। দুবাই তালুকদার সেনেরখিলের একজন প্রভাবশালী কুচক্রী ব্যক্তি। দুবাই ফেরত বিধায় তার নাম দুবাই তালুকদার। তালুকদারের সকল অপকর্মের সহযোগী হিসেবে কাজ করে ফালু, আতা এবং মস্তফা। নাট্যকাহিনীর শুরুতে ওহাব ডাকাতের অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে মৃত্যু হয় আশুনে ঝালসে যাওয়া জনৈক বৃদ্ধের। ভোলায় মানসিক ভারসাম্যহীনতা পাকবাহিনীর নির্যাতনের ফল। তালুকদার রাতের অন্ধকারে বিষ প্রয়োগে গরু মারে মুচির দ্বারা, ঘরে আশুন ধরায় ফালুকে দিয়ে। দিনের আলোয় মানুষের নিকট প্রচার করে পাপ ঢোকেছে গ্রামে। গ্রামকে পাপমুক্ত এবং ভোলায় চিকিৎসার নামে জামশা গ্রাম থেকে কবিরাজ হিসেবে আনা হয় তকিবুল্লাকে। পাগল চিকিৎসার নামে ভোলাকে অসাড় করে দিতে চায় তালুকদার। কারণ ইতোমধ্যে ভোলায় সকল জমি গোপনে দলিল করে নিয়েছে তালুকদার। ভয় দেখিয়ে হিন্দু পলুর জমিও দলিল করে নেয় সে। এই অপকীর্তি প্রকাশ পাওয়ার ভয়ে তালুকদারের লোকেরা খুন করে ভোলাকে, দেশ ত্যাগে বাধ্য করে পলুকে। তকিবুল্লার অতিরঞ্জিত ফতোয়ায় পাপবোধ জাগে জোয়াদের মনে। আত্ম অনুশোচনায় পাগল প্রায় জোয়াদ। এই সুযোগে জোয়াদের সবকিছু লিখে নেয় তালুকদার এবং তালুকদারের পরামর্শে জোয়াদ কন্যা কমলাকেও বিয়ে দিতে রাজি হয় বৃদ্ধ তকিবুল্লার সাথে। যদিও তকিবুল্লার ঘরে ছয় স্ত্রী বর্তমান। মস্তফার নিকট সব জানতে পেরে গ্রামবাসীরা আক্রমণ করে তালুকদারের বাড়ি। তালুকদার ততক্ষণে পালিয়ে যায় শহর অভিমুখে। পালিয়ে যায় গ্রামবাসীর হাতে লাঞ্চিত তকিবুল্লা।^{২৭}

নির্দেশক কর্তৃক জানা যায় উক্ত নাট্যে কোনো সংগীতের ব্যবহার হয়নি। গ্রামের একটি আবহ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে পাতাসহ কাঁচা বাঁশ এবং মধুগর আপস্টেজের কোণায় লাউগাছের মাচা। আধুনিক চরিত্রাভিনয় রীতিতে নির্মিত হয়েছে নাট্যের অভিনয় ক্রিয়া। অভিনয়-চরিত্রের পোশাক ও মেকআপ ছিলো চরিত্রানুগ।^{২৮}

শকুন্তলা নাটকে বর্ণিত হয়েছে মূলত স্বর্গ ও মর্তের চিরন্তন বিরোধ। মহামুনি বিশ্বামিত্র তপস্যার বলে স্বর্গবাসীদের আধিপত্যকে পরাভূত করতে চেয়েছিলেন। সেই তপস্যা যখন সাফল্যের দ্বারা প্রাপ্ত, তখন বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করতে বিচলিত দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে দিয়ে ষড়যন্ত্র আটলেন। বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে জন্ম হলো শকুন্তলার। মর্তে ফেলে যাওয়া মেনকা কন্যা শকুন্তলা বড় হয় গৌতমীর মাতৃস্নেহে এবং সখী অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদার সাহচর্যে। শকুন্তলার বয়ঃসন্ধিক্ষণে দেখা দেয় এক দুরারোগ্য ব্যাধি। মাথা ব্যথার সময় তার গা থেকে বের হয় স্বর্ণচাপার গন্ধ। এই ব্যাধি সূত্রেই শকুন্তলা জানতে পারে তার নিজ জন্ম

পরিচয়। একটি নতুন চেতনা আচ্ছন্ন করে রাখে শকুন্তলাকে। সে ঘৃণা করতে থাকে মর্তের মানব জীবন। তার ধিক্কার জাগে মর্তের পচনশীল মানব জীবন-বৃত্তের উপর। ক্রমশ শকুন্তলা স্বর্গমুখী হয়ে পড়ে। মানব কুলের সমস্ত স্নেহ-মমতা অস্বীকার করে শকুন্তলা স্মরণ করে তার জন্মদাত্রী মাকে, যিনি উদ্ধার করবেন এই নোংরা মর্ত থেকে। কিন্তু স্বর্গ থেকে সাড়া আসে না। অবশেষে শকুন্তলার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে নাট্যকাহিনির।^{৯৯}

নির্দেশকের মন্তব্য থেকে জানা যায় গীতল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংলাপ এবং সংলাপের সাথে চরিত্রের আবেগ নির্মাণে নির্দেশক অনেকটাই প্রাচ্যরীতির অনুসারী। মঞ্চ-পরিকল্পনাতেও প্রাচ্যের নিরাভরণতার এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয়। নাট্যের আলোকচিত্র বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় অভিনয়-চরিত্রদের সাজ-সজ্জায় নির্দেশক বাস্তববাদের আশ্রয়ী ছিলেন। অর্থাৎ প্রাচ্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্য অভিনয়রীতির যৌথ সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে এ নাট্যের প্রযোজনারীতি।^{১০০}

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে রাজাকারদের পুনর্বাসন এবং সমাজে প্রভাব বিস্তারের নিমিত্তে তাদের নানা কৌশল ও অপকর্মগুলোর সমন্বয়ে রচিত হয়েছে নাটক *বীরঙ্গনা বিমলারা*। মুক্তিযুদ্ধের সময় ডাংধরা গ্রামে একজন প্রভাবশালী রাজাকার ছিল মুনশি। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ক্ষমতার পট পরিবর্তনে জেল থেকে বেরিয়ে আসে মুনশি। কিন্তু সমাজের মানুষ মন থেকে গ্রহণ করে না তার উপস্থিতি। তোষামোদকারী অনুচর কোবাত আলীর পরামর্শে মুনশি নতুন কৌশল অবলম্বন করে সমাজে প্রভাব বিস্তারের অভিপ্রায়ে। ফলে তার সাহায্যের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত হয় গ্রামবাসীদের উপর। কখনও মজলিশ করে, কাউকে টাকা-পয়সা প্রদানের মাধ্যমে, কোনো কোনো লোককে ধান, চাল, ঘরের ছন এমনকি আবাদি জমি বর্গা দিয়ে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে গ্রামবাসীদের। এ ক্ষেত্রে সে কিছুটা সফলও হয়। গ্রামের নানা বিচার-আচারে ডাক পড়তে শুরু হয় তার। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা আজাদ এবং তার সঙ্গীদের আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হয় মুনশি। আজাদের স্ত্রী বিমলা যুদ্ধের সময় মারা যায় পাকবাহিনীদের নির্যাতনে। স্ত্রীর শোক বহন করে আজাদ প্রতি মুহূর্তে। ভোলা সে গ্রামের একজন দিনমজুর। তার অভাবের সুযোগে, জমিলাকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে মুনশির ছেলে জগলু শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে জমিলার সাথে। মুনশির চক্রান্তে অন্তঃসত্ত্বা জমিলার দায়ভার চাপানো হয় আজাদের উপর। শরিয়তের বিচারের নামে আজাদের উপর ধার্য হয় দুইশো দোররা। দোররা মারা শুরু হলে ভোলা প্রকাশ করে দেয় মুনশির চক্রান্তের কথা। গ্রামবাসী উত্তেজিত হয়ে ওঠে মুনশির উপর। শাহার আঘাতে মৃত্যু হয় মুনশির।^{১০১}

এ নাট্যের নির্দেশক জানান, প্রযোজনাটিতে আধুনিক পাশ্চাত্যধর্মী অভিনয় রীতির অধিক প্রভাব লক্ষ করা গেলেও প্রাচ্যধর্মী অভিনয়রীতির প্রভাবও এখানে দুর্লক্ষ্য নয়। নির্দেশকরে এ মন্তব্যের প্রমাণ মেলে নাট্যাভিনয়ের নিরাভরণ মঞ্চব্যবস্থা এবং সংগীত ব্যবহারের ক্ষেত্রে। চৌকোণা মুক্ত-মঞ্চ অভিনেতার অভিনয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন সীমিত আয়োজনের মধ্য দিয়ে। এ নাট্যে চরিত্র হিসেবে যেমন উঠে এসেছে গ্রামের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষগুলো তেমনি পোশাক হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত পোশাক। মেকআপের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যথাসম্ভব চরিত্রানুগ হওয়ার প্রচেষ্টা।^{১০২}

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী ভিত্তি করে রচিত নাটক *সংবাদ কার্টুন*। তৎকালীন দেশে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা যেমন, রাজাকার পীড়ন, হাইজ্যাক, ছিনতাই, নকল দ্রব্যের উৎপাদন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রদের বড় বড় বুলি আওড়ানো, গুপ্ত হত্যা, পুলিশের ব্যর্থতা, মুদ্রামানহাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, এ সবার মাধ্যমে অনিশ্চিত এবং অস্থির এক সমাজ ব্যবস্থা এ নাটকের সামগ্রিক বিষয়বস্তু। খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন দৃশ্যের সাহায্যে বা খণ্ড চিত্র রূপে এই বিষয়বস্তুগুলো নাট্যকাহিনিতে তুলে ধরা হয়েছে।^{১০৩}

এই নাটকটি উপস্থাপিত হয়েছে নাট্যকার উল্লিখিত মঞ্চনির্দেশনাসমূহ অক্ষুণ্ণ রেখেই। প্রযোজনাটির অভিনয়-ক্রিয়ায় লক্ষণীয় বর্ণনাধর্মিতার আশ্রয়ে সংলাপ ও চলনে এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গি। অভিনয়ের কোনো কোনো অংশে সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে সুর ও তালকে আশ্রয় করে। যেমন রাজাকার সন্দেহে জনৈক পথচারীকে মারার দৃশ্য। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিনেতাদের চলন নির্ধারিত ছিলো তবলার তালে তালে। যেমন পুলিশের দৃশ্যগুলোতে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে প্লাকার্ড ধারী সঙরা মঞ্চে ঢোকে পুতুল নাচের ভঙ্গিতে। প্লাকার্ডের ব্যবহার এবং বর্ণনাকারীর ভূমিকায় অনেকটা ব্রেক্টীয় অভিনয়রীতির প্রভাবও লক্ষ করা যায় এ প্রযোজনায়। অভিনেতাদের পোশাক নির্ধারিত হয়েছে বাস্তবরীতি এবং প্রতীকীর অনুযায়ী। যেমন পুলিশ ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রের পোশাক চরিত্রানুগ। তবে পুলিশের ব্যর্থতা বা অক্ষমতা প্রকাশে ফুলপ্রান্টের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে হাফপ্যান্ট। এ ক্ষেত্রে পোশাক রূপক ধর্মী। মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে চৌকোনা মুক্ত-মঞ্চ। নিরাভরণ মঞ্চব্যবস্থায় অভিনয়-ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে উন্মুক্ত মঞ্চে।^{৩৪}

সেনাবাহিনীর একজন জওয়ানের কোর্ট মার্শালকে নিয়ে কোর্ট মার্শাল নাট্যকাহিনীর অবতারণা। সিপাহী আকবর আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নির্দিষ্ট স্বীকার করে নেয়। সে স্বীকার করে ক্যাপ্টেন সাকিবর ও মেজর এফ,এ, খানকে লক্ষ করে সে গুলি ছুঁড়েছে। যার ফলে মেজর এফ, এ, খান আহত হন এবং ক্যাপ্টেন সাকিবর নিহত হন। কিন্তু আসামী পক্ষের উকিল বিচারের রায়ে বাঁধা হয়ে দাঁড়ান। তাঁর যুক্তিতে, একজন সাধারণ সিপাহী কোন পরিস্থিতিতে, কি মানসিক অবস্থায় তার উর্ধ্বতন অফিসারদের উদ্দেশ্য করে গুলি ছুঁড়ে বা ছুঁড়তে বাধ্য হন। সুবেদার মান্নান, ক্যাপ্টেন রত্না, লেঃ কর্নেল চৌধুরী, মেজর এফ. এ খানকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলল আসামী পক্ষের উকিল মেজর মাহমুদ। ঘটনা উদ্ঘাটিত হতে শুরু করে। জানা যায়, মেজর এফ, এ, খান উচ্চ বংশীয়। তার দাদা বৃটিশ আমলে উপাধি প্রাপ্ত খান বাহাদুর, পিতা পাকিস্তানী আমলে উপাধি প্রাপ্ত তৎকালে পাকিস্তান। এফ, এ, খান স্ত্রী নিপীড়ক এবং উন্মুক্ত যৌনাচারে অভ্যস্ত। তিনি বাংলাদেশের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী। পক্ষান্তরে আকবরের মা ছিলেন পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা ধর্ষিতা এবং বীরঙ্গনা। মেজর খানের ভাষায় তিনি ছিলেন ফকির এবং বেশ্যা। আরো জানা যায় মেজর এফ, এ, খান সিপাহী আকবরের স্কুল সহপাঠী ছিলেন। স্কুলে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হন। সবাই ভাবত, আকবর একদিন এশিয়ান গেমসে চ্যাম্পিয়ন হবে। কিন্তু বাদ সাধল মেজর এফ, এ, খান। কারণ আকবর তার কাছ থেকে ১০০ মিটার স্প্রিন্টে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে। এফ, এ খানের অকথ্য গালিগালি ও অত্যাচারের খড়গ নেমে আসে সং, সত্যনিষ্ঠ আকবরের উপর। এরূপ অবস্থা যখন সকল সহোদর সীমা অতিক্রম করে তখন আকবর ‘রাজাকারের বাচ্চা’ এই উচ্চারণে মেজর এফ, এ, খান ও ক্যাপ্টেন সাকিবরের দিকে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হন। এফ, এ, খান আহত এবং নিহত হয় ক্যাপ্টেন সাকিবর। নাট্যকাহিনীর শেষে বিচারের রায়ে ফাঁসি হয় আকবরের।^{৩৫}

এ প্রযোজনাটিতে একটি বিষয় এক সেটের মধ্যে প্রায় দু’ঘন্টাব্যাপী উপস্থাপিত হয়েছে। সংলাপই এর প্রধান অবলম্বন। প্রতিটি সংলাপকে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের বাচিক অভিনয়ের উৎকর্ষে দর্শকদের শ্রুতিতে পৌঁছে দিয়েছে অনায়াসে। মঞ্চ-পরিকল্পনায় পরিকল্পক বাস্তবধর্মী আর্মি কোর্টের পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়েছে। এ অভিপ্রায়ে তিনি মঞ্চের মিডিল-আপে বিচারকদের বসার জন্যে তিনটি চেয়ার ও টেবিল এবং সাক্ষীদের জন্যে মিডিল-রাইটে ও মিডিল লেফটে দুটি করে চেয়ার ব্যবহার করেছেন। ডাউন-স্টেজে কাঠ গড়ার পাশাপাশি রাইট এবং লেফটে একটি করে চেয়ার ও টেবিল ব্যবহৃত হয়েছে। আসামী ও স্বাক্ষীর জন্যে ডাউন-রাইট ও ডাউন-লেফটে দুটি কাঠগড়ার ব্যবস্থা করেছেন মঞ্চ-পরিকল্পক। পোশাক পরিকল্পনার পরিকল্পক পুরোপুরি বাস্তবধর্মী রীতিকে অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ অভিনেয় চরিত্রদের পোশাক ছিলো

বাংলাদেশের আর্মিদের ব্যবহৃত পোশাকের অনুরূপ। সঙ্গীত হিসেবে ‘মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে’ গানটির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সমালোচকরা।^{৩৬}

তালুকনগর গ্রামে মাঘী মেলায় সংঘটিত নানা ঘটনার সমন্বয়ে রচিত হয়েছে নাটক *কিঙনখোলা*। মেলায় বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে আয়োজন করা হয় যাত্রাগান, কবির লড়াই ও পুঁথিপাঠের আসর। দশ গ্রামের মানুষ একত্রিত হয় এ মেলায়। ইদু কন্ট্রাকটর মেলা কমিটির মেম্বর। ছায়ারঞ্জন বনশ্রীবালা, রবিদাস যাত্রাদলের লোক, রুস্তম, ডালিমন সাপুড়ে বেদে। সোনাই প্রায় ভূমিহীন এক শ্রমজীবী। নতুন জোতদার ইদুর নগদ টাকা আর জমির প্রতি ভীষণ লোভ। পাওনা টাকা আদায়ের নামে সোনাইয়ের শেষ সম্বল এক টুকরো জমিকে গ্রাস করতে চায় ইদু। সে জন্য সোনাইকে তাড়া করে ফেরে ইদু ও তার লোকেরা। ইদুর পরামর্শে এবং তার শাগরেদদের চক্রান্তে জুয়া খেলায় সর্বশান্ত হয় সোনাই। যাত্রাদলের ছায়ারঞ্জন ভালোবাসে বনশ্রীকে। বনশ্রী মনে প্রাণে প্রার্থনা করে দলের হিরো রবিদাসকে। অধিকারীর প্ররোচনায় বনশ্রীকে মদ গিলে নাচতে হয় ইদুর সামনে। দেহও আর শুদ্ধ নেই তার। ছায়ার মাধ্যমে বনশ্রীর সাথে পরিচয় হয় সোনাইয়ের। লাউয়ার দলের রুস্তম ও ডালিমন স্বপ্ন দেখে অন্য পেশার। এ পেশায় আর পোষাচ্ছে না তাদের। সোনাইয়ের মৃগী রোগের সূত্র ধরে রুস্তমের সাহায্যে পরিচয় ঘটে ডালিমনের। ডালিমন স্বপ্ন দেখে সোনাইকে নিয়ে। অন্যত্র রুস্তম বিয়ে করতে চায় ডালিমনকে। জুয়ায় সর্বশান্ত হয়ে ক্রুদ্ধ সোনাই খুন করে ইদু কন্ট্রাকটরকে। জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে হতে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করে বনশ্রীবালা। ডালিমনের নৌকা ভাসে গাঙে। রুস্তমের সঙ্গে সাপুড়িয়া-বেদের দেশ দুখাই পুরে যাত্রা করে সোনাই।^{৩৭}

নির্দেশকের মতে এ প্রযোজনায় প্রাচ্যধর্মী অভিনয়রীতির প্রয়োগ ঘটেছে পাণ্ডুলিপির আঙ্গিকগত দিক বিবেচনায়। ফলে অভিনয়-ক্রিয়ায় প্রতীয়মান কথকতা, মঙ্গলগান বা গাজির গানের অভিনয় রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। যে কারণে দর্শকরা নাট্য-ঘটনার সংঘাত ও উত্তেজনার পরিবর্তে অভিনেতাদের বাহ্যিক অভিনয়ের প্রতি আবিষ্ট হন অধিক। যেমন নাটকের সূচনা সঙ্গীতে পথের যে বর্ণনা বিধৃত হয় তা শেষ পর্যন্ত দর্শকের বোধশক্তিতে মঞ্চের সীমিত রাস্তায় সীমাবদ্ধ থাকে না। তাদের চিত্রমাঝে তা মানিকগঞ্জের বিভিন্ন জনপদের সত্যিকার দৃশ্যচিত্রে রূপান্তরিত হয় ভিন্ন রঙে ভিন্ন রূপে। মৃগী রোগের সাধারণ লক্ষণ প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রোটোয়াক্সির অভিনয় রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রযোজনাটির মঞ্চসজ্জা নিরাভরণ কিন্তু বিশাল ও বিস্তৃত। নদীর পাড় ঘেঁষে বৃহৎ বট বৃক্ষের নীচে বালু ও বাঁশ দ্বারা নির্মিত মঞ্চ যথার্থ আবহ তৈরি করে কোনো গ্রামীণ মেলার। পোশাক পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়েছে নাট্যচরিত্র সমূহের অন্তর্গত প্রবণতা, পেশা এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে।^{৩৮}

দেওয়ান গাজীর কিসসা নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র দেওয়ান গাজী প্রভূত বিস্তৃতিশীল এক ব্যক্তি। গাজী মাতাল অবস্থায় হৃদয়বান ভদ্রলোক। কিন্তু নেশা ছুটে গেলে সে সামন্ত-প্রভুর প্রতিভূ। তার একমাত্র মেয়ে লায়লী বাবার বিভোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রচণ্ড স্বার্থপর। লাইলীর হবু বর নফর আলী দারোগা বাহ্যত সচেতন। টাকার লোভে ভাবী স্ত্রীর ফস্টিনস্টি সে দেখেও না দেখার ভান করে। মোক্তার হচ্ছে গাজীর মদের গ্লাসের ইয়ার। গাজীর উচ্ছিষ্টেই তার তৃপ্তি। চেয়ারম্যান এবং কাজী বিত্ত ও লোভ-লালসার দাস। এই চরিত্রগুলোর বিপরীতে অন্য চরিত্রগুলো হচ্ছে, মাখন, সকিনা, চামেলী, লতা, কুসুম, আবেদ এবং মজুরের দল। মাখন আগে রিকশা চালাত। এখন সে গাজীর খাস বেয়ারা। সকিনা গাজীর বাড়ির কাজের মেয়ে। তার মায়ের নাম কুলসুম, বাবার নাম কেউ জানে না। তার জীবনে কোনো সাধারণ স্বাদ-আহ্লাদ নেই। তবে মাঝে মাঝে সে স্বপ্ন দেখে, যারা জোত-জমি, ধানের কল, সুপারি বাগান ক্রমাগত গ্রাস করছে তাদের সব কিছু ভেঙে - চুরে গুড়িয়ে দেয়া যায় না? চামেলী, লতা, কুসুম শরীর বেঁচে পেট চালায়। ওদের প্রশ্ন একটাই-পেট ভরে খেতে পাব তো, একটু ভালো-মন্দ কাপড় পাব তো? আর আবেদ ও মজুরের দলের জীবন-দর্শন, মরাকে মরার ভয় দেখিয়ে লাভ কী?^{৩৯}

নির্দেশকের উক্তি থেকে জানা যায়, প্রযোজনাটি ব্রেকটিয় অভিনয়রীতির আলোকে নির্মিত হলেও, বাঙলা বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির অনেক বৈশিষ্ট্য সচেতনভাবে ব্যবহার করেছেন অভিনয় নির্মাণের ক্ষেত্রে। যা লক্ষণীয় সূত্রধরের উপস্থিতি, অভিনেতাদের সীমিত হস্তোপকরণ, লোকজ সুরের ব্যবহার, লোকজ বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার এবং নিরাভরণ মঞ্চব্যবস্থায়। চরিত্রাভিনেতাদের পোশাক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দেশক প্রাধান্য দিয়েছেন নাট্যচরিত্র সমূহের অন্তর্গত প্রবণতা এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে। মেকআপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে চরিত্রের উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোসহ বিবেচনা করা হয়েছে চরিত্রের বয়স। অর্থাৎ নাট্যের পোশাকে ও মেকআপ ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রানুগতভাবে।^{৪০}

প্রাচ্য নাটকের কাহিনি বিস্তৃত হয়েছে সয়ফরের বিয়ে এবং সে বিয়ের বাসরে পরম কাজিত নববধূর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। শামুক ভাস্কর সয়ফর চানের সঙ্গে কাজলাকান্দার নোলকের বিয়ে। বিয়ে শেষে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরছে সয়ফর চান। সঙ্গে পালকি নৃত্যকের দল, শ্যালক আর বরযাত্রীগণ। এই যাত্রাপথে রয়েছে সয়ফরের প্রেষণবিন্দু থেকে দেখা সাত সাতটি ফ্যাশব্যাক। ফ্যাশব্যাকে সয়ফরের স্মৃতি আর কল্পনার মধ্য দিয়ে উদ্ঘাটিত হয় তার অতীত এবং বর্তমান। জমি বিক্রির টাকায় বিয়ের খরচ জুগিয়েছে সে। জোতদারের ঋণ শোধের ব্যর্থ চেষ্টায় সে এখন নিঃস্ব প্রায়। স্মৃতির চরিত্রেরা সশরীরে এসে কথা বলে। কবর ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে মৃত জোতদার জিতু মাতব্বর। স্মৃতির সঙ্গে পায়ে পায়ে চলেছে স্বপ্নভরা বর্তমান। এই বর্তমানে পালকির ভেতরে বসে থাকা নোলকের গায়ের মিহি মধুর সুবাস এসে সুখ জাগায় দিনমজুর সয়ফরের মনের ঘরে। ছয়মাস আগে আঘাতে এক বাড়ির রাতে বেহুলা-লখিন্দরের পালায় সে দেখেছিল তার এই সুবজ নীল পরীর মুখ। তখন থেকে সে উন্মুখ। এই উন্মুখ সয়ফরের বউ লোলককে বাসর শয়্যার সাপে কাটে। ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, ভাসানযাত্রার গান সবই ব্যর্থ হয়। নোলক শায়িত হয় কররের অন্ধকার গহবরে। দাদি কেঁদে ওঠেন উলটা লখিন্দর হাইগো উলটা বাসর তারপর শুরু হয় সয়ফরের আরেক যাত্রা। শেষ জমি বন্ধক রাখা বউয়ের হত্যাকারীকে খোঁজার প্রাণপণ যাত্রা। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে যখন বিশাল বাসুকির জীবন্ত ফণার মুখোমুখি হয় সে, তখন আঘাত করতে ভুলে যায় সয়ফর। এ সবার মাঝে সাপকে আগলে দাঁড়ায় সাদা শাড়ি পরিহিত দাদি। এখানেই দাদি প্রাচ্য দর্শনের মুখপাত্র হয়ে ওঠে। সয়ফর তাই আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করতে গিয়েও তার উদ্যত অস্ত্র নামিয়ে নেয়।^{৪১}

নির্দেশকের মন্তব্য থেকে জানা যায়, পাঁচালিধর্মী এ নাট্যের উপস্থাপনা কৌশল আবিষ্কার করা হয়েছে আধুনিক মনন, নাট্যবিজ্ঞান এবং লোকজ নাট্যশৈলীকে ক্রমাগত আত্মস্তু করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অর্থাৎ নির্দেশকের পূর্ববর্তী প্রযোজনাগুলো থেকে প্রাচ্যে ব্যবহৃত বর্ণনাত্মক রীতি একটি নতুন মাত্রার সংযোজন। যাকে তিনি একে বারেই অভিনব বলে উল্লেখ করেছেন।^{৪২} যেমন পূর্বের প্রযোজনাগুলোতে বর্ণনাকারী বা গায়ন ছিল একটি স্বতন্ত্র চরিত্র। তারা বর্ণনা করত সরাসরি দর্শকের কাছে। কিন্তু প্রাচ্যে বর্ণনাকারীরা কখনোই দর্শকের সঙ্গে কথা বলে না, দর্শকের চোখে চোখ রাখে না এখানে তারা অধিকতর চরিত্রঘনিষ্ঠ। স্বতন্ত্র কোনো চরিত্রের পরিবর্তে কথক বা বর্ণনাকারী এখানে অভিনয়ে চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশক। চরিত্রের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে কোনো অনুভূতি বা চিন্তা বর্ণনা করে। বর্ণনা শেষে আবার বর্ণনায় ঢুকে যায় বর্ণনাকারীরা। একই সঙ্গে বর্ণিত বিষয়ে অন্য একজন অভিনয় করে দেখায়। নির্দেশক এখানে লোকজ অভিনয়রীতি ও স্তানিস্লাভস্কি প্রবর্তিত অভিনয়রীতির সংমিশ্রণে সম্পন্ন করেছেন এ অভিনয় পদ্ধতিটি। এ প্রযোজনার মঞ্চ পরিকল্পনায় দেখা যায় দর্শকেরে মধ্যখানে কাঠের পাটতন সাদৃশ্য মাঝখানে ঢালু বিশাল আয়তাকার মঞ্চ। মহিলা সমিতি মিলনায়তনের পূর্ব-পশ্চিম দিকে লম্বালম্বি যার অবস্থান। মিলনায়তনের প্রবেশ পথ সংলগ্ন এবং তার বিপরীত পাশে অর্থাৎ প্রসেনিয়াম মঞ্চ সংলগ্ন এই দুই দিকে সারিবদ্ধ দর্শকাসন। মঞ্চের মাঝখানে খাঁজ বা ঢালু অংশটি কখনও ব্যবহৃত হয় নদী কখনও ঢালু ভূমি হিসেবে। আবার এই ঢালু বা নিচু অংশটি পুরো মঞ্চকে দুই ভাগ করে ভিন্ন ভিন্ন এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অথবা

পুরো মঞ্চটি দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের অনুভূতি জন্মায়, সে হিসেবে ব্যবহৃতও হয়। সয়ফরের সাপ খোঁজার দৃশ্যে গর্ত খননের সময় এই মঞ্চ হয়ে উঠে দ্বিতর বিশিষ্ট। মঞ্চের পাটাতন তুলে তার ভেতরে অভিনেতাকে নামিয়ে, মাথার উপর মশারির পাতলা আচ্ছাদন ব্যবহার পূর্বক মঞ্চপরিকল্পক ও নির্দেশক আপাত সরল এক স্তরের মঞ্চকে রূপান্তরিত করেন দ্বিতরের ভূমিতে। মঞ্চের নীল রং অনেকটাই প্রতীকী হিসেবে ব্যবহৃত। অভিনেয় চরিত্রদের ব্যবহৃত পোশাকের রং অনেকটা অনুজ্জ্বল, শুধুমাত্র নোলক, দাদি ও পালকি নৃত্যকের পোশাক ব্যতীত। মেয়েরা ব্যবহার করেছে টাঙ্গাইলের সূতি শাড়ি এবং ছেলেরা গ্রামীণ চেকের হাতাকাটা ফতুয়া। দাদির সাদা পোশাক অনেকটাই প্রতীকী, যা সাম্যের, সহাবস্থানের ইঙ্গিত প্রদান করে। সংগীতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় মনসামঙ্গলের, ভাসানযাত্রার পালা, মনিপুরী ফোক, ইউসুফ-জুলেখার গীত, হামদ-নাত ও ধ্রুপদি সংগীতের সুর ভাঙচুরে বাঙালির লোকজ-আবহমাখা সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।^{৪০}

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার অন্তর্ভুক্ত ৮টি অঙ্গসংগঠনের উল্লেখযোগ্য ১১টি নাট্য প্রযোজনার (১৯৮২-২০০২) বিষয়বস্তু এবং নির্মাণরীতির পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ গবেষণার মূল অভিপ্রায় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গবেষণা অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের নাট্যচর্চার স্বরূপটির সাধারণ পরিচয় প্রদান গবেষণা কর্মের প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য।

থিয়েটার সমালোচকদের মতে বাংলাদেশে থিয়েটারের যে গৌরব স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তার শুভযাত্রা বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর থেকে। অর্থাৎ ১৯৭২ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ নাট্যচর্চায় যে সমস্ত নাট্যদল প্রতিনিধিত্ব দানে সমর্থ তাদের প্রত্যেকটির আবির্ভাব ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে। এ সময়ে যুদ্ধের তরুণরা ভৌগোলিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক মুক্তির সংগ্রামে সম্পৃক্ত করে নিজেদের। জাতীয় সাংস্কৃতি বিকাশের মহৎ আদর্শ এবং আধুনিক নাট্যচর্চার অঙ্গীকার নিয়ে এসব তরুণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় *নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়* (১৯৬৮, ঢাকা); *পারাপার* (১৯৭০, ঢাকা); *আরণ্যক* (১৯৭১, ঢাকা); *থিয়েটার* (১৯৭২, ঢাকা); *নাট্যচক্র* (১৯৭২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); *ঢাকা থিয়েটার* (১৯৭৩, ঢাকা); *বহুবচন* (১৯৭৩, ঢাকা); *থিয়েটার ৭৩* (১৯৭৩, চট্টগ্রাম); *তির্যক* (১৯৭৩, চট্টগ্রাম); *খেয়ালী গ্রুপ থিয়েটার* (১৯৬৯, বরিশাল) *সারথি* (১৯৭২, রংপুর); *বগুড়া নাট্যগোষ্ঠী* (১৯৭২, বগুড়া); *নারায়ণগঞ্জ থিয়েটার* (১৯৭২, নারায়ণগঞ্জ); *বহুরূপী* (১৯৭৫, ময়মনসিংহ); *রূপান্তর নাট্যগোষ্ঠী* (১৯৭৫, খুলনা); প্রভৃতি।^{৪১}

উপস্থাপিত তালিকায় আমরা লক্ষ্য করি নাট্যদলগুলোর অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা শহরে। অবশিষ্ট কয়েকটি নাট্যদল দেশের বিভাগীয় শহর বা গুরুত্বপূর্ণ জেলা শহরে তাদের নাট্যচর্চা শুরু করেছিলো। উল্লিখিত নাট্যদলগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশে শিল্পমনস্ক বিজ্ঞানভিত্তিক নাট্যচর্চা এবং গ্রুপ থিয়েটার কার্যক্রমের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার গৌরবময় ঐতিহ্যের সূচনা ঘটেছে তাতে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু সমগ্র বাংলাদেশের অবশিষ্ট শহর এবং উপশহরগুলো নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত নাট্যচর্চার আধুনিক প্রকরণ থেকে অনেক দূরবর্তী ছিলো। থিয়েটার সমালোচকদের মতে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলাদেশের নাট্যচর্চা আবর্তিত ছিলো মূলত কোনো সমাবেশ ও বাৎসরিক উৎসবকে কেন্দ্র করে। একারণেই *নীলদর্পণ* নাটকের প্রথম মঞ্চায়নকাল (১৮৬১) থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত বাঙালিদের নাট্যচর্চাকে তারা সৌখিন নাট্যচর্চার কাল হিসেবে উল্লেখ করেন।^{৪২} তবে, *ড্রামা সার্কল* (১৯৫৬-১৯৬৩) এর নাট্যচর্চা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী প্রয়াস। সমালোচকদের মতে বর্তমান বাংলাদেশের আধুনিক থিয়েটারের পূর্ণাঙ্গরূপটি প্রথম লক্ষণীয় *ড্রামা সার্কলের* নাট্যচর্চায়।^{৪৩} স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে আধুনিক নাট্যচর্চার নিয়মিত সূত্রপাত হলেও তা দেশের সামগ্রিক নাট্যচর্চার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। যদিও বিভাগীয় শহর এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি জেলা শহরে কিছুটা প্রভাব সত্ত্বের দশকের শেষ ভাগে লক্ষ করা গেলেও দেশের মফঃস্বল শহর-উপশহরগুলো মৌসুমী বা সখের নাট্যচর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো। এ সময়ে দেশের জেলা শহর, উপজেলা শহর এবং গ্রাম পর্যায়ে নাট্যানুষ্ঠান বলতে গীত প্রধান যাত্রা পালাকেই

বুঝানো হতো। তবে স্কুল-কলেজে একাধিক নাটিকা মঞ্চায়নের প্রবণতাও ছিলো। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নাট্যচর্চায় কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলেও তা ছিলো অনেকটা অনিয়মিত মঞ্চপ্রয়াস। গ্রাম-গঞ্জ এবং শহর-উপশহর অঞ্চলে পরিবেশিত যাত্রাপালার দুটিরূপ প্রচলিত ছিলো। একটি রূপ ছিলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিবেশিত যাত্রাপালা। এ রূপ যাত্রাপালার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা মাসিক বা চুক্তিভিত্তিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো যাত্রাদলে অন্তর্ভুক্ত হতেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের খ্যাতি, জনপ্রিয়তা এবং অভিনয় দক্ষতার গুণে নির্ধারিত হতো তাদের পারিশ্রমিক। অন্য রূপটি ছিলো শৌখিন মঞ্চপ্রয়াস। পাড়ার বা মহল্লাহর সাংস্কৃতিকমনা ব্যক্তির একত্রিত হয়ে আয়োজন করতো নাট্যাভিনয়ের। তবে অঞ্চলভেদে এই মঞ্চপ্রয়োজনাগুলো, নাটক, পালা, গান, ড্রামার (ড্রামা), বই, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলো। যদিও প্রফেশনাল যাত্রার মতো এ পরিবেশনাগুলো খুব বেশী ঝাক-জমক পূর্ণ ছিলো না। তবে প্রফেশনাল যাত্রাদলের জনপ্রিয় কাহিনিগুলোই অধিক গুরুত্ব পেতে এ সকল শৌখিন নাট্যচর্চায়। আধুনিক নাট্যচর্চায় আমরা যাকে text, পাণ্ডুলিপি বা নাটক বলি তৎসময়ে তা ‘বই’ হিসেবেই অধিক পরিচিত ছিলো। সাধারণত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষয় অবলম্বনে রচিত হতো এই বইগুলো। এ ক্ষেত্রে কলকাতার লেখকগণের জনপ্রিয়তা ছিলো শীর্ষে। প্রচলিত এ ধারার নাট্যচর্চার প্রয়োগরীতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যের যথেষ্ট অপ্রতুলতা রয়েছে। বিভিন্ন উৎসের বিক্ষিপ্ত অভিমত থেকে বলা যায় যাত্রা অভিনয়ের অনুষঙ্গেই নির্মিত হতো প্রয়োজনাগুলো। উচ্চকণ্ঠের আবেগময় দীর্ঘ গীতল সংলাপ, উচ্চকিত মেকাপ, বাস্তবরীতির পোশাক, নিরাভরণ চৌকোণ খোলা মঞ্চ এবং নৃত্য-গীতের আধিক্য নিয়ে সারারাত ব্যাপী দর্শকদের রসনা তৃপ্তির খোরাক জোগাত এ মঞ্চাভিনয়গুলো। ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে থেকে এ ধারাটির সমান্তরালে পরিশুদ্ধ সমাজ ভাবনার অনুষঙ্গে স্বাভাবিক সংলাপে বিচিত্র জীবনের রূপ ক্রমাগত উদ্ভাসিত হতে থাকে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে। এ ধারার নাট্যনির্মাণাগণ নাট্যনির্মাণের প্রায়োগিক ভাবনাকে বৈজ্ঞানিক প্রকরণের সাথে সম্পৃক্ত করার প্রয়াসও নিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের বৃহৎ পরিসরে তাদের নাট্যভাবনার প্রসার ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধান অন্তরায় ছিলো দেশব্যাপী সাংগঠনিক কার্যক্রমের বিস্তার এবং তাত্ত্বিক কোনো মতাদর্শ তৈরি করতে না পারা। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার তাদের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমকে সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তারের অভিপ্রায়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। ফলে গ্রাম-গঞ্জে প্রতিষ্ঠা করে নতুন নাট্যদল এবং প্রতিষ্ঠিত নাট্যদলকে অন্তর্ভুক্ত করে গ্রাম থিয়েটারের অঙ্গসংগঠন হিসেবে।

শিল্প-সাহিত্য ও রাজনীতিকে সাধারণ মানুষের জীবনসম্পৃক্ত করার অভিপ্রায়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে সমানে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার। যা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের শুরুতেই গ্রাম থিয়েটারের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে গ্রাম থিয়েটার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে ঐতিহ্য নির্ভর লোক-নাট্যকাঠামো ও শিল্পরীতির উদ্ধার, সংরক্ষণ ও চর্চার মাধ্যমে আধুনিক নাট্যের সাথে সমন্বয় সাধন, আঞ্চলিক ভাষার সৃষ্টিশীল বিকাশ ও লোকজ অভিনয়রীতির উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন। গবেষণা অন্তর্ভুক্ত নাট্য প্রয়োজনাগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে লক্ষ করা যায় নির্দেশকগণ তাদের নির্দেশনায় বাঙলা নাট্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে আধুনিক থিয়েটারের উপযুক্ত করে উপস্থাপন করেছেন। নির্দেশকগণ লোক ভাষার সাথে সম্পৃক্ত ঘটিয়েছেন লোকজ চরিত্রের। যার ফলে সমকালীন সামাজিক চিত্র বিক্ষোভের সমান্তরালে স্থান পেয়েছে গণমানুষের জীবিকা, যাপিত জীবন ও জীবন সংগ্রামের প্রামাণ্য চিত্র। নাটকের চরিত্রেরা হাজার বছরের লালিত সংস্কৃতির নানা অনুষঙ্গ ধারণ পূর্বক মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের কোনো ভূগোল বা জনপথের প্রতিনিধি হয়ে। আধুনিক জীবনের নানা যুগযন্ত্রাকে আশ্রয় করে প্রয়োজনাগুলোর চরিত্রেরা ঐতিহ্যানুগ হয়ে হাজার বছরের শোষিত বাঙালি জাতির সামগ্রিক অবয়বকেই উদ্ভাসন করেছে মঞ্চে। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের আদর্শে অনুপ্রাণিত ও দীক্ষিত হয়ে গ্রাম থিয়েটারের নাট্যকারগণ মঞ্চে তুলে এনেছেন তাদের আপন আপন জনপথকে। সয়ফুল মূলকের *দইরা যাত্রা*, *মানুষ*

অমানুষ, জাহেন আলীরে ধর, সেনের খিলের তালুকদার, বীরঙ্গনা বিমলারা, কিন্তনখোলা, প্রাচ্য প্রভৃতি গবেষণা অন্তর্ভুক্ত নাট্য প্রযোজনাগুলোর কাহিনি চরিত্র, ভাষা, দৃশ্য বিচার-বিশ্লেষণে আমাদের এরূপ ধারণাই প্রতীয়মান হয়। প্রযোজনাগুলোর বিষয়বস্তুকে সমকালের নির্মম বাস্তবতার নিপুণ শিল্পকৌশলে বাংলা ভাষার অন্যতম বিষয় ও ভাষা সচেতন আখ্যান হিসেবে উল্লেখ করলে অত্যাঙ্কি হয় না।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের আলোচিত নাট্য প্রযোজনাগুলোর নির্মাণরীতি পর্যবেক্ষণে দেখতে পাই বিচিত্রতর লোকায়াত অভিনয়রীতির সৃজনশীল দ্যোতনা। নির্দেশকের সার্বিক আয়োজনে ভূমিসংলগ্নতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠলেও তা আন্তর্জাতিক থিয়েটারের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রে প্রোথিত। যাত্রার ইঙ্গিতধর্মীতা, অভিনেতার বাচিক অভিনয়ে গোষ্ঠীগত, জাতিগত এবং সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ, বর্ণনাধর্মী গীতল অভিনয়, নৃত্য-গীতের যুগল সংমিশ্রণ, রূপসজ্জায় লোকজীবনকে অবলম্বন, নিরাভরণ মঞ্চোপকরণ, আলোর সরলতা প্রভৃতি বিষয়গুলো যেমন বাংলা নির্দেশনার ভূমিজ একটি রূপকে উদ্ভাসিত করে অপর দিকে আধুনিক থিয়েটারের শিল্পসূত্রকেও গ্রাহ্য করে। পর্যবেক্ষণকৃত নাট্য প্রযোজনাগুলোর মঞ্চ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঘটেছে আধুনিক সংস্করণ। নির্বাচিত প্রযোজনার নির্মাণরীতির আলোচনায় লক্ষ করি মঞ্চ হিসেবে ব্যবহৃত চৌকোণ খোলা মঞ্চ। ১৬ফিট×১৬ফিট যাত্রা মঞ্চের নব্য সংস্করণে নির্মিত মঞ্চটি গ্রাম থিয়েটার নিজস্ব মঞ্চ। এতদ্ব্যতীত ভূমিসমতল বৃত্ত ও অর্ধ বৃত্তাকার মঞ্চও বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত মঞ্চ। সামান্য হস্তবাহিত উপকরণ, মঞ্চসজ্জার আর এক টুকরো কাপড়ের বহুমাত্রিক ব্যবহারে নির্দেশকগণ মঞ্চে উদ্ভাসন করেছেন ব্যাঞ্জনাময় নানা দৃশ্যকল্প। যা প্রতীকি হয়েও চরম সত্যের বাস্তব অবয়ব হয়ে উঠে। গবেষণা অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগণ ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ে সৃজন করেছেন নতুন নাট্যভাষার। এ ক্ষেত্রে অভিনেতার শরীর আর কণ্ঠ যাবতীয় বাহ্যিক বর্জন পূর্বক স্থিত হয় অভিনয়ের কেন্দ্র বিন্দুতে। আধুনিক নাট্য প্রকরণের সকল শর্ত মেনে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের নাট্য নির্দেশকগণ মঞ্চকে উদ্ভাসিত করেছেন নান্দনিক শিল্প-সুসমায়।

উপসংহার

বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার সমগ্র বাংলাদেশে আধুনিক নাট্যচর্চার প্রত্যয় নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলো ১৯৮২ সালে। বাঙালির শিল্পরীতির যে ধারা নিজস্ব নন্দন ভাবনায় গড়ে উঠবার সম্ভাবনা ছিলো তা ঔপনিবেশিক শিল্পচিন্তার প্রভাবে তার মধ্যখণ্ডন ঘটেছিলো। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঔপনিবেশিক শিল্পচিন্তার প্রভাবমুক্ত কতিপয় নাট্যকার-নির্দেশক এই মধ্যখণ্ডন থেকেই বাংলা নাকটের যোগসূত্র স্থাপন করেছেন তার হাজার বছরের গৌরবময় ঐতিহ্যের সাথে। ব্যক্তিগত প্রত্যয় এবং সাংগঠনিক তৎপরতায় বাঙালা নাট্যনির্দেশনায় দেশকাল বিশ্ব নাট্যের নানা অনুষঙ্গে ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন বক্ষ্যমাণ গবেষণা কর্মের নাট্যনির্দেশকগণ। এতদ্ব্যতীত নাট্য প্রযোজনার শিল্পভাবনার প্রসঙ্গটি বহুবিচিত্র মুখিনতায় এক সুবিশাল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার এক্ষেত্রে সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে প্রাশ্চাত্য নাট্যধারণার অনুপ্রেরণায় লোক ঐতিহ্যের সহস্র বৎসরের ধারার সঙ্গে মিশে মঞ্চে তুলে এনেছেন আধুনিক সৃজনশীলতার নব নব সম্ভাবনা। নাটক রচনা এবং নির্মাণে সর্বশিল্পমাধ্যমের আধুনিক সমন্বয় ঘটিয়েছে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার। ঔপনিবেশিক থিয়েটার চর্চার বাহ্যিক অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চার অন্যতম এক অংশীদার।

তথ্যনির্দেশ

^১ ড. সেলিম আল দীন, “গ্রাম থিয়েটার ও বৃক্ষমূল”, গ্রাম থিয়েটার বুলেটিন, সম্পা. মোসাদ্দেক মিল্লাত, (ঢাকা: ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১৯৯৭) পৃ. ৮।

^২ নাসির উদ্দীন ইউসুফ, “প্রসঙ্গ : গ্রাম থিয়েটার”, গ্রাম থিয়েটার, (ঢাকা: বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের দশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রকাশনা, ১৯৯২), পৃ. ৭।

- ^৩ নাসির উদ্দীন ইউসুফ, “প্রসঙ্গ : গ্রাম থিয়েটার”, *গ্রাম থিয়েটার*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৮।
- ^৪ তদেব, পৃ. ৮।
- ^৫ ঘোষণা প্রত্ন ও গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, পৃ. ৫।
- ^৬ দশ বছর পূর্বে সমগ্র দেশ ও জাতি যখন স্বৈরাচারের উত্থান সাম্প্রদায়িক ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পদচারণায় বিপর্যস্ত, রাজনৈতিক দল ও শক্তিগুলো যখন বিভ্রান্তির গোলক ধাঁধায় ঘোর পাক খাচ্ছে ঠিক এ রকম এক অনিশ্চিত সময়ে গ্রাম থিয়েটারের জন্ম।
- নাসির উদ্দীন ইউসুফ, “প্রসঙ্গ : গ্রাম থিয়েটার”, *গ্রাম থিয়েটার*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৫।
- ^৭ তদেব, পৃ. ১৪।
- ^৮ তদেব, পৃ. ১৪-১৫।
- ^৯ তদেব, পৃ. ১৫।
- ^{১০} তদেব, পৃ. ২৭।
- ^{১১} বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার প্রথম জাতীয় সম্মেলনে সামরিক আইন ও সকল প্রকার কালা কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিল। ৮৬-৮৮ বছলগুলোতে বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটারের সকল সংগঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে একাত্ম হয়ে সামরিক আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিল। ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের পুনর্বাসনের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে গ্রাম থিয়েটার এক সফল হরতাল পালন করে। এ ছাড়াও ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যা এবং ১৯৯০ সালের ২৯ এপ্রিল ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে গ্রাম থিয়েটার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। ঢাকা থেকে দুর্গত এলাকার উদ্দেশ্যে প্রথম যে ত্রাণ দলটি উপকূলীয় অঞ্চলে যাত্রা করে সেটি গ্রাম থিয়েটার। সীতাকুণ্ড, বাঁশখালি, পতেঙ্গায় গ্রাম থিয়েটার ৬০টি গৃহ নির্মাণ, ২৫টি টিউবয়েল, ১০০টি ল্যান্ড্রিন নির্মাণ করেছে যা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত।
- নাসির উদ্দীন ইউসুফ, “প্রসঙ্গ : গ্রাম থিয়েটার”, *গ্রাম থিয়েটার*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৩৬ ও ৩৯।
- ^{১২} ড. সেলিম আল দীন, “গ্রাম থিয়েটার ও বৃক্ষমূল”, *গ্রাম থিয়েটার বুলেটিন*, সম্পা. মোসাদ্দেক মিল্লাত, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৪৪।
- ^{১৩} ঘোষণা প্রত্ন ও গঠনতন্ত্র, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ঢাকা, পৃ. ৬।
- ^{১৪} তদেব, পৃ. ৭।
- ^{১৫} গ্রামীণ মেলা ও নাটক প্রসঙ্গে, ঢাকা থিয়েটার, ঢাকা, পৃ. ৭।
- ^{১৬} নাসির উদ্দীন ইউসুফ, “প্রসঙ্গ : গ্রাম থিয়েটার”, *গ্রাম থিয়েটার*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২৯।
- ^{১৭} তদেব, পৃ. ৩০।
- ^{১৮} গ্রামীণ মেলা ও নাটক প্রসঙ্গে, প্রাণ্ডক্ত পৃ. ৭।
- ^{১৯} বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার ইউনিট সংগঠনসমূহের তালিকা ও ঠিকানা, স্মরণিকা, ৬ষ্ঠ বাংলা লোকনাট্য উৎসব ১৪০৬, পৃ. ১৭-২৫।
- ^{২০} ড. আফসার আহমদ, বিভাগীয় সভাপতির বক্তব্য, স্মরণিকা, ঢাকা বিভাগীয় গ্রাম থিয়েটার সম্মেলন ও নাট্যমেলা’ ৯৫।
- ^{২১} হুমায়ুন কবীর, অভিনেতা, প্রযোজনা- *সয়ফুল মুলকের দইরা যাত্রা ১৯৮২*, (অডিওতে ধারণকৃত নাট্যকাহিনি)।
- ^{২২} হুমায়ুন কবীর, (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{২৩} আসাদুল্লাহ ফারাজী, নাট্যকার-অভিনেতা-নির্দেশক, *শহীদ সমর থিয়েটার*, মেলান্দহ, জামালপুর (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{২৪} আসাদুল্লাহ ফারাজী, নির্দেশক, প্রযোজনা: *মানুষ অমানুষ* (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{২৫} জাহেন আলীয়ে ধর, *গ্রাম থিয়েটার প্রত্নিকা*, (ঢাকা: বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার, ১৯৯০) পৃ. ৩০।
- ^{২৬} আসাদুল্লাহ ফারাজী, নির্দেশক, প্রযোজনা: *জাহেন আলীয়ে ধর* (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{২৭} সালাম সাকলাইন, নাট্যকার- *সেনেরখিলের তালুকদার* (অডিওতে ধারণকৃত নাট্যকাহিনি)।
- ^{২৮} হারুন অর রশীদ, নির্দেশক, প্রযোজনা: *সেনেরখিলের তালুকদার* (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।

-
- ^{২৯} সেলিম আল দীন, ‘শকুন্তলা’ তিনটি মঞ্চনাটক, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ৪৫-৯৪।
- ^{৩০} আফসার আহমদ, নির্দেশক, প্রযোজনা: শকুন্তলা (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{৩১} আসাদুল্লাহ ফারাজী, বীরঙ্গনা বিমলারা (অপ্রকাশিত মূল পাণ্ডুলিপি)।
- ^{৩২} আসাদুল্লাহ ফারাজী, নির্দেশক, প্রযোজনা: বীরঙ্গনা বিমলারা (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{৩৩} সেলিম আল দীন, ‘সংবাদ কার্টুন’ রচনা সমগ্র-১, (ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৫), পৃ. ১৪৯-১৫৭।
- ^{৩৪} এস. এম. ফারুক হোসাইন, নির্দেশক, প্রযোজনা: সংবাদ কার্টুন (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{৩৫} প্রযোজনা স্মারক, কোর্ট মার্শাল-১৯৯৯, বগুড়া থিয়েটার।
- ^{৩৬} তৌফিক হাসান ময়না, নির্দেশক, প্রযোজনা: কোর্ট মার্শাল (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{৩৭} সেলিম আল দীন, ‘কিনুনখোলা’ তিনটি মঞ্চনাটক, প্রাপ্ত, পৃ. ৯৫-২২০।
- ^{৩৮} ইউসুফ খসরু, নির্দেশক, প্রযোজনা: কিনুনখোলা (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{৩৯} প্রযোজনা পাণ্ডুলিপি, প্রযোজনা: দেওয়ান গাজীর কিসসা, অমৃত থিয়েটার, জামালপুর।
- ^{৪০} মোক্তা আহমেদ, নির্দেশক, প্রযোজনা: দেওয়ান গাজীর কিসসা (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{৪১} নির্দেশকের কথা, প্রাচ্য, বাংলাদেশ গ্রাম থিয়েটার সম্মেলন. সেমিনার, ঢাকা থিয়েটার উৎসব স্মরণিকা, মার্চ-২০০২, আয়োজক: ঢাকা থিয়েটার, পৃ. ২৩।
- ^{৪২} তদেব পৃ. ২৪।
- ^{৪৩} নাসির উদ্দিন ইউসুফ, নির্দেশক, প্রযোজনা: প্রাচ্য (অডিওতে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার)।
- ^{৪৪} “মমতাজ উদ্দীন আহমদ “বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্যচর্চার ইতিবৃত্ত”, বাংলাদেশের নাট্যচর্চা সম্পা. রামেন্দ্র মজুমদার, (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৬) পৃ: ১৪৪-১৪৬।
- ^{৪৫} অরুণ সেন, “বাংলাদেশের নাট্যচর্চা: সাম্প্রতিক পটভূমি”, অনুষ্টিপ সম্পা. অনিল আচার্য, (কোলকাতা: চতুর্দশ বর্ষ: ২য় ও ৩য় গুণ্য সংখ্যা ২০০০) পৃ: ১৬২।
- ^{৪৬} হোয়েত হোসাইন মোরশেদ, “ড্রামা সার্কল: প্রসঙ্গ কথা এবং একক ফজলুল করিম”, ‘বাংলাদেশের নাট্যচর্চা, সম্পা: রামেন্দ্র মজুমদার (ঢাকা: মুক্তধারা ১৯৮৬) পৃ: ২১৯

ইরানের কবি হাফিজের কাব্যে পির প্রসঙ্গ

ড. মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম*

Abstract: Hafiz Siraji is one of the famous poets who occupy significant position in the history of Persian literature. He is unforgettable in the arena of Persian literatures for his invaluable creations in the realm of poetry. He was born in Siraj, a city of Iran in 1326 AD, corresponding hijri 726; and died in 1389 AD, in Hijri 791. *Dewan*, a collection of poetry is his famous legacy. Lyric songs, *Quasida*, *Masnavi*, *Robai*, *Ketya* and *Sakiname* are placed in this ballad. He enriched various branches of Persian literature through his simple, clear and vivid presentations, specially though his lyric songs in which monotheism, human creations, young lives, love and beauty, romanticism, Pir-ism (sainthood) and spirituality etc. are presented in a lucid manner. Amongst his creations in the famous *Dewan*, this paper attempts to shed light on Pir-ism (philosophy related to the saint/darvish).

ফারসি সাহিত্যজ্ঞানে যে কয়জন প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিকদের নাম সংযোজিত হয়েছে, কবি হাফিজ শিরাজী তাদের অন্যতম। তিনি কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে চির ভাস্কর হয়ে রয়েছেন। হাফিজের পুরা নাম খাজা শামসুদ্দিন মোহাম্মদ হাফিজ শিরাজী। তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ। শামসুদ্দিন উপাধি। হাফিজ তাঁর উপনাম। আর এ নামেই তিনি জগৎ বিখ্যাত। ইরানের শিরাজ শহরে ৭২৬ হিজরি মোতাবেক ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে শিরাজী বলা হয়।^১ তবে গজল রচয়িতা হিসেবে তিনি ফারসি কাব্যজগতে ‘লিসানুল গায়েব’ (অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর), ‘তরজমানুল আসরার’ (রহস্যের উন্মোচক), ‘দারভিশ’ (সংসারত্যাগী দরবেশ), ‘হাফিজে আসরার’ (রহস্যময় হাফিজ), ‘কানযুল মায়ানি’ (সঞ্চিত অর্থ ভান্ডার) এবং ‘বুলবুলে দাসতানে সারা’ (সম্ভ্রান্ত বুলবুলের কাহিনীকার) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কারণ আধ্যাত্মিক জগতের এমন উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন যে, শিষ্যরা অনেক জটিল বিষয়ের সমাধান তার কাছে খুঁজে পেতেন।^২ হাফিজের পিতা বাহাউদ্দিন, যিনি পেশায় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মাতার নাম জানা যায় না। তবে তিনি ‘কাযেরুন’ এর অধিবাসী ছিলেন।^৩ শৈশবেই কবি তাঁর পিতাকে হারান এবং আর্থিক অনটনের কারণে রুটির দোকানে কাজ নেন। একই সাথে এলাকার মকতবে ভর্তি হয়ে লেখা-পড়া চালিয়ে যান। ধীরে ধীরে ইসলামের বিবিধ জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। একই সাথে যুগের শ্রেষ্ঠ মণীষীদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ক্রমান্বয়ে হাফিজ শরিয়ত ও সাহিত্য উভয় বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। হাফিজ কাওয়ামুদ্দিন আবুল বাকায়ে শিরাজীর তত্ত্বাবধানে কোরআন মজিদ মুখস্ত করেন। কবি এই সূত্রেই হাফিজ শব্দটিকে কবিনাম হিসেবে গ্রহণ করেন এবং সুগৌরবময় ‘হাফিজ’ খ্যাতি অর্জন করেন।^৪ কবি হাফিজ শিরাজী তাফসির, হাদিস, দর্শন, পারস্য সাহিত্য ও আরবি সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। কর্মময় জীবনে তিনি ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। অবশেষে তিনি ৭৯১ হিজরি মোতাবেক ১০ই ডিসেম্বর ১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।^৫ কবি হাফিজ শিরাজীর জীবনের অনবদ্য সৃষ্টি হলো ‘দিওয়ান’ (কাব্য সংকলন) কাব্যগ্রন্থ। এতে গজল, কাসিদা, মাসনাভি, রোবাই, কেতয়া এবং সাকিনামে কবিতা স্থান লাভ করেছে। তিনি তাঁর গজলকাব্যে মহান আল্লাহ ও তাঁর একত্ববাদ, মানবসৃষ্টি, যৌবনকাল, প্রেম-ভালবাসা, রোমান্টিকতা, পিরপ্রথা, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়কে সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী করে উপস্থাপন করে ফারসি সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। অত্র প্রবন্ধে তাঁর কাব্যে বিধৃত পির প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পিরের সংজ্ঞা

পির (پير) শব্দের ফারসি প্রতিশব্দ হলো কুহনে (كهنه), কুহনেকার (كهنه كار), সাবেক (سابق)। ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো old, aged, ancient, experienced ইত্যাদি। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পিরের মর্ম হলো বৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ, পুরনো, অভিজ্ঞ, দক্ষ, সম্মানিত, মুসলমান সাধুপুরুষ, পূণ্যাত্মা ইত্যাদি। শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ হলো মুর্শিদ (مرشد) বা পথপ্রদর্শক।^{১৭}

পরিভাষায় আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়াতের নিমিত্তে তাঁর কিছু বিশেষ বান্দাকে নির্বাচন করে থাকেন। যারা পার্থিব স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে পথদ্রষ্ট, গোমরাহ ও অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষদের আল্লাহর পথে আহ্বান করেন। নিজে যত্নসহকারে শরিয়তের হুকুম আহকাম পালন করার পাশাপাশি অন্যদেরও তা পালনের জন্য উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। নিজ ইসলামে বাতেন বা আত্মশুদ্ধি করার সাথে সাথে অন্যদের আত্মশুদ্ধি অর্জনের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। তাছাড়াও তাদের আত্মশুদ্ধি লাভের পথ ও তরিকা শিখিয়ে দেন, এসব ব্যক্তিবর্গকেই শরিয়তের মাপকাঠিতে সঠিক ও হক্কানি সুফি, মুর্শিদ বা পির হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।^{১৮} তবে বিভিন্ন দরবেশ তরিকার প্রতিষ্ঠাতাও সুফি, মুর্শিদ বা পির নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।^{১৯}

পিরের সংজ্ঞায় আলি রেফায়ি বুখারি লিখেছেন, ‘সুফিবাদের পরিভাষায় পির অর্থ হলো নেতা বা পথপ্রদর্শক, যার সাহায্য ব্যতীত একজন আধ্যাত্মিক সাধক যথার্থ সত্যে উপনীত হতে পারে না। পির হলেন এমন একজন সম্ভাবনাময় দায়িত্বশীল প্রশিক্ষক যিনি একজন সালিক বা সাধককে পরিশুদ্ধিতে পৌঁছে দেন, তাকেই পির বলে। পিরের নির্দেশনাবলি একজন সাধকের জন্য প্রশ্নাতীত ভাবে অনুসরণীয়। আর এটি স্বতসিদ্ধ যে, খাঁটি কামেল পিরের সুদৃষ্টি মুরিদের স্বভাব-প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণ। একজন খাঁটি পিরের সোহবত ও সংস্রবের মাধ্যমে মানুষের আত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়। অর্থাৎ ওলি আওলিয়া এবং পির মাশায়েখদের পরিবর্তন সত্য। তারা মানুষের আত্মাকে পূর্ণতায় পৌঁছায়। বিশেষ করে মানুষের আত্মাকে পবিত্র এবং জ্যোতিষ্মান করে।’^{২০}

মূলকথা হলো, যিনি আল্লাহর আদেশ নিষেধ আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চান সেভাবে পালন করার প্রশিক্ষণ দেন তাকে পির বা মুরশিদ, সুফি বলে।

পিরের উৎপত্তি ও বিকাশ

আত্মশুদ্ধি নবি করিম (সা.) থেকেই শুরু। কেননা, আত্মশুদ্ধির মূল বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিসেই রয়েছে। যা মানুষের অন্তরে বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে।^{২১} নবি করিম (সা.) বলেন-

أَلَا وَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَ هِيَ الْقُلُوبُ.^{২২}

‘মানবদেহে একটি গোশত পিণ্ড আছে, যা সুস্থ থাকলে সমগ্র দেহ পরিশুদ্ধ থাকে, আর অসুস্থ থাকলে সমগ্র দেহ অপরিশুদ্ধ হয়ে যায়। জেনে রাখো এটি হলো কলব বা হৃদয়।’

আত্মশুদ্ধি বা সুফিবাদ মানুষের আত্মার বিশোধনের শিক্ষা দেয়, তার নৈতিক জীবনকে উন্নত করে এবং স্থায়ী নিয়ামতের অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের ভেতর ও বাইরের জীবনকে গড়ে তোলে। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আত্মার পবিত্রতা বিধান এবং লক্ষ্য হচ্ছে চিরন্তন সুখ-শান্তি অর্জন করা।^{২৩}

আত্মসংশোধন বা পরিশুদ্ধকরণই হচ্ছে পির প্রথা বা সুফিবাদের মূল উদ্দেশ্য। যার সমার্থক বক্তব্য পাওয়া যায় উপর্যুক্ত হাদিসের বাণীতে। পবিত্র কুরআনেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন-

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ^{২৪}

অর্থাৎ আল্লাহর যিকর বা স্মরণে কলব প্রশান্তি লাভ করে। কুরআন ও হাদিসের এ ধরনের বক্তব্যকে ভিত্তি করেই মুসলিম সমাজে সুফিবাদ বা পির প্রথার যাত্রা শুরু হয়। এ কারণে পির বা সুফিসাধকগণের নিকট আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের জন্য রূহ বা আত্মার আলোচনাই সর্বাধিক মুখ্য বিষয়। এই প্রসঙ্গে তাঁরা রূহ, নফস, কলব শব্দগুলো ব্যবহার করেন।^{১৪} সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে কলবকে কলুষমুক্ত করে আল্লাহর প্রেমার্জন সুফিবাদের মূল উদ্দেশ্য।

কুরআন ও হাদিস সুফিবাদের উৎস হলেও হিজরি প্রথম শতাব্দীতে মুসলমানদের মধ্যে ভিন্নভাবে ‘সুফি’ (পির) নামে কোনো সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না।^{১৫} উস্তাদ মুর্তাজা মুতাহহারি প্রসিদ্ধ সুফি ও আরেফ আবুল কাসেম কুশাইরির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- ‘সুফি পরিভাষাটি ২০০ হিজরি সালের পূর্বেই উৎপত্তি লাভ করেছে।’ তিনি নিকলসনের মতও উল্লেখ করেছেন। নিকলসনের মতে- ‘পরিভাষাটি হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে উৎপত্তি লাভ করেছে।’^{১৬} আল্লামা জামি তাঁর *নাফহাতুল উনস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি সুফি পরিচয়ে ভূষিত হন তিনি হচ্ছেন শেখ আবু হাশিম কুফি (মৃ. ১৫০ হি.)।^{১৭} তাঁর সময়কাল ছিল হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দী। তিনিই প্রথম খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই খানকাহর অবস্থান ছিল ফিলিস্তিনের রামাল্লা শহরে।^{১৮}

পরবর্তীতে সুফিবাদ উৎকর্ষ লাভ করে পারস্যে। সেখানকার প্রখ্যাত সুফি-দরবেশ বা পির, কবি-সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ নানা শাস্ত্র, কাব্য ও ব্যাখ্যা-গ্রন্থ রচনা করে এই দর্শনকে সাধারণের নিকট জনপ্রিয় করে তোলেন।^{১৯} কালক্রমে বিখ্যাত পির বা ওলিদের অবলম্বন করে নানা তরিকা গড়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে চারটি প্রধান তরিকা সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। (১) বড় পির হযরত আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) (৪৭১ হি.-৫৬১ হি.) প্রতিষ্ঠিত ‘কাদেরিয়া’ তরিকা, (২) সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.) (৫২৭ হি.-৬৩৩ হি.) প্রতিষ্ঠিত ‘চিশতিয়া’ তরিকা, (৩) হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নাকশেবান্দি (রহ.) (৭১৮-৭৯১ হি.) প্রতিষ্ঠিত ‘নাকশেবান্দিয়া’ তরিকা এবং (৪) মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানি হযরত শেখ আহমদ সারহিন্দি (রহ.) প্রতিষ্ঠিত ‘মুজাদ্দিদিয়া’ তরিকা।^{২০} উক্ত চারটি তরিকার মধ্যে দুটির উৎপত্তিস্থল হচ্ছে তৎকালীন পারস্য অঞ্চল।

হাফিজের কাব্যে পির প্রসঙ্গ

কোরআন মজিদে দ্বীন বা ধর্মের ব্যাপারে হেদায়াতপ্রাপ্ত সৎ, নেককার, অভিজ্ঞ আলেম, পূর্ণবান এবং আল্লাহর পথের পথিকদের সান্নিধ্য অর্জন করতে তাদের শরণাপন্ন হতে এবং তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ^{২১}

‘হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।’

মহান আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেন-

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ^{২২}

‘যে আমার অভিमुखী হয়, তার পথ অনুসরণ কর।’

হাদিস শরিফে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدَكُمْ مَنْ يُخَالِلُ-^{২৩}

‘হজরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন, মানুষ তার বন্ধুর মত ও পথ অনুসরণ করে চলে। তাই তার দেখে নেয়া উচিত, সে কেমন লোকের সাথে বন্ধুত্ব করছে।’

হজরত আবু মুসা আশয়ারি (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন-

مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسُّوءِ كَحَامِلِ الْمَسْكِ وَ نَافِخِ الْكَبِيرِ، فَحَامِلُ الْمَسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِنَكَ وَ إِمَّا أَنْ تُبْتَاعَ مِنْهُ، وَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَ نَافِخُ الْكَبِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، إِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً.^{২৪}

‘পুণ্যবান সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গী যথাক্রমে মেশক বহনকারী আর হাপরে ফুৎকার দানকারীর ন্যায়। মেশক বহনকারী হয়ত তোমাকে মেশক প্রদান করবে বা তার নিকটই তুমি ক্রয় করবে। তাও না হলে সুগন্ধি তুমি অবশ্যই পাবে। পক্ষান্তরে হাপরে ফুৎকারকারী হয়ত তোমার কাপড় জ্বালাবে, নতুবা দুর্গন্ধ তো অবশ্যই পাবে।’

উপরে বর্ণিত যে সব আয়াত ও হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে সেগুলো এবং আরো অন্যান্য আয়াত ও হাদিসের আলোকে ওলামায়ে কেরাম একজন ইক্বানি পিরের কতিপয় আলামত তথা গুণাবলি^{২৫} উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য করা খুবই জরুরি। তাই ব্যক্তিকে পির মুর্শিদ গ্রহণ করতে হলে এবং তার সাথে বন্ধুত্ব করতে হলে অবশ্যই জেনে শুনে ভালো, হৃদয়বান, সৎ ও খোদার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত। জাহেরি আমল তথা শরিয়তের যে সকল বিধি-বিধান আমাদের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত, তার মাসয়ালা-মাসায়িল জানার জন্য যেমন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। অনুরূপভাবে বাতেনি আমলের (আত্মার সাথে সম্পৃক্ত আমল) বিধি-বিধান, যা তাসাওউফ ও তুরিকতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়, সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ও তদানুযায়ী আমল করার জন্য একজন খাঁটি ও ইক্বানি পিরের শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যিক। খাঁটি পির, মাশায়েখ হলেন আত্মশুদ্ধি ও ইসলাহে নাফসের উস্তাদ। কেননা নিজের আধ্যাত্মিক ব্যধি ও মন্দ চরিত্রকে নির্ণয় করা এবং সে অনুপাতে চিকিৎসা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সাধারণত একজন ইক্বানি পিরের সান্নিধ্য ও সহচর্য্য ব্যতীত প্রায় অসম্ভব।^{২৬} এ ব্যাপারে হাফিজ শিরাজী সম্পূর্ণ একমত। তাঁর মতে, পির তথা মুর্শিদ ব্যতীত প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তরিকত তথা, আধ্যাত্মিকতার পথ বড়ই বিপজ্জনক। এই পথ পরিভ্রমণের স্তরে স্তরে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। যদি কেউ এই পথের উঁচু নীচুতা, বক্রতা ও গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত না হয়, তবে সহজেই বিভ্রান্ত হবে। তাই মুর্শিদ ব্যতীত প্রেমের পথে পা বাড়ানো মোটেও ঠিক না। এ পথের পথপ্রদর্শক বা মুর্শিদ না পেলে পথিককে পথভ্রান্ত হতে হয়।^{২৭} হাফিজ বলেন-

به كوی عشق منه بی دلیل راه قدم

که من به خویش نمودم صد اهتمام نشد^{২৮}

‘পথপ্রদর্শক ব্যতীত প্রেমের গলিতে পা রেখো না কারণ, নিজে শতবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুই হয়নি।’

قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن

ظلمات است بترس از خطر گمراهی^{২৯}

‘খিয়ারকে সঙ্গে না নিয়ে এ পথ পাড়ি দিতে যেও না অন্ধকার অমানিশা চারদিকে, বিপথগামিতাকে ভয় কর।’

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند^{৩০}

‘তারা সুদৃষ্টি দিয়ে মাটিকে পরশমণিতে পরিণত করেন
হায়! তারা তো আমাদের চোখের কোনে (মণিতে) পরিণত করেন।’

[illegible]

দারদি কাশ (پير دردی کش) প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার ঘটিয়েছেন। এ শব্দগুলোর দ্বারা হাফিজ মূলত তাঁর পির বা মুর্শিদকেই বুঝিয়েছেন। আর হাফিজের দৃষ্টিতে তিনিই হলেন ইনসানে কামেল বা পরিপূর্ণ মানব। যিনি পার্থিব সকল অকল্যাণ থেকে উদ্ধার করে কল্যাণের পথে ধাবিত করে।^{৩৬} তার পথ নির্দেশনাই তাঁকে সফলতার মনষিলে মকসুদে উপনীত করতে সক্ষমত হয়। তাই তিনি নিজেই খাঁটি কামেল ইক্কানি পিরের সহচার্য লাভের আকুতি এবং তার আদেশ পালন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। কবি বলেন-

از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
دولت در آن سر او گشایش در آن در است^{৩৭}
'আধ্যাত্মিক গুরুর আস্তানা থেকে নিজেকে বিরত রাখব
সেখানেই তো মূল্যবান ধন ও বিকাশ নিহত রয়েছে।'

কবি অন্যত্র আরো বলেন-

منم که گوشه میخانه خانقاه من است
دعای پیر مغان ورد صبحگان من است
ز پادشاه و گدا فارغم بحمد الله
گدای خاک در دوست بادشاه من است
غرض ز مسجد و میخانه ام وصال شماست
جز این خیال ندارم خدا گواه من است
از آن زمان که برین آستان نهادم روی
فراز مسند خورشید تکیه گاه من است^{৩৮}
'শরাব খানার কোন আমার সাধনা গৃহ বা খানকা
পিরে-ই-মাগান বা খাঁটি পিরের আশির্বাদ আমার প্রাতঃকালীন ওজিফা।
আমি রাজাও নই ভিখারীও নই, আল্লাহর হাজার শোকর
বন্ধুর দরজার ধুলির ভিখারী, আমার নিকট রাজা।
তোমার মিলনপ্রার্থী, মসজিদ ও শরাব খানার প্রার্থী নই
এই বাসনা ছাড়া আর কোনো কল্পনা বা কামনা নেই, খোদা সাক্ষী।
সেই অবদি তোমার আস্তানার দরজার চৌকাঠে দৃষ্টি রেখেছি
সূর্যের সিংহাসন অপেক্ষা আমার পদমর্যাদার আসন উচ্চতর।'

অপর দিকে খাঁটি ইক্কানি পিরের আদেশ পালনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। কেননা খাঁটি পির মহান আল্লাহকে পাওয়ার উসিলা বা উপায়। সাধনার গুরুরূপে একজন মুরিদ বা শিষ্যকে পির বা গুরুর কথা বিনা বাক্যে কোনোরূপ যুক্তি প্রয়োগ না করেই মেনে নিতে হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে কবি হাফিজ বলেন-

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها^{৩৯}
'তোমার খাঁটি পির যদি বলে তবে শরাব রঙ-এ জায়নামাজ রাঙ্গিয়ে নাও
কেননা তিনি আধ্যাত্মিকতার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক অবগত।'

আবার কবি হাফিজ তাঁর কিছু কাব্যে দারভিশ (সংসার ত্যাগী দরবশে) দ্বারাও পির বা মুরশিদকে বুঝিয়েছেন। যেমন তিনি লিখেছেন-

روضه خلد برین خلوت درویشان است
مایه محتشمی خدمت درویشان است
گنج عزلت که طلسمات عجایب دارد

فتح آن در نظر رحمت درویشان است
 آنچه زر می شود از پرتو آن قلب سیاه
 کیمیاییست که در صحبت درویشان است
 دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال
 بی تکلف بشنو دولت درویشان است
 حسروان قبله حاجات جهانند ولی
 سبیش بندگی حضرت درویشان است
 روی مقصود که شاهان به دعا می طلبند
 مظهرش آینه طلعت درویشان است
 گنج قارون که فرو می شود از قهر هنوز
 خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است
 حافظ ار آب حیات ازلی می خواهی
 منبعش خاک در خلوت درویشان است^{৪০}

‘সুফি-সাধক দরবেশদের আস্তানা বেহেশতের বাগানের টুকরা সাদৃশ্য
 শান শওকতের মূলধন হচ্ছে দরবেশদের খেদমত করা।
 নির্জন সাধনাগৃহ বিস্ময়কর ধনভান্ডারে পরিপূর্ণ
 উহার বিজয় দরবেশদের কৃপাদৃষ্টিতে হয়।
 যার দিব্য জ্যোতিতে কৃষ্ণ হৃদয় স্বর্ণে পরিণত হয়
 ইহা মহা মূল্যবান জিনিস, যা দরবেশদের সংস্পর্শে ঘটে।
 এমন সম্পদ যার লোকসান অবক্ষয়ের জন্য কোনো দুঃখ নেই
 নির্ভয়ে শুনে রাখ, ইহাই দরবেশদের ঐশ্বর্য।
 বাদশারা দুনিয়ার অভাব পূরণ করতে পারে আশা করা যায়
 কিন্তু প্রকৃত হুকুম বরদারী (সম্মান) দরবেশদের।
 বাহ্যিক সফলতা যা দুনিয়ার বাদশাহগণ সম্মান করে
 উহার বহিঃপ্রকাশ কেবল দরবেশদের চেহারার দর্পণে।
 কারুনের সম্পদ আল্লাহর ক্রোধ বা গজবে জমিনের নিচের দিকে যাচ্ছে
 হয়ত তুমি পড়েছ, ইহা দরবেশদের আত্মসম্মানবোধের জন্য হচ্ছে।
 হে হাফিজ, যদি তুমি চিরন্তন অমৃত সুধা লাভ করতে চাও
 তবে পৃথিবীতে উহার উৎসই হলো দরবেশদের আস্তানা।

তবে যে সকল পির তাসাওউফের ছদ্মাবরণে লোক দেখানো, ভন্ডামি, মিথ্যা, লোভ, প্রতারণা ও চাটুকারিতা করে হাফিজ তাদের চরমভাবে ঘৃণা করেছেন। দরবেশি ছদ্মবেশ ও বুজুর্গি বিক্রির ঘৃণ্য পোশাককে কবি তীব্রভাষায় কটাক্ষ করেছেন। কবি বলেন-

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
 دام تزویر مکن چون دیگران قرآن را^{৪১}
 ‘হে হাফিজ! মদ খাও, আর মাতলামি কর এবং খুশি থাক
 তবে অন্যের মত কোরআনকে ভন্ডামির ফাঁদ করিও না।’
 نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
 ای بسا خرقة که مستوجب آتش باشد^{৪২}
 ‘সব সুফির হাল হকিকত স্বচ্ছ নির্মল নয়
 বহু আলখেল্লা আছে আগুনে দেওয়ার উপযুক্ত।’

অন্যত্র কবি আরো বলেন-

گر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود^{৪০}
‘শহরের ওয়ায়িজ মাওলানার কাছে যদিও কথাটি সহজ নয়
যার লোক দেখানো ভন্ডামি আছে, সে মুসলমান নয়।’

উপসংহার

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআন নাযিল করাসত্ত্বেও যখন রাসূল (সা.)কে উম্মতের হেদায়াত এবং তায়কিয়া তথা আত্মশুদ্ধির জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তখন এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, ইলম ও কিতাব আত্মশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়, বরং আত্মশুদ্ধির জন্য জরুরী এমন একজন মুযাক্কি তথা সংশোধনকারী যার তত্ত্বাবধানে এ দৌলত অর্জন করা যেতে পারে। রাসূল (সা.) ছিলেন সাহাবায়ে কেরামের সংশোধনকারী। সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন পরবর্তী তাবেঈদের সংশোধনকারী। অতঃপর ক্রমশঃ চলতে থাকে এর ধারাবাহিকতা। বর্তমান সময়ে উম্মতের সংশোধনকারী হলেন হক্কানি-রব্বানি ওলামায়ে কেরাম, পির-মাশায়েখ। আত্মশুদ্ধি হাসিলের নিমিত্তে একজন মুযাক্কি তথা সংশোধনকারী প্রয়োজন। সারকথা হলো, বর্তমান ফেতনা-ফাসাদের যুগে সঠিক পথের উপর অবিচল থাকা এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির জন্য খাঁটি হক্কানি পিরের আলামত বা গুণাবলি দেখে পির নির্বাচন করা অপরিহার্য। তাই আত্মশুদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে নেককার, মুত্তাকি, খাঁটি কামেল পিরের সোহবত-সংশ্রবে থেকে তাঁর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য অতীব জরুরি।

তথ্যনির্দেশ

- ^১. Edward G. Browne, *A Literary History of Persia*, Vol-III (London: Cambridge University Press, 1951), P. 271; Tanwir Ahmad, *A Short History of Persian Literature* (Calcutta: Nazz Publishing Center, 2nd edition, 1991), P. 208; আল্লামা কাযভিনি ও ড. কাসেম গানি, *গানজে রাওয়ানে হাফিজ* (তেহরান: মোয়াসসেয়ে মোতালিয়াতে ইসলামি দানেশগাহে তেহরান, ১৩৯৪ হি.শা.), পৃ. ৭; ড. রেযা যাদেহ শাফাক, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (তেহরান: চাপখানেয়ে আরমান, ১৩৬৯ হি.শা.), পৃ. ৩০৭; মির্জা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাবনামেয়ে ইরান* (লাহোর: ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, তা.বি.), পৃ. ৫৫৫।
- ^২. সিরুস নিরু, *গানজে মুরাদ (শারহে গজলহায়ে হাফিজ শিরাজী) : তারিখি, সিয়াসি, আরেফানে, আশেকানে* (তেহরান: এনতেশারাতে রুযেগার, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৫ হি.শা.), পৃ. ৩৫; আবদুস সাভার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৭, খ্রি.), পৃ. ৬৩।
- ^৩. লায়লা সুফি, *যেন্দেগি নামে শায়েরানে ইরান* (তেহরান: এনতেশারাতে জাযেরামি, ১৩৭৯ হি.শা.), পৃ. ১৪৫; *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭।
- ^৪. ড. আবদুল হুসাইন যাররিনকুব, *বা কারওয়ানে হুল্লে* (তেহরান: এনতেশারাতে এলমি, নবম মুদ্রণ, ১৩৭৪ হি.শা.), পৃ. ২৭৭; *আদাবনামেয়ে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৬।
- ^৫. *A Literary History of Persia*, Vol-III, opcit, P. 283; *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১১।
- ^৬. ড. মুহাম্মদ রেযা বাতেনি, *ফারহাঙ্গে মোয়াসেয়ে কুচে* (ইনগিলিসি-ফারসি) (তেহরান: ফারহাঙ্গে মোয়াসেয়ে প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১ হি.শা.), পৃ. ৪৪৩; Ashu Tosh Dev, *Students Favourite Dictionary* (Bengali-English), (Dhaka: New Society Art Press, 1998), P. 888; জামিল চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৮২৫; ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মুজামুল ওয়াফী আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ), পৃ. ৩৯৫।
- ^৭. ড. এস. এম. আব্দুছ ছালাম, *ইসলামী আকীদার স্বরূপ ও প্রকৃতি* (রাজশাহী: ছালেহা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮৭।

- ^৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১৪শ খন্ড (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৪৪৯।
- ^৯. বাহাউদ্দিন খুররামশাহি, *হাফিজ* (তেহরান: এনতেশারাতে তারহে নো, চতুর্থ প্রকাশ, ১৩৮৭ হি.শা.), পৃ. ১৬৩।
- ^{১০}. সংকলন, *আধ্যাত্মিকতা ও ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০১।
- ^{১১}. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল বুখারি, *আল জামিউল মুসনাদুস সহিহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়া সুনানিহি ওয়া আয়্যামিহি (সহিহুল বুখারি)*, প্রথম খন্ড (দেওবন্দ: আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা.বি.), পৃ. ১৩।
- ^{১২}. Dr. Mir Valiuddin, *The Quranic Sufism* (Delhi: Motilal Banarsidass, 1959), P. 3.
- ^{১৩}. আল কুরআন, সূরা আর রা'দ, আয়াত : ২৮।
- ^{১৪}. মোঃ সোলায়মান সরকার, *ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দীন রুমী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২২০।
- ^{১৫}. উস্তাদ মুর্তাজা মুতাহহারী, এ. কে. এম. আনোয়ারুল কবীর (অনু.), *ইসলাম ও ইরানের পারস্পরিক অবদান* (ঢাকা: ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সিলের দফতর, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৪১৪।
- ^{১৬}. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৫।
- ^{১৭}. আব্দুর রহমান জামি, ড. মাহমুদ আবেদি (সম্পা.), *নাফহাতুল উনস* (তেহরান: এনতেশারাতে এত্তেলায়াত, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৩৮২ হি.শা.), পৃ. ২৭।
- ^{১৮}. Dr. Ahmad Tamimdari, translated by Ismail Salami, *A History of Persian Literature* (Tehran: Alhoda International Publishers, 2002), P. 19.
- ^{১৯}. সম্পাদকমন্ডলী, *বাংলাপিডিয়া*, খন্ড-১০ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২২৩।
- ^{২০}. Editorial Board, *Banglapedia*, Vol-9 (Dhaka: Bangladesh Asiatic Society, 2003), P. 451.
- ^{২১}. আল-কোরআন, সূরা তাওবা, আয়াত: ১১৯।
- ^{২২}. আল-কোরআন, সূরা লুকমান, আয়াত: ১৫।
- ^{২৩}. ইমামুল আলাম আবু ঈসা মুহাম্মাদ বিন ঈসা আত তিরমিজি, *জামিউত তিরমিজি*, দ্বিতীয় খন্ড (দেওবন্দ: আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা.বি.), পৃ. ৬৩।
- ^{২৪}. ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাইল আল বুখারি, *আল জামিউল মুসনাদুস সহিহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ওয়া সুনানিহি ওয়া আয়্যামিহি (সহিহুল বুখারি)*, দ্বিতীয় খন্ড (দেওবন্দ: আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, তা.বি.), পৃ. ৮৩০।
- ^{২৫}. খাঁটি হক্কানি পিরের আলামত বা গুণাবলি: হক্কানি উলামায়ে কেরাম কোরআন-সুন্নাহ গবেষণা করে একজন খাঁটি পিরের কতগুলো আলামত বা নিদর্শন বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ:
- ক. পির সাহেবকে প্রয়োজন পরিমাণ ইলমে ধ্বনির অধিকারী হতে হবে। তা শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে হোক বা উলামায়ে কেরামের সোহবত সংশ্রবে হোক। যাতে অবান্তর আকিদা ও আমল থেকে নিজেকে এবং মুরিদকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন।
- খ. পিরের আকিদা বিশ্বাস এবং যাবতীয় আমল শরিয়তের নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। তাছাড়া তার স্বভাব-চরিত্র, চিন্তাধারা এবং অন্যান্য গুণাবলি শরিয়তের দাবী অনুযায়ী হতে হবে।
- গ. বিদয়াতমুক্ত, সুন্নতের অনুসারী হতে হবে।
- ঘ. দুনিয়ার প্রতি বিরাগী এবং আখেরাতের প্রতি অনুরাগী হতে হবে। সদা সর্বদা যাহেরি ও বাতেনি এবাদতের নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে হবে।
- ঙ. তিনি নিজেকে পিরে কামেল হওয়া দাবী করবেন না। কেননা এটি হক্কানি ও খাঁটি পিরের বৈশিষ্ট্যের পরিপন্থী।
- চ. সমসাময়িক পরহেযগার, মুত্তাকি বিজ্ঞ আলোচনা এবং সুন্নত তরিকার অন্যান্য পির মাশায়েখগণ তাকে হক্কানি ও খাঁটি বলে আখ্যায়িত করবেন।
- ছ. তালিম তালকিন অর্থাৎ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে স্বীয় মুরিদদের অবস্থার উপর দয়াপরবশ হবেন। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করবেন। তাছাড়া তিনি তাদের কখনো ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিবেন না।
- জ. দুনিয়াদার লোকদের চেয়ে দ্বীনদার পরহেযগার লোকেরা তার সাথে অনেক বেশী সুসম্পর্ক বজায় রাখবে এবং তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে।
- ঝ. খাঁটি পিরের আরেকটি গুণ হলো, তার সান্নিধ্যে এলে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ কমতে থাকবে এবং আখেরাত বা মৃত্যু পরবর্তী জগতের চিন্তা-ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।
- ঞ. তিনি নিয়মিত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যিকিরসমূহের ধারক, বাহক ও সংরক্ষক হবেন। এছাড়া তার অনুসারীদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

ট. শুধু সালেহ তথা পূণ্যবান হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং মুসলেহও হতে হবে। অর্থাৎ বিষয় জ্ঞানে জ্ঞানী এবং সংশোধনের যোগ্যতা উভয় থাকা জরুরি, যাতে মুরিদ যে বাতেনি রোগের কথা বলবে, তা খুব মনোযোগের সাথে শুনে চিকিৎসা করতে পারেন।

হজরত থানভি (রহ.) বলেন- যে ব্যক্তির মধ্যে এ আলামতগুলো পাওয়া যাবে, তার সম্পর্কে আর দেখার প্রয়োজন নেই যে, তার থেকে কোনো কারামত প্রকাশ পায় কি না? বাতেনি শক্তি আছে কি-না? তার কাশফ হয় কি-না? কেননা এসব জিনিস শায়খ বা পির হওয়ার জন্য জরুরি নয়। এমনিভাবে ওলি হওয়ার জন্যও অপরিহার্য নয়। [দ্র. তাছাওউফ তত্ত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০০; তাছাওউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০; মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, আহকামে যিন্দেগী (ঢাকা: মাকতাবাতুল আবরার, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ৬৫১।]

২৬. ইসলামী আকীদার স্বরূপ ও প্রকৃতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৭।

২৭. ইরায় শাহবাযি, সুখানে অশনা (তেহরান: এনতেশারাতে রুযানে, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৬ হি.শা.), পৃ. ৪৬; ড. মনুচেহের মুর্তাজা, মাকতাবে হাফিজ ইয়া মোকাদ্দামে বার হাফিজ শেনাসি (তেহরান: নাসেরে কিতাবখানেয়ে ইবনে সিনা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৪ হি.শা.), পৃ. ২৬৪।

২৮. আল্লামা কাযভিনি ও ড. কাসেম গানি (সম্পা.), দিওয়ানে হাফিজ (তেহরান: এনতেশারাতে আসাতির, পঞ্চম প্রকাশ, ১৩৭৪ হি.শা.), পৃ. ১৮৫।

২৯. তদেব, পৃ. ৩৬৭।

৩০. তদেব, পৃ. ১৯৯।

৩১. তদেব, পৃ. ২১৩।

৩২. মুরিদ: মহান আল্লাহকে যে চায় বা যে আল্লাহকে অন্বেষণ করে, তাকে মুরিদ, তালিব বা সালেক বলে। আল্লাহর নায়েব রাসূল (সা.), আর রাসূলের নায়েব খাঁটি পির। খাঁটি পিরের হাতে হাত রেখে আল্লাহকে হাযির-নাজির জেনে কতগুলি অঙ্গিকারে আবদ্ধ হওয়াকে ‘মুরিদ’ হওয়া বা বায়আত হওয়া বলে। [দ্র. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.), তাছাওউফ তত্ত্ব (ঢাকা: আল-আশরাফ প্রকাশনী, নবম সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ৯৭।]

৩৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, মাওলানা মুতীউর রহমান (অনু.), তাছাওউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, প্রথম মুদ্রণ, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৭৯।

৩৪. ড. মোহাম্মাদ আকরাম একরাম কর্তৃক (সম্পা.), দিওয়ানে হাফিজ (ইসলামাবাদ: মারকাযে তাহকিকাতে ফারসি ইরান ওয়া পাকিস্তান, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩৪।

৩৫. মাকতাবে হাফিজ ইয়া মোকাদ্দামে বার হাফিজ শেনাসি, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫।

৩৬. সুখানে অশনা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬; ড. তারিক সিরাজী, ‘আধ্যাত্মিক কবি হাফিজ ও তাঁর কবিতা’ নিউজ লেটার, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৯ (ঢাকা: কালচারাল কাউন্সিলরের দপ্তর, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২২; তাহমিনা বেগম, হাফিজ শিরাজী ও তাঁর কাব্যে আধ্যাত্মিক পরিভাষা, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ আর্টস এ্যান্ড ল, ভলিয়ম-৪২ (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ১২২-১২৩।

৩৭. কাযভিনি ও গানি (সম্পা.), দিওয়ানে হাফিজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫।

৩৮. তদেব, পৃ. ১২২।

৩৯. তদেব, পৃ. ৯৭।

৪০. তদেব, পৃ. ৯৭।

৪১. তদেব, পৃ. ১০১।

৪২. তদেব, পৃ. ১৮১।

৪৩. তদেব, পৃ. ২১৬।

অনুকূলচন্দ্রের রচনাবলী: বিষয়বস্তু ও প্রাসঙ্গিকতা

তাপস কুমার রায়*

Abstract: Anukulchandra was born in the year 1888 (corresponding to Bengali Era 1295) at Himaitpur village under Pabna district. Passing the various ups and downs of life he chose the medical treatment of human beings as his profession and realized that the real source or ground of disease lies inside the mind and expresses itself gradually in the body. So, for the betterment of the human mind he formulated a group of religious singers called ‘Kīrtana Dala’. Afterwards for the development of earthly, non-earthly and daily life he set up an organisation named ‘Satsanga’. Anukulachandra is the founder and key person of this organisation. He is respected and worshipped by the followers of the organisation. His personal thoughts, feelings, realised experiences are depicted in the writings *Anukula Racanabal*’-- essays written by Anukulachandra. Out of these books, *Satyānūsarana*, *Anushruti*, *Ārjya prātimoksha*, *Chalār sāthi*, *Darshana bidhāyanā*, *Amiya vāni*, *Ālochanā prasange*, *Dīprakshī*, *Kathā prasange*, *Surat sāki* etc. are remarkable. Of these books some are written by himself while the rest are written from his dictation. The background and subject matter of these books are briefly narrated in this following article. The messages and teachings contained in these books are significantly useful in our personal and social lives. Efforts have also been made to focus on them in this article.

অখণ্ড ভারতবর্ষে অনেক আশুপুরুষের জন্ম হয়েছে, যাঁরা নিজেদের কর্ম-জ্ঞান-মেধা তথা সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের ইহজাগতিক কল্যাণের পথের নির্দেশনা দিয়েছেন। পাশাপাশি মানুষের পারলৌকিক শান্তি লাভের জন্য সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। অনুকূলচন্দ্র তেমনি একজন আশুপুরুষ। পণ্ডিতপ্রবর রজতবরণ দত্তরায় বলেন—

“গৃহী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী, যোগী, কৰ্ম্মী অথবা অন্য কোন সংজ্ঞা দিয়ে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না; সবগুলো রাগ-রাগিণী যদি সু-সঙ্গত হয়ে ঐক্যতান মূর্ছনায় বেজে ওঠে তাহলে যেমনটি হয়, অনুকূলচন্দ্রের জীবনটিও তাই। হাজারো রকমের ফুল যদি তাদের বর্ণগন্ধের অশেষ বৈচিত্র্য নিয়ে একটি মালায় গ্রথিত হয় তাহলে যেমন হয়, অনুকূলচন্দ্রের জীবনটিও তাই”।^১

তিনি অখণ্ড ভারতবর্ষের ‘সংসঙ্গ’ নামক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণ-পুরুষ। জীবনের নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাঁরই উদ্যোগে ১৯২৫ সালে সংসঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ সারা বিশ্বের প্রায় ১৫ কোটির অধিক সংসঙ্গী রয়েছেন^২। সংঘের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী, আচরণবিধি, সাধনপদ্ধতি তথা অনুকূলচন্দ্রের বাণী তাঁদের কাছে প্রামাণ্য দলিল। তাঁদের জীবনাচরণের একেবারে অঙ্গীভূত সার্বিক বিধিবিধান। সংঘের প্রাণপুরুষ অনুকূলচন্দ্র তাঁদের কাছে— ‘শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র’^৩ হিসেবে পূজনীয়। কিন্তু অনুকূলচন্দ্রের জন্ম, বেড়ে ওঠা, পেশাগত জীবন, সংসঙ্গ গঠন ইত্যাদি খুব সহজ ছিল না। অনুকূলচন্দ্রের জন্মের সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজ শাসনের অধীন। শাসকদের লক্ষ্য সমগ্র ভারতবর্ষের উপরে তাদের শাসনকে চিরস্থায়ী করা। সেজন্য তারা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করে। লর্ড মেকেলের শিক্ষানীতি ভারতবাসীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া হলো। সাথে-সাথে ভারতীয় মানুষের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অপসংস্কৃতি ইত্যাদিকে সামনে আনা হয়, যাতে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে

* পিএইচ. ডি. গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রামকৃষ্ণদেব বললেন- “যত মত তত পথ”^৪। শাসকদের তাড়ানোর জন্য যুবকদের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধী অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরোধের কারণে সর্বাঙ্গিকভাবে কাজ করতে পারছিলেন না। মঠ ও মিশনে ভারত ঐক্যের ভাবধারা থাকলেও সর্বাংশে ইংরেজদের অনুকরণ বন্ধ হলো না। সমগ্র ভারতবর্ষের এমনি এক প্রতিকূল পরিবেশে অনুকূলচন্দ্রের আবির্ভাব।

গঙ্গা-যমুনার পলল-বিধৌত জেলা পাবনার অন্তর্গত হিমাইতপুর গ্রামে অনুকূলচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। আসলে গঙ্গানদী পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে পদ্মা নাম ধারণ করে। সুপরিচিত হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে পদ্মানদীর উত্তর পাশে অবস্থিত বৃহত্তর পাবনা জেলা। দক্ষিণ দিক দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা নদী। তাই বর্তমানে পদ্মা-যমুনার পলল বিধৌত বিস্তৃত জেলা পাবনা- সেখানে পদ্মাতীরবর্তী গণ্ডগ্রাম ‘হিমাইতপুর’ (হিম্মতপুর>হিমাইতপুর)। উক্ত গ্রামে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে তাঁর জন্ম।

অনুকূলচন্দ্রের পিতৃ-মাতৃকূলের কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার। পাবনা জেলার চাটমোহর থানার অন্তর্গত গুয়াখাড়া গ্রাম নিবাসী শিবচন্দ্র চক্রবর্তী একজন সম্ভ্রান্ত বারেন্দ্র শ্রেণির ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্থায়ী বুদ্ধি-সাহস-ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যে তিনি সমুজ্জ্বল ছিলেন। আশৈশব পিতৃ-মাতৃহীন শিবচন্দ্র মাসতুতো ভাইয়ের বাসায় থেকে বড় হন। কন্ট্রাকটরিকে নিজের জীবনের পেশা হিসেবে বেছে নেন। যদিও পরে জমিদারের স্টেটে নায়েবের কাজ করেন। অন্যদিকে হিমাইতপুর নিবাসী রামেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও কৃষ্ণাসুন্দরী দম্পতির ৪র্থ সন্তান হলেন মনোমোহিনী দেবী। উল্লেখ্য, বহু-ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত রামেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কুচবিহার স্টেটে ম্যানেজারের চাকরি করতেন। স্ত্রী কৃষ্ণাসুন্দরী ছিলেন সরলা, বুদ্ধিমতী ও সর্বজনশ্রদ্ধেয়া। তাঁর ছয়টি সন্তানের মধ্যে ৪র্থ কন্যা মনোমোহিনী দেবী একমাত্র বেঁচে ছিলেন, যার সাথে শিবচন্দ্র চক্রবর্তীর বিবাহ হয়। বাড়িতে পুরুষ মানুষের অভাব থাকায় তিনি শাশুড়ির অনুরোধে শ্বশুরবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এই শিবচন্দ্র-মনোমোহিনী দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান ‘অনুকূলচন্দ্র’। বাংলা ১২৯৫ সালের তালনবমী তিথিতে, সংক্রান্তি দিবসে, উষাকালে হিমাইতপুর গ্রামে অনুকূলচন্দ্রের জন্ম হয়।^৫

তখনকার দিনে প্রচলিত পাঠশালাভিত্তিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। হাতেখড়ির পরে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম কাশীপুরে কৃষ্ণচন্দ্র বৈরাগী মহোদয়ের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখানে দুইবছর পড়াশুনা শেষে পাবনা শহরের ইংরেজি স্কুল ‘পাবনা ইন্সটিটিউশন’-এ ভর্তি হন। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সেখানে পড়াশুনার পর চলে যান পিতার কর্মস্থল ঢাকার আমিরাবাদে এবং সেখানকার রাইপুরা স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু পরে আবার ‘পাবনা ইন্সটিটিউশনে’ ফিরে আসতে হয়। এ সময় তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াকালীন অবস্থায়ই দিদিমার অনুরোধে তাঁকে বৈবাহিক জীবনে প্রবেশ করতে হয়। বিবাহ পরবর্তী সময়ে কিছুকাল পড়াশুনা চলে। কিন্তু পিতা শিবচন্দ্র চক্রবর্তী চাকরি ছেড়ে দিলে সার্বিক সংসার অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে। তখন কোন রকমে তাদের দিন চলছিল। একপর্যায়ে নিজের মাসতুতো ভগ্নিপতির কাছে পশ্চিমবঙ্গের নৈহাটিতে চলে আসেন। সেখানে পুনরায় তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ হয়। প্রবেশিকা ক্লাস পর্যন্ত অধ্যয়ন চললেও প্রবেশিকা পরীক্ষা তাঁর আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কারণ, নিজের ফর্মফিলাপের টাকা দিয়ে সহপাঠীর ফর্ম পূরণের ব্যবস্থা করে নিজে বাড়ি ফিরে আসেন। গৃহে ফিরে পারিবারিক অনুরোধে অর্থকরী বৃত্তিমূলক শিক্ষা- ‘ডাক্তারি বিদ্যা’ পড়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি তো প্রবেশিকা পাশই করেন নাই। তাই ভর্তির প্রাথমিক যোগ্যতাও নেই। শেষে নির্বাচনী বোর্ডের সামনে সংসাহসী অনুকূলচন্দ্র নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে ‘কোলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে’ ভর্তি হন।

ডাক্তারি পড়ার সময়ে চরম অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে চলে কয়লার গুদামের কুলি-মজুরের সাথে বসবাস, পদব্রজে যাতায়াত, সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ- সবমিলিয়ে তাঁর জীবন চলতে থাকে। মাত্র দশ টাকাতেই তাঁর সার্বিক

খরচ নির্বাহ করতে হতো। সেসময় সুহৃদজন হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় একখানি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বই ও একটি ঔষধের বাস্ক তাঁকে দিয়েছিলেন। উক্ত বই চর্চা করে সহবসবাসকারী কুলি মজুর ও প্রতিবেশীদের মধ্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তাঁর জীবনে প্রথম শুরু হয়। ডাক্তারি চর্চায় প্রাপ্ত সামান্য অর্থ দিয়েই তাঁর জীবন নির্বাহ ও পড়াশুনা চলত। কিন্তু ডাক্তারি পড়াও শেষ না করে পরহিতব্রতী অনুকূলচন্দ্র নিজ গ্রাম হিমাঁতপুরে ফিরে আসেন।

সনদধারী না হলেও ডাক্তারি বিদ্যার শরীরতত্ত্ব, রোগতত্ত্ব, হোমিওপ্যাথি-এলোপ্যাথি ঔষধ সবই তাঁর জানা ছিল। কিন্তু আগ্রহ ছিল হোমিওপ্যাথিতে। সেইসাথে দেশজ ভেষজবিদ্যা, সঠিক পরামর্শ, উপদেশ সবমিলিয়ে তাঁর চিকিৎসার নাম হয় ‘কিউরোপ্যাথি’। অর্থাৎ রোগের চিকিৎসা নয় রোগীর আরোগ্য লাভের চিকিৎসা। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁর অনুসরণীয় নীতি ছিল—

“চিকিৎসাতে চাস্ যদি
তুই আত্মপ্রসাদ ঢাকা,
ঢাকায় নজর না দিয়ে তুই
রোগীর পানে তাকা।”^৬

সেই সময় আশে-পাশের গ্রামে রটে গেল যে অনুকূল ডাক্তারের কাছে রোগী মরে না। দলে-দলে রোগীরা তাঁর কাছে আসতে শুরু করে। উপার্জনও হয় বেশ।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তৃতীয় শ্রেণিতে থাকা অবস্থায়ই দিদিমার অনুরোধে তিনি বিবাহ করেন। বাংলা ১৩১৩ সালে ২৮ শ্রাবণ, তারিখে (১৯০৬ খ্রি.) পাবনা জেলার ধোপাদহ গ্রাম নিবাসী রামগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা ষোড়শীবালা দেবীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। পরে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথমা স্ত্রী ষোড়শীবালা দেবীর ছোটবোন সর্বমঙ্গলা দেবী অনুকূলচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করেন। উল্লেখ্য, সর্বমঙ্গলা দেবী ছিলেন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের প্রথম স্নাতক ডিগ্রিধারী মহিলা।^৭

চিকিৎসা সেবা প্রদানের সময়েই তাঁর মাধ্যমে সৎসঙ্গ গঠিত হয়। এর প্রথম কারণ দেহরোগের পাশাপাশি মানুষের মনোরোগের চিকিৎসা। ডাক্তারি বিদ্যামতে মানুষের পাঁচাত্তর শতাংশ রোগই মনোদৈহিক। মন থেকে জন্ম এবং দেহে যার বহিঃপ্রকাশ। ডাক্তার অনুকূলচন্দ্র মানুষের চিকিৎসা করতে গিয়ে এই সত্যটি উপলব্ধি করেন। মনের চিকিৎসার জন্য প্রথমে তিনি নামকীর্তনের দল গঠন করেন। বিচিত্র স্থানের বিচিত্র মানুষ সেখানে আসতে থাকে। পরে সময়ের প্রয়োজনে সেখানে সাধুজনদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে ‘সৎসঙ্গ আশ্রম’ গড়ে ওঠে। আশ্রম কাকে বলে সেটি বলতে গিয়ে অনুকূলচন্দ্র বললেন— “সৎ-এ সংযুক্তির সহিত তদ্ গতিসম্পন্ন যারা তারাই সৎসঙ্গী, আর তাদের মিলনক্ষেত্রই হলো সৎসঙ্গ।”^৮ পরে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রচেষ্টায় এই সৎসঙ্গ সরকারিভাবে নিবন্ধিত হয়। অনুকূলচন্দ্র ধর্মের নতুন সংজ্ঞা দিলেন— “Dharma is the science of being and becoming.”^৯ তিনি আরও বললেন— “ধর্ম কখনো বহু হয় না। ধর্ম একই, আর তার কোন প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমন-কি— যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না। হিন্দু-ধর্ম, মুসলমান-ধর্ম, খ্রীষ্ট-ধর্ম, বৌদ্ধ-ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ওসবগুলি মত।”^{১০} আশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে তুললেন নানামুখী কর্মপ্রতিষ্ঠান। সেই সাথে চলতে থাকে বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য নানান সমাধানী আলোচনা।

একপর্যায়ে শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে অনুকূলচন্দ্রকে ডাক্তার হাওয়া বদলের জন্য পরামর্শ দেন। ১৯৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি ভারতের বিহার রাজ্যের (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) ‘দেওঘর’ নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে গমন করেন। ইতোমধ্যে ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে দেশবিভাগ হয়ে যায়। সমগ্র ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশে পরিণত হয়। বিহার রাজ্য পড়ে ভারতের মধ্যে। এই প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর আর

হিমাইতপুরে (জন্মস্থানে) ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। কিন্তু জন্মভূমির প্রতি টান সবসময়ই ছিল। এ আকুতি নিয়েই ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি বিহারের দেওঘরে তাঁর তিরোধান ঘটে।^{১১}

অনুকূল রচনাবলী:

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে— “ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।”^{১২} পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচন্দ্র দাশের মতে— “নিজের কথা পরের কথা, বাহ্যজগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝঙ্কত হয় তারই শিল্পসঙ্গত রূপ সাহিত্য।”^{১৩} আসলে সাহিত্য একটি শিল্প। শিল্প প্রকাশের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন, সাহিত্যের মাধ্যম ভাষা। পরিবেশ ও জীবনগত ভাবকে আপন অন্তরে উপলব্ধি করে রচয়িতা ভাষা-শিল্পের মাধ্যমে যা প্রকাশ করেন তাই সাহিত্য। সাহিত্যের বিভিন্ন গঠন বা অবয়ব তার বিভাজনভিত্তিক নামকরণও ভিন্ন যেমন— গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি। অলংকারশাস্ত্রগত-ভাবে এদের বিন্যাসশৈলীও আলাদা আলাদা। অনুকূলচন্দ্রের রচনাবলী প্রকৃতপক্ষে সেই ধরনের আলংকারিক সাহিত্য নয়। জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে, সমাজের বিচিত্র শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে তিনি যা উপলব্ধি করেছেন সেগুলি তাঁর লেখার ভিতরে প্রকাশ পেয়েছে। মানবজীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য অনুকূলচন্দ্র প্রদত্ত বাণীগুলি গদ্য ও পদ্য দু’ভাগে বিভক্ত। তাঁর স্বহস্তলিখিত কিছু-কিছু রচনা রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা তাঁর ছিল না, কিন্তু সহজ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাদৃষ্টির সাহায্যে তিনি যা দিয়ে গেছেন তা অতি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকেও স্তম্ভিত করে। বাইশ বছর বয়স থেকে তাঁর লেখা আমরা পাই এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি লিখে গেছেন। তাঁর রচিত বাংলা ভাষায় ছন্দোবদ্ধ লেখা বাণীর সংখ্যা ৮৮২৯টি, বাংলা ভাষায় গদ্য বাণীর সংখ্যা ১০৩৯২টি এবং ইংরেজি ভাষায় গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে প্রকাশিত বাণীসংখ্যা ২৪৬৭টি। বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ ১০২ খানা, ইংরেজি ভাষায় ১৮ খানা। এছাড়া আরও অনেক পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত রয়েছে। তাঁর সার্বিক রচনাকে প্রাথমিকভাবে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা—

ক) স্বহস্ত লিখিত রচনা খ) ছড়া-সাহিত্য গ) শ্লোকবদ্ধ গদ্যবাণী ঘ) আলাপন-সাহিত্য ঙ) ভাববাণী ও অন্যান্য।

ক) স্বহস্ত লিখিত রচনা: অনুকূলচন্দ্রের স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর অধিকাংশ রচনাই শ্রুতিলেখকের (লেখকের বলা এবং লিপিকরের লেখা) মাধ্যমে লেখা। কিন্তু স্বহস্তলিখিত রচনাগুলি তা নয়। এগুলি লেখকের একেবারে নিজ হাতে লেখা। সত্যানুসরণ, পত্রসাহিত্য, সুরতসাকী এই রচনাগুলি স্বহস্ত রচনার অন্তর্গত। যেমন—

১. সত্যানুসরণ: ‘সত্যানুসরণ’ একটি উপদেশমূলক ছোট পুস্তিকা বিশেষ। নিজের অনুরাগী ভক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে স্বহস্তলিখিত পুস্তিকাখানি মানবজীবনের অনুসরণীয়, বর্জনীয়, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, শান্তি-অশান্তি, বন্ধন-মোক্ষ, ধর্ম-অধর্ম, কর্ম-অকর্ম ইত্যাদি বিষয়ে ৮৪ পৃষ্ঠায় এই উপদেশগুলো লেখা হয়েছে। নিজের প্রিয়ভক্ত পেশাগত জীবনের কর্তব্যে তাঁর থেকে দূরে চলে যাবেন। তাই স্বহস্তলিখিত এই বাণীগুলি তিনি জীবনচলার পাথেয় হিসেবে তাকে লিখে দেন। ভাগগুলোর শিরোনাম— দুর্বলতা, অকৃতজ্ঞতা, আদর্শ, জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম, নেতা, প্রচার, গুরু, শ্রদ্ধা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা, কপটতা, অনুতাপ, কাম, চলার সংকেত, প্রভৃতি— সবমিলে ৬৫টি শিরোনামে ব্যবহারিক অতি প্রয়োজনীয় বিষয় স্থান পেয়েছে। যেমন— ‘ব্যবহারের নয়টি মন্ত্র’ বিষয়ে গ্রন্থটিতে রয়েছে—

“১। যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে ততদিন তুমি একটি পিপীলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো— আর তা’ যদি না-কর, তোমার চাইতে হীন আর কে? ২। যদি নিজের কষ্টের বেলায় সংসারী সাজো, অন্যের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সেজো না। ৩। বল-কিন্তু আত্মপ্রশংসার বা খ্যাতি—

বিস্তারের জন্য নয়। তোমার চরিত্রের কোন উদাহরণে যদি কারো মঙ্গল হয়, তবে তার নিকট তা গোপন রেখো না।”^{১৪}

ব্যক্তি সুহৃদজনের উদ্দেশে লেখা হলেও সেগুলো পরে সমষ্টিগত জীবনের পাথেয় হিসেবে পরিণত হয়েছে।

২. পত্রসাহিত্য: নিজের পরিচিত আপনজন তথা অনুসারীদের উদ্দেশে তিনি অনেক পত্র লিখতেন। পরবর্তী সময়ে সেগুলো সংগ্রহ করে গড়ে তোলা হয় পত্র সাহিত্য, যার সংখ্যা প্রায় ১৯০টি। ১২২ টি পত্র নিয়ে (১৩৩২ বঙ্গাব্দে) প্রথমবারে প্রকাশিত হয় ‘তাঁর-চিঠি’ নামে পত্র-সাহিত্য এবং দ্বিতীয়বারে (১৯৪৯ খ্রি.) ৬৮টি পত্র নিয়ে প্রকাশিত হয় ‘অমিয়ালিপি’। অনুকূলদর্শের ছায়াই মূলত এই পত্রসাহিত্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে।

৩. সুরত সাকী: স্বহস্তলিখিত আরেকটি গ্রন্থ ‘সুরত-সাকী’- যার সহজ অর্থ- ‘একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রেমাস্পদ’। গভীর বিশ্লেষণে এর অর্থ দাঁড়ায়- ‘জীবাত্মা ও পরমাত্মা’। বাংলা ১৩৭৯ সালের ১ বৈশাখ গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যের জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা গ্রন্থটির মূল উপজীব্য বিষয়। বৈষ্ণবীয় সুর ও পদাবলীর ভাষা অনুসরণ করে প্রণয়, প্রেম, রাস, রাধাতত্ত্ব, কাম ও প্রেমের পার্থক্য ইত্যাদি মোট ৬২টি বিষয় সম্পর্কে ছোট ছোট কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য সাহিত্যে।

খ) ছড়া-সাহিত্য

বাংলা ভাষায় লোকসাহিত্যের অন্তর্গত ছড়ার একটি ঐতিহ্য আছে। সাধারণত এগুলি শিশুমনেরই অধিক উপযোগী সহজসরলভাবে স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে বাংলা কবিসাহিত্যিকদের রচিত সার্বিক ছড়াসাহিত্য শিশুমনের উপযোগী এমন নয়। বরং অনেক ছড়া বিদ্যানুরাগী শ্রোতৃ জনেরও উপযোগী ও বোধগম্য। অনুকূলচন্দ্রের রচিত ছড়াগুলি সহজ সরল ভাষার পাশাপাশি বিজ্ঞজনের জন্য উপযোগী। মূলত জীবন ও জগতের কল্যাণের জন্য যেসব কথা তিনি বলেছেন- সেগুলিকেই শ্রুতিমধুর ছড়ার মধ্য দিয়ে হৃদয়স্পর্শী করে সহজ ভাষায় ছোট ছোট কবিতায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এগুলির সাহিত্যমূল্য অপরিমিত।

১৯৪০ সালের শুরুর দিকে অনুকূলচন্দ্র ছড়া-সাহিত্য রচনা শুরু করেন। মানবজীবনের ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিবাহ, সমাজ-সংস্কার, রাষ্ট্র, দর্শন, সাধনা, কৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে ছড়া-সাহিত্যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর সংখ্যা ৮ (আট) হাজারেরও বেশী। ছড়া-বাণীগুলি ‘অনুশ্রুতি’ নামক গ্রন্থে সর্বমোট সাত খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। ১ম খণ্ডের প্রকাশকাল ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ। এছাড়াও, ইংরেজিতে আরও কিছু ছড়া-বাণী আছে যেগুলো “The Message ও Magna Dicta” নামে দুটি গ্রন্থে গদ্যবাণীর আলোচনায় উল্লিখিত। ছড়াগুলির সৃষ্টির সময়ে পরিবেশ ও কবিত্বপূর্ণ পরিমণ্ডলের কী এক অপূর্ব প্রভাবের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল সে সম্পর্কে শ্রুতিলেখক শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস ও গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য লিখেছেন-

“অস্তিকায়নে লতায় ঘেরা তাঁর ঘরটিতে পদ্মার ধারে তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র) বসে আছেন। সামনে দক্ষিণে আঁকাবাঁকা ঝিলগুলি নিয়ে বিরাট দিগন্তপ্রসারী মাঠ, তিনি অস্তিকায়নের কাঠের ঘরটিতে বসে সামনের দিকে আকাশ আর মাঠ সুদূরের যেখানে মিশেছে সেদিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে যেন কী দেখছেন- কিছুই যেন ভাবছেন না- মাঝে মাঝে দু’ একটি কথা বলে যাচ্ছেন- যেন অসীমের থেকে কার নির্দেশে তাঁর মনে বাণীগুলি ভেসে-ভেসে আসছিল- আর তিনি যেমন পাচ্ছিলেন তেমনিই যেন বলে যাচ্ছিলেন- একটা প্রচেষ্টাহীন সহজ ঔদাসীণ্যের তন্ময়ত্ব যেন থমথম করছিল সে পাতায় ঘেরা নিবিড় নীড়টির ভিতর- তাঁর মুখে চোখে সর্বাপেক্ষে! সে স্তব্ধতা সে বাণীর জন্য আকুল অপেক্ষা। সে নিরালা ঘরের ধ্যানমগ্ন উচ্ছ্বাস।

বাইরের সে আকুল করা মাঠ ও আকাশ- মাঝখানে তাঁর সে প্রখর উদাসীন দিব্য দৃষ্টিভঙ্গিমা ও সহজ প্রতীক্ষা সবটা মিলেমিশে এমন একটা দিব্য মায়ার সৃষ্টি করত- ছড়াগুলি বেরিয়ে আসত তাঁরই শ্রীমুখ থেকে ঝলকে ঝলকে, স্তবকে স্তবকে, থরে থরে অগোছালো রকমে স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা খচিত হয়ে- পরম আগ্রহে আমরা তা লিখে নিতাম।”^{১৫}

শোনার পর অনুলেখকের দ্বারা এই ছড়াগুলি লিখেছেন বলে এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ‘অনুশ্রুতি’। ‘অনু’ শব্দের অর্থ পশ্চাৎ; অর্থাৎ যা শোনার পরে হয়েছে তাই ‘অনুশ্রুতি’। বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা ছড়াগুলি। যেমন- ধর্ম বিষয়ে দুটি ছড়া-

“অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে
ধর্ম বলে জানিস তাকে।”^{১৬}
“বাঁচা-বাড়ার মর্ম যা
ঠিকই জানিস ধর্ম তা।”^{১৭}

আবার এই ধর্মের প্রায়োগিক ক্ষেত্র নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

“ধর্ম যদি নাইরে ফুটলো
জীবন মাঝে নিত্য কর্মে
বাতিল করে রাখলি তারে
কী হবে তোর তেমন ধর্মে?”^{১৮}

শিক্ষার উপর তাঁর দুটি বহুল প্রচলিত ছড়া-

“অভ্যাস ব্যবহার ভাল যত
শিক্ষাও তার জানিস তত।”^{১৯}
“শিক্ষা যেথা শ্রমের সাথে
আদত শিক্ষা জানিস তাতে।”^{২০}

শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রীতিমত তিনি একটি নিজস্ব শিক্ষা দর্শন দাঁড় করিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও সদাচার একে অপরের পরিপূরক তাই সুস্বাস্থ্যের জন্য কিভাবে নিয়ম মেনে চলতে হবে, সেকথা বহু ছড়াবাণীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

গ) শ্লোকবদ্ধ গদ্যবাণী:

এই জাতীয় রচনাগুলি প্রকৃতিতে গদ্য, কিন্তু আকৃতিতে কাব্য। গদ্যসুলভ যুক্তি-নিষ্ঠ তৎপরতায় সুনির্দিষ্ট বক্তব্যের উপস্থাপনা বাণীগুলির প্রাণ-সত্তা, কিন্তু গঠনশৈলী কাব্যিক। কেউ কেউ এগুলোকে বলে থাকেন কাব্যিক গদ্য। অনুকূলচন্দ্রের রচনার মধ্যে এই জাতীয় রচনার সংখ্যা বেশি। এসবের মোট সংখ্যা বাংলায় ১০৩৯২টি, ইংরেজিতে ২৪৬৭টি। কলেবর বৃদ্ধির দিকে তাকিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের বিরবণ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো-

১। **শাস্ত্রী**- আমাদের জীবন চলার শাস্ত্র-নীতি অল্পকথায় সূত্রাকারে এখানে বিবৃত। মোট ৯৯১ টি বাণী নিয়ে ১৯৫১ সালে প্রথম প্রকাশ হয়।

২। **সম্বিতী**- জীবনের জটিল সমস্যাগুলির বিশদ-বিস্তৃত বিবরণ ও বিশ্লেষণ যোগে সমাধানী সূত্র এখানে রয়েছে। ৫৪৩ টি বাণী নিয়ে ১৯৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গদ্য বাণীগ্রন্থ।

৩। **জীবন-দীপ্তি**- জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে উত্তরণের উপায় সম্বলিত বাণী নিয়ে ১৩৫৬ সালে প্রথম প্রকাশ হয়।

৪। **যতি অভিধর্ম**— মানবজীবনের চতুরাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের অন্তর্গত প্রচলিত বিধানগুলো এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট ৮৬টি বৃহদাকার বাণীতে গ্রন্থটি সমাপ্ত।

৫। **নারীর নীতি**— ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত এই গ্রন্থে নারীর আচার-আচরণ, কর্তব্য নিয়ে অসংখ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

৬। **চলার-সাথী**— ১৩৪১ বঙ্গাব্দে চলার সাথী হিসেবে ৩১৬ টি অতি আবশ্যকীয় বাণী নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয় এই গ্রন্থ।

৭। **পথের-কড়ি**— পথের সম্মল সার্বক্ষণিক বন্ধু হিসেবে এই গ্রন্থের প্রয়োজীয়তা অত্যাৱশ্যক।

৮। **চলার-পথে**— চলার পথে চলতে চলতে অসংখ্য জিজ্ঞাসার সমাধানে এই গ্রন্থের প্রকাশ।

৯। **The message ও Magna Dicta**— ১৯৪৯ সালে *Magna Dicta* ও ১৯৩৫ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে *The message* -এর ৯টি খণ্ড প্রকাশিত হয় যেখানে প্রায় আড়াই হাজার ইংরেজি বাণী রয়েছে।

১০। **আর্য-প্রাতিমোক্ষ**— বাংলায় গদ্যবাণীগুলি ১৯৪৮ সালে ১০ মে সোমবার প্রদান করা শুরু হয় এবং ১৯৬৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর তারিখে এগুলোর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় আট হাজার। যা পর্যায়ক্রমে ২৪ খণ্ডে ‘আর্য-প্রাতিমোক্ষ’ নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো কোন বাণীটি কখন কোথায় প্রদান করা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ সংযুক্তি। বিষয়ভিত্তিক আলাদা করে বাণীগুলি বিন্যাস করে নিম্নোক্ত ২৫ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সংক্ষেপে সেগুলোর প্রকাশকাল ও বাণী সংখ্যা উল্লেখ করা হল।

১। **শিক্ষা বিধায়না**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে শিক্ষা সম্বন্ধীয় ৩০৩টি গদ্য বাণী নিয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২। **আদর্শ বিনায়ক**— ১৯৬৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাণী সংখ্যা ২৫৬।

৩। **আর্যকৃষ্টি**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। বাণী সংখ্যা ২১৬।

৪। **চর্যাসূক্ত**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ১ম প্রকাশিত। বাণী সংখ্যা ১৬৮।

৫। **ঐতি-বিনায়ক ২ খণ্ড**— ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে ৩২৮টি বাণী নিয়ে ১ম খণ্ড ও ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ২৫১টি বাণী নিয়ে ২য় খণ্ড প্রকাশিত।

৬। **কৃতি-বিধায়না**— ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। বাণী সংখ্যা ৩৭৪।

৭। **সেবা-বিধায়না**— ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত। বাণীর সংখ্যা ২৭৬টি।

৮। **বিকৃতি-বিধায়না**— ৩৬৫টি বাণী নিয়ে ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

৯। **আচারচর্যা**— প্রথম প্রকাশিত ১৩৬৮ সনে। বাণীর সংখ্যা ৫৮০টি।

১০। **স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশ। বাণীর সংখ্যা— ১০০।

১১। **আশিস-বাণী**— ২ খণ্ডে প্রকাশিত বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত আশিস বাণী নিয়ে ১৯৬০ ও ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত।

১২। **দেবীসূক্ত**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট বাণীসংখ্যা ১৫০টি।

১৩। **রাজী সূক্ত**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ১৬৭টি শ্লোকবদ্ধ গদ্যবাণী নিয়ে প্রথম প্রকাশিত।

১৪। **সদ-বিধায়না ২ খণ্ড**— ১৩৬৯ সনে প্রথম প্রকাশিত। বাণীর সংখ্যা ২৯৩টি।

১৫। **বিজ্ঞান-বিভূতি**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ১ম প্রকাশ। বাণীর সংখ্যা ৬১টি।

১৬। **সমাজ-সন্দীপনা**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। মোট বাণীর সংখ্যা ৫১১টি।

১৭। **বিধান-বিনায়ক**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে ৩৮৭টি বাণী নিয়ে প্রথম প্রকাশিত।

১৮। **দর্শন-বিধায়না**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশ। বাণীর সংখ্যা ৩৬৭।

১৯। **সংজ্ঞা-সমীক্ষা**— ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, মোট বাণীর সংখ্যা ২২১টি।

২০। **নিষ্ঠা-বিধায়না**— ১৩৭০ সনে প্রকাশিত। বাণীসংখ্যা ১৪৫টি।

- ২১। *বিবাহ-বিধায়না*— বিবাহ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে ১৩৭০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশ।
- ২২। *তপোবিধায়না ২ খণ্ড*— ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে ১ম খণ্ড প্রকাশিত। বাণীর সংখ্যা ৩৭২টি। ১৩৭১ বঙ্গাব্দে ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ২৩৮টি বাণী নিয়ে।
- ২৩। *ধৃতি-বিধায়না ২ খণ্ড*— ৩৯৫টি বাণী নিয়ে ১৩৬৮ সনে ১ম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। ২য় খণ্ডটি ১৩৭০ সনে প্রকাশিত হয়। মোট বাণীসংখ্যা ৩২২টি।
- ২৪। *বিধি-বিন্যাস*— ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত। মোট বাণীসংখ্যা ৪৫০ টি।
- ২৫। *নীতি-বিধায়না*— ৩৬৬ টি বাণী নিয়ে ১৩৬৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ধর্ম, দর্শন, ব্যক্তি-জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র, জীবন এই লেখাগুলোর বিষয়বস্তু। “এগুলো পাঠকালে একটা ঐশী ছন্দের অনুরণন অনুভূতির মর্মমূলে কাঁপন জাগিয়ে দিব্য চেতনাকে জাগ্রত করে তোলে, যা একমাত্র বৈদিক মন্ত্র ও অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থের বাণীতেই পাওয়া সম্ভব। বাংলা সাহিত্যে এটা অনুকূলচন্দ্রেরই সম্পূর্ণ নতুন অবদান”^{২১}।

ঘ) আলাপন-সাহিত্য:

অগণিত অনুরাগী ভক্ত জীবনের বহু জটিল সমস্যা নিয়ে প্রতিদিন অনুকূলচন্দ্রের কাছে আসতেন। প্রত্যেকের সমস্যা মনোযোগ সহকারে শুনে তিনি তাঁর সমাধান দিতে চেষ্টা করতেন। পাশের অনুলেখকেরা এই ধরনের সমাধানী বাণীগুলির দিন, তারিখ, সময় ইত্যাদি উল্লেখ করে লিখে রাখতেন। এ কাজে সহযোগিতা করতেন প্রফুল্লকুমার দাস, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মৌলভী খলিলুর রহমান প্রমুখ পণ্ডিত। পরে বাণীগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বাণীগুলির সংকলক ও এগুলির সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

১। *অমিয়-বাণী*— জীবনে অসংখ্য ভক্ত অনুকূলচন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু ভক্তের সাথে অনুকূলচন্দ্রের একত্র বসবাস ঘটেছে। ঘনিষ্ঠ এসকল ভক্তের বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। এই প্রশ্নোত্তর সম্বলিত গ্রন্থখানি ‘অমিয়-বাণী’ শিরোনামে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূলত জীবন জিজ্ঞাসায় আকুল গ্রন্থ সংকলয়িতা শ্রীঅশ্বিনীকুমার বিশ্বাস মহোদয়ই ছিলেন মূল প্রশ্নকর্তা। “অন্য একজনের ছোট প্রশ্ন— সৌন্দর্য কি? উত্তরে অনুকূলচন্দ্র বললেন— সমতাই সৌন্দর্য। আবার প্রশ্ন— ভগবান যে সুন্দর সে কেমন? অনুকূলচন্দ্র— ঐরকমই, তাঁর নিকটস্থ যত হওয়া যায়, ততই মন সমতাপ্রাপ্ত হয়। আর সেই রসস্বরূপের, আনন্দস্বরূপের ভাবে বিভোর হয়। সেই রসে বা ভাবে বিভোর হওয়াই তাঁর সৌন্দর্যের অনুভব।”^{২২}

২। *আলোচনা-প্রসঙ্গে*— ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে যে সমস্ত আলোচনা অনুকূলচন্দ্রের সান্নিধ্যে হয়েছে তারই ধারাবাহিকতার ফসল এই গ্রন্থ। এখন পর্যন্ত ২২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। সংকলয়িতা শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস। পরিপূর্ণ জীবন বিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এখানে আলোচিত হয়েছে। ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে।

৩। *নানা-প্রসঙ্গে*— ৪ খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ডটি বাংলা ১৩৪১ সালে প্রকাশিত। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড ১৩৪৬ সালে প্রকাশিত হয়। সংকলক মহোদয় ৪র্থ খণ্ডের ভূমিকায় লিখছেন— “---- পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের জাতি ও সমাজ সংগঠন আন্দোলনে যে সকল বাস্তব প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে— তাহারই উত্তর সমেত ‘নানা প্রসঙ্গে’ ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইল।”^{২৩}

৪। *কথা-প্রসঙ্গে*— ৩ খণ্ডে সমাপ্ত, বাংলা ১৩৫০ সালে প্রথম প্রকাশিত অনুকূলচন্দ্রের সাথে সাধারণ মানুষের প্রশ্নোত্তর সম্বলিত গ্রন্থ।

৫। **দীপরক্ষী**— শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ‘দীপরক্ষী’ ৬ খণ্ডে প্রকাশিত। জীবনের অসংখ্য সমাধানী প্রশ্নের উত্তর এতে রয়েছে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই গ্রন্থের সংকলন শুরু হয়।

৬। **ইসলাম প্রসঙ্গে**— হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক ভুল ধারণা ও ভুল বোঝাবুঝির নিরসন কল্পে মোঃ খলিলুর রহমান ও শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ভট্টাচার্য অনুকূলচন্দ্রকে কতকগুলো প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সব ভুল ধারণাগুলি তিনি কত সহজ অথচ গভীর মনস্বীতার সঙ্গে সমাধান দিয়েছেন এসব সার্থক ধারণা পাওয়া যায় ‘ইসলাম প্রসঙ্গে’ গ্রন্থখানিতে। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে (১৯৪০ খ্রি.) গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

এছাড়াও ‘নারীর পথে’ গ্রন্থখানিতে নারীদের চলা-বলাসহ নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী মহোদয় সংকলিত বিশেষ কিছু সময়ের আলোচনা রয়েছে ‘প্রতুল দীপ্তি’ নামক গ্রন্থে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই আলোচনাগুলি অমূল্য সম্পদ। অনেক ভক্তানুরাগী ও সুধীজনের কাছে এগুলো এখন নিত্যপাঠ্য ও সর্ব-সমাধানী আকর হিসেবে গ্রহণীয়।

৬) ভাববাণী ও অন্যান্য

চিকিৎসক হিসাবে তাঁর অনুভব ছিল, শারীরিক চিকিৎসার থেকে মানসিক চিকিৎসা জরুরি। তাই তিনি মানসিক উন্নতির জন্য মানুষকে কীর্তন করতে এবং শ্রবণ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে গঠিত হয় কীর্তনের দল। একথা পূর্বেও বলা হয়েছে। কীর্তন করতে করতে তিনি নিজেও সমাধিস্থ হয়ে পড়তেন। সে সময়ে কখনও কখনও তাঁর মুখ থেকে সেই সম্বন্ধীয় অবস্থায় তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী তাঁর ভক্তরা লিখে রাখতেন। এরকম সমাধিস্থ অবস্থার ১৫ দিনের বাণী নিয়ে ১৩২৫ বঙ্গাব্দে ‘পুণ্যপুঁথি’ প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে প্রতিটি বাণী সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর ৭২ দিনের বাণী নিয়ে প্রকাশিত হয় ‘পুণ্যপুঁথি’র পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। এগুলির মূল্য ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে অপরিসীম। সেসব বাণীর মধ্যে দু-একটি আলোচনায় আনা যেতে পারে। ১২ আষাঢ়, ১৩২১ বঙ্গাব্দ— কর্ম সম্বন্ধে ভাববাণী হচ্ছে—

“External activity of body and works by the in mind, is work. Yes, also internal activity.”^{২৪}

আবার পরক্ষণেই বাংলায় বলে উঠছেন—

“যত কর্ম করবি ততই নিবৃত্তি রে ততই নিবৃত্তি। সংকর্ম সৎ-দিকে নিয়ে যায়, অসংকর্ম অসৎ-এর দিকে নিয়ে যায় – দুই দিকেই নিবৃত্তি। একদিকে জড়ত্ব, অন্যদিকে পরব্রহ্মে লয়। জড়ত্ব প্রাপ্তি হলে কি নিব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়? আবার এই মানুষ হওয়া লাগে।”^{২৫}

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একস্থানে বলছেন, ২৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ—

“না, তখন আলোর সৃষ্টি হয় নাই, অন্ধকার ছিল না, সৌরজগতের উদ্ভব হয় নাই। তিনি একা ছিলেন, ইচ্ছা হ’লো সৃষ্টি করতে— আর সব সৃষ্টি হ’লো। তিনি ছিলেন আর আমি ছিলাম।”^{২৬}

এরকমই অসংখ্য বাণী, যা শুধু বাংলা ভাষায় নয় অনেক ভাষায় মুখ দিয়ে অনর্গল নির্গত হতো। সে সময় থাকতো না কোনো বাহ্য চেতনা। সন্দেহবাদীরা বহু পরীক্ষা করে দেখেছেন। বড় বড় ডাক্তারও এসে পরীক্ষা করে বলেছেন এই ব্যক্তির শরীরে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই, ইনি মৃত। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার এই অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা ঘটনার সমাধান অনাগত দিনের কোনো গবেষক হয়তো করতে পারবেন।

সংস্কৃত ভাষায়ও তাঁর অধিকার ছিল। “সংস্কৃত ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত”^{২৭} এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। তাঁর বাণীতে ও কথোপকথনে সংস্কৃত ভাষার কথা বারংবার এসেছে। সংস্কৃত ভাষায় তিনি

অনেক বাণী প্রদান করেছেন। ধর্ম বিষয়ে এ ধরনের একটি বাণী হলো— “যেনাত্ননস্তথান্যেষাং জীবনবর্ধনঞ্চাপি প্রিয়তে স ধর্মঃ”^{২৮}। বিভিন্ন দেবদেবীর স্তুতিও তিনি নিজেই সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন।

অনুকূল সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা ও বিশ্লেষণ :

‘সাহিত্য হল মানুষের দেখা বা উপলব্ধিজাত অভিজ্ঞতার ভাষাশিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি। অনুকূলচন্দ্রের বাণী বা সাহিত্যগুলো একনিষ্ঠভাবে পড়লে মনে হয়— ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে কোন আগুপুরুষ যেন তাঁর অনুসারীর উদ্দেশ্যে কানে-কানে একান্ত প্রয়োজনীয় বাণীটি উচ্চারণ করছেন। একই সংসারে পিতা-মাতা, পুত্র-পৌত্রাদি যেই পড়ুক অথবা সমাজের বিচিত্র স্তরের বিচিত্র পেশার বিচিত্র মানসিকতার প্রতিটি মানুষ যেই পড়ুক না কেন মনে হবে একজন সৎ উপদেশদাতা একনিষ্ঠভাবে একান্তভাবে কানে কানে উপদেশ দিচ্ছেন। ফলে তার হৃদয়ের কলুষতা, অজ্ঞানতা প্রভৃতির বিনাশ ঘটে। হৃদয় পরিপূর্ণ নির্মল আনন্দে ভরে ওঠে এবং এক অখণ্ড শান্তির দিকে ধাবিত হয়।

অনুকূলচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে স্বহস্তলিখিত রচনাবলী কোনো ব্যক্তি-মানুষের উদ্দেশ্যে উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি। কিন্তু, সেগুলো সার্বিক মানুষেরই সম্পত্তি। শুধু ব্যক্তিগত সাহিত্যের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকে নি। বরং, সার্বজনীন বাণী হিসেবে তা প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন— ‘সত্যানুসরণে’ দুর্বলতা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

“সর্বপ্রথম আমাদের দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে— সাহসী হতে হবে, বীর হতে হবে। পাপের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ঐ দুর্বলতা। তাড়াও, যত শীঘ্র পার, ঐ রক্ত শোষণকারী অবসাদ-উৎপাদক vampire- কে। স্মরণ কর তুমি সাহসী, স্মরণ কর তুমি শক্তির তনয়, স্মরণ কর তুমি পরমপিতার সন্তান। আগে সাহসী হও, অকপট হও, তবে জানা যাবে, তোমার ধর্মরাজ্যে টোকবার অধিকার জন্মেছে।

হটে যাওয়াটা বরং দুর্বলতা নয়কো, কিন্তু চেষ্টা না করাই দুর্বলতা। তুমি কোন কিছু করতে প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি বিফলমনোরথ হও – ক্ষতি নাই, তুমি ছেড়ো না, ঐ অল্পান চেষ্টাই তোমাকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। দুর্বলতার সময়ে সুন্দর ও সবলতার চিন্তা করিও, মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।”^{২৯}

একই কথা সার্বজনীনভাবে কঠোপনিষদে বলা হয়েছে—

“উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যায়া

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥”^{৩০}

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় অনুকূলচন্দ্র রচিত ‘সুরত-সাকী’ গ্রন্থখানির। ছোট ছোট কবিতার মাধ্যমে অনুকূলচন্দ্র তাঁর তত্ত্বাবনাকে এক জ্যোতির্ময় রূপ দিয়েছেন। যেমন— জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের। জীবাত্মা স্ব চিন্তকে স্থির রাখতে পারছে না— বিরহে বিধুর, মিলনাকাঙ্ক্ষায় অধীর। অনুকূলচন্দ্রের ভাষায়—

“শোনো লো সজনি! হৃদয়-ঘরপি!

কি কাজ কহিয়া আরো—

বাছ প্রসারিয়া বধূরে লইয়া

হিয়ার মাঝারে ধরো।”^{৩১}

আবহমান কাল থেকেই ভারতীয় সমাজে ছোট-ছোট ছড়া বা শ্লোকের অনবদ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কিংবদন্তী মহীয়সী নারী খনার কথা আমরা সকলেই জানি। তিনি জীবন ও জগৎকেন্দ্রিক ছোট-ছোট ছড়া রচনা করেছেন। লোকপরম্পরায় আজও তা জনমানসে জাজ্বল্যমান। অনুকূলচন্দ্রও তেমনি সহজ ভাব ও

ভাষায় জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় কথাগুলো তাঁর অনেক ছড়াসাহিত্য ‘অনুশ্রুতি’-তে তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা, কর্মকৌশল-উপায় প্রভৃতি অত্যন্ত শ্রুতিমধুরভাবে তিনি ছড়ার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ধর্ম, কৃষ্টি, শিক্ষা, দর্শন, জীব, জগৎ, কর্ম, মোক্ষ, জীবনাচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে রচিত ছড়াগুলি অনুশীলনে পাঠককে এক দৈবী অনুভূতির জন্ম দেয়।

দৈনন্দিন জীবনের প্রায় প্রত্যেকটি নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাথে সাথে অনুকূলচন্দ্র আমাদের প্রাচীন কৃষ্টিকেও স্মরণে রেখেছেন। এ বিষয়ে অতি পরিচিত ও প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোক—

“পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ।”^{৩২}

— এই শ্লোকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁর রচিত ছড়া—

“পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম
পিতাই তপের নন্দনা
পিতৃপ্রীতি চারিয়ে আনে
সব দেবতার বন্দনা।”^{৩৩}

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পাপাকৃষ্ট দুর্জনদের বিনাশ ও সাধুজনদের পরিত্রাণ তথা ধর্মসংস্থাপনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

“যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।”^{৩৪}

উক্ত বাণীর সাথে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় অনুকূলচন্দ্রের নিম্নোক্ত ছড়ায়—

“ধর্ম যখনি বিপাকী বাহনে
ব্যর্থ অর্থে ধায়
পূরণ পুরুষ তখনি আসেন
পাপী পরিত্রাণ পায়।”^{৩৫}

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পার্থক্য-বৈপরীত্যের সমন্বয় সাধনে নিম্নোক্ত ছড়াটিও বড় সুন্দর—

“বিজ্ঞান সাহিত্যে ভেদ করিসনে
বিজ্ঞান দেখ সাহিত্যে কোথা
সাহিত্যটা দেখ বিজ্ঞানে
এমনি দাঁড়ায় আন সমতা।”^{৩৬}

জীবন-জিজ্ঞাসার সীমাহীন প্রশ্ন ও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের গভীর বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করা হয়েছে ‘আলোচনা-প্রসঙ্গ’ নামক গল্পের ২২টি খণ্ডে। যেখানে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের সৃষ্টি-প্রলয় পর্যন্ত তুলে আনা হয়েছে, যা আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জগৎ-জীবন-প্রকৃতি সম্পর্কে অনুকূলচন্দ্রের আত্ম-উপলব্ধি অনেকটা সূত্রবদ্ধ আকারে গ্রথিত অজস্র গদ্যবাহীতে। প্রকৃতির পরিবর্তন, মানবহৃদয়ের সুগভীর তত্ত্ব প্রভৃতির ধারক তাঁর— চলার সাথী, দর্শন বিধায়না, শিক্ষা-বিধায়না, নীতি-বিধায়না, শাস্ত্রী, সম্বিতী, বিধান-বিনায়ক প্রভৃতি গ্রন্থ। সেগুলি যেন মানবের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আকর। তাঁর ভাষায়—

“সাহিত্যের মূল ভিত্তিই হচ্ছে—

জীবন ও কৃষ্টি

অর্থাৎ, কৃষ্টি যাতে জীবনকে

পোষণ-প্রবুদ্ধ করে তুলে

বিবর্তনে উৎকীর্ণ করে দেয়—

তেমনতর নিয়মনের ভিতর দিয়ে

ঘটনাকে সন্নিবেশ করতঃ

মানুষের অন্তরে

বিবর্তনী আকৃতিকে

অনুপ্রেরিত করে তোলাই হচ্ছে—

সাহিত্যের মন্ত্র চালনা।”^{৩৭}

বর্তমান সমাজের মানুষের চিত্ত বড় অস্থির। পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, ঘৃণা, রাগ, আত্মসুখাভিলাষ ইত্যাদি এর কারণ। ফলে মানুষের হৃদয় হচ্ছে বিকারগ্রস্ত, কক্ষচ্যুত। তাই উদ্ভ্রান্ত মানুষের মনে সুখ-শান্তি আনয়নে প্রয়োজন সঠিক দর্শন, সঠিক উপদেশ। অনুকূল সাহিত্যের পরতে-পরতে তারই দিক নির্দেশনা রয়েছে। শুধু একক মানুষের জন্য এই উপদেশ নয়। পারিবারিক, সামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুকূল সাহিত্যের মর্মার্থ উপলব্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজের ধর্মে, বর্ণে, গোষ্ঠীতে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত-অস্থিরতা বিরাজ করছে তার সঠিক সত্যানুসরণের জন্য অনুকূল-বাণীগুলো প্রকৃতই অপরিহার্য। সহজ-সরল ভাষায় কখনো গুরুগম্ভীর ভাষায়, কখনো দার্শনিক পরিভাষায় সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দারিদ্রের জন্য তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তার একমাত্র লিখিত রূপ তাঁর রচনাবলী। অনুকূল-রচনাবলীর এই শব্দশক্তির মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বের মানুষের সাত্ত্বিক উন্নতি হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনকে আরও সুন্দর করে শান্তিময় জগৎ বিনির্মাণে এসব বাণীগুলি তথা অনুকূল সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার ও গবেষণার অতি প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

- ^১ প্রশান্তকুমার বৈদ্য, *সেই জীবন শিল্পী, ১ম খণ্ড*, (দক্ষিণ ২৪ পরগণা: অসীমা মিদার, ২০০৩), পৃষ্ঠা-১১।
- ^২ অনুকূলচন্দ্রের জন্মস্থান হিমাইতপুর থেকে সৎসঙ্গের সৃষ্টি। পরে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে সৎসঙ্গের দীক্ষিত অনুসারী সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষের বিহার (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) সহ প্রতিটি রাজ্যে সৎসঙ্গের অনুসারী রয়েছে। অখণ্ড ভারতবর্ষের সৎসঙ্গীরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীবন-জীবিকার জন্য গিয়েছেন। ফলে, সেখানেও সৎসঙ্গে নিয়মানুসারে দীক্ষাগ্রহণ ও চর্চা চলছে। যেমন— যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স, আফ্রিকা, সৌদিআরব, আরব-আমিরাতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এভাবে সৎসঙ্গের দীক্ষিতজন ও পারিবারিক সদস্য সবমিলে এই সংখ্যা ১৫ কোটির অধিক (আনু.) রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।
- ^৩ রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস* (কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, অখণ্ড সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৪), পৃষ্ঠা-৫০৩।
- ^৪ পরমেশ চৌধুরী, *হিন্দু জাগরণঃ বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ* (কলিকাতা: জি সাহা, ১৪০৭), পৃষ্ঠা-৮৩।
- ^৫ সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র* (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯০), পৃষ্ঠা-১৬।
- ^৬ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুপ্রাণিত ১ম খণ্ড* (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৩), পৃষ্ঠা-২৬৪।
- ^৭ মনোয়ার হোসেন জাহেদী, *শতাব্দীর ছায়াপথে এডওয়ার্ড কলেজ* (পাবনা: মনোয়ার হোসেন জাহেদী, ১৯৮৯), পৃষ্ঠা-৩৫।
- ^৮ শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সংজ্ঞা সমীক্ষা* (সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, দেওঘর-বিহার, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা-১১।
- ^৯ রবীন্দ্রনাথ সরকার, *অনুকূল ভাবনায় জন্মভূমি-তীর্থভূমি* (পাবনা, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮), পৃষ্ঠা-৩।
- ^{১০} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ* (পাবনা: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৪১৪), পৃষ্ঠা-২৭।

- ^{১১} সতীশচন্দ্র জোয়ারদার, *শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭৫।
- ^{১২} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৭৪), সাহিত্য, ‘সাহিত্যসামগ্রী’, পৃ-৩৪৭।
- ^{১৩} শ্রীশচন্দ্র দাশ, *সাহিত্যসন্দর্শন*, ষষ্ঠ সংস্করণ (ঢাকা: বর্ণ বিচিত্রা, ১৯৯৫), পৃ-২১।
- ^{১৪} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*, প্রাগুক্ত, ভূমিকা।
- ^{১৫} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, অবতরণিকা।
- ^{১৬} *তদেব*, পৃষ্ঠা-২৮২।
- ^{১৭} *তদেব*, পৃষ্ঠা-২৮৩।
- ^{১৮} *তদেব*, পৃষ্ঠা-২৮৪।
- ^{১৯} *তদেব*, পৃষ্ঠা-৩২।
- ^{২০} *তদেব*, পৃষ্ঠা-৩১।
- ^{২১} রবীন্দ্রনাথ সরকার, *অনুকূলকথা* (পাবনা: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০১২), পৃষ্ঠা-৬৮।
- ^{২২} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অমিয়-বাণী* (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫), পৃষ্ঠা-৬৫।
- ^{২৩} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *নানা প্রসঙ্গে* ৪র্থ খণ্ড (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ২০০৩), ভূমিকা।
- ^{২৪} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *পূণ্যপুঁথি* (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা-৪৬।
- ^{২৫} *তদেব*, পৃষ্ঠা-৪৬।
- ^{২৬} *তদেব*, পৃষ্ঠা-৫২।
- ^{২৭} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *দীপরক্ষী*, ৫ম খণ্ড (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৪০২ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা-১৭৪।
- ^{২৮} রবীন্দ্রনাথ সরকার, *বাণী-সহস্র* (পাবনা: সুশ্রুত প্রকাশন, ২০০৮), পৃষ্ঠা-৩০।
- ^{২৯} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সত্যানুসরণ*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১১।
- ^{৩০} মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, *উপনিষদ ভাবনা* (কলকাতা: শ্রীমহানামব্রত কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ২০০৩), পৃষ্ঠা-১৮৩।
- ^{৩১} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *সুরত সাকী* (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৩৯৪), বাণী সংখ্যা-২।
- ^{৩২} শ্রীকুমার দেব মুখোপাধ্যায় সম্পা., *হিন্দু-কর্ত্তহার* (চুঁচুড়া: বুধোদয় যন্ত্র, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা-৮০।
- ^{৩৩} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি*, ৩য় খণ্ড (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৪১২), পৃষ্ঠা-৪৭।
- ^{৩৪} শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ সম্পা., *শ্রীগীতা* (কলিকাতা: ওয়েব ইম্প্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩), পৃষ্ঠা-১০২।
- ^{৩৫} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি ১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৯৩।
- ^{৩৬} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *অনুশ্রুতি ২য় খণ্ড* (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৪১২), পৃষ্ঠা-১৩৬।
- ^{৩৭} শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র, *শিক্ষা বিধায়না* (দেওঘর-বিহার: সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৯), পৃষ্ঠা-২৫৬-৫৭।